ছন্দ যতি মিল

ধনঞ্জয় বৈরাগী

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৯
(২২০০)

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
ধীরেন সিমলাই
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ফেয়ার প্রিন্ট

বাঁধাই
ইউনিয়ন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

দাম : ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

এই লেখকের ঃ

এক মুঠো আকাশ

মধুরাই

বিদেহী

মঞ্জকন্যা

দুয়োরাণী

নাটক

ধৃতরাষ্ট্র

রুপোলী চাঁদ

এক মুঠো আকাশ

এক পেয়ালা কফি

আর হবেনা দেরী

রজনীগন্ধা

অঘটন আজো ঘটে

নাট্যগুচ্ছ

গল্প

ছিলেন বাবুর দেশে

আমার অনেক আদরের বোন

রমা

ও পরম প্রীতিভাজন ভগ্নিপতি

আঁদ্রে সেরুয়ে

যাদের মধুর দাম্পত্য জীবন

ছন্দ যতি মিল

লিখতে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছে

তাদেরই হাতে তুলে দিলাম

আমার এই স্নেহোপহার।

— রচনাকাল —

আরম্ভ ঃ অগস্ট, সেপ্টেম্বার, ১৯৫৮ লণ্ডন

ব্যাপ্তি ঃ সেপ্টেম্বার, ১৯৬০ — জুন, ১৯৬১ কলকাতা

শেষ ঃ জুলাই, ১৯৬১

এই উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোথাও কোন সাদৃশ্য নিতান্ত আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত ॥

সারা সপ্তাহ ধরে একঘেঁয়ে অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে আর কাগজের নিরাশ করা আবহাওয়া সংবাদ পড়ে, স্যাঁতস্যাঁতে মন নিয়ে, সপ্তাহ শেষের দু'দিন ছুটিতে বাইরে যাবার উৎসাহ কেউই বিশেষ পায়নি বলেই তাদের ঠাট্টা করার জন্যে যেন হঠাৎ শনিবারের সকাল বেলাতেই আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল হয়ে গেল, রোদে ঝলমল করে উঠল ঘন সবুজ গাছ আর কচি কলাপাতা রঙএর ঘাস, যা বোধ হয় বছরের মধ্যে ন'মাস শীতে কেঁপে কেঁপে ম্যালেরিয়া রোগে ভোগা তরুণের মত অল্প বয়েসে বুড়ো হয়ে বসে থাকে।

এমন একটি আশ্চর্য পরিষ্কার সকাল পাওয়া এদেশে যে কতখানি ভাগ্যের কথা, তা হাড়ে হাড়ে বোঝে যারা বারমাস বাস করে লণ্ডনে। যদিও এখানে চারটে ঋতুর নাম শোনা যায় কিন্তু বছর জুড়ে দরবার করে শীত জুজু। অন্যরা লুকিয়ে চুরিয়ে ঘোমটা সরিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারলেও বেশীক্ষণ টিকতে পারে না; জুজুর ভয়েই অস্থির। ক্যালেণ্ডারের তারিখ হিসেবে একদিন সরকারী গ্রীষ্মকাল ঘোষণা করা হয় বটে তবে তার সঙ্গে প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। দুঃখ হয় মেয়েদের জন্যে, হাল ফ্যাশানের প্যারিসের বুকপিঠ হাতকাটা জামা পরে পুরুষদের চোখে পুলক কিম্বা স্বামীদের মনে ঈর্ষা জাগাবার সুযোগ পায় না তারা, আলমারি খুলে গ্রীষ্ম সজ্জাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বিরহিণী প্রিয়ার মত।

তবু এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ না বলে কয়ে রোদভরা দিন এসে হাজির হয়; পরমায়ু তার বেশীক্ষণের না হলেও, হাসি এনে দেয় সকলের মুখে। (এমন কি ইংরেজরাও হাসে, যদিও তাদের নামে বদনাম শোনা যায় তারা হাসতে জানে না) স্কুলের ছুটি থাকলে গরীব ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলা করে। নকল বন্দুক দেখিয়ে অন্যকে ভয় দেখায়, যুদ্ধ করার ভান করে। বাড়ির বউ বাজার করতে বেরিয়ে ঠেলা গাড়িতে বাচ্চা সমেত গপ্প করতে লেগে যায় অন্য বউয়ের সঙ্গে, হয়ত আর এক বাড়ির কেচ্ছা নিয়ে। চিরকেলে মেয়েলী গল্প। মিসেস অমুকের তৃতীয় বার ডিভোর্স করা যে উচিত হয়নি তারই রায় দিচ্ছে দু'জন গৃহস্থ বধূ, কে বলতে পারে এও সেই আঙুর ফল টকের মত কোন গল্প কিনা। মধুচন্দ্রিমায় আনন্দে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছে যে দম্পতি, তারা এমন একটি দিনে মাতাল হয়ে ওঠে। আর যাদের এখনও বিয়ে হয়নি, পূর্বরাগ চলছে মাত্র তারা যে কোন অছিলায় অফিস কামাই করে যুগলে বেরিয়ে পড়েছে, সামর্থ্য অনুযায়ী পিকনিকের বাক্স নিয়ে হয়ত হ্যাম্পস্টেড্ হিথেই দিন কাটাবে। বড়রাও আজ বাদ যায় না, টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে অফিস যাবার পথে ফুল কিনে বুকে গোঁজো হয়ত একটা কারনেশান। দুপুরে খাবার সময় চট করে কিছু গিলে ফেলে বড় রাস্তায় রোদের মধ্যে বেরিয়ে বড় বড় দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে window shopping করে। আবার বাড়ি ফেরার সময়, তখনও দিন ভাল থাকলে একটা কফি বারে ঢুকে, দুধ চিনি না দিয়ে এক কাপ কফি খায় চায়ের বদলে। নিজের অজান্তে ভাল দিনের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। বুড়ো বুড়ীর দল আজ সকাল থেকে পার্কে গিয়ে বসে এক তাড়া খবরের কাগজ নিয়ে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা থেকে নাকের ডগায় রাশিয়ার হুমকি পর্যন্ত সব কিছু পড়া চাই, সেই সঙ্গে পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে কোন লর্ড তার লেডীকে সরিয়ে নাম করা নাইট ক্লাবের টুকরো কাপড় পরা বাইশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছে,

সে খবরের চার্ট নিও। ঘরে বসেও এগুলো যে পড়া যায় না তা নয়, কিন্তু এত ভাল লাগে না। বিশেষ করে সামনের বেঞ্চির যে ভদ্রমহিলা কুকুর নিয়ে বেড়াতে এসেছেন তিনি যেন কয়েকবারই ফিরে তাকালেন। সত্যি এমন দিনে নিজেকে খুব বেশী বুড়ো মনে হয় না। প্রকৃতির যাদুকর, ঝকমকে রোদ ভরা দিন, সোনার কাঠি বুলিয়ে দশটা বছর বয়েস কমিয়ে দিয়েছে।

আজব শহর লণ্ডন। যেমনি লম্বা চওড়া তেমনি পুরোন, কবে এর পত্তন হয়েছিল ঐতিহাসিকরা তার খবর জানেন। দেশবিদেশের লোক এসে শহরে বাস গেড়েছে, কালো সাদা হলদে কত রকম তাদের রঙ তার চেয়ে আরও রঙীন বেশভূষা। সকলের রুচি অনুযায়ী রেস্তরাঁ চীন ভারত ফরাসী তুর্ক কেউ বাদ যায় না। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদেশীদের বাস। বাথারহিলে ডেনরা, স্পিটালফিল্ডে ফরাসী, কারকেন-ওয়েলে ইটালীয়ান, লাইম হাউসে চীনেরা বসতি গেড়েছে কত বছর থেকে। তার ওপর হিটলারের তাড়ায় পালিয়ে এসে জার্মান ইহুদীরা তো হ্যাম্পস্টেড্‌টা দখল করে বসে গেছে বললেই হয়। ভারতীয়ের সংখ্যাও কম নয়, ইস্ট এণ্ডের অশিক্ষিত গরীব খালাসীদের কথা বলছি না, পড়ুয়া ছেলের সংখ্যাও যে অনেক, ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত শহরে। ভারতীয় রেস্তরাঁর সংখ্যা একের পর এক বাড়ছে দেখে সন্দেহ হয় ভারতীয়ের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়ছে, না দেশী রান্নার রস পেয়েছে ইংরাজদের স্বাদবিহীন জিভ যা শুধু সেদ্ধ খেতেই অভ্যস্ত।

এমন একটি চমৎকার খটখটে দিন ভারতীয় ছেলেদের মনেও উল্লাস এনে দেয়। তাদের মনে পড়ে দেশের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা, কচুর ঘন্ট আর শাকের চচ্চড়ির কথা, সেই সঙ্গে রকে বসে ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা মারার কথা। আহা কবে আবার তারা দেশে ফিরবে, কবে সকলের সঙ্গে মাটিতে বসে, হাত দিয়ে চটকে ভাত আর মাছের ঝোল খাবে।

প্রত্যেক শনিবারের মত আজকেও দেরি করে উঠে সৌরেন যখন গ্যাসের রিঙে চায়ের জল বসালো তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। অন্য শনিবার দেরি করে উঠলে কোন ক্ষতিই হয় না, কিন্তু আজ পর্দা সরাতেই যেই এক ঝলক গরম রোদ এসে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল, সৌরেনের মন খারাপ না হয়ে পারলো না। এতক্ষণ না ঘুমিয়ে আগে উঠে পড়লে রোদটা সে উপভোগ করতে পারত। এমন দিনে বাড়ি বসে থাকলে পাপ হবে। সৌরেন চা না ভিজিয়েই কয়েকটা পেনী সংগ্রহ করে, ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে, নীচে নেমে গেল টেলিফোন করতে। নামতে নামতেই দু'একজন বুড়ীর সঙ্গে দেখা, অভ্যাস মত সৌরেন গুড মর্নিং বলে গাল কুঁচকে হাসে।

সৌরেন যাকে চাইছিল সে-ই টেলিফোন ধরল, লীলা চৌধুরী।

—আমি সৌরেন কথা বলছি—কেমন আছ লীলা?

—খবর নেবার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। ভালই আছি।

—আজ দিনটা বড় চমৎকার, না?

—খুব সুন্দর রোদ উঠেছে। তুমি কি এই উঠলে নাকি?

—হ্যাঁ, কাল বাড়ি ফিরতে তিনটে বেজে গেল।

—তাই নাকি, কোথায় গিয়েছিলে?

—মীনাক্ষীর ফ্ল্যাটে। খুব জমেছিল। পীয়ের, আমি—

—সরোজদার বাড়ি আজ রিহার্সাল, মনে আছে তো?

—সেতো বিকেলের দিকে, নিশ্চয় যাবো। সৌরেন একটু থেমে বলে, 'আমি বলছিলাম আজ সকালটা কি করছ?

—কেন বলতো ?

—কোথাও খেতে গেলে হতো।

—আমি যে আরেক জায়গায় যাবো কথা দিয়েছি।

—তাই নাকি? তাহলে আর কি হবে, সৌরেন হতাশ হয়।

—দেখা তো হবেই রিহার্সালে।

—তা হবে। আচ্ছা লীলা, enjoy yourself বাই, বাই।

—বাই, বাই।

লীলা চৌধুরীর গোলগাল মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল সৌরেনের; শ্যামলা রঙের ওপর টকটকে লাল লিপস্টিক মাখা ঠোঁট, ইংরিজী কায়দায় চুল কেটে ডোনাট দিয়ে খোঁপা বাঁধা। এরা সেই জাতের মেয়ে যারা দেশে ছিল পাকা মেম সাহেব, বাড়িতেও ইংরিজীতে কথা বলত আর ক্লাবে যেত বলরুম নাচের আকর্ষণে অথচ বিলেতে এসে এরা দেশী হবার চেষ্টা করে পুরো মাত্রায়। লীলা আর প্রমীলা দুই বোন। প্রমীলা ছোট, তবে দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানটা খুব বেশী নজরে পড়ে না। এদের বাবা মারা গেছেন কিছুদিন হল, ব্যাংকে অনেক টাকা রেখে। দু' জনেই সাবালিকা তাই মা বাধা দেননি লন্ডনে আসায়। দু'জনেই কাজ করে, বাড়ি থেকে পয়সা পাঠাতে হয় না, তাছাড়া বুঝি কিছু পড়েও, অন্তত বলে তো তাই।

সৌরেনের সংগে লীলার যে কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে তা নয় তবে এমন একটি সুন্দর দিনে রেস্তরাঁয় বসে বসে গল্প করতে মন্দ লাগত না। দেশে অবশ্য মেয়েদের সংগে মেশার কোন সুযোগই ছিল না। একমাত্র বৌদির ছোট বোন অহনা মাঝে মাঝে আসত বটে তবে দু' দন্ড তাকে একলা পাবার সুযোগ ছিল কোথায়? এদেশে এসে সে বুঝেছে সময় কাটাতে হলে মেয়েদের মত সংগী আর কেউ নেই। কোথা দিয়ে যে সময় গলে যায় বুঝতে দেয় না, তার মধ্যে কত রকমের গল্প আর মান অভিমান।

তাছাড়া একথাও সত্যি, লীলাদের জাতের মেয়েদের সংগে আলাপ করার সুযোগই বা কোথায় দেশে। সাধারণ গেরস্থ ঘরের অতি সাধারণ ছেলে সৌরেন, যার না আছে টাকার জোর না লেখাপড়ার। কোন রকমে এককাপিঠের জাহাজ ভাড়া যোগাড় করে দুর্গা বলে পাড়ি দিয়েছিল, লন্ডনে এসে যদি চাকরি না পেত তাহলে হয়েছিল আর কি। ইচ্ছে ছিল কিছু একটা পড়ার, transport school-এ নামও লিখিয়েছিল, তবে এ ক' বছরের মধ্যে একটাও পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, আর হবেও বলে মনে হয় না। লেখাপড়ার অভ্যেসটা একবার চলে গেলে আবার তা ফিরিয়ে আনা সহজ ব্যাপার নয়।

লন্ডনে আসার আগে যার সংগে সৌরেনএর আলাপ ছিল সে মীনাক্ষী। তারাও বড়লোক, লীলাদের মত না হলেও মীনাক্ষীর মামা নামজাদা উকিল, বালীগঞ্জে প্রকান্ড বাড়ি। তবে একপুরুষে পয়সা বলে এখনও ব্যবহারে টাকার ঝাঁঝ পাওয়া যায় না। মীনাক্ষীর দাদা সৌরেনের সংগে এক কলেজে পড়াশুনা করেছিল, সেই সুবাদেই যাতায়াত। সৌরেন আজ অনায়াসেই মীনাক্ষীকে নিমন্ত্রণ করতে পারত কিন্তু কাল ওর ফ্ল্যাট থেকে এত রাত্রে সবাই উঠেছে যে এখনও পর্যন্ত মীনাক্ষী

হয়ত ঘুম থেকে ওঠেনি।

তাই লীলাকে না পেয়ে সৌরেন ফোন করল রজত বোসকে।

রজত বললে, যেতে পারি তবে একটা শর্তে।

—কি শুনি?

—His, his, who's who's, মানে যার যার নিজের খরচায়।

সৌরেন সানন্দে রাজী হল, তাহলে কোথায় আসবি?

—একটার সময় পিকাডেলী, আন্তর্জাতীয় ঘড়ির সামনে।

ফোন সেরে সৌরেন যখন ওপরে উঠে এল চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার গ্যাস জ্বালাতে হবে। নজরে পড়ল টেবিলের ওপর দেশ থেকে আসা কালকের এয়ার লেটারটা পড়ে রয়েছে, টেনে নিয়ে আরেকবার পড়ল। মা লিখেছেন এবার ফিরে যাবার জন্যে।

সৌরেন চিঠি পড়েই নিজের মনে হাসে, দেশে ফিরে যেতে কি তারও ইচ্ছে নেই, কিন্তু ফিরে গিয়ে চাকরি পাবে কোথায়? পেলেও আবার হয়ত সেই প্রথম ধাপ থেকে শুরু করতে হবে, এ ক'বছরের অভিজ্ঞতার কোন দামই সে পাবে না।

যদিও লণ্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় সাহিত্যের পাতায়, তবে যে জায়গাটা নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাতামাতি করেছে রোম্যাণ্টিক লেখকরা সে হলো সোহো। এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিপন্না সুন্দরী যুবতী আর সন্দেহ জাগানো বিদেশীদের যেসব রহস্যজনক কাল্পনিক গল্প লেখা হয়েছে, পড়ে মনে হয় সোহোতে বোধহয় কেউ বাস করে না, শুধু রেস্তরাঁ আর নাইট ক্লাবেরই আস্তানা।

আসলে কিন্তু সোহো লণ্ডনের হৃৎপিণ্ড পিকাডেলী সার্কাসের সঙ্গে লাগোয়া: রিজেণ্ট স্ট্রীট, অক্সফোর্ড স্ট্রীট, আর চেরিং ক্রস রোডের মাঝখানের ছোট্ট জায়গা। লণ্ডনের চারদিকে বিদেশীদের বসতি থাকলেও সোহোতে এসে সকলে যেন স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, সে ফরাসী, ইটালীয়ান, ভারতীয় যেই হোক না কেন। এখানে সব দেশের রেস্তরাঁ আছে, সেখানে নানা স্বাদের খাবার। কত রকমারি বিদেশী দোকান কত অচেনা ভাষার খবরের কাগজ। এখানে মুদির দোকানে পাওয়া যায় রকমারি রান্নার মশলা, যা বিলিতি কায়দায় প্যাকেটে ভরা নয়, চটের থলির ভেতর থেকে বার করে কাগজে মুড়ে দেয়। এখানে কফির আদর বেশী, হঠাৎ কেউ চা চাইলে অন্যেরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

বেশীর ভাগ লণ্ডনবাসীই জানে সরু গলি আর বিচিত্র গন্ধ ভরপুর এই সোহোতে কম পয়সায় পেটভরে ভাল খাবার পাওয়া যায়, যদি অবশ্য ঠিকমত দোকান জানা থাকে। তা না হলে গলা কাটা যাবারও সম্ভাবনা আছে, বাইরে থেকে ভাঙ্গা ছোট্ট দোকান কিম্বা তার নড়বড়ে চেয়ার টেবিল দেখে বোঝবার যো নেই কি পয়সা নেবে একটা মাংসের ডিশ সার্ভ করতে।

রজত বোসের কাছে কিন্তু সোহো খুবই পরিচিত জায়গা। পিকাডেলী থেকে সৌরেনকে সংগ্রহ করে, দু'তিনটি মোড় বেঁকেই সে হাজির হল ছোট্ট একটা কফি বারের সামনে। বেশী লোক ছিল না, কোণের দিকে দু'জন বিদেশী বসে কফি নিয়ে গল্প করছিল। তাদের পাশ দিয়ে রজতরা নেমে গেল নীচে, বেসমেণ্টে। এ ধরনের জায়গায় সৌরেন বড় একটা আসেনি, তাই ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পুরোন ইট বার করা ঘর তারই সঙ্গে মানানসই জর্জীয়ান আমলের লোহার

ফিটিংস, যা থেকে আলো ঝোলান হয়েছে। চেয়ার নেই, তার বদলে পিঠ উঁচু কাঠের বেঞ্চ। দু'জন পাশাপাশি বসবার। টেবিলের পায়াগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সরু তালগাছের গুঁড়ি কেটে বসিয়ে দিয়েছে।

রজত হেসে জিজ্ঞেস করে, কেমন, জায়গাটা ভাল লাগছে না?

সৌরেন কি বলবে ভেবে পায় না, অন্যরকম মানে অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

—আমার কিন্তু এ জায়গাটা খুব প্রিয়, প্রায় রোজই একবার না একবার ঢুঁ মেরে যাই। আমার কি মনে হয় জানিস সৌরেন, এ জায়গাটার একটা আভিজাত্য আছে, যা নেই ওয়েস্ট এণ্ডের আধুনিক ফ্যাশানের রেস্তরাঁগুলোয়। এখানে আমরা অনেক সহজ হতে পারি, ইচ্ছেমত চেঁচিয়ে গল্প করতে পারি, বিলিতি এটিকেটের ধার ধারতে হয় না কাউকে।

একথা রজতের বলা সাজে, কারণ তার পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেও এমন একটা মৌলিকতা আছে যা হয়ত বিলিতী ফ্যাশনের গজকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। কিন্তু সোহোর এই রেস্তরাঁয় বোহেমিয়ান আবহাওয়ার সঙ্গে চমৎকার মিলে যায়। রজত সাধারণ মাঝারি আকৃতির বাঙালী, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি আর মানান সই গোঁফে কিন্তু চেহারাটার অনেকখানি বদলে গেছে। বাদামী রঙের কর্ডের প্যাণ্টের ওপর ঘন নীল হাত লম্বা উঁচু গলার পুল ওভার, চুলগুলো উস্কোখুস্কো তেল পড়েনি অনেকদিন। কালো চুল লাল হয়ে গেছে।

নিঃখুত ভাঁজ করা কলকাতায় বানানো নীল সার্জের স্যুট পরে সৌরেনকে রজতের কাছে যেন বড় বেশী কেতা দুরস্ত আর আড়ষ্ট বলে মনে হয়। দর্জি যদিও বই-এর ছবি দেখেই স্যুট বানিয়েছে তবে বইটা বোধহয় বছর দশেক আগেকার, যুদ্ধের পরেই ইংলণ্ডে যে ধরনের স্যুটের ফ্যাশান উঠেছিল এতদিন বাদে তা কলকাতায় আমদানী হয়েছে। চক্‌চকে কালো জুতো, সাদা শক্ত কলার আর নীলের উপর ঘন নীল স্ট্রাইপ কাটা টাই পরে সাহেব সাজার প্রাণপণ চেষ্টা করলেও সৌরেনকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতই দেখায়।

রজত আর সৌরেন কলকাতার একই কলেজের ছাত্র। রজত হিস্ট্রীতে অনার্স পেয়ে লণ্ডনে চলে এসেছিল পি এইচ্ ডি করতে। তখন থেকে নাগাড়ে দশ বছর সে এদেশেই আছে যদিও পি এইচ্ ডির থিসিস্ এখনও দেওয়া হয়নি। সৌরেন লণ্ডনে এসে রজতের হদিশ পায়নি বহুদিন; মাত্র মাসখানেক আগে হঠাৎ এক টিউব স্টেশনে ওদের দেখা, তারপর দিন দুই ওরা মিলিত হয়েছে।

রজত পেছনের পকেট থেকে পাইপ বার করে ধরাবার চেষ্টা করে। বলে, সৌরেন তুমি স্বচ্ছন্দে সিগারেট খেতে পার, আমার ওটা চলে না।

সৌরেন সিগারেট ধরাল, বড় বেশী দাম।

রজত হেসে ওঠে, সেই জন্যেই তো পাইপ ধরেছি, অনেক সস্তায় হয়ে যায়, বিশেষ করে কাউকে অফার করতেও হয় না।

—আশ্চর্য! তুই ঠিক আগের মতই আছিস্।

—বদ্‌লাবার কোন কারণ ঘটেনি তো।

—তা নয়, দশ বছর এদেশে রয়েছিস। ভেবেছিলাম হয়ত সাহেব হয়ে গেছিস।

—সাহেব হবার জন্যে তো এদেশে আসিনি, এসেছিলাম পড়াশুনো করতে, করেছি।

—পি এইচ্ ডির থিসিস্‌টা দিলি না কেন?

—দিয়ে কি হতো?

—আহা দেশে ফিরে কাজে লাগত, অন্তত ভাল কলেজে একটা হিস্ট্রীর প্রফেসার হতে পারতিস্।

রজত পাইপটা দাঁতে কামড়ে বলে, সেই জন্যেই তো দিইনি।

—মানে?

—গরু চরাবার সাধ নেই।

—তবে মিথ্যে এদেশে এলি কেন?

—মিথ্যে কেন হবে? পড়েছি খুব। শুধু তক্‌মাটা লাগাই নি। সে একরকম ভালই।

কথা চাপা পড়ে গেল। ওয়েট্রেস্ এসেছিল অর্ডার নিতে, রজত তাকে বললে, একটু পরে এস এলিস্, আমরা মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি।

মেয়েটা চলে গেল। সৌরেন জিজ্ঞেস করে, মারিয়া কে রে, তোর বান্ধবী?

—একরকম তাই।

সৌরেন আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, কেমন লাগছে এদেশে থাকতে?

—খুব ভাল।

—কোন দিক দিয়ে?

—ইতিহাসে যা পড়েছি তারই পুনরাবৃত্তি দেখ্‌ছি, ভারী মজা লাগছে।

—কি বলছিস বুঝতে পারলুম না।

রজত সোজা হয়ে বসে, চোখ দুটো ছোট ছোট করে ঠোঁট ফাঁক না করেই হাসে, বলে, গ্রীক্ সাম্রাজ্য, উঠল, পড়ল তারপর এল রোমান সাম্রাজ্য তাদেরও উত্থান পতন দেখলাম। এখন বৃটিশ সাম্রাজ্য, উঠেছিল কিন্তু কালের নিয়মে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছে, দেখতে ভারী মজা লাগে।

সৌরেন কোন কথা বলে না, রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—এ কেমন জানিস, জো লুই-এর মত বক্সিং চ্যাম্পিয়ান, বছর কয়েক শ্রেষ্ঠ মল্ল বীর থেকে, যখন হারতে শুরু করে, দর্শক হিসেবে তখন দেখতে যেরকম লাগে আর কি। নতুন এক নাম না জানা বক্সারের ঘুষিতে দাঁড়াতে পারছে না জো লুই, পড়ে পড়ে যাচ্ছে, তবু মনের জোর করে, সম্মানকে আঁকড়ে ধরে থাকার লোভে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। হয়ত মুখ ফেটে রক্ত পড়ছে। ওঠো, ওঠো, বলে অনেকে উৎসাহ দিচ্ছে করুণা করে কিন্তু সে পারছে না, তার দম ফুরিয়ে গেছে আর যেন শক্তি নেই।

রজতের প্রত্যেকটা কথা ওজন করা, একটা বিরাট সত্য যা সে বোঝবার চেষ্টা করেছে তাই যেন ভাষায় প্রকাশ করছে। এই ধরনের মারাত্মক কথা সে বলে কলেজ জীবনের শুরু থেকে, তবে এতটা জোর দিয়ে নয়। এ জোর সে পেয়েছে এ দেশে এসে, মন দিয়ে পড়াশুনো করে।

পাইপের ছাইটা জুতোর গোড়ালীতে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে রজত আবার বলে—এখন আর এক রাউন্ড বাকী আছে।। ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ান কে হবে তাইতেই বোঝা যাবে। কথার জোর নয়, ঘুষির জোর কার বেশী। আমেরিকার না রাশিয়ার?

সৌরেন এতক্ষণে কথা বলে, তুই কি বলছিস তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগবে?

—লাগলেই হলো, তখুনি বোঝা যাবে পৃথিবীটা নীল হবে না লাল?

—তুই বুঝি নীল রক্ত লাল করার দলে?

রজত হাসে, আমি কোন দলেই নই, ইতিহাসের ছাত্র। ঐতিহাসিক কোন দলে নাম লেখাতে পারে না।

সৌরেন একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, দেশে ফিরবি না?

—ইচ্ছে নেই।

—শেষ পর্যন্ত বিদেশেই মরবি নাকি?

—যদি মরিই ক্ষতি কি?

—তোর কোন ন্যাশনাল ফিলিংস নেই?

—ওটা মনের সঙ্কীর্ণতা।

—তাহলে তোর পরিচয় কি হবে?

—আমি মানুষ।

—ধর্মে বিশ্বাস করিস?

—ধর্ম হল এক ধরনের ব্যবসা। যা করে অনেক পুরুত, অনেক দোকানদার, অনেক প্রকাশক দিব্যি দু'পয়সা রোজগার করছে।

সৌরেন অস্বস্তি বোধ করে, তার মানে ভগবানও মানিস না?

—মানবার মত কোন যুক্তি পাইনি।

—গীতা পড়েছিস?

—গীতা কেউ পড়ে না।

—কি বলছিস আবোল তাবোল?

রজত আবার সেই রকম ঠোঁট ফাঁক না করেই হাসে, হিন্দুদের গীতা আর ক্রীশ্চানদের বাইবেল এই দুটো বই বোধহয় ছাপা হয় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু মজা কি জানো, পড়ে সব চেয়ে কম লোক। গীতার প্রয়োজন চিতায় পোড়াবার জন্যে আর বাইবেলের দরকার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে 'সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না' হলফ নেবার সময়।

সৌরেনের কেমন সন্দেহ হয় রজত বোধহয় শুধু কথা বলার খাতিরেই উল্টো পাল্টা বকছে। মনের থেকে এ সব বিশ্বাস করে না। জিজ্ঞেস করে, তোর রাজনৈতিক মতামতটা এবার শুনি, প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস করিস ত?

—করি আবার করি না-ও।

—তার মানে।

—প্রজাতন্ত্র নির্ভর করছে প্রজাদের অবস্থার উপর। যে দেশে শতকরা নব্বুই জন নিরক্ষর সেখানে প্রজাতন্ত্র একরকমের রাজনৈতিক প্রহসন।

—তার মানে তুমি চাও ডিক্টেটরশিপ?

রজত এবার হো হো করে হাসে, ডিক্টেরশিপ্ কে না চায় সৌরেন, ছোটর মধ্যে ভাবো না, তুমি, আমি সবাই তো এক একজন ক্ষুদে ডিক্টেটর, আমাদের দরকার শুধু একপাল নিরীহ শিপ্, (ভেড়া), ব্যাস্ তাহলেই ডিক্টেটরশিপ্ চলবে পুরো মাত্রায়।

এবার সৌরেনও হাসে, তোমার কোন কথাটা যে ঠাট্টা আর কোনটা সিরিয়াস্ তা বোঝা মুশকিল।

কথা হয়ত চলত—এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে একরকম লাফাতে লাফাতে মারিয়া নেমে আসে। রজত পরিচয় করিয়ে দিতেই সে হাত জোড় করে ভারতীয় কায়দায় ক্ষমা চায়, আজ আমাকে মাপ করতে হবে মিঃ লাহিড়ি। আমি আপনাদের সঙ্গে

টেবিলে যোগ দিতে পারব না।

সৌরেনের আগে রজতই কথা বলে, কেন, হঠাৎ আবার কি হলো।

—মিঃ গ্র্যানথাম-এর সঙ্গে খেতে যেতে হবে।

—বা, বা, আমরা যে তোমার জন্যে এতক্ষণ না খেয়ে বসে আছি।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু কি করব রজত, বুঝতেই তো পারছ, মিঃ গ্র্যানথাম আমাদের মালিক উনি নিজে খেতে বললেন—

রজত গজরাতে থাকে, বুড়োর কিন্তু এ ভারী অন্যায়, আগে থেকে তার বলা উচিত ছিল।

মারিয়া নরম চোখে রজতের দিকে তাকায় প্লীজ, রজত, তুমি বোঝবার চেষ্টা কর, এত আমার পক্ষে একটা চান্স, উনি ইচ্ছে করলেই আমাকে পারমানেন্ট করে নিতে পারেন।

রজত কিন্তু তখনও বুঝতে চায় না, সৌরেনের কাছ থেকে দু'মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে মরিয়ার সঙ্গে সমানে বকর বকর করে।

সৌরেন মারিয়াকে ভাল করে লক্ষ্য করে, ওরও সাজ পোশাকটা রজতের মতই অদ্ভুত। ব্লু জিনের প্যাণ্ট পরেছে, পায়ের তলার দিকটা সরু, অনেকটা মোগল আমলের সেপাই সাজতে যে ধরণের পাজামা পাঠায় পেশাদার ড্রেসাররা। গায়ে একটা ঢিলে কোর্ট, বুকের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা, কাঁধের সঙ্গে লাগানো হুড্ ঝুলছে, দরকার হলে বৃষ্টির সময় মাথায় দিতে পারে। চুলটা বেশ ভাল, ঘাড় পর্যন্ত ঢেউ খেলানো। আজকালকার ফ্যাশান অনুযায়ী, পুরুষদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা নয়। অনেকটা চৌকো ধরনের মুখ, তবে ভাষা ভাষা নীল চোখ দুটো সুন্দর।

হাসলে পরে গালের সঙ্গে চোখ দুটোও তার হাসে।

নিজেদের মধ্যে কথা শেষ করে, সৌরেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারিয়া ওপরে উঠে যাচ্ছিল, রজত জিজ্ঞেস করলে, কখন ফিরবে?

মারিয়া উঠতে উঠতেই বলে, আশা করছি সন্ধ্যার আগে।

—অন্তত রাত্রে ফিরবে তো?

মারিয়ার চোখে মুখে দুষ্টুমী খেলা করে, বুড়ো ছাড়ে তবে তো।

রজত ঘুষি পাকিয়ে দেখায়।

মারিয়া চলে গেলে রজত খাবার অর্ডার দিয়ে এসে বসে। বলে, দুপুরটা যখন ফাঁকা পাওয়া গেছে, চল কোন ছবিতে যাওয়া যাক।

সৌরেনের মনে পড়ে যায় চিত্রাঙ্গদার কথা। বলে, আমাকে যে সরোজদার বাড়ি যেতে হবে, রিহার্সাল আছে।

—তুই কি করবি?

—গান।

রজত আবার এক চোট হাসে, তুইও তাহলে ঐ দলে ঢুকেছিস।

—কোন দলে?

—আমি সরোজ অ্যান্ড কম্পানীর নাম দিয়েছি পারস্পরিক পিঠ চুলকানো সমিতি।

—তার মানে?

—খুব সোজা, সরোজ গান করলেই জয়রা বাহবা দেয়, জয় নাচলে সরোজরা পিঠ

চাপড়ায়, একজন আরেকজনের পিঠ চুলকোচ্ছে আর কি। লীলা, প্রমীলা, বেঁটে কেষ্ট, বাজপায়ী সব ঐ দলে।

—তুই তাহলে সবাইকেই চিনিস?

রজতের চোখ দুটো হাসে, চিনি বইকি, সব মক্কেলকে চিনি। ওদের দলে যত কটা ছুঁড়ী আছে সব লন্ডনে এসেছে বিয়ে করার জন্যে, সুযোগ পেলেই ছিপ্ ফেলে বসে থাকে, যদি কোন দেশী ছেলেকে গাঁথতে পারে। কিন্তু ছোঁড়াগুলোর উল্টো মতি, দেশী মেয়েতে মন ওঠে না, তারা ঘুরছে মেম্সাহেবদের পেছনে। এ ভারী মজার ব্যাপার, আমি বসে বসে সার্কাসের ঘোড়দৌড় দেখি।

কথার স্রোত এতদূর এসে অন্য দিকে মোড় ফিরলেই বোধহয় সৌরেন খুশী হত কিন্তু খেতে খেতে রজত যখনই জিজ্ঞেস করলে, তোর মীনাক্ষী তো এখানেই, খবর কি?

সৌরেন মনে মনে প্রমাদ গণল, দেখা হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রে, দেশে থাকতে তো তুই অনেক দূর এগিয়েছিলি।

সৌরেন সহজ হবার চেষ্টা করে, ওসব ছেলেমানুষির কথা ছেড়ে দে। মীনাক্ষী আজকাল মন দিয়ে ছবি আঁকছে।

—দূর দূর ছবি এঁকে কি হবে। এবার জীবনটাকে দেখতে বল।

—তুই যা ভাবছিস তা নয় রে, বলব একদিন যদি অবশ্য শোনার ইচ্ছে থাকে।

রজত উৎসাহ প্রকাশ করে, নিশ্চয় শুনব, তোদের কথা শুনতে আমার ভারী ভাল লাগে। আধফোটা প্রেম, আধ আধ কথা, চোখের জল, মান অভিমান। দেহ পর্যন্ত পেঁাছবার আগেই বিয়ে, না হয় আত্মহত্যা। এ ভারী রোম্যান্টিক ব্যাপার। রজত হাসতে থাকে, সেই ঠোঁট-না-ফাঁক করা, ছোট ছোট চোখের বিদ্রূপ মাখা হাসি।

সুইস্ কটেজ টিউব স্টেশনে নেমে মোড়ের দোকান থেকে এক থোকা বিলিতি ফুল কিনে, লীলা চৌধুরী যখন সরোজ রায়ের ফ্ল্যাটের ঘণ্টি টিপল তখন ঘড়িতে বারটা বেজে গেছে। আজ লীলার সাজের বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। ইচ্ছে করে ডোনাট দিয়ে খোঁপা না বেঁধে ফরাসী কায়দায় চুলগুলো টান করে ওপরে বেঁধে ঘোড়ার ল্যাজের মত ফুলিয়ে ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে।

সরোজ দরজা খুলে সাদরে অভ্যর্থনা করল, মাদাম এসে গেছেন দেখছি, দেরি দেখে ভাবলাম আর কোথায়ও বুঝি আটকে গেলে।

লীলা ওপরে উঠ্তে উঠ্তে বলে, প্রায় আটকে গিয়েছিলাম, সৌরেন ফোন করে ছিল খেতে যাবার জন্যে।

সরোজ কপাল কুচকে জিজ্ঞেস করে, সৌরেন? হঠাৎ কি ব্যাপার? স্বর্ণ ঘটিত মকরধ্বজ-এর মত প্রেম ঘটিত কিছু নয় ত?

লীলা হাসে, হলেও একতরফা।

—যাই বল লীলা, আজ কিন্তু প্রেম করবার দিন, কি রোদরে বাবা, রীতিমত গরম হচ্ছে, আজ রাত্রে চান করতে হবে।

—আপনি ভারী বেরসিক সরোজদা, রীতিমত অফুল।

—কেন?

—কি কথার ছিরি, প্রেম, গরম, চান, কি রকম এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন।

হো হো করে হেসে ওঠে সরোজ, সত্যি, কিছুতেই রোম্যাণ্টিক হতে পারলাম

না। কখন যে মুখ ফস্‌কে কি বলে ফেলি।

লীলা বসবার ঘরে ঢুকে ফুলগুলো টেবিলের ওপর রাখে, কোট খুলতে খুলতে বলে, মুখ ফস্‌কে মোটেই নয়, ইচ্ছে করে বলেন।

সরোজ তখনও হাসে, তাতে আমার লাভ?

—এক একটা বিচ্ছিরি মানুষ থাকে, খালি চেষ্টা, কি করে মেয়েদের অ্যাটেনশান ড্র করবে।

—মেয়েরা কান না দিলেই তো পারে।

লীলা কোণঠাসা হতে চায় না, বলে, কোন মেয়েই কান দেয় না, আপনি নিজেই হামবড়া হয়ে বসে আছেন।

সরোজ কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, যদি মনে কর সুপ্ রান্না করা দরকার, এক প্যাকেট চিকেন সুপ্ কেনা আছে, তৈরী করে ফেলতে পারো। আমি মাংস আর ভাত রেঁধে রেখেছি।

—সে আমি দেখছি কি করতে হবে না হবে। জয় খাবে তো?

—না, ও বেরিয়ে গেছে। মাথা চুলকে বলে গেল, 'সরোজদা একটু বেরুচ্ছি, একেবারে রিহার্সালের সময় ফিরব।' নিশ্চয় ডোরিয়া লণ্ডনে ফিরেছে।

লীলা মুখ বেঁকিয়ে হাসে, আচ্ছা সরোজদা, দেশে কি আর মেয়ে পাওয়া যেত না, কি বলে ও ডোরিয়াকে বিয়ে করল? যেমনি প্যাঁকাটির মত চেহারা তেমনি মুখশ্রী। জয়টার কি টেস্ট্ বলে কিছু নেই?

সরোজ ফুলগুলো সাজিয়ে রাখছিল, না তাকিয়েই বলে, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা না বলাই ভাল।

লীলা কিন্তু তখনও থামে না, কি নোংরা মাগো, সারাক্ষণ নাকটা সর্দিতে ভড় ভড় করছে; আমি বলে দিচ্ছি ও সাতজন্মে চান করে না।

সরোজ কথাটা হঠাৎ থামিয়ে দেয়, আমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে।

লীলা বিরক্ত হয়েও হেসে ফেলে, আপনি যে জাতে বামুন তা বেশ বোঝা যায়। বেশ চল্লাম আমি রান্নাঘরে। একেবারে খাবার দিয়ে ডাকব, মিথ্যে আর বিরক্ত করবেন না।

সরোজ রায় কলকাতার নামকরা ভাল ছেলে। পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ নিয়ে ইওরোপে এসেছিল। এখানেও তার নাম অক্ষুণ্ণ ছিল, বিদেশী ছেলেরাও কেউ হটাতে পারেনি। পাস করে বেরিয়ে সরোজ চাকরি নিল এখানকার এক নামজাদা ফারমে, হাতেনাতে কাজ শেখার সুযোগ পাবে বলে; সেই সঙ্গে অবশ্য মাইনেও তার কম ছিল না। তাই সুইস্‌কটেজের কাছে তিনি কামরার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত সরোজ। ওর সঙ্গে অনেক সময় অনেকেই থেকেছে, যেমন আজকাল জয় থাকে কিংবা আগে সোরেন ছিল। তবে এ ফ্ল্যাটের বেশীর ভাগ খরচাই সে চালায় নিজে। শুধু এইটুকুই বললে বোধ হয় এ ফ্ল্যাটের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। যখনই লণ্ডনে এমন কোন বাঙালী ছেলে এসে পড়ে যে হয়ত কোথাও থাকবার ব্যবস্থা না করেই জাহাজ থেকে নেমে পড়েছে, বন্ধুরা তাকে পাঠিয়ে দেয় সরোজ রায়ের কাছে। জানে, সপ্তাহখানিক এখানে সে অনায়াসে থাকতে পারবে গৃহস্বামীর আতিথ্যে।

এ ছাড়া সরোজের আর একটি বিশেষ গুণ আছে যা তাকে সাহায্য করেছে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে আরও আপন আরও ঘনিষ্ঠ হতে। তা হল রবীন্দ্র সঙ্গীত। সরোজ সত্যি ভাল গান করে। বিদেশে এসে অনেক কলঘরি গায়কও গাইয়ে বলে

পরিচয় দেয়, কিন্তু সরোজ মোটেই সে জাতের নয়, দেশে থাকতেই গানে তার যথেষ্ট নাম ছিল। খাঁটি শান্তিনিকেতনের ঢঙ তার গলায়, দরদ দিয়ে ভাষার মাধুর্য পেঁাছে দিতে পারে শ্রোতার অন্তরে। এখানে যারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত তারা সকলেই তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সরোজদা বলে ডাকে। তাই লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের যা কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তার মহলা চলে সরোজের ফ্ল্যাটে, এখানে সকলের অবারিত দ্বার।

ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে সরোজ গুন গুন করে গান করছিল, 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুন গুনিয়ে'। অন্যমনস্কভাবে অনেক কথাই সে ভাবছিল, বিশেষ করে আজকের রিহার্সালের কথা, ছেলেমেয়েগুলো ঠিক সময় মত এলে হয়। লণ্ডনে থাকলে কি হবে, সময় জ্ঞানটা দেশের মতই রয়ে গেছে। যারা বা গাইতে পারে তাদের তাল জ্ঞান মারাত্মক, নাচিয়েদের অবস্থাও তথৈবচ। লীলা কিন্তু আজ কাল মন্দ নাচে না, যদিও কলকাতায় সে কখনও নাচেনি, যা নেচেছে সবই ইংরিজী বলরুম নাচ। কিন্তু আশ্চর্য, গানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পা ফেলে ঠিকই। এদেশে এসে আর কিছু না হক, সত্যিকারের মেম সাহেব দেখে, এ মেয়েগুলোর বিলিতীপনা অনেক কমেছে।

ওদিকে রান্নাঘরে ঢুকে লীলা সুপ্ চড়াতে গিয়ে দেখে অপরিষ্কার বাসনের পাহাড় জমা হয়েছে বেসিনের ওপর। পুরুষ মানুষদের সংসার করা দেখলে সত্যি হাসি পায়। বাইরের ঘরদোর পরিষ্কার ফিটফাট্ হলে কি হবে, যত নোংরা রান্না ঘরে। লীলা এপ্রনের অভাবে একটা তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বাসন ধুতে শুরু করে। আশ্চর্য, এই দেড় বছরে তার কত পরিবর্তন হয়েছে। দেশে থাকতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, রান্না করা কিছুই সে জানত না, এগুলি বরাবর বেয়ারা বাবুর্চিরাই করে এসেছে অথচ এখানে এসে হাতে নাতে সবই তো করছে। শুধু করছে বললে কম বলা হয়, করে আনন্দ পাচ্ছে। অবশ্য কাজ করার সুবিধেও এদেশে অনেক।

পাশের ঘর থেকে সরোজদার গুন গুন শোনা যাচ্ছে। এ মানুষটাকে ভারী অদ্ভুত লাগে লীলার। কলকাতায় নিখুঁত ভাঁজের দেশী ছাঁটের সুট পরা গলায় টাই লাগানো যে সব ছেলেরা তাদের বাড়িতে আসত কিংবা ক্লাবে নাচতে যেত তাদের সঙ্গে এর যেন কোন মিলই নেই। সরোজ যে খুব সুন্দর দেখতে তা নয়। সে বেঁটে। ইংরেজদের পাশে আরও যেন বেঁটে দেখায়। কপালটা মেয়েদের মত ছোট, গায়ের রঙ্ দেশে নিশ্চয় ময়লা ছিল, এখানে অনেক দিন থাকার জন্যে খানিকটা ফিকে হয়েছে। পাঁচজনের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে প্রথম দেখাতে সরোজকে বেছে নেওয়া শক্ত, কিন্তু আলাপ হবার পর বোঝা যায় তার একটা নিজস্ব ধরণ আছে, যার জন্যে পঞ্চাশটা লোকের মধ্যে থেকেও সে তাদের মধ্যে হারিয়ে যায় না। যে কোন পোশাকে সরোজকে সুন্দর দেখাবে বলে মনে হয় না, কিন্তু ও যা পরে তাতে ভালই মানায়। সরোজের বয়স হবে তিরিশ কি বড় জোর বত্রিশ, কিন্তু এমন একটা ভাব করে থাকে যেন অনেক বড়, সেই অতি গম্ভীর মুখখানা ভাবলেই লীলার হাসি পায়। তবে যে জিনিসটা তার ভাল লাগে তা হল সরোজের কালো কুচকুচে চোখ দুটো। কি চালাক অথচ কি গভীর।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সরোজ, হেসে জিজ্ঞেস করল, ও কি করছ, ওই পাহাড় এখন বুঝি কেউ সাফ করতে বসে?

লীলা কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, দোষ কি!

—এক ঘন্টা লেগে যাবে।

—মোটেই না, ধোয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আপনি যদি শুকুতে সাহায্য করেন, তাহলে দশ মিনিটে হয়ে যাবে।

সরোজ একটা ঝাড়ন টেনে নিয়ে ধোয়া বাসনগুলো মুছতে শুরু করে, এ কাজটা আমি করে ফেলতে পারতাম তবে আজ জয়ের পালা ছিল তাই করিনি।

লীলা হাসে, জয় আবার ডিস্ ধোবে!

—মিলে মিশে থাকতে হলে সবাইকেই সমান কাজ করতে হবে।

—এত যে উপদেশ দেন, কেউ শোনে? বিশেষ করে জয়?

—শুনলে ওদেরই লাভ হবে, আমার আর কি? সরোজ একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, মাকে চিঠি লিখেছ?

লীলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

—কি লিখলে?

—যা বলেছিলেন। পুজোর সময় ফিরে যাব, প্যাসেজ্ বুক্ করতে।

—আর প্রমীলা?

—ও থাকবে, ইক্নমিক্স নিয়ে পড়াশুনা করবে।

—হয়ত তোমরা আমার ওপর চটবে, কিন্তু বিশ্বাস কর এতে তোমাদের অনেক উপকার হবে। মিথ্যে এদেশে পড়ে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ কি? তুমি দেশে ফিরে যাও, বিয়ে থা' কর, মার বয়স হচ্ছে তো। আর প্রমীলা চাকরি ছেড়ে যাহোক কিছু পড়ুক। এখানে এসে কেরানির চাকরি ধরায় কোন লাভ আছে কি?

লীলার মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি পাক খাচ্ছিল, নোংরা হাতে সরোজের মুখটা খপ করে চেপে ধরে, দোহাই আপনার, আর লেক্চার দেবেন না, আমি সব বুঝে ফেলেছি, আপনার মত বিজ্ঞ লোক আর দ্বিতীয় নেই।

সরোজ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইংরিজী কায়দায় বলে, দাঁড়াও দুষ্টু মেয়ে, তোমায় আমি মুরগীর ঝোল দিয়ে চান করাব।

হাসি ঠাট্টা হৈ হৈ এর মধ্যে তারা যখন খেতে বসল, ঘড়িতে তখন দুটো বেজে গেছে।

শনি রবি দু'দিন ছুটি থাকে বলে শুক্রবারের দুপুর থেকেই কেমন যেন ছুটি ছুটি ভাব দেখা যায় লণ্ডনের অফিস পাড়ায়। লাঞ্চ থেকে ফিরে কাজে আর কারো মন বসে না, কোন রকমে ফাইলপত্তর গুছিয়ে রেখে বাড়ি পালাতে পারলেই বাঁচে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় যখন লণ্ডনের সীমানা ছাড়ালেই ইংলণ্ডের গ্রামগুলো মনোরম হয়ে থাকে; সবুজ ঘাস আর কত রঙের ফুল, নীল আকাশ আর সূর্যের আলো। গ্রামে যাদের বাড়ি আছে, তারা শুক্রবার রাতেই গাড়ি করে বেরিয়ে যায়, দুদিন গ্রাম্য জীবন উপভোগ করতে। যাদের বাড়ি নেই কিন্তু পয়সা আছে, তারা শনিবার সকালে, সমুদ্রের ধারে কিংবা কোন নির্জন হোটেলে একটা রাত কাটিয়ে আসতে। আর যাদের পয়সা নেই, তারা অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে শনিবার ভোর বেলা বাড়ি ফেরে। ভারতীয় ছাত্ররা অবশ্য এদের কোনটার মধ্যেই পড়ে না। তারা কয়েকজন মিলে কারুর বাড়িতে জড় হয়ে আড্ডা মারে। স্রেফ্ আড্ডা। বকর বকর করতে করতে কখন যে রাত্রি বেড়ে যায় বুঝতে পারে না। তারপর

হঠাৎ একজনের হাই উঠলেই সবাই একে একে হাই তোলে, পরস্পরকে বিলিতী কায়দায় সুপ্রভাত জানিয়ে, আস্তে আস্তে যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

মীনাক্ষীকেও যেতে হয় অনেক শুক্রবার অনেকের অনুরোধে। কিন্তু কোনদিনই কোথাও বেশী রাত পর্যন্ত থাকে না, এমন কি সরোজদার 'পিঠ চুলকানো সমিতি' থেকেও বারটার আগেই সে উঠে পড়ে। কারণ প্রতি শনিবার সকালবেলা তাকে অতুল মামার সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতে হয়, তাঁদের বাড়ি গিয়ে। এ নিয়ম আজকের নয়, যবে থেকে মীনাক্ষী এ দেশে আছে এই ব্যবস্থা। এক শনিবার না গেলে বা দেরি হলে সর্বনাশ। হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, এমন কি দেশে দাদুর কাছে নালিশ করে চিঠিও চলে যায়। কিন্তু এ শুক্রবার বিপদে পড়ল মীনাক্ষী. এতজন এসে পড়ল ওর ঘরে যে কাউকেই উঠতে বলতে পারল না, গল্প আর তর্ক চলল অনেকক্ষণ। যখন তারা উঠে গেল রাত প্রায় তিনটে। এর পর ঘুমুলে সকাল বেলা ওঠা অসম্ভব মীনাক্ষীর পক্ষে, তাই বিছানায় না শুয়ে কোচের ওপরই চোখ বুজে পড়ে রইল। কিন্তু তবু ঘুমকে এড়াতে পারল না, আপনা হতেই এক সময় চোখ বুজে এল।

সকাল বেলা তাড়াহুড়া করেও অতুলমামার বাড়ি পেঁছিতে মীনাক্ষীর প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। অতুলমামা ড্রয়িং রুমে বসে চা সহযোগে আগাথা ক্রিস্টির ডিটেক্টিভ বই পড়ছিলেন, মীনাক্ষীকে দেখে ঘড়ির দিকে আঙুল দেখালেন।

মীনাক্ষী লজ্জিত স্বরে বলে, আমি খুবই দুঃখিত অতুলমামা. বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কাল এত রাত করে শুয়েছি—

অতুলমামা বই থেকে চোখ না তুলেই প্রশ্ন করেন. কার বাড়ি গিয়েছিলে?

—কোথাও যাই নি বাড়িতেই ছিলাম।

—তবে।

মীনাক্ষী মিথ্যে কথা বলল, কাজ করছিলাম. একটা পোর্ট্রেট ধরেছি।

অতুলমামা ছবির বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেন না. যাও মামির সঙ্গে দেখা কর। আমরা দেরী দেখে খেয়ে নিয়েছি।

অতুলমামার বয়েস এখন বছর পঞ্চাশ। যুদ্ধের আগে ব্যারিস্টারী পড়তে এসে এখানেই বিয়ে করে চাকরি নিয়ে বসে গেছেন। কিন্তু এখন আর দেশে ফিরতে ভাল লাগে না। শুধু যে গরম লাগে তাই নয়. এত ঢিমে তেতালায় ওখানকার জীবন চলে যে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি কিছুতে। অবশ্য দেশেও তাঁর বিশেষ কোন টান ছিল না। আপনার জনের মধ্যে ছিলেন বুড়ো বাবা। তাঁকেও অতুলমামা বিলেতে এনেছিলেন; এখানেই তিনি মারা গেছেন বছর কয়েক আগে। মীনাক্ষীদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক ওঁর নেই, তবে অনেক দিনের যাতায়াত ও বাড়িতে। কলেজ জীবনে মীনাক্ষীর মামাই ছিলেন ওঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু: সেই সূত্রে মীনাক্ষীও অতুলমামা ডাকে।

কলকাতায় থাকতে অতুলমামা সম্বন্ধে মীনাক্ষীর বড় চমৎকার ধারণা ছিল, বয়েসের তুলনায় কত ছেলেমানুষ। কি সুন্দর ব্যবহার। কিন্তু বিলেতে এসে ওঁরই অভিভাবকত্বে থেকে সে ধারণা ওর পাল্টেছে। এখন মনে হয় মানুষটা যেন বড়ই শুকনো, এতটুকু রস নেই শরীরে।

যদিও অতুলমামাকে সহ্য করতে পারে মীনাক্ষী কিন্তু মেম মামি তার কাছে অসহ্য। শুকনো চিমড়ে চেহারা, সাদা ফ্যাকাশে রঙের সঙ্গে ম্যাড় ম্যাড়ে সোনালী

চুল। সারাক্ষণই যেন নাক তুলে বসে আছেন, ভদ্রমহিলা কেন যে নিজেকে এত বড় মনে করেন, তা আজও মীনাক্ষী বুঝতে পারে না। সব সময়ই তার মনে হয়েছে মেজ মামি একের নম্বর স্বার্থপর, পান থেকে চুনটি খসলেই ওঁর নিজ মূর্তি বেরিয়ে পড়ে।

মিসেস আইলিন চৌধুরী সেজেগুজে কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরচ্ছিলেন, মীনাক্ষীকে দেখে আড়ষ্ট হাসি হাসলেন, মীনা ডারলিং, তুমি এসে পড়েছ, আমি ভেবেছিলাম আজ আর বোধ হয় আসবে না।

মীনাক্ষী আগের মতই দুঃখ প্রকাশ করল।

—তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না মীনা, আমাকে এখুনি বেরতে হবে। বেচারী শীলু এই সময়টির অপেক্ষায় সকাল থেকে বসে থাকে, আমি রোজ ওকে বেড়াতে নিয়ে যাই কি না।

মেম মামি কুকুরের দিকে সস্নেহে তাকালেন। শীলু, বড় বড় বাদামী রঙের লোমওয়ালা সুন্দর দেখতে শিকারী কুকুর। এতক্ষণ মীনাক্ষীর হাত চাটতে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ নিজের নাম শুনে কান দুটো তুলে মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকাল। মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি বলে, না, না, আপনি নিশ্চয় বেড়াতে যান, আমার জন্যে কেন সময় নষ্ট করবেন।

তাহলেও না খেয়ে যেও না। রান্নাঘরের কোথায় কি আছে সবই তো জান, তোমার মামাকে জিজ্ঞেস কর, গরম চা হচ্ছে শুনলে উনিও হয়ত এক কাপ খেতে পারেন।

হাতে চেন নিয়ে কুকুরের সঙ্গে মেম মামি বেরিয়ে গেলেন। মীনাক্ষী ঢুকল রান্নাঘরে। খাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, গ্যাস জেবলে চায়ের জলটা বসিয়ে দিল। আইলিন চৌধুরীর বয়েস যতই হোক চল্লিশের বেশী নয় নিশ্চয়। হাল ফ্যাশানের পোশাকের ওঁর অভাব নেই। পনের দিন অন্তর দোকানে গিয়ে চুল সেট্ করিয়ে আসেন, বুকটা কৃত্রিম উপায়ে ফুলিয়ে রাখেন সব সময়। তবু ওঁকে দেখলে পঞ্চাশ বছরের বেশী বলে মনে হয়। অতুলমামার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কতখানি হৃদ্যতার তা মীনাক্ষী আজও বুঝতে পারেনি। অনেক সময়ই তার মনে হয়েছে অতুলমামা যেন স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন। আইলিন মামি যদি সত্যি কাউকে ভালবাসে তো সে ঐ শীলু। এও মীনাক্ষীর কাছে মনে হয় বড় বেশী আদিখ্যেতা। ঐ কুকুরটা যেন এ বাড়ির একমাত্র ছেলে। রাত্রে সে অতুলমামাদের বিছানাতেই শোয় তাছাড়া ওর ঘুম আসে না। সারাদিন বসে থাকে কোচের ওপর, ড্রইং-রুমের কোণের দিকে যে ছাই রঙের কোচটা রয়েছে তার নামই হোল শীলুর কোচ। শীলুর খাবার মেনু প্রত্যেকদিন বদলাতে হয়, রোজ রোজ একঘেঁয়ে খেতে ওর অরুচি লাগে। শীলু চান করে বাথটবে, বড় পরিষ্কার তোয়ালেতে গা মুছিয়ে মেম মামি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে লোমের জল শুকিয়ে দেন; এ ধরনের আরও কত কি। ইংরেজরা কুকুর ভালবাসে মীনাক্ষী তা জানত, কিন্তু আইলীন চৌধুরীর এ ধরনের কুকুর পরিচর্যাকে ও পাগলামি ছাড়া আর কিছু আখ্যা দিতে পারে না।

দু' কাপ চা হাতে নিয়ে মীনাক্ষী যখন অতুলমামার ঘরে এল তখনও উনি মন দিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়ছেন। চা খেয়ে খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডিম রুটি সব খেয়েছ ত? মীনাক্ষী মিথ্যে বলল, খেয়েছি।

অতুলমামা কি যেন ভাবছিলেন, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, বাড়ির চিঠিপত্র পেয়েছ সম্প্রতি?

—গত সপ্তাহে পেয়েছিলাম, মামিমা লিখেছিলেন।

—হুম্। তারপর আর কেউ লেখেনি?

—না।

অতুলমামা চুপ করে গেলেন। মীনাক্ষীর কেমন যেন সন্দেহ হয় উনি কোন কথা গোপন করার চেষ্টা করছেন। কেন কি হয়েছে?

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

মীনাক্ষী তবু প্রশ্ন করে, দাদু কি আপনাকে কিছু লিখেছেন?

মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকিয়ে অতুলমামা আর কথা লুকোতে পারেন না, স্বীকার করেন, হ্যাঁ।

—কি লেখেছেন?

—চিঠিটা উনি নিজে লেখেননি, মনে হল অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন।

মীনাক্ষী উৎকণ্ঠিত হয়, কেন?

অতুলমামা সহজ হবার চেষ্টা করে বলেন, পাছে তুমি উতলা হও, তাই বলতে চাইছিলাম না, মানে তোমার দাদুর শরীরটা ভাল নেই।

—কি হয়েছে?

—তা লেখেননি, তবে বয়েস হয়েছে তো, কত রকমই হতে পারে। চিঠিটা সেণ্টিমেণ্টাল হয়েছে, অসুখ হলে যা হয় আর কি। লিখেছেন ওঁর ভাল মন্দ যদি কিছু হয়, আমি যেন তোমার দেখাশুনো করি। এ আবার লেখবার কি আছে। তোমার দেখাশুনো করাতো আমার কর্তব্য। তাছাড়া মনে কর—

অতুলমামা হয়ত আরও অনেক কথাই বলতেন, কিন্তু মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন, তার মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, একটুকু রক্ত যেন তাতে নেই। টানা টানা চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। অতুলমামা তাড়াতাড়ি উঠে এসে মীনাক্ষীর মাথায় হাত রাখলেন, কি ছেলেমানুষ তুমি, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? অসুখ করেছে, আবার সেরে যাবে; মানুষের কি অসুখ করতে নেই? ছি, ছি, তোমাকে দেখছি বলাই উচিত ছিল না।

মীনাক্ষী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, কান্না ভেজা গলায় বলে, আজ আমি আসি অতুলমামা।

অতুলমামা বোঝেন বাধা দিয়ে লাভ হবে না, শুধু বললেন, বিকেলের দিকে একটা ফোন করো।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে মীনাক্ষী অতুলমামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর কেমন করে টিউব ধরে সে বাড়িতে এসে পৌঁছয় কিছুই তার মনে থাকে না। সারাক্ষণ সে তার দাদুর কথাই ভেবেছে।

একটা উঁচু পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে অনেক চেষ্টা করেও যেমন পুরো পাহাড়টা দেখা যায় না, অথচ দূর থেকে দেখলে তার সবটুকু পরিষ্কার হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তেমনি কলকাতায় থাকতে তার দাদুকে মীনাক্ষী যত না বুঝতে পেরেছিল, লণ্ডনে একলা থেকে তাঁর মহত্ত্ব অনেক বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছে। ছোট বেলায় বাপ মা হারিয়ে মীনাক্ষী আর তার ইস্কুলে পড়া

দাদা যখন এসে উঠল মামার বাড়িতে তখন যিনি তাদের সব অভাব পূরণ করেছিলেন, শুধু স্নেহ ভালবাসা দিয়ে নয়, কর্তব্য বোধের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে, তিনি এই দাদু। সংসারে অনেক মানুষ আছে যাদের অকৃপণ ভালবাসা অনেক সময় স্নেহাস্পদকে পঙ্গু করে দেয়, আবার এমন হিতাকাঙ্ক্ষীও আছেন, যাদের সুদৃঢ় কর্তব্য বোধ নিষেধের দড়ি দিয়ে এমনভাবে পাক দিয়ে ফেলে যা থেকে মুক্তি পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। এ দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারে খুব কম লোকই, মীনাক্ষীর মতে তার দাদু তা পেরেছিলেন। সেইজন্যেই কলকাতায় থাকতে মীনাক্ষী দাদুকে ভালবাসত, অসঙ্কোচে তাঁর কাছে আবদার জানাত আবার ভয়ও করত সকলের চেয়ে বেশী।

মীনাক্ষীর দাদামশায় বারীন্দ্রনাথ যে যুগের বাংলায় মানুষ সে যুগে একদিকে যেমন ইংরেজীপনার আদেখলামির স্রোত বইছে অন্য দিকে তেমনি মাটি চাপাপড়া দেশী সংস্কৃতিকে খুঁড়ে বার করার প্রয়াস চলছে পুরো দমে। বারীন্দ্রনাথ দুই বিভিন্ন ধারার সঙ্গম। সাহেবদের নকল করে তখনকার ফ্যাশান অনুযায়ী তিন পীস সুট গ্যালিস দিয়ে পরে থাকতেন সারাক্ষণ, ধুতি পরলে নাকি অস্বস্তি বোধ করতেন। শুধু বেশ নয় ইংরেজী ভাষাটাকেও আয়ত্ত করেছিলেন মাতৃভাষার মতন। প্রফেসার থেকে যখন সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন, তখন কত সময় ছোকরা ইংরেজ প্রফেসারদের ভাষায় ভুল শুধ্‌রে দিতেন। তারা লজ্জিত হয়ে স্বীকার করে নিত। আবার সন্ধ্যে হলেই ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মদের বোতল নিয়ে বসতেন। এমন সান্ধ্য মজলিস তখন বসত অনেকের বাড়িতেই। বারীন্দ্রনাথও যেতেন কত নাম করা সাহিত্যেকের নিমন্ত্রণে। এঁরা মদ খেতেন বটে, তবে মাতলামি করতেন না। চারটে পেগ খাবার পরও তর্ক করার সময় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আলোচনার খেই হারাতেন না কখনও।

বারীন্দ্রনাথ আবার বইও লিখতেন, ধনবিজ্ঞান আর বাণিজ্য। ইকনমিকস্ আর কমার্সের ওপর প্রথম বাংলা বই। মহাভারত আর রামায়ণের তথ্য ঘেঁটে তার মধ্যে যে সমাজতন্ত্রের বীজ আছে, তা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিতেন ছাত্রদের সামনে। বিদেশী সরকারের তলায় চাকরী করেও ছাত্রদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন স্বদেশপ্রীতির আনন্দ। তাই আজও অনেক ছাত্র, যারা উত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এসে বারীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে যায়।

মীনাক্ষী বারীন্দ্রনাথকে দেখেছে রিটায়ার করার পর। ঠিক যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ওঁর সময় বাঁধা থাকত। সকালে উঠে খবরের কাগজের সঙ্গে চা পান শেষ করে ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে গাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন। হয় লেক্ না হয় ভিক্টোরিয়া। বাড়ি ফিরে তেল মেখে চান, বারটার মধ্যে খাওয়া। মাছ, মাংস, ডিম সবই খেতেন তবে অল্প পরিমাণে। দুপুর বেলা তিনখানা খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়ে ইংরাজ সরকারের নিত্যনূতন ফন্দি ধরার চেষ্টা করতেন।

এ প্রোগ্রামের একদিনও নড়চড় দেখেনি মীনাক্ষী। এমন কি মীনাক্ষীর মা যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও উনি সময় মত সব কাজই করেছেন। আশ্চর্য চাপা মানুষ। মীনাক্ষীর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, বাপ মা কেউই চিরকাল বেঁচে থাকে না, যদি তোমার মায়ের আত্মাকে সুখী করতে চাও, নিজের পায়ে

নিজে দাঁড়িও, সৎপথে থেকো আর নিজে সুখী হয়ো।

এ আশীর্বাদ নয়। উপদেশও নয়, এ একজন শুভানুধ্যায়ীর ঐকান্তিক শুভ কামনা। সেদিনের কিশোরী মীনাক্ষী দাদুর এ কথাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছিল, তাই ত বড়লোক মামার বাড়িতে কুঁড়েমির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার সব রকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে।

দাদু তাকে সব সময় পথ দেখিয়েছেন, যখনই বুঝেছেন মীনাক্ষী নিজেই পথ হাতড়াচ্ছে কিংবা অন্যদের বোকা প্রশংসায় ভুল পথে যাচ্ছে। মীনাক্ষীর স্পষ্ট মনে পড়ে, ও তখন বি এ ক্লাশের ছাত্রী, একদিন লেকের ধারে বসে একটা ল্যান্ড-স্কেপ এঁকেছিল তেল রঙ দিয়ে। কলেজের বান্ধবীরা প্রশংসা করল পঞ্চমুখে, সেই সঙ্গে দু-একজন পরিচিত প্রফেসারও। বাড়িতে ছবি দেখে মামিমা ঠিক করলেন বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবেন বসবার ঘরে। আর সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল মীনাক্ষীর আঁকবার হাত চমৎকার। এত প্রশংসার পর ছবি নিয়ে মীনাক্ষী দাদুর কাছে যেতে যেতে ভেবেছিল উনিও খুশী হবেন নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য। চোখে চশমা লাগিয়ে অনেকক্ষণ ছবিটা দেখে ধীর স্বরে বললেন, সত্যিই যদি ছবি আঁকতে চাও, তাহলে ভাল করে তাকিয়ে দেখো যাকে আঁকছ। কতগুলো ধারণার বশে রঙ ফলাতে যেয়ো না।

কথাটা পরিষ্কার বুঝতে না পেরে মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকায়।

দাদু হাসলেন, শান্ত মোলায়েম হাসি, যে দিকে তাকাবে সে দিকেই দেখবে রঙের খেলা। আমি তো আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখি কত রঙের বিচিত্র প্রকাশ সেখানে। ছবি আঁকছ বলে আকাশ মানেই নীল ভেবো না, পাতা মানেই সবুজ নয়, সূর্য আঁকতেই লাল রঙ দিও না। প্রত্যেকটি মিনিটে কত তার পরিবর্তন তা দেখতে হবে, বুঝতে হবে, অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে, তারপর তুমি সৃষ্টি করতে পারবে। সে তুমি শিল্পীই হও, কবিই হও।

মীনাক্ষীর চোখে জল এসেছিল। গোপন করার জন্যে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। শুনতে পায় পেছন থেকে দাদু বলছেন, জানি তুমি মনে কষ্ট পেলে, কিন্তু অবসর সময়ে কথাগুলো ভেবে দেখো, সমাজের কাছে শিল্পীর দায়িত্ব যে অনেকখানি।

ওই শেষের কথাটি মীনাক্ষী কিছুতেই ভুলতে পারে না। সেই দিন থেকে বলতে গেলে সে ছবি আঁকায় সত্যিকারের মন দিয়েছে। শুধু রেখা রঙ আর আলোছায়ার খেলাই নয়, প্রকৃতির রূপকে অন্তরে উপলব্ধি করে ছবির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছে।

বারীন্দ্রনাথের সকলের চেয়ে বড় গুণ তিনি যুগের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেছেন, তাই কোনদিনই তাঁর মতামতগুলো সেকেলে বলে মনে হয়নি। মীনাক্ষীর মামাতো ভাই যখন বামুনের মেয়ে বিয়ে করবে বলে বায়না ধরল তখন সকলের আগে মত দিলেন বারীন্দ্রনাথ, শুধু তাই নয় নিজে অগ্রণী হয়ে মেয়েকে বরণ করে বাড়ি নিয়ে এলেন। মীনাক্ষীর বিয়ের জন্যে বাড়ির সকলে উতলা হলেও বারীন্দ্রনাথ হননি। উনি বলেছিলেন, মীনাক্ষী যদি ইচ্ছে করে, বিয়ে না করে চাকরিবাকরি করতে পারে, তাতে উনি আপত্তি করবেন না।

তাই ত এই পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ছবি আঁকা নিয়ে থাকতে পেরেছে। এই ইওরোপে আসাও তো বারীন্দ্রনাথ

না হলে হতো না, কি রকম করে উনি নাতনীর মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন।

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, পীয়ের টেলিফোন করছে।

—সুপ্রভাত মীনাক্ষী।

—সুপ্রভাত পীয়ের।

—কখন ঘুম থেকে উঠলে।

—উঠেছি অনেকক্ষণ, অতুলমামার বাড়ি গিয়েছিলাম।

পীয়ের অন্য দিকে হাসে, হ্যাঁ, আজ তো তোমার হাজিরা দেবার দিন। এখন কি করছ?

—জানি না।

—তার মানে বাড়িতে থাকছ তো?

—হয়তো থাকব।

পীয়ের আশ্চর্য না হয়ে পারে না। এরকম করে কেন কথা বলছ মীনা, তোমাকে আজ বড় অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

মীনাক্ষী অস্বীকার করতে পারে না, হ্যাঁ পীয়ের, আমার দাদুর শরীরটা ভাল নেই, অতুলমামার কাছে চিঠি এসেছে।

—তাই নাকি!

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

পীয়ের নিজে থেকেই বলে, আমি আসছি এখুনি মীনা, তুমি কোথাও বেরিয়ে যেয়ো না।

পীয়ের টেলিফোন কেটে দিয়েছে। মীনাক্ষীও আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখে। সে জানত দাদুর শরীর খারাপ হয়েছে শুনলে পীয়েরও তারই মত উদ্বিগ্ন হবে। মীনাক্ষীর কাছে অনবরত দাদুর কথা শুনে শুনে ও আজকাল প্রায়ই বলে, এখন আমার কি মনে হয় জানো মীনা, তোমার দাদু যেন আমার খুব চেনা লোক। অনেক দিনের পরিচয় আমাদের।

আমাদের দেশের ছেলেদের বিলাত সম্বন্ধে কৌতূহল তো আজকের নয়, সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে টুপিওয়ালা লালামুখো ইংরাজ বণিকদের দেখে অবধি তাদের দেশটা ঘুরে আসার ইচ্ছে। ইচ্ছে অবশ্য ইচ্ছেই থেকে গেছে বেশির ভাগ লোকের, তাদের মধ্যে যারা দুঃসাহসী, অর্থাৎ শুধু টাকাই নয়, যাদের বুকের পাটা আছে, তারা টিকিওয়ালা সমাজের হুমকি না শুনে কোন না কোন সুযোগে ঘুরে গেছে এ-দেশে, হয় কিছু পড়বার অছিলায় কিংবা কোন ব্যবসার খাতিরে; পরে দেশে ফিরে প্রয়োজনবোধে প্রায়শ্চিত্ত করে জাঁকিয়ে বসেছে সমাজের মাথায়।

এরাই হল বিলাতফেরত!

বিলাতফেরতদের কাছে গল্প শুনে হয়ত বিলাত সম্বন্ধে কৌতূহল কমেছিল কিছু মাত্রায়, তবে যা বেড়ে ছিল অপরিসীমভাবে তা হোল মোহ। এ মোহ বিলাত দেশটা দেখার মোহ নয়, কোনরকমে ঘুরে এসে 'বিলাতফেরত' এই খেতাবে ভূষিত হওয়ার মোহ। লণ্ডনে গিয়ে তারা লেখাপড়া করেছে কি করেনি, মানুষের মত থেকেছে কি থাকেনি, সে হিসাব মেলাতে বসত না কেউ। স্টেশন থেকে মালা পরিয়ে বাড়ি নিয়ে যেত আত্মীয়রা, সরকারি বেসরকারি বিলাতি অফিস চাকরী দিত চড়া

মাইনের, আর সুন্দরী কুমারীদের বাবা মা-রা, পণের টাকা নিয়ে হাঁটা হাঁটি করত রোজ।
তবে যারা এ রাস্তায় যেত না তাদের জন্যে ছিল রাজনীতির প্রশস্ত পথ। সরকারি চাকরি না নিলেও ইংরাজ সরকারের সঙ্গে পীরিত তাদের কমতো না, যে কোন অছিলায় রাজ-অতিথি করে ঢুকিয়ে রাখত পারদে। ইংরাজ রাজত্বে যারা সকলের চেয়ে বেশি মর্যাদা আর সম্মান পেয়েছে তারা এই বিলাতফেরত।
কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর বিলাতফেরতদের আভিজাত্য যেন কমে গেছে অনেকখানি। হেঁজিপেঁজি সবাই আজকাল বিলাত যায়, কেউ হয়ত কোন স্কলারশিপ পায়, আবার অনেকে নিজের চেষ্টায় ওখানে গিয়ে চাকরিবাকরি করে। আগের সেই পয়সাওয়ালা লোকদের বিলাতফেরত হয়ে আসার একচেটেমি ক্রমশই উঠে গেছে। যুদ্ধের পর সমাজের চেহারাটাও যে বদলে গেল, এখন না আছে ইংরাজ সরকার, না আছে আগের মত ইংরাজ সওদাগরী কোম্পানি; যারাও-বা আছে, এখন গুটিয়ে ফেলছে ক্রমশ। তাই পাস না করে ফিরে আসা অনেক বিলাতফেরতকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয় রাস্তায়। রাজনীতির পথও পাল্টেছে, সত্যিকারের কাজ না করে আগের মত স্রেফ বক্তৃতা দিয়ে আর মোড়লী করা যায় না।
এ সব কথা জেনে-শুনেই সৌরেন এসেছে লণ্ডনে। দেশে ফিরে মোটা মাইনের চাকরি পাবার লোভে নয়, নতুন একটা দেশ দেখার জন্যেই তার আসা। যতদিন এখানে থাকবে চাকরি করে খরচা চালাবে নিজের। প্রথম প্রথম এসে অবশ্য লণ্ডনের বিরাটত্বের কাছে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছে, অনেকটা গ্রাম থেকে শহর দেখতে আসার মত। কোন কিছুরই যেন খেই পাওয়া যায় না। হাতে শহরের নকশা নিয়ে পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে কোন রকমে পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে। লম্বায় চওড়ায় লণ্ডন বোধ হয় কলকাতার চারগুণ হবে, লোকসংখ্যাও প্রায় সেই আন্দাজে বেশি। দোকান-পাট, হোটেল, রেস্তোরাঁ সবেরই বাড়াবাড়ি। মাটির তলা দিয়ে রেল লাইন, আর ওপর দিয়ে বাসরুটের জাল পেতেও যেন সারা শহরটাকে বাগে আনা যায় না। কোন সময়েই লোকের কমতি নেই; বাস, ট্রেন বোঝাই হয়ে সকলে চলেছে। সৌরেনের প্রায়ই তখন মনে হত অনবরত জলস্রোতের মত যে গাড়িগুলো ছোটে তাদের সত্যিই কি কোন উদ্দেশ্য আছে, না এ নিরুদ্দেশে যাওয়া।
কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতেই ব্যস্ত লণ্ডন ক্রমশ সয়ে গেল সৌরেনের চোখে। লণ্ডনবাসীদের মত সেও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে জোরে জোরে পা চালিয়ে চলতে শিখে গেল, অনায়াসে বুঝে ফেলল রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সহজ পদ্ধতি, পাড়ায় বেপাড়ায় পায়ে হেঁটে ঘোরার ফলে অচেনা লণ্ডন পরিচিত হয়ে উঠল কলকাতারই মত। তারপর সাজপোশাক, রীতিনীতি, আদবকায়দা। এখন আর সৌরেনকে কেউ ঠকাতে পারবে না, কোন্ রঙের স্যুটের সঙ্গে কি রঙের টাই কিংবা মোজা পরতে হবে তার মুখস্থ, সকালের আর বিকেলের পোশাকের মধ্যে যে অনেকখানি তফাত, তা দেশে থাকতে না জানলেও এখানে এসে পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে। এমনকি, কেউ খাবার নিমন্ত্রণ করলে কণ্টিনেণ্টাল প্রথায় এক তোড়া ফুল কিনে নিয়ে যেতেও ভোলে না।
এত কিছু শেখার পর সৌরেন বুঝতে পেরেছে লণ্ডনে যতদিনই সে থাকুক না কেন, এদের সমাজের বাইরের খোলসটুকুই সে দেখতে পাবে, ভেতরে ঢোকবার কোন পথ পাবে না। বড় আত্মকেন্দ্রিক জাত এই ইংরেজ, হামবড়া ভাব নিয়ে দিব্যি দ্বীপের মধ্যে বসে আছে। মুখের ভদ্রতায় এদের জুড়ি পাওয়া ভার, কিন্তু ভেতরের আদান-

প্রদান এতটুকুও করে না। ব্যবসায়ীবুদ্ধিতে পাকা বলেই বোধ হয় হৃদয়ের রাজত্বেও দাঁড়িপাল্লার আমদানি করেছে।

দেশে থাকতে ইংরাজ সম্বন্ধে সৌরেনের খুব একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাদের সঙ্গে মেশবারও কোন অবকাশ ঘটেনি। ছোটবেলায় সিনেমা দেখতে গিয়ে সর্বশেষে রাজা রাণীর ছবির সঙ্গে God Save the King বাজলে ও অন্যদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াত। শুধু দাঁড়াত বললে ভুল বলা হবে, দাঁড়াতে ভালবাসত। এই ছিল তার ইংলন্ডের রাজার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। তারপর স্কুলের উঁচু ক্লাশে উঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে পড়ে প্রথমে সে বৃটিশ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করল সিনেমার শেষে God Save the King শুনেও উঠে না দাঁড়িয়ে কিংবা হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে। সে সময় আড়চোখে লালমুখো ইংরাজ আর ফ্যাকাশে ফিরিঙ্গীদের বিরক্তি ভরা মুখ দেখে মনে মনে খুশী হত, গর্ব অনুভব করত। এখন সে কথা মনে হলে সৌরেনের হাসি পায়, কিরকম ছেলে-মানুষই না ছিল সে সময়।

তবে একথাও সত্যি, লন্ডনে আসার পর থেকে ক্রমশ যে সৌরেনের মন ইংলন্ড এবং ইংরাজদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে তার প্রধান কারণ পীয়েরের অনর্গল বিষোদ্গারণ। পীয়ের কণ্টিনেণ্টাল, বেলজিয়ামের ছেলে। লন্ডনে এসেছে তাদের দূতাবাসের কাজ নিয়ে, কিন্তু না এলেই বোধ হয় ভাল করত। লন্ডনের কোন কিছুই তার ভাল লাগে না, এদেশের লোকগুলো তার অসহ্য। ওর মতে এই নাকতোলা মানুষগুলো সব সময় নিজেদের বড় মনে করে বলেই, ইচ্ছে করে সারা পৃথিবীর লোক যে পথে হাঁটে তার উল্টো দিকে চলে। উদাহরণ দিয়ে বলে, সব জায়গায় রাস্তার ডানদিকে গাড়ি চলে, তাই ওরা চালাবে বাঁ দিকে। পাউন্ড শিলিং-এর এমন এক খিচুড়ী পদ্ধতি বার করে রেখেছে যে, এদেশে এলে সবাইকে নামতা মুখস্ত করতে হয়, তবু কণ্টিনেণ্টের মত শতকরা হিসেবে যাবে না। বিদেশী ভাষা কোনটাই আয়ত্ত করতে পারে না, তবু ভাব দেখাবে এক একজন বিদ্যে দিগ্‌গজ। পীয়ের-এর কথার মাত্রাই হল, ইংরেজকে কখনও ফরাসী বলতে শুনেছ? যদি শুনেও থাক তাহলে বুঝতে পারনি। কারণ এমন সুন্দর তাদের উচ্চারণ যে, হঠাৎ শুনলে মনে হয়, সার্কাসের কোন ক্লাউন বুঝি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

পীয়ের-এর সঙ্গে সৌরেনের আলাপ মীনাক্ষীর বাসায়। প্রাণ খোলা চমৎকার মানুষ। তবে প্রথম প্রথম তার এ ধরনের কথাবার্তায় সৌরেন বিব্রত বোধ করত কারণ তখন এদেশ সম্বন্ধে খানিকটা মোহ তার ছিল, যা ক্রমশ ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। হাজার হোক, পীয়ের একজন স্বাধীন দেশের সাদা চামড়ার ইওরোপীয়ান, তার ওপর সে ভারতীয় সেণ্টিমেণ্ট বোঝবার চেষ্টা করে। এমন একজন লোকের কাছ থেকে ইংরাজ চরিত্র বিশ্লেষণ শুনতে সৌরেনের ভাল লাগে বইকি।

পীয়ের বলে, সারা কণ্টিনেণ্ট ক্যাথলিক, তাই এরা হোল প্রোটেস্টাণ্ট। সৌরেন আপত্তি ভুলে হয়ত বলেছে, কিন্তু প্রোটেস্টাণ্ট তো এরা সাধে হয়নি, অনেক সুবিধা যে।

পীয়ের হাসে, সুবিধা তো শুধু ডিভোর্স করার।

—তার মানে ?

—জান না বুঝি ? ঘুমুবার সময় স্বামীর নাক ডাকে বলে ইংলন্ডের স্ত্রী তাকে ডিভোর্স করতে পারে। ক্যাথলিক থাকলে তো এসব সুবিধা পাবে না।

—এ তুমি বাড়িয়ে বলছ।

—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? পীয়ের হাসতে হাসতেই বলে, সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করো না, শেষ বয়েসে পথে বসিয়ে ছাড়বে।

সৌরেন ভরসা দিয়ে বলে, আমাকে নিয়ে সে ভয় নেই, আমি দেশ বেড়াতে এসেছি, বিয়ে করতে আসিনি।

সেদিন সোহোর কফি বার থেকেই সৌরেন রজতের কাছে বিদায় নিল। রজত গেল সিনেমায়। সৌরেন এসে দাঁড়াল পিকাডেলীর বাস স্ট্যাণ্ডে। এখান থেকে ৫৯নং বাস ধরলে সোজা গিয়ে পেঁৗছবে ওয়েস্টএন্ড লেনে। ওখানেই বাস থেমে যায়। ওয়েস্টএন্ড লেন থেকে দু' কদম হাঁটলে ওর বাড়ি, প্রায়রী রোডে। তাড়াতাড়ির সময় অবশ্য আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে যাওয়ার সুবিধে। পিকাডেলী থেকে বেকারলু লাইনের ট্রেন ধরলে পনের মিনিটের মধ্যে পেঁৗছে দেয় ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেড্ স্টেশনে। এ স্টেশন থেকেও ওর বাড়ি দু' মিনিটের রাস্তা। তবে আজকের মত এমন চমৎকার দিনে একেবারে আনকোরা নতুন লোক না হলে কিংবা বিশেষ কোন তাড়া না থাকলে মাটির তলার রাস্তা দিয়ে কেউ যাতায়াত করবে না। দোতলা বাসের উপর তলায় জানলার পাশে আসন পেলে সারা শহরটা দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। পিকাডেলী আর অক্সফোর্ড সার্কাসের দোকানগুলো দেখতে দেখতে কখন এসে পড়বে সেণ্ট জনস্ উড্। তারপর কয়েকটা পাক খেয়েই ৫৯নং ঢুকবে কিলবার্ন হাই রোডে, সেখান থেকে ডাইনে মোড় নিলেই ওয়েস্টএন্ড লেন। রাস্তাগুলো এখন তার কত পরিচিত, অথচ প্রথম প্রথম বাসে সৌরেন উঠতে চাইত না। বাস রুটের নম্বর প্রায় তিনশ' পর্যন্ত দেখে সত্যিই সে অবাক হয়েছিল। বাস ধরে যে নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁৗছন সম্ভব তা সে বিশ্বাসই করতে চাইত না। অথচ টিউব ট্রেনে যাতায়াত করা খুব সহজ। নিতান্ত নির্বোধ না হলে পথ হারাবার কোন ভয় নেই।

দশ মিনিটের মধ্যে বাস পেল সৌরেন। এমন কি দোতলায় পছন্দমত একটি খালি আসনও। যাক্, এখন প্রায় আধ ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত। হাতের কাগজটা খুলে অন্য যাত্রীদের মত পড়তে বসবে কিনা ভাবছিল। নজরে পড়ল সামনের সিটে শাড়ি পরা একটি এদেশী মেয়ে। লন্ডনের রাস্তায় বাসে, টিউবে শাড়ি দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, অনেকেই পরে। তবু বিদেশী মেয়ে হলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বইকি। মেয়েটির পাশে যে দেশী যুবকটি বসেছিল তার দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে সৌরেন বুঝতে পারল, ওরা মোটেই অপরিচিত নয়। জয় আর ডোরিয়া।

জয়কে সৌরেন কলকাতাতেই চিনত। ওরা ছিল একই কলেজের ছাত্র, যদিও জয় পড়ত উঁচু ক্লাসে। অবশ্য পাস সে করতে পারেনি কোনদিনই। তবু কলেজে আসত, মাঠের কাছে বসে আড্ডা মারত অন্য ছেলেদের সঙ্গে। অনেকে বলত জয়কে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল খারাপ ব্যবহারের জন্যে, সত্যি মিথ্যে সৌরেন জানত না। তবু সে তাকে এড়িয়ে চলত।

জয় লন্ডনে এসেছে সৌরেনের চেয়েও দু' বছর আগে। কোন ফ্যাক্টরীতে কাজ শিখে সেখানেই চাকরি করছে। সে ছ' ফুট লম্বা বছর ত্রিশের জোয়ান পুরুষ মানুষ। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া কাল চুল, তামাটে মুখের রঙ্, কপালে একটা কাটার দাগ আছে। জয় সব সময় প্যান্ট পরে আঁটসাঁট, যাতে তার চাবুকের মত শরীরটা দেখতে পাওয়া যায়। তবে কোট পরে ঢিলে কাঁধের, টাই-এর চাইতে বো

পরতে ভালবাসে বেশী। চট্ করে দেখলে জয়কে ভারতীয় বলে মনে হয় না। দক্ষিণী ফ্রেঞ্চ বা ইটালীয়ান বলে সে চালিয়ে দিতে পারে আপনাকে।

ডোরিয়া এখন ওর বিবাহিতা স্ত্রী। পূর্বরাগ চলেছিল অনেকদিন ধরে, সৌরেন এদেশে এসেই ওদের দুজনকে এক সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে, বিয়ে হয়েছে, মাস দুয়েক। ডোরিয়া জয়-এর চেয়ে বছরখানেকের বড়। লীলা ঠাট্টা করলেও ডোরিয়ার যা বর্ণনা দিয়েছিল তা একেবারে মিথ্যে নয়। বড্ড যেন বেমানান লম্বা মনে হয় ওকে। সরু মুখ, তাতে একটা শেল ফ্রেমের চশ্মা। তবু ভালোর মধ্যে ওর চুলটা, বেশীর ভাগ ইংরেজ মেয়ের মত শনের নুড়ী বলে মনে হয় না। অনেকটা তাজা আর চক্‌চকে।

বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা থেকে ফিরে এসে ওরা স্থির করেছে বাংলা দেশে চলে যাবে। এখন চলছে সেই পর্ব। অর্থাৎ জয় তার অফিসে ছুটির দরখাস্ত করে কয়েক সপ্তাহের জন্যে সরোজদার ফ্ল্যাটে দিন কাটাচ্ছে। নিজেদের ফ্ল্যাট তারা তুলে দিয়েছে। ডোরিয়া গিয়েছিল তার বাবার কাছে, বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কিছু টাকারও দরকার ছিল, ভারতে যাবার পথে ওদের ইচ্ছে কন্টিনেন্টটা ঘুরে যায় অর্থাৎ জাহাজ ধরে ইটালী থেকে। ডোরিয়ার বাবা সাধারণ গৃহস্থ, চাষআবাদ নিয়েই থাকেন। তাঁর পক্ষে টাকা দেওয়া যে অসুবিধে তা ডোরিয়া জানত। সেজন্যে বাবাকে বলার আগে সে কথাটা তুলেছিল বুড়ী দিদিমার কানে। ভদ্রমহিলাকে কিন্তু দু'বার অনুরোধ করতে হয়নি, প্রথম কথাতেই তিনি রাজী হয়েছেন। বলেছেন, ডোরিয়া তুমি আমার সবচেয়ে আদরের নাতনী, আমার যা সামর্থ্য তোমাকে দেব। পাঁচশ' পাউন্ড।

ডোরিয়ার চোখে জল এসেছিল, বলেছিল, তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই।

বৃদ্ধা প্রার্থনা জানিয়েছেন, তুমি আর জয় সুখী হও। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন উপভোগ কর।

ডোরিয়া গলা পরিষ্কার করে বলে, এ টাকা কিন্তু ফেরত দিয়ে দেবো। দিদিমা সানন্দে হেসেছেন, নিজেদের সুবিধা মত যখন দিতে পারবে, দিয়ো। নিশ্চয় নেব। আমি বুড়ী মানুষ, একলা থাকি, জানই তো ওই সঞ্চিত টাকার ওপরই যা আমার ভরসা।

ডোরিয়া তাড়াতাড়ি বলেছে, তুমি নিশ্চিন্ত থেক ভারতে গিয়ে একটু গুছিয়ে নিয়েই তোমার টাকা আমরা পাঠিয়ে দেব।

এ সুখবরটা জয়কে চিঠিতে জানাতে ডোরিয়ার ইচ্ছে করেনি, তাই সে নিজেই ছুটে চলে এসেছে এই শনি রোববারটা লণ্ডনে কাটাবার জন্যে।

অক্সফোর্ড সার্কাসের মোড়ে ওদের পাশের সিট্ দুটো খালি হয়ে গেল। সৌরেন দু'একবার ইতস্তত করল সামনে গিয়ে বসবে কিনা, একবার মনে হল যদি ওরা বিরক্ত হয়। তবু এগিয়ে গেল।

জয়রা কিন্তু সৌরেনকে দেখে খুশী হল,. বিশেষ করে ডোরিয়া। সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল, জান ত সৌরেন, আর পনের দিন বাদেই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ছি।

সৌরেন স্মিত হেসে বলে, শুনেছি, এ সময় ঘুরতে খুব ভাল লাগবে।

—কোথায় কোথায় যাচ্ছি জান? প্রথমে প্যারি, সেখান থেকে ব্রাসেল্‌স্ হয়ে

লুক্সেমবার্গের মধ্যে দিয়ে যাব জার্মানি। তারপর সুইজারল্যান্ড-এ সপ্তাহখানেক কাটিয়ে ঢুকবো ইটালীতে। মিলান, ফ্লোরেন্স, রোম। জাহাজ ধরব নেপেল্‌স্‌ থেকে।

জয় হাসতে হাসতে বলে, জানিস সৌরেন, ডোরিয়া যাকে পাচ্ছে ওর ভ্রমণসূচী শুনিয়ে দিচ্ছে। বেড়াবার নেশা দেখছি ওর খুব।

ডোরিয়া সহজ গলায় বলে, আমার তো ভাল করে ঘুমই হচ্ছে না, মনে হচ্ছে এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়। এ রকম থ্রিল আমি কখনও অনুভব করিনি। আচ্ছা তুমিই বলতো সৌরেন, আমার মত ভাগ্যবতী মেয়ে ক'জন আছে? এইটুকু বয়সে, প্রায় আধখানা পৃথিবী ঘোরা হয়ে যাবে।

সৌরেন সায় দেয়, তা সত্যি, এখান থেকে বাংলা দেশের দূরত্ব তো কম নয়। কত হাজার মাইল।

—সম্পূর্ণ অন্য দেশ, অন্য জাতের মানুষ, অন্যরকম ভাষা। আচার, ব্যবহার, সমাজ, সব আলাদা। ভাবতেই কিরকম মজা লাগছে।

—একটা কথা মনে রেখো ডোরিয়া, লন্ডনে যে-সব সুযোগ সুবিধা তোমরা পাও, কলকাতায় তার দশ ভাগের এক ভাগও পাবে না।

—নাই বা পেলাম।

—তখন বিরক্ত হবে না তো?

ডোরিয়ার মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, আমাকে দেখে বুঝি তোমার তাই মনে হয়। তাহলে জেনে রাখো, সবরকম কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি। ভারতবর্ষের ওপর যতগুলো বই লন্ডনে পাওয়া সম্ভব আমি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি।

জয় তাড়াতাড়ি বলে, আর ও পাগ্‌লীকে খ্যাপাস না সৌরেন, আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে রাজ্যের বই পড়ে যাচ্ছে, ভারতের দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, কিছুই বাদ দিচ্ছে না। আমিই পড়েছি এখন মহা মুশকিলে। ঠিক ঠিক সব উত্তর দিতে পারি না। তার ওপর আবার বাংলা শিখছে।

—তাই নাকি।

ডোরিয়া সগর্বে হাসে, জয় মোটেই পড়াতে পারে না। আমি তাই আজকাল ওর বাঙালী বন্ধু পেলেই তার সঙ্গে বাংলা বলার চেষ্টা করি।

—শুধু তাই নয়রে সৌরেন, মাকে ও বাংলায় চিঠি দিয়েছে।

—সত্যি?

জয় এবার বাংলায় বলে, ডোরিয়ার বুদ্ধি খুব, চিঠি লিখে লিখে মাকে একেবারে হাত করে ফেলেছে। মা ওর বাংলা নাম দিয়েছেন শুভ্রা।

ডোরিয়া মন দিয়ে জয়ের কথা শুনছিল, মনে হল বাংলা সে ভালই বোঝে, বলে, জয়ের মা-র সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি বড় উদগ্রীব হয়ে আছি। ওদের বাড়ি থেকে অনেকেই আমায় চিঠি লেখে, কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল লাগে ওর মায়ের চিঠি। কত সহজ, কত সরল।

—মা-র সঙ্গে যাতে ও কথা বলতে পারে সেইজন্যেই বাংলা শেখার চেষ্টা করছে।

সৌরেন খুশী হয়ে বলে, চেষ্টা থাকলে নিশ্চয় পারবে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, আজ বিকেলে তোমরা সরোজদার বাড়িতেই থাকবে তো?

—কেন বলতো?

—বাঃ, রিহার্সাল আছে না?

জয় ঠোঁট ওলটায়, আজ আর রিহার্সালে থাকব না। ও বেচারী দু'দিনের জন্যে এসেছে, তুই একটু সরোজদাকে বুঝিয়ে বলিস।

ডোরিয়া আপত্তি করে, দেখো আবার, আমার জন্যে তুমি রিহর্সালের ক্ষতি করো না। চাও তো আমিও গিয়ে রিহার্সাল দেখতে পারি।

—না, থাক। এমন সুন্দর দিন ওভাবে নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে চল, আজ আমরা নাচতে যাই।

—অনেক পয়সা খরচা।

—তা হোক। জয়ের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

ডোরিয়া ম্লান হাসে। নাচতে তোমার খুব ভাল লাগে, না!

—খুব, খুউব। নাচের বাজনা আমার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। মনে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি নেচে যাই। শুধু আমার শরীর নয়, মনটাও নাচে। তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না।

ডোরিয়ার নীল চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, আমি বুঝতে পারি জয়, শুধু আশ্চর্য হই এই ভেবে, তোমাদের দেশে তো এ নাচের চল নেই, অথচ তুমি কোথা থেকে—

জয় তার কথা শেষ করতে দেয় না, আমি ছোটবেলা থেকে নাচতে ভালবাসি। কলকাতায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে নাচতে যেতাম ক্লাবে, নাইট ক্লাবে। একরকম সেই জন্যেই দেশে থাকতে পড়াশুনো বিশেষ হল না। গ্রাজুয়েট হবার আগেই, কলেজের ক্যাথলিক 'ফাদার'রা আমায় তাড়িয়ে দিলেন। এদেশে এসেও নাচ শিখেছি। একটু থেমে ডোরিয়ার মুখের উপর পুরো চোখ মেলে তাকিয়ে জয় বলে, এই নাচের জন্যেই তো তোমাকে পেলাম।

এক নাচের ফ্লোরেই জয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল ডোরিয়ার। ইউথ ফেস্টিভ্যাল থেকে ফিরে জয় গিয়েছিল ইন্ডো চেক ফ্রেণ্ডশিপ্ সোসাইটির সাংস্কৃতিক আসরে। সেইখানেই ডোরিয়ার সঙ্গে নেচেছিল জয়। ভাল নাচতে পারে তা নয়। তবে দু'জনের এক সঙ্গে নাচতে বেশ ভাল লেগেছিল। সেইখানেই বন্ধুত্ব, পরে প্রণয়, শেষ পর্যন্ত যা বিবাহে রূপান্তরিত হয়েছে।

ডোরিয়া জয়ের মধ্যে দেখেছে অফুরন্ত পৌরষ, যে পৌরষকে একদিন হয়ত সে ভয় করত, আজ যা ভালবাসে, সর্বান্তঃকরণে চায়। যৌবনের জোয়ার এনে দিয়েছে জয় তার এই ভাঁটা-পড়া শরীরে। নাচ, গান, হৈ হৈ ভরা যে জীবন থেকে স্বেচ্ছায় একদিন বিদায় নিয়ে ডোরিয়া চলে এসেছিল, আজ আবার জয়ের হাত ধরে সেখানেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে, গান করে নেচে আনন্দ পেয়েছে। তাই জয়ের কোন অনুরোধই সে উপেক্ষা করতে পারে না, বলে, তাই হবে জয়, তোমার যখন ইচ্ছে, আজ আমরা নাচতেই যাব।

সৌরেনের বেশ ভাল লাগছিল ওদের কথাবার্তা শুনতে, নিজেদের নিয়েই ওরা মশগুল হয়ে আছে। আর একজনের উপস্থিতি এতটুকুও তাদের বিব্রত করছে না। এক সময় ফিস্ ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল, খানিকটা হাসল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সৌরেনের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়ে দ্রুত বাস থেকে নেমে চলে গেল।

সৌরেন ওপর থেকে ওদের দেখছিল। রাস্তার মধ্যে দিয়েও নিজেদের মনেই কথা বলতে বলতেই ওরা চলে যায়। আশপাশের জনস্রোতের দিকে লক্ষ্যও করে

না। বেশ আছে ওরা, সৌরেন মনে মনে হাসল। পুরুষ আর নারী, ওই তাদের পরিচয়। দেশকালের কোন গন্ডীই ওদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

সৌরেন যখন নিজের বাড়ির দরজায় এসে পেঁছিল তখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। পকেট থেকে চাবি বার করে সন্তর্পণে বাইরের দরজা খুলে আবার তা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। বাড়ি নিস্তব্ধ, এ সময় কোনরকম শব্দ হবার কথাও নয়, বাড়িতে কে-ই বা থেকে। পাপোষে পা মুছে কার্পেটের ওপর দিয়ে লঘু পায়ে সৌরেন উঠে চলল। কাঠের সিঁড়িতেও বিশেষ শব্দ হল না। তিনতলায় ওর ঘর, ঘরের চাবিও তার পকেটে ছিল, খুলে ভেতরটা দেখে খুশী হল। মিসেস হেরিং ঘরদোর পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখে গেছেন। বিছানার চাদর বদলে দিয়েছেন, সাদা ধব ধব করছে। ভাল দিন দেখে মিসেস হেরিং জানালার কাঁচগুলো খানিকটা খুলে রেখে গিয়েছিলেন, তাই অন্যদিনের মত আজ ঘরের মধ্যের হাওয়াটা ভ্যাপসা নয়। কোটটা খুলে রেখে গলার টাই-এর গিটটা ঢিলে করে সৌরেন আরাম করে বসল সোফার ওপর।

আজ তার বেশ ভাল লাগছে, ঠিক কিসের জন্যে বলা শক্ত। হয়ত এই ঝলমলে রোদভরা দিনের জন্যে, হয়ত রজতের সঙ্গে অনেকদিন বাদে আজ দেখা হয়েছে বলে। আবার কে বলতে পারে জয় আর ডোরিয়ার হাসিভরা মুখগুলো দেখে তার মনে নতুন স্বপ্ন জেগে উঠেছে কিনা।

এক এক সময় অলসভাবে বসে চিন্তা করতে বেশ ভাল লাগে, আবোল তাবোল চিন্তা। কিন্তু ঘড়ির ধমককেও উপেক্ষা করতে পারে না। এদেশে ওই এক জ্বালা, ঘড়ি ধরে কাজ করা বাতিক সকলের। দু'ঘণ্টার মধ্যে পেঁছতে হবে সরোজদার ফ্ল্যাটে, সেখানে আজ রিহার্সাল। কাজ কিছু হোক বা না হোক, গেলে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, পাঁচরকম গল্প করা চলে। দেশে থাকতে সৌরেন কোন অজুহাতেই মঞ্চে ওঠেনি, কলেজে থাকতেও ভলেণ্টিয়ার ছাড়া আর কিছু সে হতে চাইত না। কিন্তু এখানে এসে সরোজদার পাল্লায় পড়ে তাকে অন্যদের সঙ্গে মঞ্চে বসে গান করতে হয়। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ হলেও এখন ভালই লাগে।

সৌরেন ভাবছিল গ্যাসের রিং-এ চায়ের জল বসাবে কিনা। দরজায় কে টোকা মারল। সৌরেন আশ্চর্য না হয়ে পারল না, এ সময় কে আসবে। বিশেষ করে এদেশে না জানিয়ে হঠাৎ বাড়িতে দেখা করতে আসার দস্তুর মোটেই নেই। তবে হয়ত মিসেস্ হেরিং দুধের টাকা চাইতে এসেছেন।

সৌরেন চেয়ারে বসে থেকেই বলল, ভেতরে আসুন।

তবু দরজা খুলে কেউ ঢুকল না। আবার মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

নিশ্চয় কোন অচেনা লোক। সৌরেন উঠে গিয়ে দরজা খুলল, সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা, কৈফিয়ত দেবার সুরে বললেন, মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে, আশা করি আপনিই মিঃ ল্যারী?

সৌরেন সংশোধন করে দিয়ে জানাল, আমার নামটা শুনতে ওইরকমই বটে তবে আসলে লাহিড়ী।

মেয়েটি স্মিত হেসে বললে. গুড্ আফটারনুন মিঃ লাহিড়ী।

গুড আফটারনুন্—

মেয়েটি পাদপূরণ করে দেয়, এলিজাবেথ্, আমি আপনার পাশের ঘরে এসে উঠেছি।

—কবে থেকে?

—আজকেই। ঘণ্টাখানেক আগে।

—হ্যাঁ, ঘরটা এক সপ্তাহ থেকে খালি পড়েছিল। একটু থেমে সৌরেন জিজ্ঞেস করে, আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?

মেয়েটি বললে, যে বুড়ী ভদ্রমহিলা এ বাড়ি দেখাশোনা করেন, কি যেন নাম বললেন,

—মিসেস্ হেরিং।

হ্যাঁ, ওঁর আজ সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল এক বান্ধবীর সঙ্গে, আমাকে ঘর দেখিয়ে, চাবি দিয়ে, তাড়াতাড়ি উনি বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, হঠাৎ কোন কিছু দরকার পড়লে যেন আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিই।

সৌরেন খুশী হয়ে বললে, মিসেস্ হেরিং বড় চমৎকার মানুষ, আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন, আপনার যদি কিছু দরকার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

এলিজাবেথ সাবলীল কণ্ঠে জানাল, আপাতত একটা দেশলাই আর একটা শিলিং।

সৌরেন তাড়াতাড়ি বলে, তিনতলার ঘরগুলোর এই মুশকিল, শিলিং না থাকলে গ্যাস জ্বালান যায় না। আমি তাই সব সময় হাতে শিলিং এলেই জমিয়ে রাখি। কথা বলতে বলতে সৌরেন পকেট থেকে দেশলাই আর শিলিং বার করে এলিজাবেথের হাতে দিয়ে দেয়।

—অনেক ধন্যবাদ, আমি বাজার থেকে ফিরে এসে এগুলো ফেরত দিয়ে দেবো।

—সেজন্যে তাড়া কিছু নেই।

এলিজাবেথ হেসে বললে, আমি যাই ঘরদোরগুলো গুছিয়ে ফেলি, আবার পরে দেখা হবে।

মেয়েটি ঘরের মধ্যে চলে গেল। সৌরেনের হঠাৎ মনে হল, ওর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল চা খাবে কিনা। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডেকে বলল, মাপ করবেন, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, আমি চা করছিলাম, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, হয়ত এ সময় চা খেতে আপনার ভালই লাগবে।

এলিজাবেথ সানন্দে বলল, সত্যিই খুব সুখী হব। আশা করি, আপনার কোন অসুবিধে আমি করছি না।

—মোটেই না। আমি তো চা খেতেই যাচ্ছিলাম, তৈরি হয়ে গেলে আপনাকে খবর দেব।

মেয়েটি আবার ধন্যবাদ জানিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সৌরেন নিজের ঘরে ফিরে এসে চায়ের জল বসাল গ্যাসের রিংএ। খুঁজে দেখল ঘরে খানিকটা নোন্‌তা বিস্কুট, মাখন আর চীজ্ আছে। একবার ভাবল মোড়ের দোকান থেকে কেক কিনে আনবে কিনা। পরেই মন হল, হয়ত তাতে বাড়াবাড়ি দেখাবে।

এলিজাবেথকে দেখলেই মনে হয়, সে শহরের মেয়ে নয়, গ্রাম থেকে এসেছে, তার চোখ মুখের সরলতা সহজেই চোখে পড়ে। এলিজাবেথ দীর্ঘাঙ্গী, চোখ মুখ বেশ পরিষ্কার, সাধারণ ইংরেজ মেয়ের মত শ্রীহীন নয়। মুখ চোখে কোথাও তার এতটুকু রঙ্ নেই, তবু দেখলেই মনে হয়, সে চেহারার মধ্যে আছে প্রাণের প্রাচুর্য।

একটু বাদেই এলিজাবেথ এ ঘরে আসবে, হয়ত তারই মধ্যে মাথার এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে মুখ হাত পা ধুয়ে ভদ্রস্থ হয়ে নেবে। সৌরেনের সঙ্গে সোফায় বসে চা খাবে হয়ত গল্প করবে, তার বাড়ির কথা।

ভাবতেই সৌরেনের বেশ ভাল লাগল। কিন্তু রিহার্সালে যাবার দেরী হয়ে যাবে না তো।

হোক্‌গে দেরি, রোজই তো সে সময় মত যায়। আজ না হয় একটু দেরিই হ'ল।

বলাই বাহুল্য সেদিন রিহার্সাল জমল না। অর্ধেকের ওপর লোক আসেনি; শুধু আসেনি নয়, আসবে না তা ফোন করে জানায়নি, পাছে সরোজ তাদের ওজর আপত্তি না শোনে, আসবার জন্যে জোর জবরদস্তি করে। ফলে এ ধরনের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হল, যারা এসেছিল অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে উঠল। সকলেই কতরকম অসুবিধা করে এসেছে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করল, যারা আসেনি তাদের উদ্দেশ্যে চোখা চোখা বিশেষণ প্রয়োগ করতেও কার্পণ্য করল না। সব কিছুই শুনতে হল বেচারী সরোজকে। আজকাল এ ধরনের 'শো' করাতে গিয়ে ওর অনেক সময় মনে হয় এরা যেন থিয়েটার করে আনন্দ পেতে আসে না, আসে সরোজকেই উদ্ধার করতে। বিলেতে এলে কি হবে, দেশের অ্যামেচার আর্টিস্টদের এ অভ্যাসটি তারা সঙ্গে করেই এনেছে।

সরোজের মাঝারি আকৃতির ঘরের তুলনায় লোক অবশ্য কম হয়নি, তবে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ গল্প করার সঙ্গী। একলা এসে রিহার্সাল দিতে আর কার ভাল লাগে। তাই সকলেই প্রায় এক একজন সঙ্গে নিয়ে আসে, আর কিছু না হোক চা কফি খেয়ে আর গল্প-গুজব করে তাদের মন্দ কাটে না। জয় থাকলে, ও আর ডোরিয়া দু'জনে মিলে অনবরত চা পরিবেশন করে। আজ জয় না থাকায় লীলা আর সৌরেন রান্নাঘরে ঢুকেছে।

সৌরেন কাপ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করে, তুমি তাহলে সত্যিই ফিরে যাচ্ছ লীলা? লীলা মিষ্টি করে হাসে, কেন আপত্তি আছে?

—তা নয়, তবে তোমরা সবাই চলে গেলে মন খারাপ হবে বইকি।

—প্রমীলা তো রইল।

—ও কি করবে?

—জানি না। বড় খামখেয়ালী, যখন যা ইচ্ছে তাই বলে।

—প্রমীলাকে দেখলাম আসবার সময়।

—কোথায়?

—মার্বেল আর্চের কাছে পার্কে ঢুকছিল। ভেবেছিলাম ও এখানে আসবে। কই এল না তো।

সে কথার উত্তর না দিয়ে লীলা ট্রেতে চা সাজিয়ে দেয়, আমার হয়ে গেছে সৌরেন, ও ঘরে দিয়ে আসতে পার।

সৌরেন ট্রে নিয়ে বসবার ঘরে চলে যায়। লীলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সৌরেনকে লীলার ভাল লাগে না, কেন, তা হয়ত সে বলতে পারবে না, তবে ওকে দেখলেই লীলার মনে হয় ও মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জানে না। আজ যেরকম করে হোক ওকে এড়িয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, তা না হলেই পেঁছে দিতে যাবে বাড়ি পর্যন্ত, কফি খাবার ছুতো করে ভেতরে ঢুকে পড়বে। তারপরই শুরু হবে বকর বকর করা। রাজ্যের গল্প। লীলা ইচ্ছে করে বার কয়েক হাই তুললেও সৌরেন তার ইঙ্গিত বুঝতে চাইবে না। লীলা আর প্রমীলার রাত্রের খাওয়া থেকে ভাগ বসিয়ে যখন উঠবে তখন এদেশী প্রথায় সুপ্রভাত বলার সময়।

অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করে সরোজ এসে ঘরে ঢোকে। লীলা মুখ তুলে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলে, কি হল, চা খেলেন না?

সরোজ শুক্‌নো উত্তর দেয়, না।

লীলা তাকিয়ে তাকিয়ে সরোজকে দেখে, বেচারীর ভুরু কোঁচকান মুখখানা দেখলে সত্যিই মায়া হয়।—কি অত ভাবছেন?

—ভাবছি মাথা আর মুণ্ডু, কি কুক্ষণেই যে চিত্রাঙ্গদা করব বলে কথা দিয়েছিলাম! একটা কেউ সময় মত আসবে না, কিছু করবে না। যত দায় যেন আমার।

—সত্যি সরোজদা, আমারও ভারী বিশ্রী লাগে, না করবে তো বলে দিলেই হয়। সরোজ নিজের মনে বিড় বিড় করে যায়, কার ওপর আস্থা রাখব বল? জয় যে আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে, সে এল না। মীনাক্ষীর সঙ্গে সাজ-পোশাক নিয়ে আজ পাকা কথা হবার ছিল ফোন করে বলে দিলে শরীর ভাল নেই। এমন কি প্রমীলাটাও আসেনি।

সৌরেন যে প্রমীলাকে গ্রীন পার্কে ঢুকতে দেখেছে সে কথার উল্লেখ না করে লীলা বলে, প্রমী তো বলেছিল অফিস থেকে এখানে চলে আসবে, কি হল বুঝতে পারছি না।

—বিপদ হল আমার, রিহার্সালও হবে না, অথচ বেরতেও পারব না। এতগুলো লোক এসে গল্প করতে লেগে গেছে, তাদের ফেলে রেখে তো আর চলে যাওয়া যায় না?

লীলা নীচু গলায় বলে, আমি কিন্তু পালাব।

—কোথায়?

—বাড়িতে।

—এত তাড়া কিসের?

—দেরী করলেই পেছনে ফেউ লাগবে।

সরোজ এবার হেসে ফেলে, ভয় কাকে? সৌরেনকে? আমি ওকে এখুনি বলে দিচ্ছি। লীলা সরোজের হাতটা ধরে ফেলে, খবর্দার সরোজদা, তাহলে ভাল হবে না বলছি।

—আজ আমি ঘুমুতেই চাই, সৌরেন যদি সঙ্গে আসে তাহলে আর ঘুম হবে না।

—সৌরেনটা এরকম পাগলা নাকি?

—ন্যাকা, নিজে জানেন না যেন।

সরোজ হো হো করে হাসে, যাই হোক বাড়ি গিয়ে প্রমীলাকে ব'লো একটা টেলিফোন করতে, কোন্ ছেলে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিল ধরতে হবে।

লীলাও ম্লান হাসে, কিন্তু আমি আর বসবার ঘরে ঢুকছি না। এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। কেউ খোঁজ করলে বলবেন অন্য কোথাও এনগেজমেণ্ট আছে।

—থাক, আমাকে আর মিথ্যে শেখাতে হবে না। তুমি নির্বিঘ্নে চলে যেতে পার। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, কাল দুপুরে কি করছ?

—কিছু না।

—চল. কোন দেশী রেস্তরাঁয় গিয়ে ভাত দিয়ে মাছের ঝাল খাওয়া যাবে।

—আমি আসতে পারি, তবে প্রমীলা বোধ হয় ওর অফিসের স্টাফের সঙ্গে কোথাও পিকনিকে যাবে।

সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, সে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব এখন। তুমি কাল সাড়ে বারটার সময় ক্যালক্যাটা রেস্তরাঁয় এস।

সরোজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে লীলা বাসেও উঠল না, টিউবও ধরল না সোজা গেল কিণ্ডলে রোড স্টেশনের দিকে। ওখানে অনেকগুলো দোকান, শনিবারদিনও বেশ সন্ধ্যে পর্যন্ত খোলা থাকে। কাল রবিবার, দোকানপাট সব বন্ধ থাকবে, কিছু তরকারি কয়েকটা টিনের স্যুপ, আর মাছ, পাঁউরুটি আর মাখন কিনে রাখা দরকার, তা না হলে কাল হয়ত উপোস দিতে হবে। কেনা-কাটার কাজটা বেশীর ভাগ দিন লীলাই করে, প্রমীলার ওসব ঠিক ধাতে সয় না। আদুরে ভাবটা ওর এখনও যায়নি।

কিণ্ডলে রোড দিয়ে উত্তরদিকে এগিয়ে গিয়ে ফ্রগন্যাল লেন ধরলেই ওদের বাড়ির রাস্তা। জোরে হাঁটলে মিনিট কুড়ি লাগে, ঢিমে চালে আধঘণ্টা। এমন কিছু তাড়া ছিল না তাই লীলা আস্তে আস্তে দোকানগুলো দেখতে দেখতে যায়। বেশীর ভাগ দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে, তবে কাঁচের বড় বড় জানলাগুলো কেমন সুন্দর আর লোভনীয় করে জিনিসপত্র দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। হাতে সময় থাকলেই লীলা হাজারো লণ্ডনবাসীর মত উইনডো শপিং করতে ভালবাসে। পিকাডেলী সার্কাস কিংবা অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দোকানগুলোর আভিজাত্য অন্য রকমের। প্যারিসের নামজাদা ফ্যাশান বিশারদদের ধরে এনে এরা দোকান সাজায়। সেখানে আলো, রঙের ছড়াছড়ি, কতরকমের কায়দা। লীলার মনে হয় এ সব দোকান বাইরে থেকে দেখতেই ভাল, ভেতরে ঢুকে জিনিস কিনতে বেশ অস্বস্তি লাগে। তার চেয়ে কিলবার্ন কি হ্যাম্পস্টেডের দোকানগুলো অনেক যেন ছাপোষা, দোকানদারদের চোখে খানিকটা আন্তরিকতা আছে যা পাওয়া যায় না ওই সব নামজাদা পাড়ায়, যেখানে রাজবাড়ির আত্মীয়রা যান বাজার করতে, আর ঘুরে বেড়ায় আমেরিকান টুরিস্টরা কাঁধে দামী ক্যামেরা ঝুলিয়ে, যাদের কাছে লণ্ডনের সব জিনিসপত্রই মারাত্মক সস্তা বলে মনে হয়।

কাগজের ব্যাগে কয়েকটা প্রয়োজনীয় খাবার জিনিস কিনে লীলা ফ্রগন্যাল লেনের চড়াই ভেঙ্গে উঠতে লাগল বাড়ির দিকে। তাড়াতাড়ির সময় কিংবা অফিসের দিনে ও বড় একটা এ রাস্তা দিয়ে আসে না, চড়াই ভাঙ্গার ভয়েই একরকম। তবে আজ তার ভাল লাগছিল, সারাদিন সরোজের ফ্ল্যাটে বসে থেকে তবু খানিকটা হেঁটে বাঁচল। বাড়ির সামনে এসে ব্যাগ থেকে চাবি বার করে নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লীলা। সামনের করিডোর পেরিয়ে ডান দিকে ওদের দু কামরার ফ্ল্যাট। দরজা খোলা ছিল, তাই আর ঘরের চাবি বার করতে হল না। বসবার ঘরে ঢুকে লীলা কোটটা খুলে কোচের ওপর রাখে, এইটুকু হাঁটতেই রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছিল সে। শোবার ঘর থেকে প্রমীলার গুন গুন গান শোনা যাচ্ছে।

লীলা জিজ্ঞেস করে, কিরে প্রমী, রিহার্সালে গেলি না যে?

প্রমীলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল, অল্প হেসে বললে, না।

উত্তর শুনে লীলার বিরক্তি ধরে, না বলে দিলেই হল, ওদিকে যে রিহার্সালই হল না।

প্রমীলা ভুরু উঁচু করে পাল্টা প্রশ্ন করে, কেন, তোমরা তো সবাই ছিলে, একলা প্রমীলা না গেলে আর কি আসে যায়।

প্রমীলার এই ধরনের পাকা পাকা কথাগুলো সহ্য করতে পারে না লীলা, কেন যাওনি তাই বল না।

—কাজ ছিল।

—কিসের কাজ?

প্রমীলা একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, কাজ আবার কিসের, অফিসেরই।

—আজ শনিবার না?

—মিঃ মেনন বললেন কতগুলো দরকারী কাজ আছে, আমি যদি ওঁর সঙ্গে একটু সময় দিই, তাই আর না করতে পারলাম না।

—তাহলে একটা টেলিফোন করে দিলে না কেন?

—এত দেরী হয়ে যাবে ভাবিনি।

সৌরেন যে প্রমীলাকে গ্রীন পার্কে ঢুকতে দেখেছে দু'টোর সময় সে কথা না তুললেও লীলা বুঝল প্রমীলা মিথ্যে কথা বলছে। বললে, দয়া করে সরোজকে একটা টেলিফোন কোরো।

প্রমীলা কোন আগ্রহ দেখাল না, কেন?

—তোমায় করতে বলেছেন।

—আজ আর এখন পারছি না। করব এখন কোন সময়।

লীলা আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল বাথরুমে।

প্রমীলা বয়সে লীলার চেয়ে যদিও দু' বছরের ছোট, কিন্তু ব্যবহারে তা বোঝবার জো নেই। না জানলে সমবয়সী বান্ধবী মনে হয়। প্রমীলা লীলার চেয়ে কালো কিন্তু তার মুখশ্রী ভাল। দিদির অনেক কিছু অনুকরণ করলেও ওর দেখা-দেখি চুলটা আজও কেটে ফেলেনি। লম্বা চুলে দু'টো বিনুনি ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নয়ত আলতো করে এলো খোপা বাঁধে। রঙটা কালো বলেই বোধ হয় টানা টানা চোখ দু'টো সহজে নজরে পড়ে। দু'বোনের মধ্যে প্রমীলার ইংরিজীটা মার্জিত, এমন-কি ইংরিজীতে কবিতাও লিখত, বিলেতে এসে সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছে। বলরুম নাচে কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না। তবে সরোজের পিঠ চুলকোন সমিতিতে দু'বোনের দু'ধরনের কাজ। লীলা নাচে, ভারতীয় নাচ, যা সে এখানে এসে আয়ত্ত করেছে। আর প্রমীলা করে গান।

লীলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলে প্রমীলা খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। কথা বলার আর প্রবৃত্তি হল না, সোজা ঢুকে গেল রান্নাঘরে, যা'হোক কিছু চড়িয়ে দিতে হবে তো: অন্তত একটা স্যুপ আর এক প্যাকেট সসেজ। বেশী কিছু রাঁধবার আর ইচ্ছে নেই।

প্রমীলা এক সময় নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে. তুই সারাদিন সরোজদার ওখানেই ছিলি?

লীলা এবার গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

—আর কেউ এসেছিল নাকি?

—না।

—খুব গলপ হল তো।

—তা হল।

আবার খানিকক্ষণ কোন কথা হয় না। লীলা স্যুপটা চড়িয়ে দিয়ে. দু'একটা নোংরা প্লেট ধুতে থাকে। প্রমীলা চিত হয়ে শুয়ে বইটা বুকের ওপর নামিয়ে রেখে ছাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করে, সত্যিই আজ

রিহার্সাল হল না?

—আমি কি মিথ্যে বলছি, অর্ধেক লোকই তো আসেনি।

প্রমীলা আস্তে আস্তে বলে, হ্যাঁরে, সরোজদা আমার ওপর খুব রেগে গেছে না?

—না রাগলে আশ্চর্য হব। বেচারী সারা সপ্তাহ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে। তার ওপর শনি, রবিবার রিহার্সালের জন্যে বসে থাকে, তোমরা যদি কো-অপারেট না করো বলে দিলেই পারো।

প্রমীলা আবার চুপ করে যায়। খাট থেকে উঠে পড়ে বসবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। লীলা রান্নাঘর থেকে শুনতে পায় প্রমীলা কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে, হয়ত সরোজ। লীলা মনে মনে খুশী হয় প্রমীলা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে বলে, নিশ্চয় সরোজের কাছে ক্ষমা চাইছে।

পরদিন লীলা ঘুম থেকে উঠেছিল দেরি করে, প্রত্যেক রবিবারই তাই হয়। প্রমীলা আগেই তৈরী হয়ে চলে গেছে পিকনিক পার্টিতে। তাড়াহুড়া করে তৈরী হয়েও লীলা যখন ক্যালকাটা রেস্তরাঁয় এসে পৌঁছল মিনিট দশেক দেরি হয়ে গেছে। সরোজ দাঁড়িয়ে ছিল, ওকে দেখে ঠোঁট টিপে হাসে, কি মেমসাহেব, এখন ঘুম থেকে উঠলেন নাকি?

লীলা লজ্জিত স্বরে বলে, সত্যি সরোজদা ঘুমুতে পেলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

—এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করলে চলবে না, সব টেবিল ভরে যাবে।

—চলুন ভেতরে।

রেস্তরাঁয় অবশ্য তেমন ভীড় ছিল না। খান পাঁচেক টেবিলে লোক বসে আছে, বেশীর ভাগই ইওরোপীয়ান। সারা লণ্ডনে এ ধরনের ভারতীয় রেস্তরাঁ অনেক, তবে সবই প্রায় শহরের মাঝখানে, পিকাডেলী সার্কাস আর লেস্টার স্কোয়ার ঘেঁষে। খাবার ভাল হলে এ ব্যবসায় লাভ প্রচুর, খদ্দের অবশ্য সাহেবরাই বেশী। যারা একবার দেশী রান্নার স্বাদ পেয়েছে তারা সুযোগ-সুবিধে পেলে ঘুরে ফিরে এসে দেশী রেস্তরাঁয় ঢোকে। একথা ইংরেজদের বিষয়ে আরো বেশী খাটে কারণ তারা খেতে জানে না। সারা কণ্টিনেণ্টের লোকেরা এ নিয়ে হাসাহাসি করে, বিশেষ করে ফরাসীরা। ওদের মতে ইংরেজদের রান্না মানেই খানিকটা সেদ্ধ, সে মাছ মাংস যাই হোক না কেন; নুন, মরিচ, মাস্টার্ড আর সস দিয়ে স্বাদ তৈরী করে নিয়ে খাও। ইংরেজ মেয়েদের কুঁড়েমির তুলনা করে এফিল টাওয়ারের সঙ্গে, সেদ্ধ করতেও নাকি তাদের ইচ্ছে করে না, তাই টিনের খাবার খেয়ে বসে থাকে। এক-ঘেঁয়ে সেদ্ধ আর টিনের খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেলে ওরা ঢুকে পড়ে বিদেশী রেস্তরাঁয় মুখের স্বাদ বদলাতে।

রেস্তরাঁর মালিক রসিদ আলি, ছোটখাট হাসিখুশী মানুষটি সরোজদের ভাল করেই চেনেন। আপ্যায়িত করে এক কোণের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, খবর সব ভাল তো?

সরোজ হেসে উত্তর দেয়, ভালো আলি সাহেব।

—এ বছর কিন্তু তেমন গরম পড়লা না, যা একঘেঁয়ে বৃষ্টি চলছে।

—ও আর বলবেন না, লণ্ডন মানেই বৃষ্টি, কম বছর তো এখানে নেই। ভালো ওয়েদার আর পেলাম কবে?

আলি সাহেব হাসে, আপনার কত বছর হল?

—তা প্রায় আট।

—আমার কত বছর লন্ডন বাস জানেন?

—কত?

—পঁচিশ বছর হয়ে গেছে।

লীলা এবার বিস্মিত না হয়ে পারে না, পঁচিশ বছর? আপনার ভালো লাগে থাকতে?

আলি সাহেবের চোখ দুটো হাসে, আগে লাগত না কিন্তু এখন লাগে। জানি না দেশে গেলে এখন থাকতে পারব কিনা। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান কত রকম হয়েছে। আমার দেশ চট্টগ্রামে, দেশে ফিরলে পাঠিয়ে দেবে পাকিস্তানে। অথচ ছোটবেলা থেকে কাজ করেছি কলকাতায়, সেখানেই আমার বন্ধুবান্ধব সব। মেটিয়া-বুরুজ-এ আমার 'রেস্টুরেণ্ট' ছিল। তবে এত সুন্দর নয়।

নতুন খদ্দের ঢোকায়, আমায় মাপ করবেন বলে বিদায় নিয়ে আলি সাহেব তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যায়। সেইদিকে তাকিয়ে লীলা মন্তব্য করে, বেশ আছে এরা, লেখাপড়াও শেখেনি, কিছুই নয় অথচ চালিয়ে যাচ্ছে তো।

সরোজ সিগারেট ধরাচ্ছিল, দেশলাইটা নামিয়ে রাখে, ব্যবসা চালাবার জন্যে তো আর লেখাপড়ার দরকার নেই। বুদ্ধি থাকলে হ'ল।

লীলা দুষ্টুমি করে হাসে, তাহলে তো আপনার দ্বারা ব্যবসা করা চলবে না।

—সত্যিই চলবে না। গণেশ উল্টে পাওনাদার ভাগিয়ে, ইনকামট্যাক্সকে পাশ কাটিয়ে, মাটির নীচে টাকা পুঁতে রাখার মত বুদ্ধি আমার নেই। অবশ্য তার জন্যে আফসোস করি না, বরং যাদের আছে তাদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করি।

—আপনার সঙ্গে এই জন্যে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, সব সময় একটা হিরো-হিরো ভাব, সুবিধে পেলেই বড়ো বড়ো কথা বলতে শুরু করেন।

সরোজ লীলাকে রাগাবার জন্যে ইচ্ছে করে টেনে টেনে হাসে, তা না হলে আর তোমাদের মত হিরোইনরা আসবে কেন?

লীলা ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, আমার কিন্তু মোটেই শুনতে ভাল লাগে না, মনে হয় অস্কার ওয়াইল্ড-এর লেখার নকল করে আজকাল যে সব চটকদার কথাওয়ালা বাংলা নভেল নাটক বেরচ্ছে, আপনি তাদেরই কোন একটায় হিরোর পার্ট করছেন।

ইতিমধ্যে ওয়েটার 'মেনু' দিয়ে যাওয়ায় খানিকক্ষণের জন্যে কথা বন্ধ করে দুজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল কয়েকটা ভালো পদ বেছে নিতে। দুজনে খেতে যাবার এই এক মুশকিল, কিছুতেই এমন পছন্দ মত 'মেনু' পাওয়া যায় না যা দুজনের ভাল লাগবে; বিশেষ করে সরোজের দুষ্টুমি তো আছেই। লীলা যদি বলে ল্যাম্ব কারি, ও বলবে মাছভাজা নয় কেন?

সুতরাং দুজনের মধ্যে মিটমাট করে অর্ডার দিতে বেশ দেরি হয়ে যায়।

লীলা হাঁফ ছেড়ে গুছিয়ে বসতে বসতে বলে, আপনার সঙ্গে আমার পছন্দর কি এতটুকু মিল থাকতে নেই?

সরোজ পাল্টা প্রশ্ন করে, না থাকাটা ভাল না মন্দ?

—জানি না।

—তাহলে কি জান?

—যে আপনি একটি বিচ্ছিরি লোক।

—এত দেরিতে বুঝলে, ছি ছি আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বুদ্ধিমতী। হাজার হোক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একজন গ্র্যাজুয়েট।

লীলা না হেসে পারে না, আচ্ছা বাবা আমি হার মানছি, আর বকর বকর করবেন না। প্রমী আপনার কথার ঠিক জবাব দিতে পারে।

সরোজ পকেট থেকে ছোট ডায়রী বার করে কি যেন নোট করছিল, বললে, আজ বিকেলবেলা প্রমীলা আসবে বলেছে, পিকনিক ফেরত।

—আপনার কাছে ?

—হ্যাঁ, ফোন করেছিল।

লীলার সঙ্গে প্রমীলার কাল থেকে আর বিশেষ কথা হয়নি. তবে ও টেলিফোন করছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন মনে হচ্ছে তারপর থেকে প্রমীলাকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। একটা কথা প্রমীলা সম্বন্ধে লীলা কদিন থেকে ভাবছে। অবশ্য সত্যি মিথ্যে এখনও যাচিয়ে দেখেনি। বড় চাপা আর কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের মেয়ে। খোলাখুলি আর কিছু আলোচনাই করতে চায় না লীলার সঙ্গে। ছোটবেলা থেকে ওরা দুজন একসঙ্গে মানুষ, লীলা সব সময় প্রমীলার কাছে গল্প করেছে, সব রকম গল্প, অথচ প্রমীলার কাছ থেকে সাড়া পায়নি।

—কি ভাবছ লীলা ?

সরোজের কথায় লীলার চমক ভাঙ্গে. কই না তো।

—কেন মিথ্যে বলার চেষ্টা করছ, যখন ভালো করে বলতে পারো না।

—না. বাড়ির কথা ভাবছিলাম।

—উঁহু, বাড়ির কথা ভাবোনি।

লীলা মিষ্টি করে হাসে. আপনি ঠিক ধরেছেন. সত্যিই ভাবিনি।

—তাহলে কি ভাবছিলে।

—বলব ? আপনি রাগ করবেন না ?

—না. বল।

লীলা তবু ইতস্তত করে, থাক সরোজদা, আর একদিন বলব এখন।

সরোজ মজা পেয়ে যায়, জোর দিয়ে বলে, আজই বলতে হবে. এখুনি।

লীলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্থির গলায় বলে, প্রমীলা আপনাকে ভালবাসে।

সরোজ হাসবার চেষ্টা করে। প্রমীলা! আমাকে ? হঠাৎ তোমার এ অদ্ভুত ধারণা হল কেন ?

—সত্যি কথা।

—কি করে বুঝলে ?

—প্রমীলা আমার বোন তো. ওকেও যদি বুঝতে না পারি তবে কাকে বুঝব।

সরোজ আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়, প্রমীলা নিজে তোমায় একথা বলেছে ?

—না।

—তবে ?

—আমি জানি।

সরোজ তেমনি গম্ভীর স্বরে বলে, যা জান আর কেউ যেন না জানতে পারে। এ নিয়ে কোনরকম হাসি-ঠাট্টা, আলাপ-আলোচনা আমি পছন্দ করি না। তোমরা দুই বোন বিদেশে এসেছ, আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তোমরা আমাকে দাদার মত শ্রদ্ধা কর, আমিও তোমাদের বোনের মত ভালবাসি। এই চমৎকার সম্বন্ধটা নষ্ট

করে ফেল না।

সরোজ যে এতখানি চটে যাবে, বিরক্ত হবে, লীলা তা বুঝতে পারেনি। তাই বাকী সময়টুকু চুপ করেই থাকে। খাবার দিয়ে গেলে নিঃশব্দে খেয়ে নেয়। সরোজের পাঁচটা প্রশ্নের একটা উত্তর দেয়। কোন রকমে এখান থেকে উঠে পড়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারলে যেন বাঁচে। সরোজও যে খুব মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে তা নয়, তবে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিদায় নেবার সময় দরদভরা গলায় বলে, জানি লীলা তুমি মনে দুঃখ পেলে, কিন্তু আমি বলছি এতে আমাদের পক্ষে মঙ্গল হবে। আজ আর এ নিয়ে কথা বলতে চাই না; দরকার বুঝলে একদিন বলব।

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে সরোজ সোজা বাড়িতে ফিরে গেছে। যেতে যেতে সারা রাস্তাই সে ভেবেছে লীলার কথাগুলো। এদিক দিয়ে সরোজ কোনদিন চিন্তা করেনি। এ দুটি বোনকে তার ভাল লেগেছিল, কলকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেয়ে এরা, তাই সে চেয়েছিল এদের পুরোপুরি দিশী ছাঁচে ঢেলে সাজতে। কিন্তু এর মধ্যে প্রমীলা যে তাকে ভালবেসে ফেলবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। কলকাতার পর্দানশীন মেয়েদের কথা সে বুঝতে পারে, যাদের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালে ভাবে বুঝি তাদের প্রেম নিবেদন করা হচ্ছে। কিংবা যারা হাতে হাতে ছোঁয়া লাগলে সারারাত আকাশ-কুসুম ভাবে। এরা ঠিক সে জাতের ঠুনকো মেয়ে নয়। অনেক পুরুষ মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেছে, তবে হঠাৎ এ ভুল করবে কেন? সুস্থ সবল বন্ধুত্বের মধ্যে প্রেমের বীজ ঢুকলে যে তা নষ্ট হয়ে যায় তা সরোজ ভাল করে জানে বলেই লীলার কথায় এতখানি ভয় পেয়েছে।

প্রমীলা যে আজ তার সঙ্গে একলা দেখা করতে আসছে, সে কি তবে এই কথা বলবার জন্যে। যদি তাই হয় তাকে যতদূর সম্ভব নরম গলায় বোঝাতে হবে। যা সেন্টিমেনটাল মেয়ে, সরোজকে না ভুল বোঝে। লীলার চেয়ে প্রমীলাকে বুদ্ধিমতী মনে হলেও ও অনেক ছেলেমানুষ আর আদুরে। সরোজ ওকে সত্যিই ছোট্ট মেয়ের মত দেখেছে ওর মনের কথা কি চোখের ভাষা পড়বার কোন চেষ্টা করেনি। নারী হিসাবে দেখলে প্রমীলার আকর্ষণ কম নয়। যৌবনের ভরা জোয়ার তার শরীরে, কথায়বার্তায়, সাজগোজে অনেককেই সে হারিয়ে দেয়। ওর পাখীর মত চালাক চোখ দুটোর তারিফ তো সরোজ কতদিনই করেছে। তার ওপর কুচকুচে কালো চুলগুলো। প্রমীলার মধ্যে এমন একটা বন্য সৌন্দর্য আছে যা অনায়াসেই মাতিয়ে দিতে পারে, যা হয়ত অনেক নামজাদা সুন্দরীদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। ছি, ছি, একি ভাবছিল সে। সরোজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়ে পড়ে। এই মাত্র লীলাকে যে কথা থামাবার জন্য ধমক দিয়ে এসেছে, মনে মনে সেই কথাই চিন্তা করছিল কি করে? বাড়ি ফিরে বার কয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সরোজ কথাগুলো ভালো করে সাজিয়ে নিল, যা বলবে আজ প্রমীলাকে, যদি সে খোলাখুলি ঐ কথারই অবতারণা করে।

কথামত বিকেলবেলা প্রমীলা এল, একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে।

—ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছি সরোজদা, শীগগির এক কাপ গরম চা খাওয়ান। সরোজকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই কোট সমেত সোফার উপর থপ করে বসে পড়ে প্রমীলা।

সরোজ সহজ গলায় প্রশ্ন করে, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

—কিউ গার্ডেনস্।

—খুব হৈ হৈ হল?

—আর বলবেন না, আমি একেবারে হাঁপিয়ে গেছি। এতক্ষণ কি পারা যায়, সেই সাত সকালে গেছি। আপনি থাকলে বেশ মজা হত। গান-টান করতে পারতেন।

সরোজ রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, তার মানে তুমি বুঝি অনেক গান করেছ?

প্রমীলা চেঁচিয়ে উত্তর দেয়, যাতে সরোজ পাশের ঘর থেকেও শুনতে পায়, অন্তত খান-চারেক, যা, যা, আপনি শিখিয়েছেন। এমনকি চিত্রাঙ্গদা থেকেও। কি রকম সবাই হাততালি দিল যদি শুনতেন! রীতিমত হিংসে হত আপনার।

—ছাত্রী হাততালি পেলে বুঝি গুরুর হিংসে হয়?

—হয় বৈকি, হিংসুটে গুরুদের হয়।

প্রমীলা কথা বলতে বলতে কোট খুলে বাথরুমে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এসে বসে। সরোজ তখন কাগজ ওল্টাচ্ছে।

—আজ কাগজ দেখতে পারিনি, কি লিখছে? পৃথিবী ঠিক ঘুরছে তো?

প্রমীলার কথা বলার ধরনে সরোজ হেসে ফেলে, তা ঘুরছে। তবে আজকের প্রধান খবর হল এক ভদ্রলোক তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে ডিভোর্স করে আবার প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় স্ত্রীটির ঐ একই চার্চে তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এই তাদের চারজনের পাশাপাশি ছবি।

প্রমীলা শব্দ করে হেসে ওঠে, এরা বেশ আছে সত্যি, যখন খুশী বিয়ে করছে, তারপরই ডিভোর্স, আবার বিয়ে। এ মন্দ বুদ্ধি নয়।

—যা হোক একটা তো কিছু করতে হবে।

—তা সত্যি। যেমন আমাকে আবার পড়াশুনো করতে হবে।

সরোজ প্রমীলার দিকে চোখ তুলে তাকায়, কেন, তোমার পড়তে ইচ্ছে নেই?

প্রমীলা হাসে, না এমনি বললাম।

—না, বল। ইচ্ছে না থাকলে অন্য কিছু কর। সত্যি, তোমাদের নিয়ে এই মুশকিল, পরিষ্কার করে তো কিছু বলবে না। আমাদেরই হয় বিপদে পরামর্শ দিতে গিয়ে।

প্রমীলা বিনুনিটা নিয়ে সাপের মত গলায় জড়ায়, আমাকে নিয়ে মিথ্যে আর নাই বা মাথা ঘামালেন।

—তার মানে?

—আমি ঠিকই পড়াশুনো নিয়ে থাকব, যাকে নিয়ে ভাববার তার কথা ভাবুন।

—কার কথা বলছ?

—প্রমীলা স্থির দৃষ্টিতে সরোজের দিকে তাকায়, কার কথা বলছি আপনি সত্যি বুঝতে পারছেন না সরোজদা?

—না।

—কেন আপনি লীলাকে দেশে ফিরে যাবার জন্যে বলেছেন?

—ও এখানে বসে থেকে কি করবে? কেরানীর চাকরি করার জন্যে তো তোমরা আসনি, দেশে ফিরে—

প্রমীলা আরও গম্ভীর হয়ে যায়, ওসব কথা অনেকবার শুনেছি। আমার পক্ষে লেখাপড়া করা ভাল, স্বীকার করলাম। কিন্তু লীলা কি করবে দেশে ফিরে আমি বুঝতে পারি না।

সরোজ আশ্চর্য হয়, একথা কেন বলছ প্রমীলা?

প্রমীলা সরোজের ওপর চোখ রাখে, আপনি কি জানেন না লীলা আপনাকে ভালবাসে?

সরোজ থতমত খেয়ে যায়, আর যাই হোক প্রমীলার কাছ থেকে একথা শুনবে সে মোটেও আশা করেনি।

প্রমীলা কিন্তু থামে না, আমি জানি আপনারা, পুরুষ মানুষরা সবাই সমান, দেখেও অনেক জিনিস দেখতে চান না। মেয়েদের নিয়ে খানিকটা খেলা করতে পারলেই খুশী, কি বলুন?

—তুমি যা বলছ সত্যি?

—মিথ্যে বলে আমার লাভ?

সরোজ এতক্ষণে চোখ তুলে তাকায়, লীলা নিজে তোমায় একথা বলেছে?

—না।

—তবে?

—আমি জানি।

—কি জান?

প্রমীলা ক্লান্ত হাসি হাসে, she is madly in love with you.

'সোহো'র মতই লন্ডনের আর একটি অঞ্চলের নাম সাহিত্যের পাতায় পাওয়া যায় তা হল ইস্ট এন্ড। বহু বিখ্যাত রোমাঞ্চকর কাহিনীর পটভূমিকা আঁকতে গিয়ে সাহিত্যিকরা ইস্ট এন্ডকেই বেছে নিয়েছেন। এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে আছে লন্ডনের ডক। কোন শহরেই ডক অঞ্চল ভদ্রলোকদের বাস উপযোগী হয় না। বোধ হয় সেই কারণেই ইস্ট এন্ডের ডকের বড় বড় গুদামঘর, বিশাল একটানা পাঁচিল নানা ধরনের বস্তি সরু বাঁকা গলি দেখলেই মনে হয় এখানে সহজেই খুন খারাপী হতে পারে।

যে কোন হত্যাকাণ্ড এই ইস্ট এন্ডে ঘটলে যেন আরও ভয়াবহ আর বীভৎস বলে মনে হয়। 'ডি, কোয়েন্সি' তাঁর "র‍্যাট ক্লিফ হাইওয়ে" হত্যাকান্ডের যে রহস্যঘন রূপ দিয়েছেন তা বোধহয় সম্ভব হত না যদি তিনি ওয়েস্ট এন্ড এর কোন রাস্তা নিয়ে ঐ ঘটনা লিখতে চাইতেন। অস্কার ওয়াইল্ড-এর ডোরিয়ান গ্রে এই ডক অঞ্চলেই নৈশ ভ্রমণে ঘুরে বেড়াত ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। ডিটেক্টিভ শার্লক হোমস থেকে শুরু করে আজকের দিনের জনপ্রিয় ফরাসী গোয়েন্দা হারকিউল পায়রো পর্যন্ত সকলে কোন না কোন রহস্যের তদন্ত করতে ঢুকতে হয়েছে ইস্ট এন্ডের মধ্যে।

এ অঞ্চলকে আরও বেশী রহস্যময় করে তুলেছিল বিদেশীরা। ডেনমার্ক, সুইডেন এবং সমগ্র পূর্ব ইওরোপ থেকে পালিয়ে এসে অনেকেই এখানে আশ্রয় নিত, সেই সঙ্গে আসত সুদূর প্রাচ্য থেকে চীনা আর ভারতীয়, আসত আফ্রিকা থেকে নিগ্রোরা। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল নিঃসম্বল, না ছিল টাকাকড়ি না ছিল পাসপোর্ট। লোক চক্ষুর অন্তরালে এদের দিন কাটাতে হত। তারপর হয়ত একদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইস্ট এন্ডের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য কোথাও বাসা নিত কিংবা এখানেই ভদ্রভাবে বাস করত।

আজকের ইস্ট এন্ড কিন্তু আর আগের মত নেই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এ অঞ্চলকে উন্নত করার যে চেষ্টা চলছিল তা ত্বরিত

হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। জার্মানিদের বোমায় ইস্ট এণ্ডের যে সব জায়গা বিধ্বস্ত হয়েছিল সেখানে বড় বড় বাড়ি উঠেছে। এখানে এখন বহু ভদ্র পরিবারের বাস, তবু তাদের মনে কোথায় যেন একটা লুকোন সঙ্কোচ আছে। প্রশ্নের উত্তরে চট করে বলতে চায় না যে তাদের বাসগৃহ ইস্ট এণ্ডে। ঐ নামটুকুর সঙ্গে দারিদ্র্য আর রহস্য কেমন যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আজও লণ্ডনে বেড়াতে গিয়ে অনেকেই তাদের সবচেয়ে পুরনো জামা কাপড় পরে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের দেখতে যায়। অবশ্য বিশেষ কিছুই নজরে পড়ে না। দৈবক্রমে দু' একজন ডরোথী আলি কি পেগী নন্দীর সাক্ষাৎ পেলে তারা মনে করে তাদের ইস্ট এণ্ড পরিক্রমা সার্থক হয়েছে।

রজত অবশ্য এ পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল ইচ্ছে করেই। ভাড়া অল্প, তার ওপর লোককে সে গর্ব করে বলত সে থাকে ইস্ট এণ্ডে। এই তার স্বভাব। যে কথা বলতে অনেকে লজ্জা পায় সেই কথা জাহির করে বেড়িয়েই তার আনন্দ। এখানকার ফ্ল্যাটের সন্ধান সে পেয়েছিল ওল্ড কম্পটন স্ট্রীটের দোকানে লাগানো হাতে লেখা এক টুকরো কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে। কম ভাড়ার ফ্ল্যাটের সন্ধান লণ্ডনে এইভাবেই পাওয়া যায়।

বাড়িটা বড়, বেশ পুরোনও। মনে হয় যুদ্ধের সময় খুব কাছাকাছি বোমা না পড়ায় এ যাত্রা বেঁচে গেছে। খান দুয়েক ফ্ল্যাট আছে, রজতরা থাকে তিনতলার পূর্বদিকে। দু'খানা ঘর, মাঝারি সাইজের, দেয়ালের ওয়াল পেপারগুলো অনেকদিনের পুরনো, কাঠের মেঝে এব্ড়ো খেব্ড়ো, জানালার কাঁচগুলোও কেমন যেন ঘোলাটে, সূর্যের আলো ফিকে হয়ে ঘরে ঢোকে। কোনরকম আসবাবপত্র না থাকায় এ ফ্ল্যাটটা পেয়েছিল খুব সস্তায়, সপ্তাহে মাত্র এক গিনি ভাড়া। বাজার থেকে কম দামী ভাঙ্গাচোরা খাট আলমারি কিনে ঘর সাজিয়ে ছিল রজত, দেখতে ভাল না হলেও এসব দিয়ে কাজ চলে যায় ভালভাবে।

রজতের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে সৌরেন একদিন এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢোকার পর মনে হল না সে খুব খুশী হয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই এখানে থাকিস?

রজত হাসতে থাকে, কেন কি হয়েছে?

সৌরেন কি বলবে ভেবে পায় না, তা নয়, মানে কলকাতায় তোদের বাড়ি দেখেছি তো, তারপর কি করে এই ধরনের ফ্ল্যাটে আছিস তাই ভাবছি।

—তখন ছিলাম বাবার হোটেলে, আর এখন আছি নিজের রোজগারে, তফাৎ তো হবেই।

সৌরেনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রজত চেঁচিয়ে ডাকলো, মারিয়া ডার্লিং, একবার দেখে যাও আমার বন্ধু সৌরেন এসেছে।

পাশের ঘর থেকে নারী কণ্ঠে সাড়া এল, আমি এখুনি আসছি, এক মিনিট।

একটু পরেই হাসতে হাসতে মারিয়া ঘরে ঢুকলো। গায়ে তার কালো রঙের আঁট সাঁট গেঞ্জির জামা আর সেই সঙ্গে লাগোয়া পাজামা। চুলগুলো ঘাড়ের কাছে একত্র করে ক্লিপ দিয়ে আঁটা, খালি পা, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, সুপ্রভাত মিঃ লাহিড়ী, আমি জানতাম আপনি আসবেন। কিন্তু আজ থিয়েটারে দুটো নতুন নাচ আমায় করতে হবে আর একটি মেয়ের জায়গায়, তাই সেটা তুলে নিচ্ছিলাম।

সৌরেন তাড়াতাড়ি বলে, আমার জন্যে মোটেও ব্যস্ত হবেন না, আপনি নাচ প্র্যাক-

টিস করুন। আমরা দুই বন্ধুতে ততক্ষণ গল্প করছি।

মারিয়া খুশী হয়, বেশীক্ষণ নয়, আর আধঘন্টা অভ্যেস করলেই মনে হয় পায়ের স্টেপগুলো আমি রপ্ত করে নিতে পারব। চায়ের জল বোধহয় বসানোই আছে, রজত ডার্লিং, তুমি ওটা নামিয়ে রেখো।

রজত ছোট ছোট চোখ দিয়ে হাসে, অতিথি সৎকারের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, চা আমি নিজেই তৈরি করে নেব।

মারিয়া লাফাতে লাফাতে চলে গেল পাশের ঘরে। সৌরেনের কিন্তু সবটাই যেন কেমন অদ্ভুত লাগে, তোরা কি এক সঙ্গে থাকিস?

নির্বিকার রজত পাইপটা হাতে নিয়ে বলে, হ্যাঁ।

—বিয়ে থা করেছিস নাকি?

—না।

—করবি তো?

—কেন?

সৌরেন চোখগুলো বড় বড় করে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, সে আবার কি কথা? বিয়ে থা না করে এক সঙ্গে কদ্দিন থাকবি?

রজত হাসে, সেই ঠোঁট ফাঁক না করা হাসি, যতদিন বন্ধুত্ব থাকবে। ধর না, তোতে আর আমাতে যদি এক সঙ্গে থাকতাম, তাহলে কি বিয়ের প্রশ্ন উঠত?

সৌরেন চটে যায়, কি যা তা বলছিস। দু'জন ছেলে এক সঙ্গে থাকা আর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এক সঙ্গে থাকা কি এক হল?

রজতের গলায় তাচ্ছিল্যের আভাস, দৈবক্রমে মারিয়া নারী, সে যদি পুরুষ হত এইভাবেই দুজনে থাকতাম, আসলে আমরা বন্ধু।

—তার মানে তুমি বলতে চাও মারিয়াকে তুমি নারী হিসেবে দেখ না!

—ওসব কথা ভাববার আমার সময় কোথায়?

সেদিন সৌরেন আরও একঘণ্টা রজতের ফ্ল্যাটে ছিল। ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে চা খেয়ে গল্প করে সে বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু কিছুতেই সে রজতের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। পুরুষ আর নারীর সম্পর্ক কি এতটা সহজ হওয়া সম্ভব? বার বারই তার মনে কেমন যেন খটকা লেগেছে।

সৌরেন চলে যাবার পর রজত মারিয়াকে জিজ্ঞেস করেছে, কেমন লাগলো আমার এ বন্ধুটিকে?

মারিয়া না ভেবে উত্তর দিয়েছে, ভালই তো মনে হ'ল।

মারিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে রজত অল্প শব্দ করে হাসে।

—হাসছ যে?

—সৌরেনের কথা যত ভাবছি তত হাসি পাচ্ছে। আমাদের দেশের মার্কামারা ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায় সৌরেন হল তাই।

—তার মানে?

—ও সেই ধরনের ছেলে যার নিজের কোন মতামত নেই। যে পাত্রে ওকে রাখবে সেই পাত্রের আকার ও ধারণ করবে। ও বাবা মার খুব বাধ্য, যদি তাঁরা বলেন ডানদিকে যাও, ও যাবে। যদি বলেন ডিগবাজী খাও, ও তাই খাবে।

মারিয়া প্রতিবাদ করে, তাই কখনও হয়, দেশ ছেড়ে এতদূরে এসেছে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে।

রজত হো হো করে হাসে, তাহলে তুমি ওর কিছুই চেননি। শুনবে বিলেতে ও আসেনি, ওর বাবা মা ওকে পাঠিয়েছে। এখানে পড়াশুনো করে ঠিক সময় মত ফিরে যাবে, তাদের ইচ্ছে মত চাকরী করবে, তাদের পছন্দ মত মেয়েকে বিয়ে করবে।

—না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—না করলে কি হবে, ওরাই হল আমাদের দেশের ভাল ছেলে. চল্লিশ বছর বয়সেও বাবা বেঁচে থাকলে এরা নাবালক থাকে। জীবনের সংগে কোন পরিচয় হয় না। চোখ বাঁধা বলদের মত সমাজের দড়ি ধরে ঘুরে বেড়ায়। তাই তো ওদের দেখলে আমি বিরক্ত হই। লণ্ডনে এতদিন আছি তবু যেতে ইচ্ছে করে না, ঐ সব ভাল ছেলেদের গোয়ালে।

মারিয়া রজতকে থামিয়ে দেয়, তবে ওদের কথা ভেবে কেন মাথা গরম করছ? আমি চট করে বাজারটা ঘুরে আসি। আজ একটু আগে থিয়েটারে যেতে হবে।

—কেন?

—মিঃ গ্র্যানথামের সংগে আজ পাকা কথা হবে।

রজত ঠুকে ঠুকে পাইপ পরিষ্কার করে, বুড়ো তাহলে মাইনে বাড়াতে রাজী হয়েছে।

মারিয়া মিষ্টি করে হাসে, কতকটা, তবে বাইরে যেতে বলছে।

—কোথায়?

—এডিনবারা তো বটেই, হয়ত কণ্টিনেণ্টে।

রজত শুভ কামনা জানায়, আশা করি তোমার উন্নতি হবে।

—তোমার শুভ কামনার জন্যে ধন্যবাদ। বলে মারিয়া পোশাক বদলে বাজারের থলে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

রজত কিন্তু চুপচাপ গা এলিয়ে সোফার উপরে বসে থাকে, মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করে। আজ সৌরেন না এলেই বোধহয় ভাল হত, ভেবেছিল দেশের কথাবার্তা বললে মনটা ভাল লাগবে, কিন্তু শুনে মনে হল দশ বছর আগে এখানে আসবার সময় দেশকে যে অবস্থায় দেখে এসেছিল আজও ঠিক সেইভাবে আছে। কোনদিকেই উন্নতি হয়নি, তার ওপর নৈরাশ্যের জমাট মেঘ সমস্ত দেশটার ওপর অন্ধকার ছায়া ফেলেছে।

রজত মনে মনে স্থির করে আর সে দেশে ফিরবে না। এখানে সে জীবনের স্বাদ পেয়েছে। দেশে ফিরে কি করে সৌরেনদের মত পুতুল খেলায় মেতে থাকবে। লোকে মনে করে বেশীদিন বিদেশে থাকলে ক্রমে একটা অসহায় বোধ জন্মায়। রজত তা স্বীকার করে না। মারিয়া তো দিব্যি লণ্ডনের জীবন যাত্রার সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে; কই সে তো ইতালীর নীল সমুদ্রের কথা ভেবে মন খারাপ করে না, চোখের জল ফেলে না 'মিলানো'র গির্জার কথা ভেবে যেখানে তার প্রথম জীবনের মিষ্টি বছরগুলো কেটেছে। তবে রজতই বা কেন মারিয়ার মত এখানে সুখে দিন কাটাতে পারবে না।

মারিয়ার সংগে তার আলাপ হয়েছিল আশ্চর্যভাবে। 'সোহো'র এক রেস্তরাঁয়। মারিয়া ছিল সেখানকার ওয়েট্রেস। লোকজন কম থাকলে নির্জন রেস্তরাঁর এক প্রান্তে রজত অনেকক্ষণ বসে থাকত। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পড়ত বই, কখনও বা ফাউণ্টেন পেনের নিব দিয়ে সাদা কাগজের উপর ছোট ছোট স্কেচ করত। ছোট বেলা থেকেই রজতের শিল্পীর চোখ, আঁকতেও সে পারে, কিন্তু সে

ঐ স্কেচ পর্যন্তই, তার বেশী এগোতে চায় না। রেস্তরাঁয় বসে বসে খেয়াল খুশি মত সে আঁকত 'সোহো'র বিভিন্ন রাস্তার ছবি, আঁকত এখানকার লোকজনের চেহারা।

এক শনিবারের দুপুরে রজত অভ্যাসমত কোণের টেবিলে বসে কাগজের ওপর হিজিবিজি কাটছিল নিজেরই খেয়াল হয়নি কখন সে এঁকেছে ওয়েট্রেস মারিয়ার আকৃতি। খেয়াল হ'ল মারিয়া যখন জিজ্ঞেস করলে, ওটা কার ছবি?

রজতের চমক ভাঙ্গল, পাল্টা প্রশ্ন করলে, কার মনে হয়?

মারিয়া ঝুঁকে পড়ল ছবিটার ওপর, মেয়েটিকে যে রকম এপ্রন পরিয়েছেন তা দেখে মনে হচ্ছে হয়ত বা আমারই ছবি।

রজত হেসে জিজ্ঞেস করে, কি পছন্দ হয়?

—অন্তত এইটে ভাবতে ভাল লাগছে যে আমার এই চেহারা দেখেও কোন শিল্পীর ছবি আঁকার ইচ্ছে হয়েছে।

কথা হয়েছিল ওদের অনেকক্ষণ ধরে তবে একটানা নয়। মারিয়াকে প্রায়ই চলে যেতে হচ্ছিল অন্য টেবিলে খাবার পরিবেশন করার জন্যে। তবে প্রায়ই ঘুরে ফিরে এসে রজতের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে যাচ্ছিল। একবার বললে, জানেন সোহোতে সবাই আমাকে কি বলে ডাকে?

—কি?

—ugly duckling.

রজত আপত্তি করে, আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

মারিয়া কৌতুক অনুভব করে, তাই নাকি?

রজত দার্শনিকের মত চোখ দুটো ছোট করে মারিয়ার দিকে এক দৃষ্টে তাকায়, তারা আপনার অনিন্দ্যসুন্দর দেহটার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

মারিয়া থতমত খেয়ে যায়, এ ধরনের কথা সে ঠিক রজতের মুখ থেকে আশা করেনি, হাসবার চেষ্টা করে বলে, আপনার দৃষ্টি দেখছি খুব প্রখর।

রজত কিন্তু নির্মল হাসে, সেটা বোধহয় আমার এই শিল্পী চোখের দোষ। নারী দেহের সৌন্দর্যকে তারিফ করার শক্তি আমাদের সহজাত। একটু থেমে বিস্মিতা মারিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আপত্তি না থাকলে চলুন না সন্ধ্যের সময় কোন ভারতীয় রেস্তরাঁয় খাওয়া যাবে।

রজত লক্ষ্য করেনি মারিয়া ইতস্তত করেছিল কিনা কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা তারা গিয়েছিল ওয়েস্ট এণ্ডের নামকরা ভারতীয় রেস্তরাঁয়। মারিয়া এই প্রথম কোন ভারতীয় ছেলের সঙ্গে বাইরে বেরল। ভাল লাগল তার রজতকে, ভাল লাগল ভাত আর চিংড়ীর কারি, কিন্তু তার চেয়েও ভাল লাগল রজতের কথাবার্তা। এক সময় বুঝি বলেও ফেললো, আপনার কথাবার্তা শুনলে চমকে উঠতে হয়।

রজতের চোখে কৌতুক, কেন?

—এতদিন যেসব কথা গুরুজনদের কাছে শুনেছি, কিংবা বইএ পড়েছি, আপনি ঠিক তার উল্টো কথাগুলো বলেন।

—হবেও বা, কিন্তু ইচ্ছে করে সাজিয়ে বলি না। অর্থাৎ ওগুলো আমার পোশাকী মতামত নয়, অন্তরের কথা।

—হয়তো তাই, মারিয়া সেদিন এর চেয়ে বেশী উৎসাহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু এর পর অনেক সন্ধ্যাই সে কাটিয়েছে রজতের সঙ্গে। সিনেমায়, রেস্তরাঁয়, আবার কখনও বা রজতের ফ্ল্যাটে। আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কত সময় মারিয়া তার

মনের দরজার আগল খুলে দিয়েছে।

• মারিয়া ইতালী দেশের মেয়ে, বাড়ি মিলানোতে। কিন্তু দেশ ছেড়েছে অনেক-দিন হল। ইওরোপে তখন ফ্যাসিজম প্রবল হয়ে উঠছে, ইতালীতে মুসোলিনীর 'ব্ল্যাক শার্ট' দল আর জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসীরা সবাইকে চোখ রাঙিয়ে তটস্থ করে রেখেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধির ফলে যে অপমান আর লাঞ্ছনা জার্মান জাতকে বরণ করে নিতে হয়েছিল তারই প্রতিশোধ নিতে তারা বদ্ধপরিকর। জার্মানীর হিটলার আর ইতালীয় মুসোলিনী দুজনে তখন এক সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে, দু' দেশেই পুরো মাত্রায় সন্ত্রাসবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে দুই দিগ্বীজয়ী ডিক্টেটারের ভয়ে। এ সময় স্বাধীনচেতা বহু স্ত্রী-পুরুষ এ সব দেশ থেকে পালিয়েছে, কেউ ফ্রান্সে, কেউ ইংলণ্ডে। মারিয়ার বাবা মেয়েকে নিয়ে পাড়ি দেন ফ্রান্সের দিকে ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার এক বছর আগে। কিন্তু ফরাসী দেশে বেশী দিন থাকতে পারলেন না। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পরেই হুড়মুড় করে জার্মান সৈন্য এগিয়ে এল পশ্চিম দিকে। দখল করলে বেলজিয়াম, কেড়ে নিলে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের স্বাধীনতা, এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসী রাজ্যও হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। এমনও যে সম্ভব হতে পারে কেউই তখন ভাবেনি, ইওরোপের বিভিন্ন রাজ্যের উদ্বাস্তুরা ডেরা ডাণ্ডা তুলে চললো পর্টুগালের দিকে। ঐ তখন একমাত্র নিরপেক্ষ দেশ।

অন্যদের সঙ্গে মারিয়ারাও গেল লিস্‌বন'-এ। সেখানে রইল প্রায় দু' বছর। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালে সুযোগ পেয়ে জাহাজে চড়ে পাড়ি দিল ইংলণ্ড। সে সময় ইংলণ্ড সমগ্র নিপীড়িত জাতির একমাত্র আশার স্থল। সকলেই চেয়ে আছে ইংরেজ আর আমেরিকার দিকে, শুনছে চার্চিলের ধীর গম্ভীর প্রতিজ্ঞা, দেখছে সম্মিলিত বাহিনীর তৎপরতা।

জার্মানদের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হল লণ্ডনের অনেক অঞ্চল, প্রাণ হারালো বহু লোক। সেই সঙ্গে মারিয়ার বাবাও। মারিয়া হয়ে গেল সম্পূর্ণ একা, আপনার বলতে তার কেউ নেই। কাজ নিল 'সোহো'র এক রেস্তরাঁয়। আজকের লণ্ডনকে দেখলে সেদিনের কথা ভাবা যায় না, আমেরিকান সৈন্যে লণ্ডন ভরে গেছে। বৃটিশ টমি বড় একটা চোখে পড়ে না। তারা সবাই যুদ্ধ করতে চলে গেছে দেশের বাইরে। মাঝে মাঝে যাদের বা চোখে পড়ে, বোঝা যায় তারা আহত হয়ে ফিরে এসেছে।

মরিয়ার মনে পড়ে প্রথম যে বছর সে চাকরি নিল, দোকানে দেখেছিল কত আপেল, খৃসেনথিমাম ফুল, আর বড় বড় পেঁয়াজ। অথচ ক'দিন আগে পর্যন্ত একেবারেই পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না লণ্ডনে, তাই নিয়ে সবাই কত ঠাট্টা করত, বলত, পেঁয়াজ আজকাল ওজন দরে নয় নীলামে বিক্রী হয়।

সে সময় দোকানে কবে যে কি জিনিস উঠবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারত না, যা পাওয়া যেত তাই নিয়েই সবাই খুশী। বেশীর ভাগ সৈনিকই বুকে পপি ফুল গুঁজে রেস্তরাঁয় খেতে আসত। সন্ধ্যার পর মেয়েরা বেরুত ওদের সঙ্গে। মারিয়া দেখেছে ওর চেনাশোনা প্রায় সব মেয়েকেই রাতের অন্ধকারে অভিসারে যেতে। কিন্তু তার নিজের কখনও যাওয়া হয়নি, ইচ্ছে যে করেনি তা নয়, কেউ তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি।

সে সময় এজন্যে তার মনে দুঃখ ছিল। আয়নার সামনে নিজেকে দেখে সে

দীর্ঘশ্বাস ফেলত, ভাবত কেন একজন পুরুষকে নারী হিসেবে আকর্ষণ করার শক্তি তার নেই? সেকি তার ঐ কালো কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলগুলোর জন্যে যা দেখে অনেকে ঠাট্টা করে বলে থিয়েটারের পরচুলো। না তার এই নাক, চোখ, ভুরু যা সৃষ্টিকর্তার সযত্ন অবহেলায় শরীরের অনুপাতে বেমানান বলে মনে হয়। অবাঞ্ছিত নারীত্বের অপমানের ভয়ে মারিয়া শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। জীবনের ওপর জেগেছিল বিতৃষ্ণা, মানুষের ওপর তো বটেই।

তার জীবনের মোড় ঘোরালো রজত। ওদের আলাপ ঠিক যুদ্ধ শেষ হবার পর। মারিয়া যখনই নিজের চেহারার কথা বলতে গিয়ে আগলি ডার্কলিং-এর প্রসঙ্গ তুলত, রজত তাকে বুঝিয়ে বলত, ঐখানেই তোমার প্রচণ্ড ভুল মারিয়া। নারীর মুখশ্রীটাকেই আমি বড় মনে করি না, তার সৌন্দর্য দেহে, যা নিয়ে 'মাইকেল এঞ্জেলো'র এত বড় বড় সৃষ্টি, রেনেসাঁস শিল্পীদের এত দম্ভ।

মারিয়া তরল কণ্ঠে বলে, তার সঙ্গে আমার কি?

—তুমি সেই ইতালীর মেয়ে। আমি তো মনে করি তোমার দেহশ্রী এদেশের যে কোন সুন্দরীকে হারিয়ে দেবে। তুমি যদি কোন নাইট ক্লাবে নাচের আসরে যোগ দাও দেখবে সেখানে কি ভীড়। তোমাকে পাবার জন্যে পুরুষের চোখে কি অপরিসীম তৃষ্ণা।

মারিয়া আপত্তি তুলেছিল, ও ধরনের অসভ্য নাচ আমার ভালো লাগে না। রজত বিদ্রূপ করে—এ তুমি কথা বলছ না মারিয়া, বলছে তোমার সংস্কার।

—তাই বলে লজ্জাকে বিসর্জন দিতে হবে?

—যেটা মিথ্যে তাকে আঁকড়ে থেকে লাভ কি? দু'দিন বাদেই দেখবে বিবস্ত্র হতে তোমার এতটুকু লজ্জা করছে না, তুমি সম্পূর্ণ সহজ হয়ে গেছ।

—না, আমি পারব না। রজত হেসেছে, কোনো উত্তর দেয় নি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিতেছে রজত। মারিয়া এখন ক্লাব-থিয়েটারে নাচে, ভাল মাইনে পায়। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে, স্টেজের ওপরে দাঁড়িয়ে নিজেকে তার বিজয়িনীর মত মনে হয়, রাতের পর রাত দেখে অসংখ্য পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি। মনে পড়ে রজতের কথাগুলো, সে ঠিকই বলেছে। মারিয়া ইতালীর মেয়ে, সত্যিই তো ওদের দেহশ্রী এখনও জগতের বিস্ময়।

রজতের বোহিমিয়ান সংসার যাত্রার ছবি স্বচক্ষে দেখেও সৌরেন কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারলো না যে, এ ধরনের জীবনও অনেকের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। অবশ্য তারাই বা দোষ কোথায়? এতদিন পর্যন্ত যে নারী আর পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র তুলনা শুনেছে ঘি আর আগুনের সঙ্গে, সে কী করে রজত আর মারিয়ার এই সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ককে স্বীকার করে নেবে? কলকাতায় থাকতে আর পাঁচটা ছেলের মত যে সৌরেন, বৌদির ছোট বোন অহনার মাথার কাঁটা আর চিরুনীতে জড়ানো চুল দেখে কল্পনার জাল বুনতো, লণ্ডনে এসে কান লাল না করে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারাটাকেই সে অনেকখানি বলে মনে করতো। লীলা প্রমীলার সঙ্গে আলাপ জমাতে তার সঙ্কোচ হয়নি, লজ্জা পায়নি মীনাক্ষীর বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত বসে আড্ডা মারতে। কিংবা এলিজাবেথের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে। তবু রজত-মারিয়ার কথাবার্তা, চাল-চলনকে সে সহ্য করতে পারেনি, বারবারই মনে হয়েছে ওদের জীবনে কেমন যেন

শালীনতার অভাব।

এতদিন লণ্ডনে থেকেও তার কোন এদেশী বান্ধবী ছিল না। পাশের ঘরের নতুন বাসিন্দা এলিজাবেথ হোপ বোধহয় সে অভাব পূরণ করবে। সত্যিই সোরেনের ভালো লাগে এলিজাবেথকে। বড় সংযত ব্যবহার অথচ কী সরল। হাসি খুশীতে ভরা ভারী মিষ্টি স্বভাব। বেশীর ভাগ ইংরাজ মেয়ের মত তারও জ্ঞানের পরিধি পরিমিত কিন্তু অজানাকে জানবার আগ্রহ তার অসীম।

মনে পড়ে, কয়েকদিন আলাপের পর এলিজাবেথ হাসতে হাসতে বলেছিল, ছোটবেলায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার কী ধারণা ছিল জানেন?

সৌরেন জিগ্যেস করেছে, কি?

—ওরা মাথায় পালক পরে।

সৌরেন হাসে। সে কি, তারা তো রেডইণ্ডিয়ান?

—তখন অত জানতাম না। এক ভারতীয় ভদ্রলোক আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁকে আমি পালকের কথা জিগ্যেস করেছিলাম। তিনি খুব হেসে-ছিলেন।

—আমার মনে হয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণত এদেশের লোকের জ্ঞান কম।

—নেই বললেই হয়। বিশেষ করে, যখন দেখি আপনারা কত খুঁটিয়ে আমাদের দেশের কথা পড়েছেন।

—সে বোধহয় উপায় ছিল না বলে। ইংরাজের রাজত্বে মানুষ হয়েছি, অগত্যা তাদের দেশের কথাও পড়তে হয়েছে।

এলিজাবেথ এতক্ষণ কোন একটা কথা বলার জন্যে উসখুস করছিল, এবার বলে ফেলে। অনেকের মুখে শুনেছি, ভারতের বড় বড় শহরেও নাকি সাপের উপদ্রব, সে কী সত্যি?

সৌরেন ইচ্ছে করে জোরে হাসে, শুধু এইটুকু শুনেছেন, কেন শোনেন নি, কলকাতার বড় রাস্তায় গাড়ি চড়ে যাচ্ছেন, এমন সময় হলদে কালো ডোরাকাটা সুন্দরবনের বাঘ এসে বলল, গাড়ি থেকে নামো, আমি তোমায় খাবো!

সৌরেনের কথা বলার ভঙ্গিতে এলিজাবেথও হেসে ফেলে, আমি জানি, ওসব বাজে কথা। কিন্তু কি করা যায়, এদেশের অনেক লোকই ভারতে চাকরি করে এসে, ঐ ধরনের আজগুবি গল্প রটিয়েছে।

অজান্তে সৌরেনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, লণ্ডনে এসে পর্যন্ত তাই দেখছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কেউ কিছু জানে না। শুধু এইটুকু জানে, ঐখানে তাদের রাজত্ব ছিল। আর হয়তো জানে তিনজন ভারতীয়ের নাম, এক গান্ধী, দুই টেগোর, তিন সাবু।

এলিজাবেথ সলজ্জে বলে, আমার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করবেন। আমি শুধু দুজনকে চিনতে পারলাম, কিন্তু টেগোর কে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

সৌরেনের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, আপনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনেন নি? উনি কবিতার জন্যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

—কবিতায় নোবেল পুরস্কার? কোন্ সালে?

—সে অবশ্য অনেক বছর আগে।

—তাই বলুন। অতদিন আগেকার কথা কি করে জানবো। আমার তো এখন সবে একুশ বছর বয়স। একটু থেমে বলে, ওঁর কবিতার ইংরাজী অনুবাদ বই

জোগাড় করে দেবেন, আমি পড়বো।

সৌরেন প্রতিশ্রুতি দেয়, দেবো।

এলিজাবেথকে ঐজন্যই ভালো লাগে। অজ্ঞতাকে সে স্বীকার করে, মিথ্যে ঢাকবার চেষ্টা করে না।

সেদিন রজতদের বাড়ি থেকে ফিরে, সৌরেন নিজের ঘরেই চুপচাপ বসেছিল, ভাবছিল নানারকম কথা, বিশেষ করে রজত আর মারিয়াকে নিয়ে। অনেকক্ষণ থেকে নীচের দরজায় কে ঘণ্টা টিপছে। সাধারণত নীচের লোকরাই দরজা খুলে দেয়, মিসেস হেরিং বাড়ি থাকলে উনি সাড়া দেন সকলের আগে। প্রায় তিন মিনিট হতে চলল, সমানে ঘণ্টা বাজছে। এতক্ষণেও যখন কেউ দরজা খুললো না, মনে হয়, আর কেউ বাড়িতে নেই।

অগত্যা, সৌরেন নামতে শুরু করে দরজা খোলার জন্যে। তার মনের কোণে একটা মধুর চিন্তা উঁকি দেয়। কে বলতে পারে হয়তো এলিজাবেথ বেল টিপছে। এমন তো কত সময় হয়, সামনের দরজার চাবি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলে গেলে বাড়ি ফিরে বেল টেপা ছাড়া আর উপায় থাকে না। তার নিজেরই তো এ রকম কত-দিনই হয়েছে।

এলিজাবেথ না হলেও সৌরেনের আন্দাজ অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছিল। এক ভদ্রলোক এলিজাবেথকে খুঁজছেন।

সৌরেন জানালো, মিস হোপ বাড়িতে নেই।

ভদ্রলোক শুকনো হাসলেন, দরজা খুলতে দেরী দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল, বাড়িতে বোধহয় কেউই নেই।

—মিস হোপ ফিরে এলে আমি কি তাঁকে কিছু বলবো।

ভদ্রলোক খুশী হলেন, তাহলে বড় উপকার হয়। বলবেন আমার নাম লিন্ডসে হোপ। আমি ওর কাকা। আমাকে যেন একবার টেলিফোন করে।

—নিশ্চয় বলে দেবো।

ধন্যবাদ জানিয়ে লিন্ডসে হোপ গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন।

সৌরেনের মনে হয়, লিন্ডসে হোপের চেহারা ওর অপরিচিত নয়। বেঁটে, মোটা অথচ বেশ আঁটসাঁট শক্ত শরীর। মাথায় চুল কম, হয়তো বয়স হয়েছে কিন্তু মুখে এতটুকু দাগ পড়েনি। চোখ দেখলেই মনে হয়, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। কথার ধরনে বিনয় প্রকাশ পেলেও, সযত্নে লুকোন ঔদ্ধত্যকে পুরোপুরি চেপে রাখতে পারে না।

এ সেই অতিপরিচিত জন বুলের চেহারা।

এলিজাবেথ বাড়ি ফিরলে সৌরেন তার সঙ্গে দেখা করে রহস্য করে বলে, আপনি যে আমায় বলেছিলেন, লণ্ডনে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?

এলিজাবেথ মুখ তুলে চায়, কেন তাতে কি হল?

—আজ বিকেলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আপনার খোঁজে।

—কে বলুন তো?

—আপনার কাকা, লিন্ডসে হোপ।

নামটা শুনেই এলিজাবেথ যেন ক্ষেপে উঠলো, কে তাকে এ বাড়ির ঠিকানা দিল? সেকথা সৌরেনের জানবার নয়, সে রইলো চুপ করে।

এলিজাবেথের কিন্তু চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমরা তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। তবু কেন সে আসে? লোকটা চরিত্রহীন, লম্পট।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। আস্তে আস্তে এলিজাবেথের মাথা ঠাণ্ডা হয়, নরম গলায় বলে, আপনার সামনে এভাবে কথা বলা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু কি করবো বলুন, ঐ মানুষটার কথা শুনলেই কিরকম যেন গা হাত পা জ্বালা করে। আশা করি, আপনি কিছু মনে করবেন না।

সৌরেন এতক্ষণে যা হোক একটা কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশী হয়, না, না, মনে করবো কেন? ভদ্রলোককে দেখে আমারও খুব ভালো লাগেনি।

—ও যে কতখানি নীচ, আর নৃশংস ধরনের লোক তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। অথচ প্রচুর টাকা। মেফেয়ারে 'হোপস ফ্যাশনহাউস' নামে একটা জামা কাপড়ের দোকান আছে—

সৌরেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি দেখেছি, সে তো বিরাট দোকান।

—উনি তার একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

—তাই নাকি?

এলিজাবেথের মুখ তিক্ততায় ভরে যায়, অথচ একমাত্র উনিই আমাদের বংশের কলঙ্ক।

এলিজাবেথের এ ধরনের তীব্র কথায় বিস্মিত হল সৌরেন, কে বলবে এ সেই সহজ সরল গ্রামের মেয়ে, যাকে দেখে মনে করেছিল সংসারের নোংরা দিকটার কোন খবরই সে জানে না।

নৈশ ভোজনের পালা ইচ্ছে করেই বাইরে চুকিয়ে বাড়ি ফিরল মীনাক্ষী। একলা নয়, সঙ্গে ছিল পীয়ের।

ওরা খেতে গিয়েছিল কিঙ্গলে রোডের এক কণ্টিনেন্টাল রেস্তরাঁয়। ওখানে নাকি বীফ্ স্টেক্ রাঁধা হয় সম্পূর্ণ ফরাসী কায়দায়, গরম স্পেগেটি, যখন লাল 'সসে'র সঙ্গে প্লেটে এনে হাজির করে, মনে হয়, ইতালীর কোন ছোট্ট কাফেতে বসে আছি। এ সবই অবশ্য পীয়েরের কথা।

পীয়ের নিঃসন্দেহে ভোজনবিলাসী। লণ্ডনের কোথায় কোন্ রেস্তরাঁয় সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায় তা তার নখদর্পণে। খুব বেকায়দায় না পড়লে সে কখনও ইংরাজী রেস্তরাঁয় ঢোকে না, স্বাদহীন খানিকটা সেদ্ধ মাংস খাবার ভয়ে। কিঙ্গলে রোডের এ রেস্তরাঁ তার অতি প্রিয়। মীনাক্ষীকে ধরে এনে কতদিন যে সে এখানে খাইয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আজ অবশ্য মীনাক্ষীর বের হবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু পীয়ের কিছুতেই তার কথা শোনেনি, বলেছে, বাড়িতে বসে থাকলেই তুমি গোমড়া মুখ করে ভারতীয় দর্শনের বড় বড় কথা আওড়াবে, তার চেয়ে চল ফাঁকা হাওয়ায় খানিকটা বেড়ালে, রাস্তার আলো আর লোকজন দেখলে মনটা অনেক হাল্কা হবে।

মীনাক্ষী তখনও আপত্তি করেছে, না পীয়ের আজ থাক।

—আমি কোন কথা শুনব না, তোমায় বেরতেই হবে।

—এত আচ্ছা জবরদস্তি।

—সে তুমি যাই মনে কর। এক্ষুনি আমার সঙ্গে তোমায় বেরতে হবে। রেস্তরাঁয় ঢুকে তিন কোর্সের ডিনারও খেতে হবে। যত তুমি দেরী করবে, তত

আমার জিদ্ বেড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত—

—হাতাহাতি। এইত—, মীনাক্ষী মৃদু হেসে উঠে পড়ে, যখন শুনবে না, তখন চল। কপালে দেখছি দুর্ভোগ আছেই, মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। তা নাহলে কি আর তুমি রেহাই দেবে।

পীয়েরও হেসেছে, যাক এতদিনে তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছ?

মীনাক্ষীর বেরবার আপত্তি আর কিছুর জন্যেই নয়, অতুল মামার কাছে দাদুর শরীর খারাপের খবর শুনে কলকাতায় সে তার পাঠিয়েছিল। যদিও জবাব এসেছে দাদু এখন আগের চেয়েও ভাল আছেন, কিন্তু মন তার কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। বারবার মনে হচ্ছে, কলকাতার লোকরা ওকে সত্যি কথা জানাচ্ছে না, পাছে এই দূর বিদেশে মীনাক্ষী চিন্তা করে মন খারাপ করে সেই ভয়ে। এতে কিন্তু ওর চিন্তা কমেনি বরং বেড়েছে। যদি সত্যিই দাদুর ভালোমন্দ কিছু হয়, তাঁর এই শেষ সময়ে মীনাক্ষী তাঁর পাশে থাকতে পারবে না, এই ভাবনাই তাকে পীড়া দিয়েছে সকলের চেয়ে বেশী। অথচ সে নিরুপায়।

পীয়ের মিথ্যে বলেনি, আজকাল মীনাক্ষী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। সহজে বাড়ির বার হয় না, বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে চায় না। অপিস যায় আর ফিরে আসে। ছবি আঁকতে বসেনি অনেকদিন। যে কাজটা শুরু করেছিল তাও শেষ করা হয়নি। জিগ্যেস করলে, বাঁধা গতের এক উত্তর, কিছু ভালো লাগছে না।

একমাত্র পীয়ের ওর কোনরকম আপত্তি গ্রাহ্য করেনি, প্রতিদিন মীনাক্ষীর কাছে গিয়ে গল্প করেছে, দরকার বুঝে বাড়ির বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেছে। যে রকম আজও সে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিংসলে রোডের রেস্তরাঁয়। মীনাক্ষী প্রথম চোটে বেরুতে আপত্তি করলেও, রাস্তায় বেরিয়ে তার ভালো লেগেছে। প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়েছে খুশী হয়ে বলেছে, বাঃ আজকের সন্ধ্যেটা বড় চমৎকার।

পীয়ের ঠাট্টা করে বলেছে, ক'দিন থেকেই সন্ধ্যেগুলো ভালোই যাচ্ছে, কিন্তু কি করে তারা তোমার ঐ বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে 'ব' সুয়ার' বলে করমর্দন করবে?

—কি করবো বল, বাজে লোকের সঙ্গে বকর বকর করতে আর ভালো লাগে না।

—তুমি বুড়ী হয়ে যাচ্ছো।

মীনাক্ষী হেসে ফেলে, আমারও তাই মনে হচ্ছে। তুমিই বা মিছিমিছি এই বুড়ীর কাছে এসে সময় নষ্ট কর কেন? লণ্ডনে বহু সুন্দরী যোড়শী রয়েছে, তাদের কাছে গেলেই তো হয়।

পীয়ের একটা চোখ ছোট করে উত্তর দেয়, আমার কপাল খারাপ।

রেস্তরাঁর পীতাভ মৃদু আলোয় বড় সুন্দর দেখায় মীনাক্ষীকে। মনে হয়, ওর নাক চোখ মুখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সাজবার বাহাদুরিতে গায়ের শ্যামলা রঙটাও অলিভ রঙের শাড়ির সঙ্গে কী সুন্দরভাবে মিলিয়ে গেছে। ইচ্ছে করে, ঢেউ খেলানো বব্ চুলের অনুকরণে মুখের চারপাশে চালচিত্রের মত চুলগুলো সাজিয়ে কাঁধের কাছে রোল করে খোঁপা বেঁধেছে। ঢলঢলে মুখখানা আপনা হতেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে।

পীয়ের একটা সিগারেট ধরিয়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই কথাটা তোলে, আমি বুঝতে পারছি, তুমি দিন রাত দাদুর কথা ভাবছ, জানি তাঁকে তুমি কতটা ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, কিন্তু এতে কি লাভ হবে?

মীনাক্ষী চোখ তুলে তাকায়।

—তোমার দাদুর শরীর এতে ভাল হবে না, বরং নিজের স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে।

মীনাক্ষী ম্লান হাসে, কি করব বল, ঐ আমাদের স্বভাব, কিছু করতে না পারি, বসে বসে ভাবি।

পীয়ের গম্ভীর গলায় বলে, অনেক সময় মনে হয়, আমি তোমায় ঠিক বুঝতে পারি না।

—পারবেও না, যদি না তুমি বাংলাদেশে আস, সেখানকার আবহাওয়ার মধ্যে, সমাজের মধ্যে আমাকে দেখ। লন্ডনের আমি আর কলকাতার আমি এক নই। দু'জনের মধ্যে অনেক তফাত। যখনই কলকাতার কোনও খবর আসে, আমি আনমনা হয়ে যাই, কলকাতার আমি আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখনই তুমি আমায় বুঝতে পার না।

পীয়ের কোন কথা বলে না, চুপ করে শোনে।

—ধর, আমি যদি ইওরোপে না আসতাম তাহলে কি বুঝতে পারতাম তোমাদের কথা, কেন তোমরা বড় হলেই নিজেরা সংসার পাত, বাবা মার সংগে থাক না, কেন দু'বার বিবাহ বিচ্ছেদের পরও বিয়ের নেশা তোমাদের কাটে না। কেন ভগবানকে তোমরা চার্চের মধ্যে বন্দী করে রেখেছ। বইএ পড়লে এ সব কথা কি বিশ্বাস করতে পারতাম।

পীয়ের এতক্ষণে কথা বলে, ভারত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অবশ্য খুবই পরিমিত, তাতো জানই। বলতে গেলে এক রকম তোমার সংগে আলাপ হবার পর তোমাদের দেশ সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে। দু'চারটে বই পড়েছি, কিন্তু সবটা যে বুঝতে পেরেছি বলতে পারি না। তবে যদি কখনও সুযোগ সুবিধে আসে বেড়াতে যাবো ভারতবর্ষে।

মীনাক্ষী সাগ্রহে বলে, নিশ্চয় এস। অন্য কেউ হলে বলতাম না, কিন্তু তুমি বলেই বলছি, আমাদের দেশ তোমার ভাল লাগবে। আর কিছুর জন্যে না হোক, দেশের লোকদের ভাল লাগবে। ওদের সরলতা, ওদের ধর্মবিশ্বাস তোমাকে মুগ্ধ করবে।

মাস ছয়েক হবে পীয়েরের সংগে আলাপ হয়েছে মীনাক্ষীর। শুধু মীনাক্ষীর নয়, সেই সূত্র ধরে সরোজদের পিঠ্ চুলকানো সমিতির সে একজন রীতিমত সভ্য। সময় পেলেই সে এদের আড্ডায় আসে, গল্প করে, ভারত সম্বন্ধে জানতে চায়। কিন্তু তার আশ্চর্য লাগে এই দেখে যে, এদের কারুর সংগে কারুর মতের মিল নেই। ইতিহাস, দর্শন, সামাজিক রীতি নীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পীয়ের লক্ষ্য করেছে সরোজ যা বলে সৌরেন ঠিক তার উল্টোরকম ছবি আঁকে। জয়ের সংগে গল্প করতে গিয়ে মনে হয়েছে, ইওরোপ সম্বন্ধে তার জ্ঞান যতখানি সে তুলনায় দেশের বিষয় সে কিছুই জানে না। লীলা বা প্রমীলাকে পীয়েরের ভাল লাগে কিন্তু ভারতবর্ষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে হতাশ হয়েছে। বোধ হয় এই জন্যেই মীনাক্ষীর সংগে তার বন্ধুত্ব সবচেয়ে বেশী। মনে প্রাণে মীনাক্ষী ভারতীয়, দেশের কথা বলতে গর্বে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে জাতীয়তাবাদের অজুহাতে নিজের মনকে সে সংকীর্ণ হতে দেয়নি। ভুলকে সে ভুল বলে স্বীকার করে, তাকে নির্ভুল প্রমাণ করার জন্যে মিথ্যে তর্ক করে না।

মীনাক্ষী আর পীয়েরের প্রথম সাক্ষাৎ এক চিত্রপ্রদর্শনীতে। এ চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল বেলজিয়ান দূতাবাস, ওদের দেশের কয়েকজন তরুণ শিল্পীর আঁকা ছবি লণ্ডনের রসিক সমাজকে দেখাবার জন্যে। এরা সকলেই ইম্প্রেশনিস্ট, এদের ছবিতে ইংগিতের প্রাধান্য, খুঁটিনাটি বিবরণ না দিয়ে শিল্পীর মনের ভাবকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ছবির ক্যানভাসে।

মীনাক্ষী গিয়েছিল ছবি দেখতে। বিশেষ ভিড় ছিল না। দূতাবাসের পক্ষ থেকে পীয়ের নিযুক্ত ছিল অতিথিদের প্রশ্নোত্তরের উত্তর দেবার জন্যে। শাড়ি পরা একটি সুন্দরী ভারতীয় তরুণীকে ঢুকতে দেখে সে বোধ হয় একটু বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু সে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল ছবিগুলো দেখে এসে মীনাক্ষী যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, মাপ করবেন, এ শিল্পীরা কি লণ্ডনে আছেন?

বিস্মিত পীয়ের, পাল্টা প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো?

—তাহলে আলাপ করতাম।

—না, ওরা এখানে নেই। শুধু ছবিগুলো আমরা ব্রাসেলস্ থেকে আনিয়েছি। একটু থেমে পীয়ের জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি বুঝি শিল্পী?

মীনাক্ষী ঘুরিয়ে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, ছবি আঁকতে আমি ভালবাসি।

—মডার্ন আর্ট?

পীয়েরের কথার ধরনে মীনাক্ষী না হেসে পারে না, কেন, আপনার বুঝি মডার্ন আর্ট ভালো লাগে না?

ধরা পড়ে গিয়ে পীয়ের অপ্রস্তুত হাসি হাসে, মানে ওটা বুঝতে পারি না। কি যে এরা বলতে চায়? ধরুন না র‍্যাফেলো, কি মাইকেল এঞ্জেলো—

—আপনি সেই রেনেসাঁস যুগে এখনও পড়ে আছেন?

—কি করবো, তাদের ছবি ভাল লাগলেও বলতে পারব না?

মীনাক্ষী মিষ্টি করে হেসেছিল, তা নয়, এদের ছবিতেও একটা ভাষা আছে। সম্পূর্ণ নতুন ভাষা, তাই অনেক সময় হয়ত আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখবেন কারুর কাছেই এ আর্ট আর দুর্বোধ্য ঠেকবে না। সকলেই বুঝতে পারবে।

পীয়ের মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছে, হয়ত হবে।

ইচ্ছে করে মীনাক্ষী এ প্রসংগ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, ভারতীয় চিত্রকলা আপনার কিরকম লাগে?

পীয়ের এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিয়েছিল, আমি খুব বেশী দেখিনি।

—যদি আপনার উৎসাহ থাকে ইণ্ডিয়া হাউসে যেতে পারেন, ওখানে কতগুলো ভালো ছবি টাংগিয়ে রাখা হয়েছে।

পীয়ের উৎসাহ প্রকাশ করে, বেশ তো, যাব একদিন।

সেইদিন থেকে এদের দুজনের পরিচয়। পীয়ের তার কথা রেখেছিল, গিয়েছিল ইণ্ডিয়া হাউসে ছবি দেখতে একদিন নয়, দুদিন। দ্বিতীয়বার হয়তো মীনাক্ষীর খোঁজে, দেখাও তাদের হয়েছিল। শুধু মীনাক্ষী নয়, সেদিন পীয়েরের সংগে সরোজদের দলের অনেকের আলাপ হয়েছিল ভারত ভবনে।

সে আলাপ ক্রমে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। অনেকে তা নিয়ে ঠাট্টা করে। প্রেম বলে সন্দেহ প্রকাশ করে, কিন্তু মীনাক্ষী তাতে কান দেয় না, হাসে, সে জানে পীয়ের এমনই মার্জিত রুচির ছেলে, সে কোনদিন ইচ্ছে করে তাদের এই অনাবিল সুন্দর সম্পর্কের অবমাননা করবে না।

আজ কিণ্ডলে রোডের রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা টিউব ধরল। মাত্র দু'টো স্টেশন। কিলবার্নে নেমে সোজা রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে ডান হাতে মোড় নিলে মীনাক্ষীর এক কামরার ফ্ল্যাট। দোতলায় ওর ঘর, নিঃশব্দে দু'জনে এসে ঘরে ঢুকলো, পীয়েরকে জিজ্ঞেস না করেই কফির গরম জল বসাল মীনাক্ষী। তারা দু'জনেই ভাবছে, হয়ত সম্পূর্ণ আলাদা কথা। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, অথচ ভাল লাগছে দু'জনের নির্জন সান্নিধ্য।

মীনাক্ষীর নাম ধরে নীচের থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকলো। বোধ হয় টেলিফোন এসেছে, একটু আগে তার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছিল।

মীনাক্ষী বেরিয়ে যেতে পীয়ের একটা সিগারেট ধরালো। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে কয়েকটা ধোঁয়ার রিং ছাড়লো, আস্তে আস্তে উপরে উঠে তারা ঘরের ছাদের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল। পীয়ের মৃদু হাসে, এমনি করে যদি চিন্তাগুলোও মিলিয়ে যেত!

মীনাক্ষী ফিরল মিনিট পাঁচেক বাদে।

শুধু কথা বলার খাতিরে পীয়ের প্রশ্ন করল, কে ফোন করছিল?

মীনাক্ষীর নিস্পৃহ উত্তর, লীলা।

—বোধ হয় চিত্রাঙ্গদার ব্যাপারে।

—হ্যাঁ ওরা জিজ্ঞেস করছিল, ড্রেস নিয়ে আমি আরও কিছু ভেবেছি কিনা। পীয়ের মীনাক্ষীর দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে আস্তে জিজ্ঞেস করে। —কি বললে?

মীনাক্ষী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলেছি দু'দিন বাদে জানাব।

—তারপর দু'দিন বাদে কি বলবে?

—জানিনা।

পীয়ের চেয়ারের ওপর নড়েচড়ে বসে, সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের গলার অনুকরণ করে বলে, ধরো এ অসুখটা যদি তোমার দাদুর না হয়ে আর কোন প্রিয়জনের হত আর তুমি এরকম কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে তাহলে তোমার দাদু কি বলতেন?

মীনাক্ষী উত্তর দেয়, তা হবার উপায় ছিল না, উনি বলতেন আমি নির্বোধ, বলতেন সময় নষ্ট করার অধিকার আমাদের কারুর নেই।

—তবে তুমি এদিক দিয়ে ভাবছ না কেন? তোমার দাদুর কথা তোমার মুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয়, উনি খুব প্র্যাকটিক্যাল লোক, তাঁর উপদেশের কথা তুমি সব সময় স্মরণ কর, অথচ এখন এই দরকারের সময় ভুলে গেলে কি করে।

মীনাক্ষী মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল, কফির জলটা রিং থেকে নামিয়ে নিয়ে বলে, না আমারই ভুল হয়েছে, দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

পীয়ের কথা বলার উৎসাহ পায়, এই তো ভালো মেয়েটির মত কথা মীনা। কাল থেকে তুমি তাহলে চিত্রাঙ্গদার ড্রেস নিয়ে ভাববে।

মীনাক্ষী স্মিত হাসে, বেশ ভাববো।

—কথা দিচ্ছ?

—দিচ্ছি।

পরদিন অফিসের কাজে পীয়েরকে যেতে হয়েছিল সাউথ অড্‌লে স্ট্রীটে।

ওখানে ভারতীয় দূতাবাসের পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়। সৌরেন ঐ অফিসে চাকরি করে। হাতের কাজ শেষ করে পীয়ের গেল দোতলায় ওর সঙ্গে দেখা করতে। সৌরেন তখন টেবিলে বসে তন্ময় হয়ে বাড়িতে চিঠি লিখছে, পীয়েরকে দেখে সে অবাক হল, কী ব্যাপার, অফিসে যে?

পীয়ের বসতে বসতে উত্তর দেয়, নীচে একটু কাজ ছিল।

—হয়ে গেছে, না আমি তোমায় সাহায্য করবো।

—না, কাজের পালা চুকিয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি যে ভয়ঙ্কর কাজ করছো দেখছি, গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রাইভেট চিঠি লিখছো।

সৌরেন শব্দ করে হাসে, ঘণ্টা দুয়েকের বেশী কাজ সারাদিনে আমাদের থাকে না। বাকি সময়টা কাটানোই তো দুষ্কর। এর ওর টেবিলে গল্প করে বেড়াতে হয়।

পীয়ের রসিকতা করে, আহা আমাকে একটা অমন চাকরি জোগাড় করে দাও না।

—তাতে তোমার পোষাবে না। কাজও যে রকম কম, মাইনেও তেমনি অল্প। একমাত্র ছাত্রদেরই সুবিধা, খানিকটা রোজগার করতে পারে, আবার সেই সঙ্গে পড়াশোনাও চলে।

সৌরেনের কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই ভারতীয় দূতাবাসের বেশীর ভাগ কেরানী কাজ করে না। স্রেফ আড্ডা মেরে আর গল্প করে সারাদিনটা কাটিয়ে দেয়। ওদের যে কোন একজনের দিনপঞ্জী খুললে দেখা যাবে, কার্লো যা বলেছে 'লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়' তারই পুনরাবৃত্তি। 'সুখ কাকে বলে বুঝতে পারছি ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করে : সকাল সাড়ে ন'টায় অফিসে যাবার কথা, যাই দশটার পর তারপর কোট খুলে কাজে হাত দিতেই চায়ের সময়। সাড়ে দশটা থেকে সওয়া এগারটা চা-এর সময় আইনসঙ্গতভাবে নয়, তবে কেউ কিছু বলে না। সওয়া এগারটায় অফিসে এসে একটা সিগারেট খেতেই পৌনে বারটা বেজে যায়। তারপর একটা ফাইল ওল্টাতে না ওল্টাতে লাঞ্চে যাবার তোড়জোড় শুরু হয়, হাত মুখ ধোয়া, তারপর ক্যাণ্টিনের দিকে দ্রুত পদবিন্যাস।

লাঞ্চ শেষ হবার কথা দেড়টায়, কিন্তু হয় না--কারণ 'বস'দের (Boss) লাঞ্চের সময় একটা থেকে দুটো—অতএব দু'টোয় আসলে ক্ষতি নেই। এসে একখানা কাগজ হাতে নিয়ে ফাইল খুঁজতে বেরিয়ে যাই। গিয়ে দু'চারজন বন্ধুদের সঙ্গে সমাজ-তন্ত্রবাদ যে ভাল তা বোঝাই, ফিরে এসে একে ওকে টেলিফোন করি, চায়ের সময় হয়, তিনটে বাজে। তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে চায়ের টেবিলে রাজনীতি চর্চা করি, সেখান থেকে বেরিয়ে একটু পোস্ট অফিসে যাই। ফিরে আসি যখন চারটে বেজে গেছে। এই সময় একখানা চিঠি লিখি কোথাও। তারপর পৌনে পাঁচটায় হাত ধোবার সময়; পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় বাসের কিউতে দাঁড়াই।'

অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে, কেউই কাজ করে না, তাহলে আর অফিস চলছে কি করে। কাজের লোকও নিশ্চয় আছে তবে সংখ্যায় বোধ হয় কম।

সৌরেন পীয়েরকে আমন্ত্রণ জানায়, একটু বাদেই তো লাঞ্চের ঘণ্টা, চল আমাদের ক্যাণ্টিনে আজ খাবে।

পীয়ের সবিনয়ে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, আজকে আমায় মাপ করতে হবে, লাঞ্চের আগেই অফিসে ফেরা দরকার। আমাদের অফিসে যে ঠিক উল্টো ব্যাপার। কম লোক বেশী কাজ। সারাদিন ধরে হিমসিম খেতে হয়।

—তাহলে অন্য একদিন আমার সঙ্গে খেতে হবে।

—সানন্দে।

—মীনাক্ষীর সঙ্গে তোমার সম্প্রতি দেখা হয়েছে নাকি? কিরকম আছে?

পীয়ের স্বভাবসুলভ মৃদু হাসে। আছে ভালই তবে ওর দাদুর কথা খুব ভাবছে।

সোরেন টেবিলের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে, না ভাবলেই আশ্চর্য হতাম। আমি তো ওদের বাড়ির সবাইকে চিনি, কলকাতায় থাকতে কতদিন গেছি ওদের বাড়ি, সত্যিই আশ্চর্য লোক ওর দাদু, নাতনীকে সারাক্ষণ আগলে রেখেছেন অথচ কোনদিনও তার কাজে বাধা দেননি। আমাকে অবশ্য উনি খুব পছন্দ করতেন না।

পীয়ের কোন কথা না বলে মুখ তুলে তাকায়।

সোরেন হাসতে হাসতে বলে, মনে হয়, উনি আমাকে খুব বোকা ভাবতেন। আর ভয় পেতেন পাছে আমি মীনাক্ষীর প্রেমে পড়ি।

কথা শুনে পীয়েরও হাসল।

সোরেন অতীতের চিন্তায় ডুব দেয়, নিষ্প্রাণ গলায় বলে যায়, মীনাক্ষী কিন্তু অনেক বদলে গেছে। কলকাতায় ওকে মনে হতো বড় কোমল, একটু জোরে হাওয়া বইলেই হয়ত নুয়ে পড়বে, কিন্তু এখানে দেখলে মনে হয়, ও সম্পূর্ণ স্বাবলম্বিনী। দেশে থাকতে ও ছিল অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ, কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলত। কিন্তু এখানে এসে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে ফেলেছে। লণ্ডনে যত বাঙালী মেয়ে দেখেছি তার মধ্যে ওকেই আমার সবচেয়ে বেশী প্র্যাক্‌টিকাল বলে মনে হয়।

পীয়ের মন দিয়ে কথা শুনছিল, বললে, তুমি যখন অত ভাল করে মীনাক্ষীকে চেন, কেন যাও না মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে। ও বেচারী বড় একলা।

সোরেন পকেট থেকে সিগারেট বার করে পীয়েরের দিকে এগিয়ে দিল, আমি গেলে মীনাক্ষী খুব খুশী হবে না।

পীয়েরের ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে, তার মানে?

—ও আমাকে পছন্দ করে না, না কলকাতায়, না এখানে। যদি জিজ্ঞেস কর কারণ কি আমি বলতে পারব না। যদিও তার কোন কাজে লাগতে পারলে আমি নিজে খুব খুশী হতাম।

এ ধরনের কথা শুনতে হবে জানলে পীয়ের আগে থেকেই প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করত। হালকা হেসে জিজ্ঞেস করলে, চিত্রাঙ্গদার রিহার্সাল কিরকম চলছে?

—খুব জবর।

—যাব একদিন সরোজের ফ্ল্যাটে।

—নিশ্চয় এস, পারত মীনাক্ষীকে সঙ্গে করে ধরে এনো। ড্রেসের ব্যাপার এখনও ফাইন্যাল হয়নি।

পীয়ের এবার উঠে পড়ে, আজ চলি, আশা করি, শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

পীয়ের চলে গেলেও তারই কথা ভাবছিল সোরেন। সত্যিই সে সুদর্শন, প্রায় ছ'ফিট লম্বা, ছিমছাম শরীর, ফর্সা রঙ কিন্তু সে রঙ কাগজের মত সাদা নয়, গাল দুটোয় তার গোলাপী আভা, চুলগুলো কালো নয় কটা, তার উপর নীল চোখ। বড় সুন্দর দেখায় পীয়েরকে যখন সে আধুনিক মার্কিন স্টাইলের কাঁধ চওড়া কোট আর ফরাসী কায়দায় তৈরী কর্ডের প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। সাজ-পোশাক সম্পর্কে রুচি তার খুব সূক্ষ্ম। যে জিনিসটি পরে তা নিখুঁত, নিভাঁজ হওয়া

চাই। তা না হলেই পীয়ের-এর মন খুঁতখুঁত করে।

শুধু চেহারা নয়, পীয়ের-এর মনটাও বড় পরিষ্কার। প্রাণখোলা আলাপ করে সকলের সঙ্গে, এ স্বভাব সে পেয়েছে কণ্টিনেণ্টের ছেলে বলে। ইংরাজদের সঙ্গে আলাপ করলে বোঝা যায়, ওদের মনে কতকগুলো বদ্ধমূল ধারণা থাকে, তাই দিয়ে ওরা সবকিছু বিচার করতে চায়। আমাদের দেশের লোকের মত তর্ক করে ওরা গলা ফাটায় না বটে, কিন্তু আলোচনার সময় নিজেদের মনগড়া ধারণার সঙ্গে না মিললে সবকিছু শোনার পর মৃদু হেসে নির্ভীক মন্তব্য প্রকাশ করে, আমি বুঝতে পারছি আপনি যা বলতে চাইছেন, এবং এতে যুক্তিও আছে যথেষ্ট কিন্তু দুঃখিত, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

পীয়ের হয়ত তর্ক করে, আমাদের মতই কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়, কিন্তু নিজের ভুল শুধরে নেবার জন্য সে সর্বদাই সচেষ্ট। এইজন্যেই বোধ হয় ভারতীয় মহলে পীয়ের যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য মীনাক্ষীর সঙ্গে তার হৃদ্যতার কথা ভাবলে সৌরেন মনে মনে কষ্ট পায়। বরাবর দেখে এসেছে মীনাক্ষী নিজের চারদিকে বেড়া দিয়ে রাখে, ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মিশলেও আসল মীনাক্ষী কোনদিনই বেড়ার বাইরে আসে না। ঢুকতেও দেয় না কাউকে বেড়ার ভিতরে। সে তার নির্জন রাজত্বে একলা বাস করে। কিন্তু সৌরেনের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এই বিদেশী ছেলেটি বোধ হয় মীনাক্ষীর সেই লুকোন রাজত্বে ঢুকবার অধিকার পেয়েছে। পীয়েরের এ সৌভাগ্যে সৌরেন মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা জ্বালা অনুভব করে।

এই থেকে বোঝা যায়, মীনাক্ষীকে আজও সৌরেন ভুলতে পারেনি। মীনাক্ষীর দাদা তার সহপাঠী ছিল। বলতে গেলে স্কুল-জীবন থেকে তার সঙ্গে ওদের বাড়ি সৌরেন গেছে। আলাপ হয়েছে সকলের সঙ্গে, ফ্রক পরা ছোট মেয়ে মীনাক্ষী তখন স্কুলের ছাত্রী। ওরা একসঙ্গে খেলা করেছে, গল্প করেছে, ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকে মীনাক্ষীকে সে বন্ধুর বোন হিসেবেই দেখেছে, কিন্তু কবে যে দেখার রূপান্তর ঘটল তা বলা মুশকিল। মীনাক্ষীর দিক থেকে কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে হয় না, তবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরবার সময় মেয়েদের চোখেমুখে যে স্বাভাবিক চঞ্চলতাটুকু দেখা যায় তাই প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। সেইটে বুঝতেই বোধ হয় সৌরেন ভুল করেছিল, মীনাক্ষীর হাবভাবের মধ্যে অন্য অর্থ খুঁজতে গিয়ে শুধু অনর্থই ঘটিয়েছে। কলকাতায় থাকতেই শেষের দিকে সম্পর্কটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দু'জনের দেখা হলে কথা কাটাকাটি আর ঝগড়াই হয়েছে বেশী। ভেবেছিল বিলেতে এসে আবার আগের সম্বন্ধ ফিরিয়ে আনা যাবে, কিন্তু তা হয়নি। এখানে আর কলকাতার মত ঝগড়া না হলেও ছেলে-বেলাকার সেই প্রীতির সম্পর্কটা আর নেই।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সৌরেন, কোটটা পরে নিয়ে নীচে নামতে শুরু করল, লাঞ্চের সময় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এইবেলা ক্যাণ্টিনে না গেলে টেবিল খালি পাওয়া যাবে না, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

একটা প্রশ্ন সৌরেনকে চিমটি কাটল। সে লণ্ডনে এসেছিল কেন? শুধু কি দেশ দেখার লোভে? না কলকাতায় ফিরে চাকরীতে উন্নতি করার আশায়? কিন্তু এ দুয়ের চাইতে কি বড় হয়ে দেখা দেয়নি মীনাক্ষী।

সৌরেন ইচ্ছে করেই এ চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিল। ক্যাণ্টিনে ঢুকে একটা

ট্রে হাতে নিয়ে পছন্দ মত কয়েকটা সাজানো ডিশ্ তুলে নিয়ে বসল গিয়ে কোণের টেবিলে। মাংসটা ভাল রেঁধেছে। পাঁপড়টা ঝাল।

কচুরি পানার মত ওই একই চিন্তা ঘাড়ে এসে পড়ে। মীনাক্ষীর লণ্ডনে এসে কি লাভ হয়েছে, মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে দেশে ফিরে গেলেই তো পারে। কত লোকে কতরকম কথা বলে ওর সম্বন্ধে। সৌরেনের তা মোটেই শুনতে ভাল লাগে না।

—মিঃ লাহিড়ী।

সৌরেন পাশ ফিরে দেখল জ্যাক্ তাকে ডাকছে। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার?

—একটা কথা ছিল।

—বল।

—মানে ভাবছি বলা ঠিক হবে কিনা।

সৌরেন ওকে ভরসা দেয়, বোস না চেয়ারে।

জ্যাক্ ইতস্তত করে বসে। ওর পুরো নাম জ্যাক্ বয়েড ব্রেণ্ট, বয়েসে সৌরেনদের চেয়ে কিছু বড়, কাজ করে এই অফিসেই। জামা কাপড় দেখলেই বোঝা যায় খুব সচ্ছল নয়, তবে লোকটা ভাল।

—যদি অসুবিধে না হয় আমাকে পাউণ্ড তিনেক ধার দিতে পার? এ সপ্তাহের মাইনে পেলে তোমায় দিয়ে দেব।

সৌরেন হাসে, এ কথাটা বলার জন্যে এত ভাবনায় পড়েছিলে কেন?

জ্যাক চোখ নামিয়ে বলে, না লাহিড়ী, বার বার ধার চাইতে আমার বড় লজ্জা করে। এর আগেও তো তোমার কাছ থেকে দু'বার নিয়েছি।

—ফেরতও দিয়েছ ঠিক সময়ে।

জ্যাক্ তবু যেন বুঝতে চায় না, আমি মনে প্রাণে ঐ জিনিসটা অপছন্দ করি। পলোনিয়াসের মত আমিও ভাবতাম ওর বুদ্ধিতে চলব neither a borrower nor a lender be কিন্তু হল না, টাকা আমাকে ধার করতেই হয়।

—কিন্তু জ্যাক্ তুমি তো বেসামাল খরচে নও।

জ্যাক্ অতি দুঃখেও হাসে, মোটেই না, সেইজন্যেই তো কষ্ট হয়।

সৌরেন ওর কথা বুঝতে পারে না, তবে—

—কালকে আমার মনিব্যাগটা পকেট মার হয়ে গেছে।

—লণ্ডনে পকেট মার? সৌরেনের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

—রাস্তায় নয়, বাড়িতে।

—তার মানে?

—একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সেই ব্যাগটা চুরি করেছে।

—কে সে, তাকে তুমি চেন?

জ্যাক্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বড় বেশী চিনি, A little more than kin, and less than kind, আমার ছোট ভাই। The problem child of our family.

শনিবার।

আজ ছুটি বলে প্রমীলা বেরিয়েছে বাজার করতে। বাজার ঠিক নয়, দু' একটা কাজ অনেকদিন ধরেই করা হয়নি কুঁড়েমি করে। ইচ্ছে আজ সেগুলো চুকিয়ে ফেলা। লণ্ডনে থাকলে দেশ থেকে অনেক চিঠি আসে। বেশীর ভাগই তাতে

ফরমায়েশ, যে জিনিসগুলো কলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে না যদি তা লণ্ডনে কিনে কারুর সঙ্গে পাঠানো যায়। মাঝে মাঝে ফরমাশ মত জিনিস পাঠানো সম্ভব হলেও বেশীর ভাগ সময় হয় না। হয় পাঠাবার মত লোক পাওয়া যায় না, না হয় টাকার অভাব।

প্রায় তিনমাস ধরে তোতন লিখছে একটা বই-এর কথা, কলকাতার বাজারে নেই যদি প্রমীলা সেটা কিনে বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেয়। তোতন প্রমীলার বড়দিদির ছেলে, স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়ছে। কলকাতায় থাকতে ওর সব আবদার ছিল এই ছোট মাসীর কাছে। এখনও সে অভ্যেস যায়নি। মাসে দু'তিনবার ওর চিঠি আসে, তাতে যত না কলকাতার খবর থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে প্রশ্ন। লণ্ডনকে জানবার বাসনা তার অসীম, বোধহয় এখানে আসবার আগ্রহও তার উগ্র। কিন্তু সব চিঠির শেষে একটি দু'টি জিনিসের উল্লেখ করে সে লিখতে ভোলে না, 'মাসীমণি যদি পারো এই জিনিসগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিও, খবরদার কিন্তু মাকে লিখ না যে আমি বলেছি।'

চিঠি পড়ে প্রমীলা হাসত, দিদি সত্যিই বড় কড়া মেজাজের। কারুর কাছে ছেলে কিছু চায় তা সে একেবারে পছন্দ করে না। প্রমীলার মনে পড়ে আদুরে মেয়ে বলে বাড়িতে কারুর কাছে কোনদিন সে ধমক খায়নি, কিন্তু দিদি বাপের বাড়ি এলে প্রমীলা খুব সংযত হয়ে চলত, জানত এতটুকু বেয়াদপি দিদি ক্ষমা করবে না। আজকাল কিন্তু দিদি অনেক নরম হয়ে গেছে, বয়েসও তো কম হল না। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে, প্রমীলার চেয়ে পনের বছরের বড়।

তোতনের এ বইটার কথা দিদিও লিখেছে সেইজন্যে আর গড়িমসী না করে প্রমীলা আজ বেরিয়ে পড়েছে বই কেনার জন্যে। এর আগে রাস্তায় দু'চারটে বই-এর দোকানে সে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল একমাত্র ফয়েল'স্-এর দোকানে তোতনের ওই বইটির খবর পাওয়া সম্ভব।

ফয়েলস্-এর দোকান বিরাট। অনেকে বলে এত বড় বই-এর দোকান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। হবেও বা সত্যি। রাস্তার ওপরে একতলার বিরাট ঘরখানা নানারকম বই-এ সাজানো, বেশীর ভাগ নভেল নাটক আর গ্রন্থাবলী। নানা বাঁধাই-এর, নানা দামের।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে প্রমীলা একজনকে জিজ্ঞেস করল, আমি একটা মেকানিকসের পাঠ্যপুস্তক খুঁজছি। কোথায় গিয়ে খোঁজ করব বলতে পারেন? ভদ্রলোক কপালে দু'বার তর্জনী ঠুকে মনে মনে ভেবে নিয়ে বললেন, দোতলায় একেবারে বাঁদিকের কোণের ঘরটায় চলে যান।

ধন্যবাদ জানিয়ে প্রমীলা সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক বিনীতভাবে জানান, মাদাম, ইচ্ছে করলে আপনি লিফট্-এ যেতে পারেন, সিঁড়ির পেছন দিকেই লিফট আছে।

প্রমীলা দোতলায় নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ খুঁজেও তোতনের ফরমাশ মত বই পেল না। অগত্যা তাকে শরণাপন্ন হতে হল সাদা লম্বা কোট পরা হাসিখুশী যে বয়স্থা ভদ্রমহিলা ওই ঘরের ইনচার্জ, তাঁর। লেখকের নাম শুনে ভদ্রমহিলা হাসলেন, এ বই তো এদেশে পড়ানো হত যুদ্ধের আগে, এখন আর পাওয়া যায় না।

প্রমীলা চিন্তিত স্বরে বলে, তাহলে!

—আপনি কি শুধু ঐ বইটিই চান? নয়ত মেকানিকস্-এর অনেক নতুন নতুন বই আপনাকে দেখাতে পারি, সব কটিই খুব ভালো বই।

প্রমীলা মাথা নাড়ে, অন্য বই হলে চলবে না, ওটি স্কুলের পাঠ্যপুস্তক। ভদ্র-মহিলা চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় জানতে পারি?

—কলকাতায়।

—আশ্চর্য। এত পুরোন বই সেখানকার পাঠ্যপুস্তক? দিন এগুচ্ছে, বিজ্ঞানের কত উন্নতি হচ্ছে, তার সঙ্গে পা ফেলে বেরুচ্ছে নতুন নতুন বই। ঐ সব পুরোন বই পড়লে আমাদের বুদ্ধি এগুবে, না পিছোবে।

প্রমীলা লজ্জিত স্বরে বলে, আমি বরং কলকাতায় চিঠি লিখে ওদের মতামত জেনে, অন্য বই নিয়ে যাব।

মনে মনে বিরক্ত হয়েই দোকান থেকে বেরিয়ে এল প্রমীলা। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে আমরা বড়াই করি। অথচ সেই মান্ধাতার আমলের শিক্ষা প্রণালী আগের মতই রয়ে গেছে। যাঁরা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা তৈরী করেন, তাঁদের জ্ঞান বোধহয় নিজেদের ছাত্রাবস্থায় পড়া বই-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারপর আর কোন নতুন বই বেরচ্ছে কিনা কোন খবরই রাখেন না।

দোকান থেকে বেরিয়ে প্রমীলা ডান দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো, দু'ধারে শুধু বই-এর দোকান। হাতে সময় থাকলে এ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে প্রমীলার খুব ভাল লাগে, নতুন বইয়ের দোকানগুলো এমন লোভনীয় করে সাজানো যে দেখলেই ইচ্ছে করে ভেতরে ঢোকবার। শুধু পেঙ্গুইন সিরিজের মত সস্তা দামের বই-এর স্টলও যে রকম আছে তেমনি আবার তারই পাশে 'Zwemmer'-এর মত বিশিষ্ট দোকান, যেখানে পাওয়া যায় দামী দামী 'আর্টে'র বই। এসব দোকানে ঢুকলে চারদিকের সাজানো বিখ্যাত কন্টিনেন্টাল ছবির প্রতিচ্ছবি দেখলে কেবলই কিনতে ইচ্ছে করে, এখানকার দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলে সে অতি সহজে বুঝিয়ে দিতে পারে পিকাসো আর পিসারোর মধ্যে তফাত কোথায়।

আবার এই নতুন দোকানের পাশেই আছে পুরোন বই-এর দোকান। তাদের আভিজাত্যও কম নয়, বহু নামজাদা বই-এর পুরোন সংস্করণ সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়। সেক্সপীয়ারের প্রথম যে গ্রন্থাবলী বেরিয়েছিল তার কপি থেকে শুরু করে লরেন্সের দুষ্প্রাপ্য বই পর্যন্ত এখানে সযত্নে সাজানো থাকে। অবশ্য যাদের বই কেনার রীতিমত অভ্যেস, তাদের ভাল লাগে এই সব বই-এর দোকানের সামনে সাজানো সস্তা দামের র‍্যাক থেকে বই বেছে নিতে। বরাত ভাল থাকলে হয়ত এক শিলিং-এর নীচেই মম-এর উপন্যাস কিম্বা শ'-এর নাটক পাওয়া যায়। এ অনেকটা কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে টাঙানো বই-এর মত।

তবে একথা সত্যি লন্ডনের লোকেরা বই কিনতে ভালবাসে, এই বিরাট শহরে খুব কম রাস্তাই আছে যেখানে বই কেনার সুযোগ নেই। উইগমোর স্ট্রীটের মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো বেশী দামের বই-এর ক্রেতারা হয়ত গাড়ি থেকে নেমে পছন্দ মত বই তুলে নিয়ে চলে যায়, কিম্বা টেলিফোনে বই-এর অর্ডার দিয়ে দেয়। কিন্তু ক্যারিংডন স্ট্রীটের সাধারণ ক্রেতারা সস্তা দামের পুরোন বই স্টলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নেড়ে-চেড়ে শেষকালে হয়ত লজ্জায় পড়ে এক কপি কিনে ফেলে। যে ধরনেই হোক এরা বই কেনে, শুধু কেনে না, পড়তে ভালবাসে, তাই লন্ডনের বাসে, টিউবে, রেস্তরাঁয়, সব জায়গাই দেখা যায় পাঠরত ইংরাজকে। কিছু না কিছু তারা পড়ছেই, হয় খবরের কাগজ না হয় কোন বই।

—প্রমীলা না?

অন্যমনস্ক প্রমীলা নিজের নাম শুনে ফিরে তাকাল।

রজত বোস। মুখে একটা পাইপ, হাতে কয়েকটা বই, ফিক ফিক করে হাসছে।

রজতকে দেখে প্রমীলা বিরক্ত হল, বরাবরই তাই হয়, মুখের ভাব গোপন করার চেষ্টা না করেই বললো, কি ব্যাপার, এখানে ?

রজতের গা জ্বালান উত্তর, এ ত আমাদেরই জায়গা, তোমাকে দেখেই আশ্চর্য হচ্ছি। তোমরা ঘুরবে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দোকানে, কিনবে নতুন ফ্যাশানের জামা কাপড়, রকমারি মন ভোলানো জিনিস। এখানে তোমাদের মানায় না।

প্রমীলা তেতো গলায় বলে, খোঁচা দিয়ে কথা বলার স্বভাবটা যায়নি দেখছি।

—খোঁচা আবার দিলাম কোথায় ? সত্যি কথা বলছি, তোমরা যে রকম দোকানে ঢুকে পঞ্চাশটা শাড়ী নামিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখ, আমরা সেই রকম বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি।

প্রমীলা ভেবেছিল দু' একটা কথা বলে রজতকে এড়িয়ে চলে যেতে পারবে, কিন্তু রজতকে ওর সঙ্গে সঙ্গে এগুতে দেখে মনে মনে ও চিন্তিত হয়ে পড়ল।

প্রসঙ্গ বদলে রজত জিজ্ঞেস করে. তোমাদের পিঠ চুলকানো সমিতি কি রকম চলছে ?

প্রমীলা ছোট্ট উত্তর দিল, ভালই।

—অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

প্রমীলা ইচ্ছে করেই তীব্র মন্তব্য করল, তার জন্যে কোন রকম অভাব আমরা অনুভব করিনি।

রজত সে কথা গায়ে মাখলো না, বললে. শুনছি আবার নাকি তোমরা নৃত্যনাট্য লাগিয়েছ ? সংস্কৃতির নামে আর কেন আমাদের যন্ত্রণা দেবে !

—আপনাকে যেতে বলেছে কে ?

—আমরা ছাড়া আর তোমাদের টিকিট কিনবে কারা ?

প্রমীলা ক্রমশ রাগতে থাকে, অত দয়া আর নাই বা দেখালেন, আমি সবাইকে বারণ করে দেব কেউ যেন আপনাকে টিকিট কেনার জন্যে বিরক্ত না করে।

প্রমীলাকে চটাতে পেরে রজত যেন খুশী হয়. তুমি রেগে গেছ নাকি ?

প্রমীলা গলা সরু করে উত্তর দেয়. ভগবান আপনাকে এতটা বোঝবার শক্তি দিয়েছেন দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

—তাহলে তুমি নিশ্চয় চটেছ, চল, বরং সোহোর বারে ঢুকে দু'টো ঠান্ডা বীয়ার খাওয়া যাক। বেশ তেষ্টা পেয়েছে।

প্রমীলা কঠিন চোখে তাকায়, আমি ড্রিঙ্ক করি না।

রজত দুষ্টুমি করে হাসে, এখনও বীয়ার খেতে শেখনি, একেবারে ছেলেমানুষ, বেশ. তুমি না হয় কফিই খেও।

—আমার অন্য কাজ আছে।

—পনের মিনিট দেরী হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। বিশেষ করে 'সোহো'র যে বারে তোমায় আমি নিয়ে যাব, সেখানে একদিন—

প্রমীলা সত্যিই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে. সোহো সম্বন্ধে আমার কোনরকম কৌতূহল নেই।

রজত তাতেও দমে না, বলে, তুমি বোধহয় জানো না, ঐ সোহোতে বসেই কার্ল মার্ক্স কম্যুনিজম-এর স্বপ্ন দেখেছিল।

—যাই দেখে থাকুন আমার আর সময় নেই, মাপ করবেন, চল্লাম।

রজতকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে প্রমীলা চট করে লেস্টার স্কোয়ার টিউব স্টেশনে ঢুকে পড়ে। জনস্রোতের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেয়, একেবারে টিকিট ঘরের সামনে সে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, উঃ, এতক্ষণে সে ঐ বিদঘুটে লোকটাকে কাটাতে পেরেছে, এঁটুলীর মত চেপে ধরেছিল আর কি।

প্রমীলা নর্দান লাইনের টিকিট কাটবে, যাবে হ্যাম্পস্টেড। সেখান থেকে বাড়ি, বেশী হাঁটতে হবে না। টিকিট ঘরের সামনে আট-দশজন লোক কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রমীলা তাদের পেছনে দাঁড়ায়। প্রায় যখন কাউণ্টারের কাছে এসে পড়েছে হঠাৎ মনে হল সরোজদাকে একবার ফোন করে দেখলে হয় সে কি করছে। ব্যাগ খুলে দেখে নিল খুচরো পেনী সঙ্গে আছে কিনা।

টেলিফোন 'বুথে' ভিড় ছিল না, প্রমীলা একটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সরোজের নম্বর ডায়াল করল, অন্যদিক থেকে সরোজের গলা ভেসে এল, সরোজ রায় কথা বলছি।

—আমি প্রমীলা।

সরোজ খুশী হয়, তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

প্রমীলা দুষ্টুমি করে বলে, কেন বাড়ি থেকে।

—সেকি, লীলা যে বললে তুমি বাড়িতে নেই।

প্রমীলা গম্ভীর হয়, ও, লীলা বুঝি ফোন করেছিল?

—না, আমিই তোমাদের খবর নিচ্ছিলাম।

—এত দয়া।

হঠাৎ এইভাবে কথা বলছ কেন প্রমীলা?

—না এমনি, প্রমীলা শুকনো উত্তর দেয়।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

সরোজ কথা বলে, আজকাল কি হয়েছে তোমার বলতো?

—কেন?

—সব সময় আমাকে এড়িয়ে চলছো। এর চেয়ে এক সময় বসে খোলাখুলি আলাপ করলে ভাল হয় না কি? আমার কথা পরিষ্কার করে তোমাদের বলেছি, কিন্তু তোমরা বলনি।

প্রমীলা মৃদুস্বরে বলে, আমার আর বলবার কি আছে?

সরোজ সহানুভূতিভরা গলায় জিজ্ঞেস করে, কিছুই কি নেই?

—হয়তো আছে, তবে তা শুনতে আপনার ভাল লাগবে কিনা জানি না। আমার জীবনের কথা।

সরোজ আগ্রহ প্রকাশ করে, নিশ্চয় শুনব।

—যদি খুব ব্যস্ত না থাকেন আসুন না আমাদের বাড়িতে।

—কখন?

—দুপুরে। যা হোক কিছু লাঞ্চ করা যাবে।

সরোজ চিন্তিত সুরে বলে, লীলা কিন্তু বাড়ি থাকবে না, ও মীনাক্ষীর কাছে গেছে।

প্রমীলার শ্লেষ মাখানো কণ্ঠস্বর, কেন? আমি একলা থাকব বলে আসতে ভয় করছে?

—তা নয়, তবে—

প্রমীলা স্থির গলায় বলে, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।

প্রমীলাকে যারা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে তারা জানে ছোটবেলা থেকেই প্রমীলা বয়েসের অনুপাতে অনেক বেশী পরিণত। কথায় কথায় বুদ্ধিদীপ্ত মতবাদের ছটায় অন্যদের চমক লাগাবার চেষ্টা সে করে না, কিন্তু তার ধীর সুচিন্তিত মতামতকে উপেক্ষা করতেও কেউ পারে না। যারা মনে করে অসংখ্য বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে হেসে গল্প করে প্রমীলা সানন্দে দিন কাটায় তাদের ধারণা নির্ভুল নয়। যারা তার অন্তরঙ্গ তারা অনেক চেষ্টা করেও প্রমীলার নিজের মতামত জানতে পারেনি। এ তার ছোটবেলার অভ্যাস। ওর মুখের কথা কোনদিনই মনের কথা নয়, সেইজন্যেই অনেকে ওকে ভুল বোঝে, বিপদে পড়ে।

লীলা ওর দিদি, বয়েসে কিছু বড়, তবু প্রমীলা মনে করে সে অনেক ছেলেমানুষ, কোনদিনই লীলার কথা সে মন দিয়ে শোনার দরকার মনে করে না। হেসে উড়িয়ে দেয়। কলকাতায় থাকতে লীলা স্কুল কলেজে সর্দারি করত, আয়োজন করত নানারকম অনুষ্ঠানের, কিন্তু কোনদিন প্রমীলাকে সে এসবের মধ্যে টানতে পারেনি, ওর মতে এগুলো ছেলেমানুষি, ভীতু ছেলেমেয়েদের মেলামেশা করবার একটা জায়গা। এ সব নিয়ে লীলার সঙ্গে তার তর্ক হ'ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লীলারই চোখ দিয়ে জল পড়ত, প্রমীলার মত বদলাতে সে পারত না।

প্রমীলার গর্ব ছিল চিরকেলে বাঙালী মেয়েদের প্যানপ্যানানি তার মধ্যে নেই। তার চোখে জল দেখতে পাবে না কেউ। সে গর্ব সে এখনও করতে পারে কারণ সাধারণ মেয়েদের তুলনায় তাকে দেখলে মনে হয় অনেক বেশী শক্ত। একথা লীলাও স্বীকার করে, কিন্তু তার ভাল লাগে না প্রমীলার অযথা দম্ভ। এই কথাটাই পাঁচজনের কাছে জাহির করার চেষ্টা। তবে একথাও সত্যি, দিদি হয়েও প্রমীলার ব্যক্তিত্বকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না, তার নীরস কঠিন মন্তব্যকে সে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

আপাতদৃষ্টিতে দুই বোনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কোথাও যেন তাদের নিবিড় মিল আছে, সেটা বাইরের লোকে বুঝতে না পারলেও আপনার জনেরা অনুভব করে, প্রমীলা না থাকলে লীলা সত্যিই নিজেকে অসহায় মনে করে। আবার লীলার অনুপস্থিতি প্রমীলার নির্জন বাসকে দুর্বিসহ করে তোলে।

আজ ঝোঁকের মাথায় সরোজকে আসতে বলে, টেলিফোন কেটে দেবার পর প্রমীলার মনে হল এভাবে আসতে না বললেই সে ভাল করত। কি বলবে সে সরোজকে, নিজের জীবনের কথা কোথা থেকে শুরু করবে। নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে তাদের বাড়ির সব কথাই তো সরোজ শুনেছে, বাবার মৃত্যু, দাদার সংসার, ভাইবোনদের পরিচয়, মার মহিমা, কোন কথাটাই তো তার অজানা নয়, তবে আর তার নতুন করে বলবার কি আছে?

এই বোধহয় প্রথম প্রমীলা নিজেকে দুর্বল মনে করল। প্রথম যৌবনের উন্মেষে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রমেনের। রমেন তাদের আত্মীয়, গড়ে উঠেছিল একটা প্রীতির সম্পর্ক, কিন্তু তা নিতান্ত ছেলেমানুষি। নিজের দেহকে জানবার প্রবল আগ্রহ ছাড়া আর বোধহয় তার মধ্যে কিছুই ছিল না। জোর করে যেদিন রমেনের কাছ থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিল, তখনও সে মনে কোনরকম দুর্বলতা অনুভব করেনি। দুর্বল হয়ে পড়েনি কলেজের বন্ধু পুলকেশের সঙ্গে মেশবার সময়।

পুলকেশকে সে ডেকে এনেছে বাড়িতে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সকলের সঙ্গে, গেছে সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, হয়তো বা পিকনিকে। কিন্তু তার মধ্যেও প্রাণ ছিল না। পুলকেশ সুদর্শন স্বাস্থ্যবান তার ওপর বড়লোকের ছেলে। যে কোন মেয়ের কাছেই তার আকর্ষণ তীব্র হওয়া উচিত, বিশেষ করে আমাদের দেশে। প্রমীলার ভাল লেগেছিল পুলকেশের সঙ্গে ততদিনই ঘুরে বেড়াতে যতদিন সে লক্ষ্য করেছে সহপাঠিনীদের চোখে ঈর্ষার জ্বালা। তাদের সামনে দিয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে যেতে প্রমীলার বেশ মজা লাগত। তার বেশী আর কিছু নয়। ক'দিন বাদেই পুলকেশের সঙ্গ তার কাছে একঘেঁয়ে মনে হল, মনে হল, আধুনিক আদবকায়দায় কেতাদুরস্ত ও যেন একটা নিষ্প্রাণ কাঠের পুতুল। আস্তে আস্তে সে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিল। সেদিন পুলকেশের চোখের জল দেখে সে দুর্বল হয়ে পড়েনি।

কিন্তু আজ কেমন যেন তার অসহায় মনে হচ্ছে, সরোজ-এর চোখকে সে যদি ফাঁকি দিতে না পারে, ও মানুষটা বড় চালাক। হয়ত কিছু বুঝতে পেরেছে, আজ-কাল ইচ্ছে করেই হেঁয়ালী করে কথা বলে। সরোজের মেয়ে বন্ধু অনেক, হয়ত প্রমীলার জেদী মন একদিন চেয়েছিল সকলের মাঝ থেকে সরোজকে স্বতন্ত্র করে পেতে, কিন্তু এখন আর সে বাসনা তার নেই। বিশেষ করে যেদিন থেকে জানতে পেরেছে সরোজের উপর লীলার দুর্বলতার কথা, প্রমীলা অতি সন্তর্পণে ওদের মাঝখান থেকে সরে আসতে চেয়েছে। কিন্তু পেরেছে কি? ঐ একটা প্রশ্নই প্রমীলাকে ভাবিয়ে তোলে। সত্যিই যদি লীলার সঙ্গে সরোজের কোন মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে, ও কি খুশী মনে তা নিতে পারবে?

সেদিন সরোজ বারোটার কিছু পরে ফিকে ছাই রঙের সুট পরে হ্যাম্পস্টেডের ফ্ল্যাটে এসে দেখে প্রমীলা ঘর দোর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে লাঞ্চের আয়োজন করতে ব্যস্ত। যে সিল্কের শাড়ী পরে সে বাইরে বেরিয়েছিল সেটা এখনও ছাড়া হয়নি, এতক্ষণ কাজকর্ম করে এলোমেলো হয়ে গেছে, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, সরোজকে অভ্যর্থনা করে বলল, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি আরও পনের মিনিট দেরী করে আসবেন, ততক্ষণে আমি নিজে তৈরী হয়ে নিতাম।

সরোজ হাসতে হাসতে বলে, কি করে জানব তোমার রূপচর্চা এখনও হয়নি।

—বাঃ, আপনি তো সবজান্তা, প্রমীলার কথাটা যেন একটু ধারালো শোনায়।

—বেশ তো, তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমি বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি।

—বেশ দেরী হবে না, আমি একটা টোমাটোর স্যুপ এনেছি। দু' প্যাকেট ফ্র্যাঙ্কফার্ট সসেজ আছে, কিছু সালোম, আর একটা ফ্রুট স্যালাড এনেছি, এতেও যদি আপনার পেট না ভরে আমি নাচার।

সরোজ কপাল কুঁচকে বলে, ওরে বাবা, তুমি তো পাকা গিন্নীর মত আয়োজন করেছ দেখছি, বলতো আমি তোমার রান্নাঘরে সাহায্য করতে পারি।

প্রমীলা খাবার টেবিলে ডিশগুলো রাখতে রাখতে উত্তর দেয়, তার দরকার হবে না, বিশেষ করে অমন সুন্দর স্যুটটা পরে এসেছেন, রান্নাঘরে ঢুকে নষ্ট হলে আফসোস হবে।

সরোজ খুশী হয়ে নিজের স্যুটটা দেখে, এটা নতুন করালাম, তোমার ভাল লেগেছে?

প্রমীলা সরোজকে ভাল করে দেখে, রঙ চমৎকার, কাটটা আপনাকে মানিয়েছে,

তবে বাটানহোলে একটা লাল ফুল গোঁজা উচিত ছিল।

সরোজ হাসে।

পনের মিনিটের জায়গায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ওপর সরোজকে একলা খবরের কাগজ পড়তে হল। মাঝে প্রমীলা যে এঘরে আসেনি তা নয়, তবে দু' একটা জিনিস টেবিলে রেখে দ্রুত ফিরে গেছে রান্না ঘরে। সরোজের মনে হল প্রমীলার স্বাভাবিক চঞ্চলতাও যেন হ্রাস পেয়েছে। অথচ আজ সকালবেলা টেলিফোনে প্রমীলার গলা শুনে মনে হয়েছিল ও বিশেষভাবে উত্তেজিত, ভেবেছিল আজ সে সরোজকে ডেকেছে বিশেষ কোন কথা বলার জন্যে, মনে মনে তার জন্যে যে শঙ্কিত হয়নি তা নয়, নানারকম কল্পিত প্রশ্নের সুচিন্তিত উত্তর সে তৈরী করে এ বাড়িতে ঢুকেছিল। তাই প্রমীলার এই সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারে সে বিস্মিত না হয়ে পারেনি। হয়তো খানিকটা হতাশও হয়েছে। মানুষ যখন মনে করে কোন নাটকীয় মুহূর্তের সে সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তখন তা না ঘটলে কেমন যেন বিস্বাদ লাগে।

খেতে বসেও প্রমীলার ব্যবহারে কোনরকম পরিবর্তন সে লক্ষ্য করল না। সরোজকে জোর করে খাওয়াল, নিজে খেল, হাসি ঠাট্টাও করল যেমন সে করে।

থাকতে না পেরে সরোজ নিজে থেকেই কথা পাড়ে, কেন জানি না প্রমীলা আজ আমার মনে হয়েছিল তুমি বোধহয় কোন বিশেষ কথা আমাকে বলতে চাও।

প্রমীলা কপট বিস্ময়ের ভান করে, হঠাৎ এ ধারণা হল কেন?

—হয়তো আমারই বোঝবার ভুল।

প্রমীলা একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিজের মনেই হাসল।

—হাসছ যে?

প্রমীলা ব্যঙ্গ করে বলে, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে, তাই না?

সরোজ মৃদু হাসে, তুমি সত্যিই দুষ্টু।

এবার প্রমীলা শব্দ করে হাসে, হাসিটা শুনতে ভাল লাগে না। বলে, সরোজদা, আপনি বোধহয় ভেবেছিলেন আজ আপনাকে একলা ডেকে, আপনার সহানুভূতি পাবার আশায় কতগুলো মন গড়া দুঃখের কাহিনী শোনাব।

সরোজ কোন জবাব দেয় না।

—আমি আপনাকে হতাশ করেছি, তাই না সরোজদা?

সরোজ এ ধরনের কথাবার্তায় অস্বস্তি বোধ করে, তবু গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ, জীবনটাকে বুঝতে পারোনি। মনের মধ্যে পুষে রেখেছ কতকগুলো কমপ্লেক্স, সেইজন্যেই বোধহয় কষ্ট পাও।

প্রমীলা তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করে, আমার আবার কষ্ট কোথায় দেখলেন?

সরোজের কেমন রোখ চেপে যায়, তুমি হলপ করে বলতে পারো তুমি মনের মধ্যে কষ্ট পাও না? মনে কর না এ পৃথিবীতে তুমি একলা? বন্ধবান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ তোমার নেই?

প্রমীলা সদম্ভে বলে, ঐ সব ফ্রয়েডিয়ান থিওরীর চকমকি ঠুকে আপনার অন্য বান্ধবীদের কাছে হয়ত নাম কিনতে পারবেন, তবে আমার কাছে তা' চেষ্টা করবেন না।

সরোজ অবাক হয়ে প্রমীলাকে দেখে, বলে, কি হল? এত উত্তেজিত হয়ে উঠছ কেন?

—কই না, আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

—তোমাকে আগে কখনও এতটা চটে যেতে আমি দেখিনি।

—তার কোন কারণ ঘটেনি আগে।

—আজই বা এমন কি ঘটল যার জন্যে—

প্রমীলার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে, ঘন ঘন নিশ্বাস নেয়, বলে, সরোজদা, আমি জানি পুরুষ মানুষ দরকার হলেই ন্যাকা সাজে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি সেটা আশা করিনি, ভেবেছিলাম সাধারণ ভেড়ার পালের চাইতেও আপনি ওপরে।

বিস্মিত সরোজ থেমে থেমে বলে, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছো না তুমি কি বলছো।

—আপনি আমায় যতটা খুকী মনে করেন আমি তা নই। লেখাপড়াও শিখেছি, বুদ্ধিও আছে। এতদূর বলে প্রমীলা থেমে যায়, স্থির দৃষ্টিতে গেলাসের তলানি জলটার দিকে দেখে বলে, আপনি বলছিলেন আমি একা, যদি তাই হই, কার কি এসে যায়। এ সংসারে কারুর জন্যে অপেক্ষা করার সময় নেই, এগিয়ে যেতে হবে কোথায়, কেউ জানে না। কে একলা পড়ে রইলো তার খবর নেবার সময় কোথায়?

সরোজ উৎসাহের সঙ্গে বলে, তুমি আমাকে বুঝতে পারনি প্রমীলা। আমি বলতে চাইছিলাম অনেক সময় আমরা ভুল করি। মনে করি আমি একলা, আমি নিঃস্ব, আসলে হয়তো তা সত্যি নয়, অথচ সেই জন্যে আমরা দুঃখ পাই, যে রকম আজ তুমি পাচ্ছো।

প্রমীলা সহ্য করতে পারে না, চোখ বুজে ফেলে, কাঁপা গলায় বলে, দুঃখ পাই নিজে স্বার্থপর হতে পারি না বলে। অন্যের কথা যদি ভাবতে না হত, তাদের কষ্ট দেখেও যদি এড়িয়ে চলে যেতে পারতাম তাহলে আর আমার কোন দুঃখ ছিল না সরোজদা। এ আত্মবঞ্চনার দরকার হত না, পরতে হত না মিথ্যের মুখোশ, 'যা চাই' তাকে বলতে হত না 'চাই না'।

সরোজ ইতস্তত করে বলে, আজ বরং এ প্রসঙ্গ এইখানেই বন্ধ থাক প্রমীলা।

প্রমীলা সে কথা কানে তোলে না, ঠিক আগের মতই বলে যায়, সবচেয়ে ট্র্যাজেডী কোথায় জানেন সরোজদা, যাকে ভালবাসি সে যদি অবুঝ হয়, সে যদি বুঝতে না পারে, অজান্তে সে আমার আনন্দের সব কটা বাতি নিবিয়ে দিচ্ছে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমার জীবনে ঐ রকমই ঘটছে, আপনাকে রমেনের কথা বলেছি, পুলকেশের কথাও গোপন করিনি। কিন্তু কেন আমি তাদের সেদিন ছেড়ে দিলাম, শুধু কি মিল খুঁজে পেলাম না বলে। তা নয়, এখন কত সময় পুলকেশের চোখের জলের কথা আমার মনে পড়ে, সে যে আমাকে সত্যিই ভালবেসেছিল। তবু কেন নির্দয় হয়ে সরে এলাম, লোকে মনে করল ফ্লার্ট, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি তা নই।

সরোজের কৌতূহল জাগে, তবে তুমি ওর কাছ থেকে সরে এসেছিলে কেন?

প্রমীলার মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি, যেদিন জানতে পারলাম লীলাও মনে মনে পুলকেশকে ভালবাসে।

—সেকি?

—লীলার সুবিধে ও অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, রাত্রে আমরা এক খাটে শুতাম, ও বলে যেত ওর মনের কথা, আমি শুনতাম। অগত্যা আমাকে সরে আসতে হল।

সরোজ চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করে, তাহলে লীলার সঙ্গেই বা পুলকেশের বিয়ে হল না কেন?

প্রমীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হয়ত পুলকেশ ওকে পছন্দ করেনি, তাছাড়া লীলাও আমাকে সরে আসতে দেখে নিজেও সরে এল। আপনি তো জানেন, ওর নিজের কোন মতামত নেই।

—লীলাও কি একথা জানে?

—না। আমি তাকে জানতে দিতে চাই না। জানি এতে বিপদ অনেক। ভুলের পুনরাবৃত্তি আগেও ঘটেছে, আজও ঘটছে, তবু আমি ওকে জানাব না, নিজেই ওর জীবন থেকে সরে যাব। ও বড় অসুখী সরোজদা, কতজনের সঙ্গে মেশে, কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু ও পায় না, কেন তা বলা শক্ত। আমাকে ও ভালবাসে, নিজের বোনের চাইতেও আরও বেশী মনে হয়। আমি তার এই বিশ্বাসের দাম যেন কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

সরোজ অবাক হয়ে দেখল প্রমীলার চোখ দিয়ে আজ জলের ধারা নেমে এসেছে, কোনরকম গোপন করারও সে চেষ্টা করল না।

সরোজ উঠে গিয়ে প্রমীলার পিঠের ওপর আলতো করে হাত রাখে, প্রমীলা কান্না ভেজা গলায় বলে, আপনাকে অনুরোধ করব, এ কথাগুলো ভুলে যেতে। দু'-দিনের আলাপ। এ বিরাট সংসারে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ব জানি না, যদি খুব অসম্ভব না হয়, যদি লীলার দায়িত্ব আপনি নেন, আমি সর্বান্তঃকরণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি আপনাদের সুখী করবেন।

তখনও মারিয়ার শো শেষ হয়নি।

এইবার তার শেষ নাম্বার। ড্রেসিংরুমে ও একলা বসে, অন্য মেয়েরা এখন স্টেজে। মাঝারি সাইজের সাজঘর। দোতলায়। এর ঠিক নিচেই স্টেজ। ছোট মঞ্চ, পাশে উইংস রাখারই জায়গা নেই তো আবার গ্রীনরুম! তাই শিল্পীদের নাচ শেষ করেই সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে হয়। ছেলেমেয়েদের আলাদা সাজবার ব্যবস্থা নেই, অবশ্য ওদের কোম্পানীতে ছেলে মাত্র একজন, মেয়েরা সংখ্যায় দশ। ছেলেটির নাম বিল, ভাল গান করে। সবচেয়ে বেশী মাইনে পায়।

বিলকে মেয়েদের লজ্জা করে না, ওর সামনেই তারা জামা কাপড় বদলায়। অবশ্য যারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিত্য নূতন দর্শকের সামনে বিবস্ত্র হয় তাদের আবার সাজঘরে একলা পুরুষের সামনে লজ্জা কি?

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল মারিয়া। আর দশ মিনিটের মধ্যে ওকে মঞ্চে নামতে হবে চীনে মেয়ে সেজে। আয়নার সামনে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আরও কালো করে ভুরুগুলো টানছিল। এ নাচের সময় মাথায় মারিয়া পরচুলো পরে। প্রাচ্যের ধরনে কুচকুচে কালোচুল মাথায় পরে নিজেকে দেখতে ওর বেশ ভাল লাগে।

মাইকেল ঘরে ঢুকলো। মাইকেল স্টেজ ম্যানেজার, অল্প বয়েস, মার্কিনী ধরনে সোনালী চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। বললে, মারী, মিঃ উইলিয়াম তোমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছেন।

মারিয়া আয়নার দিকে চোখ রেখে উত্তর দেয়, বুড়ো আবার জ্বালাতে এসেছে। মাইকেল হাসে, তোমাদের বোঝা ভার। কেউ এসে অপেক্ষা করছে শুনলেই বিরক্ত হও অথচ দেখি তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাচ্ছ।

মারিয়া সে কথায় কান দেয় না, ও বুড়ো তিনবার বিয়ে করেছে, দুটো বুঝি ডিভোর্স, একটা মরে গেছে। রোজই উলটো পালটা হিসেব বোঝায়, অথচ আশ্চর্য,

এখনও মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়।

—নিশ্চয় অনেক টাকা আছে।

—হয়ত হবে। মারিয়া উঠে পড়ে, মাইক, ওকে বলে দাও অপেক্ষা করতে, আমি শেষ নাচটা সেরে আসছি। বুড়োর পয়সায় আজ বেশ করে পান করা যাবে।

তারা দুজনে হাসে।

শুধু যে এ ক্লাব-থিয়েটারের মঞ্চ ছোট তা নয়, দর্শকদের বসবার আসনও বেশী নয়, বোধ হয় শ' খানেক হবে। তবে যে কেউ টিকিট কেটে ঢুকে এখানকার শো' দেখতে পারে না, প্রথমে তাকে এক গিনি দক্ষিণা দিয়ে এ ক্লাবের সভ্য হতে হবে। তবেই সে দশ শিলিং দামের টিকিট কেনার অধিকার পাবে। এখানে শো' আরম্ভ হয় দুপুর দুটো থেকে, চলে রাত এগারোটা পর্যন্ত। একটা শো শেষ হতে সময় লাগে দু' ঘণ্টা, অর্থাৎ সারাদিনে এখানে শো' হয় পাঁচটা। কোন সময়ই একটি সিট খালি পড়ে থাকে না। এ ক্লাবের সভ্যসংখ্যা তিরিশ হাজারের ওপর, তাই থেকেই বোঝা যায় এখানকার জনপ্রিয়তা কতখানি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কিন্তু লণ্ডনে এ ধরনের ক্লাব-থিয়েটার ছিল না। নগ্ন মেয়েদের নাচ দেখার জন্যে সাধারণ রঙ্গালয় থাকলেও সেখানে বিবস্ত্র মেয়েদের চলাফেরা করার হুকুম ছিল না। তাই তারা স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকত। প্যারিসের অনুকরণে এ ধরনের শো' চালু হলেও তার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। পৃথিবীর চারিদিক থেকে দর্শক যেমন যেত প্যারিসের ক্যাসিনো আর ফলিবারজের দেখতে, সেইরকম লণ্ডনের লোকেরাও ছুটি পেলেই ওইখানেই ছুটত।

এই ক্লাব-থিয়েটারগুলো সেই অভাব অনেকখানি পূরণ করেছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের কড়াকড়ি নিয়মের আওতায় এরা পড়ে না। এখানে বিবস্ত্র মেয়েরা ঘুরে ফিরে বেড়ায়, নেচে গেয়ে দর্শককে অভিভূত করে। প্যারিসের এ ধরনের শো'তে আছে প্রচণ্ড জাঁকজমক, আছে সূক্ষ্ম রুচির পরিচয়। খানিকক্ষণ দেখার পর দর্শকের মনে হয় না এর মধ্যে কোথাও অস্বাভাবিকত্ব আছে। যেমন মনে হয় না রেনেসাঁস যুগের চিত্রকলা আর স্থাপত্য দেখলে। সুন্দরের পূজারী ফরাসী জাত, নারীদেহের অসামান্য সৌন্দর্যকেই ফুলের মত ফুটিয়ে তোলে দর্শকের সামনে। কিন্তু লণ্ডনের ক্লাব-থিয়েটার প্যারিসের শো-এর অনুকরণে হলেও, অনুষ্ঠানের সে উৎকর্ষ এখানে থাকে না। মার্কিন মিউজিক্যাল কমেডির ধরনে এখানে ছোট ছোট নাচ গান হয়, বেশীর ভাগই আধুনিক জীবনযাত্রার ওপর কটাক্ষ করা হাসির গান, তার সঙ্গে মেশানো হয়েছে প্যারিসের শো'-এর নগ্নতা। এ এক বিচিত্র কক্‌টেল। এর মার্কিনি নাম 'স্ট্রিপ্‌টিস্‌'; এর যৌন আবেদন মারাত্মক।

মারিয়া মঞ্চে ঢুকল চীন দেশের মেয়ে সেজে, বিচিত্র তার বেশ। সঙ্গে একটা কারুকার্য করা লণ্ঠন। আগে থেকে পিয়ানো বাজছিল, মিষ্টি গলায় মারিয়া গান ধরলো, হাজার লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় ভরা এক নির্জন রাস্তায় সে এক অনভিজ্ঞা ষোড়শী চীনা মেয়ে। সংসারের মারপ্যাঁচ সে কিছু বুঝত না, জানত না আলো হাতে নির্জন রাস্তায় দাঁড়াবার অর্থ কি, কত লোক এলো গেলো, কত কথা বললো, কিন্তু সে তার কিছুই বুঝতে পারেনি। শেষকালে তার সামনে এসে দাঁড়ালো এক সুদর্শন মার্কিন সৈন্য, সে কেমন করে যত্ন নিয়ে শেখালো তাকে যৌবনের ভাষা। গানের প্রত্যেকটি পংক্তির সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া অভ্যস্ত হাতে খুলে ফেলছিল তার দেহের এক একটি আবরণ। সবশেষে পূর্ণ নগ্ন দেহে, হাতে লণ্ঠন তুলে নিয়ে সে

যখন যৌবরাজ্যে প্রবেশ-এর অছিলায় ধীর পদে হাস্যমুখর ভঙ্গীতে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল, দর্শকদের ঘন ঘন করতালিতে মুখর হয়ে উঠল প্রেক্ষাগৃহ।

সাজঘরে মেক্‌আপের রঙ্‌ তুলে নিজের জামা কাপড় পরে বেস্‌মেণ্টের 'বারে' নামতে নামতে মারিয়ার আরও আধ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। তখনও মিঃ উইলিয়াম কোণের সোফাটায় বসে। পাশে আধ খাওয়া হুইস্কির গেলাস, হাতে একটা ছবির পত্রিকা। মারিয়াকে দেখে মিঃ উইলিয়াম স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে পাশে বসালেন। মামুলী দু' চারটা কথাবার্তার পর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জন্যে কি পানীয় অর্ডার দেব? মারিয়া যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, হেসে বললে, হুইস্কি সোডা।

পান করতে করতে ওরা গল্প করে। ঠিক গল্প নয়, মিঃ উইলিয়াম বলে যাচ্ছেন, মারিয়া শুনছে। এক কথা, যে আসে সেই এ ধরনের কথা বলে, কোন বৈচিত্র্য নেই। প্রথম প্রথম মারিয়ার অস্বস্তি হতো কিন্তু আজকাল আর অসুবিধে হয় না, সে অভিনেত্রী হয়ে গেছে। এক দৃষ্টে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁত দিয়ে হাসে, মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে, কিন্তু কান দিয়ে শোনে না। ও তখন অন্য কথা ভাবে।

মিঃ উইলিয়াম বলছিলেন, মাই ডিয়ার, জান, আমি এই শো'টা চোদ্দবার দেখেছি, শুধু তোমাকে মঞ্চে দেখবার জন্যে।

মারিয়া দুষ্টুমি করে বলে, অন্যদের সময় বুঝি চোখ বুজে থাকো?

—বিশ্বাস কর আমি উঠে চলে আসি, বারে বসে ড্রিঙ্ক করি, আর কোন মেয়েই তোমার পাশে দাঁড়াতে পারে না।

—তাই নাকি? লোকে তো বলে লিলিয়ান সবচেয়ে সুন্দরী, বলতে গেলে ও এ কোম্পানীর হিরোইন।

—লিলিয়ান? মিঃ উইলিয়াম হেসে পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকটা পরিষ্কার করেন, নুন না দেওয়া রান্নার মতই ওকে আমার বিস্বাদ মনে হয়।

মারিয়া খিল খিল করে হাসে, এটা কিন্তু নতুন কথা শুনলাম।

মিঃ উইলিয়াম একটা বড় চুমুকে গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কি শেষ করে বলেন, যাই, আরও দুটো হুইস্কি নিয়ে আসি।

মারিয়া বাধা দেয়, আমার জন্যে পিঙ্ক্‌ জিন।

এর আগে মারিয়া তিনটে বড় হুইস্কি খেয়েছে, তারপর হঠাৎ পিঙ্ক্‌ জিনের অর্ডার দিতে মিঃ উইলিয়াম ভুরু ওপরে তুলে জিগ্যেস করলেন, ড্রিঙ্ক মিশিয়ে ফেললে তোমার শরীর খারাপ হবে না তো?

মারিয়া হাসলো, আমার অভ্যাস আছে।

মিঃ উইলিয়াম একবার কাঁধটা ঝাকিয়ে পানীয় আনতে 'বারম্যানে'র দিকে এগিয়ে যান।

মারিয়ার আজ পান করতে বেশ ভাল লাগছে। বিশেষ করে বুড়ো উইলিয়ামের সঙ্গে বকর বকর করা এক যন্ত্রণা। ক'দিন আগে পর্যন্ত ঐ বুড়ো লিলিয়ানের পেছনে ঘুরে বেড়াত, বোধ হয় সেখানে বিশেষ পাত্তা না পেয়ে মারিয়ার দিকে ঝুঁকেছে। মারিয়ার মনে হয়, এ ধরনের লোকগুলো নির্লজ্জ বেহায়া, প্রৌঢ়ত্বের পাসপোর্ট হাতে নিয়ে তরুণী মহলে 'বিলাভেড্‌ পাপা' সেজে মজা লুটে বেড়ায়। অবশ্য একথাও মনে হয়, শুধু উইলিয়ামকে দোষ দিয়ে কি হবে, নারীত্বে উপনীত হবার পর থেকে মারিয়া বুঝেছে সব পুরুষ মানুষই সমান, বিশেষ করে ক্লাব-থিয়েটারে নাচতে এসে

তার এই ধারণা আরও বদ্ধমূলে হয়েছে। রাতের পর রাত তারা এখানে শো দেখতে আসে। বেশীর ভাগই বিবাহিত স্বামীর দল। পাছে স্ত্রীরা জানতে পারে তাই দুপুরবেলা দুটোর সময় লাঞ্চ খাবার নাম করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে ঢোকে এসে ক্লাব থিয়েটারে, আবার অফিসে যায় চারটের সময়। সেখান থেকে যথাসময়ে সন্ধ্যের পর যখন বাড়ি ফেরে স্ত্রীর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হয় না। মারিয়ার ভাবতেও ঘেন্না হয়, দাম্পত্য জীবনের এ কী মর্মান্তিক প্রহসন!

মিঃ উইলিয়াম হাতে করে পিংক্ জিন এনে গ্লাসটা মারিয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে মারিয়া প্রথম চুমুক দিল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। এত তাড়াতাড়ি জিনের প্রতিক্রিয়া শুরু হবে মারিয়া ভাবেনি, কিন্তু তার ভাল লাগল, বেশ একটা স্বপ্নালু আবেশ ক্রমশ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। বোধ হয় এই ভাবটা কাটাবার জন্যেই মারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিঃ উইলিয়ামের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তা না হলে বোধ হয় এ প্রসঙ্গ তোলার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সে বলে, মিঃ উইলিয়াম, আমার মনে হয়, স্ত্রীরা সব সময় স্বামীর চেয়ে বোকা।

প্রশ্ন অদ্ভুত, উইলিয়াম বিস্মিত হন, বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিলে বুঝি?

—না, মানে, যে সব স্বামী আমাদের নাচ দেখতে আসে তাদের স্ত্রীরা বুঝতেও পারে না।

উইলিয়ামের মুখে অভিজ্ঞ হাসি, কে বললে? সবই বোঝে, তবে না বোঝার ভান করে আর কি।

—তাতে লাভ?

—বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীকে অনেক সময় মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়।

মারিয়ার কণ্ঠে বিদ্রূপের রেশ, কেন?

—নিজেদের ঘর বাঁচাবার জন্যে।

—ওরকম মিথ্যের ঘর আমি অন্তত চাই না।

উইলিয়াম নীরস কণ্ঠে বলে, তাহলে আর তোমার ঘর বাঁধা হবে না।

মারিয়া অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল রজতের কথা, ভারতবর্ষে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নাকি অনেক সহজ, অনেক দৃঢ়। সেখানে তাদের লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয় না।

কথাটা না বললেই বোধ হয় মারিয়া ভাল করত, শুনেই উইলিয়ামের চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়, তার দেহের সাম্রাজ্যবাদী-রক্ত গরম হয়ে ওঠে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না বলে একথা বলছ।

—কেন?

—এখনও ওটা একটা অসভ্য দেশ, শতকরা নব্বইজন নিরক্ষর মুখ্যু, ওখানকার মেয়েরা সব পর্দানশীন। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেশবার তাদের কোন অধিকার নেই। সেই জন্যেই ওরা সুখী দাম্পত্য জীবনের বড়াই করে। ওদের দেশের মেয়েদের অবস্থা কিরকম জানো? মিঃ উইলিয়াম দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, আগে যেরকম আমাদের দেশে ক্রীতদাসী ছিল, সেই রকম।

মারিয়া অস্বীকার করে, ওকথা আমি বিশ্বাস করি না, এমন কয়েকজন ভারতীয় ছেলেমেয়েকে আমি চিনি, যাদের সঙ্গে আলাপ করতে সত্যিই ভাল লাগে।

—তারা কেউ সত্যিকারের ভারতীয় নয়, লন্ডনে থেকে, এখানে লেখাপড়া শিখে

তারা আমাদের ধরন-ধারনকে পুরোপুরি নকল করে চলে।

মারিয়ার আর তর্ক করার ইচ্ছে হল না, সে চুপ করে যায়।

মিঃ উইলিয়ামও নিজেকে সংযত করেন, রাগ করে কথা বলার জন্যে আমি দুঃখিত। একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করেন, আর-একটা পিঙ্ক জিন নিয়ে আসি?

—না থাক।

উইলিয়াম দুঃখিত হয়, তাহলে বুঝব আমার কথায় তুমি বিরক্ত হয়েছ।

মারিয়া হেসে ফেলে, বেশ আর-একটা, তারপর আমায় উঠতে হবে।

—বলতো আমি গাড়ি করে তুমি যেখানে যেতে চাও নামিয়ে দিতে পারি।

মারিয়া মিথ্যা বলল, না, আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি।

—ও, আচ্ছা।

মিঃ উইলিয়াম আবার ড্রিংক আনতে গেলেন।

মিঃ উইলিয়ামকে এড়াবার জন্যেই মারিয়া মনে মনে রজতের কথা ভেবে বলেছিল একজনের জন্যে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু পিঙ্ক জিনের এমনই মজা, নেশা ধরার সঙ্গে সঙ্গে রজতের আসার কথাটাও যেন বিচিত্রভাবে জড়িয়ে গেল। মারিয়ার মনে হতে লাগল, সত্যি সে আসবে। উইলিয়াম বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরও সে খানিকক্ষণ বসে রইল বারে। কিছুতেই সে মনে করতে পারল না, সত্যিই এখানে রজতের আসবার কথা আছে, না নেই। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে পড়ল। বুকিং অফিসের মেয়েটিকে বলে গেল, রজত এসে খোঁজ করলে সে যেন বলে দেয় মারিয়া বাড়ি চলে গেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে মুক্ত বায়ুর স্পর্শে মারিয়ার অনেকটা নিজেকে ঝরঝরে মনে হল। বেশ রাত হয়েছে। যদিও লন্ডনের এ অঞ্চলে, অর্থাৎ পিকাডেলীর আশেপাশে রাত্রের বয়স বোঝার কোন উপায় নেই। রাস্তার চারদিকে আলো, দোকানের উজ্জ্বল জানলা, তার ওপর চতুর্দিকে আলোর বিজ্ঞাপন। বেশ লাগছে দেখতে। বভরিল জ্বলছে নিবছে, তার পাশে গিনিস্ টাইম। উল্টো ফুটপাথের দোতলায় রিঙলে, রাতের পর রাত এরা জেগে থাকে। নতুন লোকদের চোখে বিস্ময় জাগায়, শহরের নানা প্রলোভনের মধ্যে এদেরও নাম করা যায়।

ধীর মন্থর গতিতে মারিয়া এগিয়ে চলল, সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে। কোথায় সে যাবে, তার ঠিক নেই, কেন সে চলছে বলতে পারে না। তবু সে চলল, জনস্রোতকে এড়িয়ে, বড় রাস্তা পার হয়ে, অপেক্ষাকৃত নির্জন গলির মোড়ে এসে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। না, দুটো পিঙ্ক জিন তার পক্ষে একটু বেশী হয়ে গেছে। তার ওপর একেবারে খালি পেট, এখুনি তার কোথাও ঢুকে খাওয়া উচিত, নয়তো বাড়ি ফিরে গেলে ভাল। এতক্ষণে তার খেয়াল হল, এ কোন রাস্তায় এসে সে দাঁড়িয়েছে, না, এ-রাস্তা তার অচেনা নয়। যুদ্ধের সময় 'সোহো'র রেস্তরাঁয় ও যখন কাজ করত, কতদিন মারিয়া এ-গলি দিয়ে শর্টকাট করেছে।

মনে হল দূর থেকে কে যেন আসছে ফুটপাথের ওপর খট খট করে, তার নালওয়ালা জুতোর শব্দ হচ্ছে। মারিয়া চোখটা টেনে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল, রজত নয়ত। তার পরেই ভাবল, তা কি করে হবে, রজত তো ওরকম জুতো পরে না। আগের গ্যাস পোস্টের আলোয় সে এবার আগন্তুককে দেখতে পেল, কালো পোশাক-পরা একজন পুলিস।

রজত নয় দেখে মারিয়া প্রথমটা হতাশ হল। কিন্তু তার পরেই সন্দেহ হতে

লাগল, পুলিসটা ওর কাছেই আসছে নাতো? মারিয়ার হাসি পেল, কে জানে হয়ত মারিয়াকে ভেবেছে কোন পুরুষ-শিকারী মেয়ে, রাস্তার ধারে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি এসে জিজ্ঞেস করবে, কার জন্যে মারিয়া এই নির্জন জায়গায় অপেক্ষা করছে। নাঃ, খেতে যাওয়া আর হলো না; তার চেয়ে বাড়ি ফেরাই সমীচীন। পুলিসকে পেছনে রেখে মারিয়া আগে আগে চলতে শুরু করল। তার খট খট জুতোর শব্দ কানে ঠিক ভেসে আসছে। মারিয়ার মাথায় হঠাৎ দুষ্টুমি বুদ্ধি চেপে বসল, ইচ্ছে করেই এ-গলি থেকে ও-গলি ঘুরতে লাগল। পুলিস তখনো আসছে। কিছুক্ষণ পরে দু-তিনটে মোড় ঘুরে মারিয়া এসে পেঁছিল স্যাফটস্‌বেরী এভিন্যুতে। অল্পক্ষণের জন্যে থেমে ভাবছিল, ডান দিকে যাবে, না বাঁদিকে। এমন সময় সামনের একটি ভারতীয় ছেলেকে দেখে তার মনে হল চেনা। এতটুকু ইতঃস্তত না করে জিজ্ঞেস করলে, মিঃ লাহিড়ী না?

সৌরেন আগে থেকে মারিয়াকে দেখতে পেয়েছিল, যদি চিনতে না পারে, এই ভয়ে নিজে গিয়ে কথা বলেনি, খুশী হয়ে বললে, কি খবর মারিয়া। কিরকম আছ তোমরা? রজত কোথায়?

মারিয়া জবাব দিলে, ওর কথা বলো না, কতক্ষণ অপেক্ষা করছি, এখনও এল না।

—তাহলে কি করবে?

—আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে, কোন একটা রেস্তরাঁয় ঢুকব। যদি তোমার সময় থাকে মিঃ লাহিড়ী, চল না তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।

যদিও সৌরেনের হাতে কোন কাজ ছিল না, তবু এ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত হবে কিনা ভাবছিল। কারণ বিশেষ কিছু তার ব্যাগে ছিল না।

মারিয়া যেন বুঝতে পেরেই বলে, আজ আমি মাইনে পেয়েছি, ঠিক করেছিলাম রজতকে খাওয়াব, ও যখন এল না তোমাকে নিয়ে খেতে যাই। শুনে রজত মনে-মনে নিশ্চয় ঈর্ষা অনুভব করবে।

সৌরেনকে আর কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে মারিয়া তার বাঁ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে পুরে হাঁটতে শুরু করে।

কথা বলতে বলতে ওরা চলে, পুলিসম্যানের সামনে এসে মারিয়া সকৌতুকে তার মুখের দিকে তাকায়।

মনে হল পুলিসটাও মুচকি হাসল। ভগবান জানে সে কি ভাবছে।

প্রথম দিন রজত সৌরেনকে নিয়ে 'সোহো'র যে রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছিল, সেখানকারই বেস্‌মেন্টের একান্তে বসে ওরা গল্প করছিল, খাচ্ছিল দুটো গরম বীফ স্টেক, আর খানিকটা আলুসেদ্ধ, কথা বলছিল অনর্গল, অবশ্য মারিয়াই বেশী। সৌরেন হাঁ, না, ছাড়া বিশেষ কথা বলার সুযোগ পায়নি। আজ মারিয়াকে তার ভাল লাগছিল, শুধু যে তার সাজ-পোশাকই অন্য দিনের চেয়ে রুচিসঙ্গত তাই নয়, ওর কথাবার্তার মধ্যেও অনেকখানি হৃদ্যতার আভাস। এর আগে মনে হত, মারিয়া ইচ্ছে করেই সৌরেনের সঙ্গে অনেকখানি দূরত্ব রেখে কথা বলত, কিন্তু আজ তার চোখে-মুখে হাল্কা খুশীর উচ্ছ্বাস, কথার মধ্যে দিয়ে ওদের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে নেবার চেষ্টা। এতদিন বাদে আজ যেন হঠাৎ মারিয়া মিঃ লাহিড়ীকে বিদায় দিয়ে সৌরেনকে অন্দর মহলে ঢোকবার অনুমতি দিয়েছে।

মারিয়ার এ-পরিবর্তনের কারণ প্রথমটা না বুঝলেও সে যখন সৌরেনের বারংবার

আপত্তি উপেক্ষা করে তার সঙ্গে পিঙ্ক জিন খেতে বাধ্য করল, সৌরেন বুঝল আজ মারিয়ার পানের মাত্রা নিশ্চয় অন্য দিনের চেয়ে বেশী হয়ে গেছে।

মারিয়া হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, ড্রিংক করতে তোমার ভাল লাগছে না?

সৌরেনও হাসবার চেষ্টা করে, আগে কখনও খাইনি কিনা, তাই ভয় করছিল।

—সত্যি সৌরেন, রজত ঠিকই বলে, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ।

—ড্রিংক না করাটাই বুঝি ছেলেমানুষির পরিচয়?

মারিয়া টেবিলের ওপর রাখা সৌরেনের বাঁ হাতটায় মৃদু চাপ দেয়। আগে জীবনটা দেখ, তবে তো সাবালক হবে। লন্ডনে এসেছ, চোখ চেয়ে দেখ, এখানকার মানুষ, এদেশের সমাজ, এ-শহরের বৈচিত্র্য।

সৌরেন বলবার চেষ্টা করে, তাইত দেখি।

মারিয়া খিল খিল করে হাসে, কিছুই দেখনি। রাতে লন্ডনকে তুমি চেন, দেখেছ তার রূপ?

—রাতের লন্ডন?

মারিয়া স্বপ্নালু গলায় বলে, আমার বড় ভাল লাগে, রাত্রি যখন নেমে আসে লন্ডনের ওপর, সারাদিনের লুকিয়ে-রাখা আদিম প্রবৃত্তিগুলো যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। রাত্রি ভয়ঙ্কর, জঙ্গলের মত ভয়াবহ। জঙ্গলে বেরয় পশুরা, তার শিকার ধরার জন্যে, আর শহরে বেরয় মানুষ জীবনকে এক ঘণ্টা বেশী উপভোগ করার আশায়।

কথার মধ্যে দিয়ে মারিয়ার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে, সৌরেন মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে। মারিয়া বলে যায়, আঁধারের রূপকে যদি কখনও ভালবাসতে পার, তখন বুঝতে পারবে 'পলমলে'র অন্ধকারের সঙ্গে বিশপ গেটের রাত্রির অন্ধকারের তফাত কোথায়। বুঝতে পারবে পিকাডেলীর আলো মনের মধ্যে যে মোহের সৃষ্টি করে, তা কেন 'এজওয়ার' রোডের আলোর মধ্যে পাওয়া যায় না। ভাল লাগবে রাত্রের জনস্রোতকে, নারী-পুরুষ, লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়, কর্মব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি পেয়ে সারাদিনে এই প্রথম তারা নিজের ইচ্ছেয় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে বলতে পারে কি তাদের মনের বাসনা। হয়তো ল্যাম্প পোস্টের আলোয় মুখ তাদের ফ্যাকাশে সাদা দেখায়, তবু আমি বলি, এই সময়টুকুর জন্যে তারা সুখী, কারুর অধীন তারা নয়।

সৌরেন মৃদু গলায় বলে, তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি, সত্যি তুমি রাতের লন্ডনকে ভালবাস।

—মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ভাবতে পার সৌরেন তাদের কথা, যারা প্যাঁচার মত রাত্রে জেগে থেকে আমাদের সুখসুবিধের জন্যে কাজ করে। যাতে আমরা সকাল বেলা রুটি পাই, দুধ পাই, খবরের কাগজ পড়তে পারি, তার জন্যে হাজার হাজার লোককে সারারাত্রি ধরে কাজ করে যেতে হয়। এ ধরনের বহু লোককে চেনার আমার সুযোগ হয়েছিল, সেই জন্যেই বোধ হয় ওদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে।

সৌরেন মন থেকে বলে, যদি তোমার সুবিধে হয়, আমি ঘুরতে রাজী আছি।

মারিয়া দুষ্টমি করে হাসে, সে আমার জন্যে নয়ত?

ওর কথার ইঙ্গিতে সৌরেন লজ্জিত হয়ে পড়ে।

—আর-একটা পিঙ্ক জিন আনতে বলি?

—না থাক।

—তোমার আপত্তি না থাকলে আমি খাই।

সৌরেন বাধা দেয়, না, তুমিও খেয়ো না, আজ মাত্রাটা বেশী হয়ে গেছে।

মারিয়া তরল কণ্ঠে হাসে, এইরে, আমার জন্যে তোমার দরদ ক্রমশ বাড়ছে যে দেখছি। দেখ, আবার দুই বন্ধুতে ডুয়েল লড়ো না।

এবার সৌরেনও হাসে, চল একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক।

ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বাড়ির ঠিকানা বলে কোণের দিকে গা এলিয়ে দিয়ে মারিয়া বসে পড়ল।

সৌরেন সহজ হবার চেষ্টা করে ব্যবহারিক গলায় জিজ্ঞেস করে, তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাতো ?

মারিয়া জড়ানো গলায় উত্তর দেয়, না, তবে একটু ঘুম পাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে নিজে থেকেই বলে, সৌরেন তোমাকে একজন মজার লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

—কে ?

—একজন ফ্রেণ্ড আর্টিস্ট।

—ছবি আঁকে ?

—হ্যাঁ, তবে ফুটপাথের ওপর। অসাধারণ ওর অভিজ্ঞতা, আলাপ করলে খুশী হবে।

—নিশ্চয় যাব।

আর কোন কথা হয় না, মারিয়ার চোখ টেনে আসছে, বাড়ির সামনে গাড়ি থামতে ও নেমে পড়ল, সৌরেনকে বাধা দিয়ে নিজে ভাড়া চুকিয়ে বললে, চল ওপরে যাওয়া যাক।

সৌরেন আপত্তি করে, বেশ রাত হয়েছে, আজ থাক, আমি বাড়ি যাই।

—সেকি, রজতের সঙ্গে দেখা করবে না ?

—ও বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

—না, না, আমাদের ফ্ল্যাটে এই তো সন্ধ্যে শুরু হল।

সৌরেনকে নিয়ে মারিয়া ওপরে উঠে এল, চাবি খুলে ঘরে ঢুকলো, ফ্ল্যাট অন্ধকার। বলে, দেখছ তো, তোমার বন্ধু এখনও ফেরেনি।

—আশ্চর্য, এত রাত পর্যন্ত ও কি করছে।

মারিয়া টেবিল ল্যাম্পের আলোটা জেলে দেয়, বলে, রজত তো, নিশ্চয় কোন সাদা চুলের মেয়ে পেয়েছে, তার সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে।

বিস্মিত সৌরেন প্রশ্ন করে, তার মানে ?

—রজত 'ব্লন্ড'দের খুব ভালবাসে।

মারিয়ার কথার ধরন সৌরেনের বড় অদ্ভুত লাগে, এমনভাবে কথা বলছে রজত সম্বন্ধে যেন তার কোন বিশেষ অনুভূতি নেই। নিশ্চিন্তমনে এগিয়ে গিয়ে সে রিং জ্বালিয়ে কফির জল বসাল। কোটটা খুলে রেখে সৌরেনের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি এত ভাবছ সৌরেন ?

সৌরেন চমক ভেঙে বলে, কিছু না তো।

মারিয়া হাসতে হাসতে সৌরেনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, বলে, নিশ্চয় ভাবছ এ কার পাল্লায় পড়লাম। আমাকে নষ্ট না করে বোধ হয় ছাড়বে না।

সৌরেন জবাব দিতে গিয়ে মারিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়, সে চোখে

নারীর আকর্ষণ।

সৌরেন ভয় পায়, ওর গলা শুকিয়ে আসে।

মারিয়া কৌতুক বোধ করে, সৌরেনকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খায়, ওর ঠোঁটে, মুখে, গালে। হতভম্ব সৌরেনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজে একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে দেয়। দুষ্টুমি করে বলে, বুঝতেই পারছি, ঠোঁট দুটো তোমার নিষ্পাপ, অনভ্যস্ত, কিন্তু উত্তাপ কম নয়।

আশ্চর্য, সোফায় শুতে-না-শুতে মারিয়া ঘুমিয়ে পড়ে। সৌরেন ভেবে পায় না সে কি করবে, উঠে যাবে, না আরও বসে থাকবে। ঘুমন্ত মারিয়াকে তার দেখতে ভাল লাগছিল, লোভও যে হয়নি তা নয়, কিন্তু কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় ভয় পাচ্ছিল।

অবশ্য মিনিট দশেকের বেশী এভাবে সৌরেনকে বসে থাকতে হয়নি।

বাড়ি ফিরল রজত, বোধ হয় সে-ও খুব প্রকৃতিস্থ নয়, তবু সৌরেনকে দেখে হাসলে, হাতে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুই কতক্ষণ?

সৌরেন ঘামছিল, উত্তর দেয়, মারিয়ার সঙ্গে 'সোহো'তে দেখা হয়ে গেল।

রজত থামিয়ে দেয়, দাঁড়ালি কেন, বোস।

—আর নয়, অনেক রাত হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরব।

রজত এতক্ষণে মারিয়াকে দেখলে, হেসে বললে, নিশ্চয় বেশী ড্রিঙ্ক করেছে, তা নইলে এত তাড়াতাড়ি ঘুমোবার মেয়ে তো ও নয়।

সৌরেন আর কথা বাড়াতে চায় না, আমি চলি রজত, বাই বাই।

—আর একদিন আসিস। রজত ওর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি পাবি, টিউব এখন বন্ধ হয়ে গেছে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে ফেল, লিপস্টিকের দাগ লেগেছে।

সৌরেন কোন উত্তর দিতে পারে না, মাথা নীচু করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।

রজত শুভরাত্রি জানিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

ক'দিন থেকে রিহার্সাল চলছে পুরোদমে।

না করলেই বা চলবে কেন। সমানের শনিবার শো'। হাউস ঠিক হয়ে গেছে, সেই মত ছাপানো হয়েছে হ্যাণ্ডবিল আর টিকিট। অগত্যা যা হয়ে থাকে, সকলেই এ' ক'দিন উঠে পড়ে লেগেছে। যাতে না প্রযোজক হিসাবে সরোজদার সুনাম নষ্ট হয়।

বিশেষ করে আজকের শনিবার আর কালকের রবিবার কেউ আর কোনরকম এনগেজমেন্ট রাখেনি। সরোজের ফ্ল্যাটের চেহারা পুরোপুরি থিয়েটার পার্টির রিহার্সাল রুমে রূপান্তরিত হয়েছে। দরজা দিয়ে ঢুকে করিডোরের ডান দিকে সরোজের যে শোবার ঘর সেখানে মাটিতে কার্পেট বিছিয়ে প্রায় বারোজন ছেলেমেয়ে চিত্রাঙ্গদার গানগুলো অনুশীলন করছে। তার মধ্যে আছে প্রমীলা, আছে সৌরেন আরও অনেকে। একক সঙ্গীত নিয়ে তো ভয় নেই, যারা গাইতে জানে যেরকম করে হোক শেষ পর্যন্ত গেয়ে যাবে ঠিক, বিপদ হল সমবেত কণ্ঠের গান নিয়ে, এতদিন চেষ্টা করেও কোথায় যে কখন কার বেসুরো গলা বেরিয়ে পড়ছে তা বুঝে শুধরে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ। একমাত্র পারে সরোজ কিন্তু শুধু গানের মহড়া দেখলেই তো তার চলবে না। কিছুক্ষণ বসেই যেতে হচ্ছে ড্রইংরুমে।

সেখানে চলছে নাচের রিহার্সাল। এতদিন পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদার নাচ বাদ রেখেই রিহার্সাল করা হয়েছে, কারণ ওই পার্ট করার মত মেয়ে লণ্ডনে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই সরোজের বিশেষ অনুরোধে নন্দিতা সেন চিত্রাঙ্গদা করতে রাজী হয়েছে। নন্দিতা সেন থাকে প্যারিসে, তার স্বামী ওখানকার দূতাবাসে বড় কাজ করেন। ভারতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের এমন কোন নৃত্য নাট্য নেই যাতে নন্দিতা সেন নাম ভূমিকায় নামে নি, তবে কলকাতায় নয় সবই দিল্লীতে।

গতকাল রাত্রে স্বামীসহ নন্দিতা সেন এসে পৌঁছেছে লণ্ডনে, আছে সরোজের ফ্ল্যাটে। এ সপ্তাহটা রিহার্সাল করে শনিবার স্টেজে নেচে উড়ে ফিরে যাবে প্যারিসে। তারা বড়লোক, যানবাহনের খরচা নিজেরাই বহন করছে বলে সরোজদের পক্ষে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে অসুবিধে হয়নি। শুধু তাই নয়, সত্যি কথা বলতে কি, ও এসে পড়ায় সকলের মনে ভরসা জাগছে এবারের 'চিত্রাঙ্গদা' অন্যান্য বারের শো'-এর চেয়ে ভাল বই খারাপ হবে না।

নিজের চিত্রাঙ্গদা নাচ ছাড়াও নন্দিতা অন্যদেরও নাচ দেখিয়ে দিচ্ছে। লীলার অর্জুন দেখে এতদিন যারা ভয় পাচ্ছিল, নন্দিতার নির্দেশ মত কিছু অদল বদলের পর, তাদের কাছেও লীলার নাচ উপভোগ্য বলে মনে হচ্ছে। অমিতাভর সুন্দর চেহারা দেখে নামানো হয়েছিল মদনের ভূমিকায়। বেচারী অমিতাভ, নাচা তো দূরের কথা স্টেজেও নামেনি কোনদিন, তার ওপর এত'দিন তাকে নাচ শিখিয়েছে লীলা, যে তিনটের বেশী চারটে স্টেপ্ নিজেই জানে না। নন্দিতা আসায় অমিতাভও ভরসা পেয়েছে, তার পায়ের কাজ বন্ধ করে চোখ মুখ আর হাতের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই 'মদন'কে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে নন্দিতা। এতে আর যাই হোক দৃষ্টিকটু কিছু হবে না।

অমিতাভ অনেক সময় হয়ত না পারার লজ্জা ঢাকতে বলেছে, আমাকে নেওয়াই ভুল হয়েছে নন্দিতাদি, আমার দ্বারা এসব হবে না।

নন্দিতা হেসে বলেছে, এই তো বেশ পারছ, তাছাড়া তোমাকে মানিয়েছে চমৎকার।

ওর মনে আরও উৎসাহ দেবার জন্যে সরোজকে বলে, সত্যি সরোজ, অমিতাভ যখন সেজেগুজে মঞ্চে দাঁড়াবে তখন আর চেনা যাবে না। মনে হবে সত্যিই মদন।

এ কথা শুনে অনেকে হাসে। অমিতাভ লজ্জা পায়, কান লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু কথা মিথ্যা নয়। অমিতাভব মতন এমন সুদর্শন যুবক সহজে চোখে পড়ে না। ফর্সা রঙ্, মোমের মতন মোলায়েম শরীর, টানাটানা চোখ, চোখের কালো পাতাগুলো বেশ বড়, ঘন ভুরু, মাঝখানটায় পাতলা হয়ে এসে জুড়ে গেছে। সতেজ কালো চুল। খুব একটা লম্বা না হলেও বড় মানানসই গড়ন। অনেকে তার চেহারাকে, মেয়েলী বলে ঠাট্টা করলেও তার আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে না। তার ওপর বয়স কম বলেই বোধ হয় উৎসাহ প্রচুর। যখনই সময় পায় মদনের পার্ট রপ্ত করার চেষ্টা করে।

খাবার ঘরে মীনাক্ষী সাজ পোশাক তৈরী করার কাজে ব্যস্ত। লণ্ডনে ভারতীয় আধুনিক নাটক করা সহজ হলেও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক, যাতে বিচিত্র বেশভূষার প্রয়োজন তা করা বেশ শক্ত, কারণ মাথার মুকুট, হাতের গয়না, চট্ করে খুঁজে পাওয়া যায় না। শৌখীন থিয়েটারের ড্রেস যে সব কোম্পানী ভাড়া দেয় তাদের কাছে এ ধরনের গয়নাপত্তর থাকে না, অবশ্য চেষ্টা চরিত্র করলে পাওয়া যায় ফিল্ম কোম্পানী থেকে। কিন্তু তার ভাড়া পড়ে প্রচুর। সেই ভাড়া দিয়ে এক রাত্রের

শো' করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

এই জন্যে বোধ হয় মীনাক্ষীর কদর এত বেশী। সে অতি সহজে খানিকটা পীচ্-বোর্ড, কিছু রাংতা আর রঙীন পুঁথি নিয়ে বসে অতি সহজে গয়না তৈরী করে ফেলে। কাছে থেকে দেখলে খুব একটা ভাল না লাগলেও, মঞ্চের আলোয় সত্যিই তাদের চেনা যায় না, মনে হয় মহামূল্য অলঙ্কার। সিল্কের রঙীন শাড়ী, মেয়েদের অনুরোধ করলে যত খুশি পাওয়া যায় তা নিয়ে কাজ করতে মীনাক্ষী কোনদিন অসুবিধে বোধ করেনি। কিন্তু যা পাওয়া যায় না তা হোল সুতীর শাড়ী। খুব কম মেয়েই লন্ডনে সুতীর শাড়ী ব্যবহার করে, কাচা মুশকিল, ইস্ত্রি রাখাও শক্ত। তাই সুতীর শাড়ী দরকার পড়লে মীনাক্ষী ছেলেদের কাছ থেকে ধুতি চেয়ে নিয়ে রঙে ছুপিয়ে নেয়। অনেক ছেলেই তাদের গরম পোষাকের সঙ্গে অন্তত এক সেট ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে যায়। বোধ হয় মনে করে কোন পুজোর দিন পরবে কিংবা তাদের জাতীয় সাজের বৈচিত্র্য অন্যদের দেখাবে। হয়তো জাহাজে যেতে যেতে ফ্যান্সী ড্রেস পার্টিতে কেউ পরেও, কিন্তু লন্ডনে পৌঁছে ব্যবহার করার আর সুযোগ হয় না। বাক্সয় ভরা থাকে। তাই মীনাক্ষীর মত কেউ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাইলে সাগ্রহে তারা এগিয়ে দেয়।

মীনাক্ষী একলা কাজ করতে পারে না, তাকে অনবরত যোগান দেবার জন্যে কোন একজনকে পাশে বসতে হয়। আজ ওর সঙ্গে কাজ করছিল ডোরিয়া, সেও ফিকে সবুজ রঙের শাড়ী পরেছে, কপালে একটা ঘন সবুজ টিপ এঁকেছে। এখন ভারতীয় কাউকে কাছে পেলেই ডোরিয়া ভারতবর্ষ নিয়ে কথা বলে। আর ক'দিন বাদেই সে যে ভারতের মাটিতে পা দেবে, তা ভেবে আনন্দে অধীর হয়ে আছে। কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তার উচ্ছল প্রকাশ।

ডোরিয়া জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মীনাক্ষী কলকাতায় অনেক পার্ক আছে, না? মীনাক্ষী কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, আছে, তবে লন্ডনের মত এত বেশী নয়। —জয় বলে ওদের বাড়ির কাছে খুব বড় একটা লেক আছে, আমরা রোজ ওখানে বেড়াতে যাব। জল দেখতে আমি খুব ভালবাসি, আর ফুল।

মীনাক্ষী দাঁত দিয়ে একটা সুতো কেটে বলে, জল দেখতে ঠিকই পাবে তবে ফুল আছে কি না বলতে পারি না।

—কেন?

—খুব কড়াকড়ি না থাকলে ফুল ফুটলে লোকেরা ছিঁড়ে নিয়ে যায়। ডোরিয়া আরও বিস্মিত হয়, তাতে কি লাভ?

মীনাক্ষী হাসে, ডোরিয়া তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। তবে যা ঘটে তাই বললাম। কলকাতা সম্বন্ধে তোমার কতটা ধারনা আছে জানি না। লন্ডনের মত না হলেও কলকাতা বিরাট শহর, অনেক রাস্তা অনেক বাড়ি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রেখ সেখানে প্রচুর বস্তি। বেশীর ভাগ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে না, চারদিকে ছড়ানো আবর্জনা, ট্রাম আছে, বাস আছে, দেখতেও ভাল। কিন্তু দরকারের সময় ওঠা যায় না। কলকাতার মার্কেটে এমন কোন জিনিস নেই যা তুমি কিনতে পাবে না। কিন্তু সেই অনুপাতে দামও দিতে হবে। কম দামের জিনিস পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগ ভেজাল।

ডোরিয়া মনে করেছিল মীনাক্ষী তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, তাই প্রথমটা হাসছিল। কিন্তু ক্রমশ গম্ভীর হয়ে যায়, এসব কি তুমি আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলছ?

—মোটেই নয়, যা সত্যি তাই বলছি। মীনাক্ষী ছুঁচে সুতো পরাতে থাকে, দুটো দেশের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। মানে আমি তোমাদের আর আমাদের দেশের কথা বলছি, যদি মনে করে থাক লণ্ডনের মত কলকাতায় সুখসুবিধে পাবে তাহলে ভুল করবে।

ডোরিয়া আপত্তি তোলে, কিন্তু জয়রা যে বলে—

—যে যাই বলুক আমি অনেক ভেবে দেখেছি তুমি যদি কলকাতা সম্বন্ধে মিথ্যে কল্পনার জাল বোন ওখানে গিয়ে তোমাকে হতাশ হতে হবেই।

ডোরিয়া পাল্টা প্রশ্ন করে, তুমি যখন প্রথম লণ্ডনে আস, এদেশ সম্বন্ধেও কি তোমার মনে কোন রকম স্বপ্ন ছিল না?

—ছিল।

—তার জন্যে কি তুমি হতাশ হয়েছ?

মীনাক্ষী মৃদু হাসে, শহরের দিক থেকে হইনি। এদেশের বহু জিনিস আমার ভাল লেগেছে, মানে আমি বাইরের খোলসটার কথা বলছি। কিন্তু হতাশ হয়েছি ভেতরের দিকে উঁকি মেরে অর্থাৎ মানুষের মনের কথা ভেবে। এই দমবন্ধ করা সভ্যতার চাপে পড়ে সে যেন শুকিয়ে গেছে। মীনাক্ষী থেমে যায়, ডোরিয়াও কোন কথা বলে না, বোঝে মীনাক্ষী আরও কিছু বলতে চায়। হাতের কাজটা পাশে সরিয়ে রেখে মীনাক্ষী হাঁটু মুড়ে সহজ হয়ে বসে। বলে, আমি কি বলতে চাইছিলাম জান ডোরিয়া, যদি তুমি কলকাতার বাইরের রূপটাকে উপেক্ষা করতে পার তাহলে তুমি খুশী হতে পারবে, অন্তত কিছু লোক তুমি পাবে যাদের মনের গভীরতা তোমাকে মুগ্ধ করবে। যাদের সঙ্গে আলাপ করে তুমি মনে শান্তি পাবে। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে শিখতে হবে আমাদের দেশের ভাষা।

—বাংলা?

—হ্যাঁ। ইংরাজী ভাষা না শিখে লণ্ডনে এলে এ শহরকে বুঝতে আমার অনেক দেরী হত, তেমনি শুধু ইংরাজীকে পুঁজি করে কলকাতায় গেলে ও শহরকেও তোমার দুর্বোধ্য মনে হবে। ভাষার সঙ্গে দেশের মিল কতখানি তা বোধ হয় বিদেশে না গেলে বোঝা যায় না।

ডোরিয়া অন্যমনস্ক স্বরে বলে, বাংলা শেখার ইচ্ছে আমারও আছে কিন্তু জয় যে শেখাতে চায় না।

—তাহলে জয় ভুল করছে।

—কলকাতায় গিয়ে আমি শেখবার চেষ্টা করব।

—শুধু চেষ্টা নয় ডোরিয়া, মীনাক্ষী দৃঢ় স্বরে বলে, শিখতে তোমায় হবেই, যদি তুমি ওদেশে থাকতে চাও। একটা কথা মনে রেখ, দাম্পত্য জীবনকে সুখী করতে হলে মেয়েদের অনেক কিছু ছাড়তে হয়, অন্তত আমাদের দেশের বিশ্বাস তাই। এক সংসার ছেড়ে আর এক সংসারে ঢুকতে গেলে তাদের পছন্দ মত নিজেকে অনেকটা তৈরী করে নিতে হয়, না হলেই বিবাদ। কলহ।

আর কথা বলা হোল না, সরোজ এসে ঘরে ঢুকল, হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কাজ কি রকম এগুচ্ছে মীনাক্ষী?

মীনাক্ষীও হাসল, ভাল।

—দাদুর কোন খবর পেয়েছ? কেমন আছেন?

—ভাল।

—কিরকম মনে হচ্ছে? এবারে চিত্রাঙ্গদা কেমন দাঁড়াবে?

—ভাল।

সরোজ শব্দ করে হাসে, এ ত আচ্ছা মেয়ে, যা জিজ্ঞেস করি সবই ভাল।

উত্তর দিল ডোরিয়া, আমি আর মীনাক্ষী গভীর আলোচনা করছিলাম। সরোজ চোখ দুটো বড় বড় করে, তাই নাকি. কি নিয়ে?

—প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য।

—ও সর্বনাশ. দোহাই ডোরিয়া এখন ওসব কথা তুলে মীনাক্ষীর মাথা গোলমাল করে দিয়ো না। তাহলে আর আমাদের নাটক নামবে না। এখনও অনেক ড্রেস বাকী।

মীনাক্ষী চোখ তুলে তাকাল, ভয় নেই. অর্ধেকের বেশী হয়ে গেছে, আর দুটো দিন খাটতে পারলেই শেষ করে ফেলব।

—আজ পীয়ের এল না? ওতো ড্রেস তৈরী করায় খুব উৎসাহী।

—আসবে দুপুর বেলা। অফিসের ছুটির পর।

সরোজ টেবিলের ওপর থেকে গ্লাস নিয়ে খানিকটা জল ঢেলে পান করল। রুমাল বার করে মুখটা পুছতে পুছতে খুব সহজ গলায় বললে. ডোরিয়া. সবুজ শাড়ীতে তোমায় বড় চমৎকার মানিয়েছে।

ডোরিয়া খুশী হয়, বলে এটা আমায় জয় উপহার দিয়েছে।

—তোমাদের জাহাজের বুকিং হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ. শনিবার আপনাদের শো. মঙ্গলবার আমরা রওনা হব।

সরোজ বোধ হয় গলাটা একটু নামিয়ে বলে, মীনাক্ষী, এক কাজ করা যাক, জয় আর ডোরিয়াকে আমরা একটা ফেয়ারওয়েল ডিনার দেব।

মীনাক্ষী সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, কবে?

—আগামী শনিবার, শো'-এর রাত্রে আমরা খেতে যাব। কোন একটা ভাল রেস্তরাঁয়। তবে বেশী লোককে বলা হবে না। আমি, তুমি, পীয়ের. লীলা, প্রমীলা, জয়, ডোরিয়া আর নন্দিতারা।

ডোরিয়ার মুখ চোখ খুশীতে ভরে ওঠে, আমার এখনই ভাবতে কিরকম 'থ্রিল' হচ্ছে. তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সরোজদা।

সরোজ সস্নেহে বলে, এর মধ্যে কোন লৌকিকতা নেই. জয় আমাদের ভাই-এর মত।

এলিজাবেথও এ ক'দিন প্রায় রোজই এসেছে সরোজদের ফ্ল্যাটে রিহার্সাল দেখার লোভে। সৌরেনের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে ভারতীয় জীবনের কথা জানবার যে আগ্রহ মনের মধ্যে উঁকি মেরেছিল তারই তাগাদায় বোধ হয় এই ভারতীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে বন্ধু হিসেবে নাম লেখাতে সে রাজী হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এদের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে নিজের ইচ্ছেয় সে এখানে এসেছে, সৌরেনকে একবারের বেশী দু'বার আমন্ত্রণ জানাতে হয়নি। ভারতীয় মজলিসের যে বৈশিষ্ট্য এলিজাবেথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে তা হল এখানকার সভ্যদের অনাড়ম্বর মেলামেশা। খুব সাদাসিধে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে এতগুলো ছেলেমেয়ে খায় দায় গল্প করে, অবসর সময়ে বিদেশে এসেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে ওঠে।

এলিজাবেথ একাগ্র মনে গান শুনছিল। প্রমীলা উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে,

বাংলা গান শুনতে কেমন লাগছে?

এলিজাবেথ হাসে, ভাষা তো বুঝতে পারছি না।

—তবু সুরটা?

—ভালই।

—ঠিক বলছ?

এলিজাবেথ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, মানে অন্যরকম। আমরা যে ধরনের গান শুনতে অভ্যস্ত এ ঠিক সে ধরনের নয়।

প্রমীলা যেন নিজের মনেই বলে, আমার কিন্তু ইংরিজী মিউজিক খুব ভাল লাগে, ছোটবেলা থেকে। ওর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে। আমাদের দেশের মিউজিক এক এক সময় বড্ড একঘেঁয়ে মনে হয়।

এলিজাবেথ সহজ উত্তর দেয়, তোমাদের মিউজিক বেশী শোনার আমার সুযোগ হয়নি। তাই ভাল মন্দ বলা মুশকিল; ঠিক বুঝতেও পারি না দু'দেশের সঙ্গীত ধারার মধ্যে তফাৎটা কোথায়।

তার কথা শুনে প্রমীলাও নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, আমিও ঠিক বলতে পারব না।

প্রমীলা বুদ্ধিমতী, যা জানে না তার একটা ভুল ব্যাখ্যা করে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা সে করল না। কিন্তু অনেকেই করে, সেইখানেই হয় বিপদ। বিদেশে গিয়ে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, ঠিক না জেনেও এ দেশের ছাত্ররা এমন সব উল্টো পাল্টা উত্তর দেয় যার ফলে বহু বিদেশীর মনে ভারত সম্বন্ধে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

প্রমীলা বললে, একজন তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, সে সরোজদা। ও এদেশে আসবার পর ইওরোপীয়ান মিউজিকও খানিকটা শিখেছে।

একটু বাদে সরোজ সে ঘরে ঢুকতে প্রমীলা হাত নেড়ে কাছে ডাকল। এলিজাবেথের প্রশ্নটা বাংলায় জিজ্ঞেস করে বললে, ওকে একটু বুঝিয়ে দিন না সরোজদা আমি পারছি না।

সরোজ এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল। আমাদের দেশের সঙ্গীতে দেখবে মেলডি হচ্ছে প্রধান, সে গান বাজনা যাতেই বল না কেন। কিন্তু তোমাদের দেশের সঙ্গীতে মূল কথা হল হার্মনি, এইখানেই আসল প্রভেদ। সঙ্গীতের জন্ম মেলডি দিয়েই, তোমাদের দেশেও তাই ছিল। ক্রমে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে স্বর সামঞ্জস্যের উৎপত্তি দেখা যায়, তখনও পাশাপাশি মেলডি স্থান পেয়েছে। কিন্তু এলিজাবেথান যুগের পর থেকে তোমাদের সঙ্গীতের রাজত্বে হার্মনি জাঁকিয়ে বসেছে। বিশেষ করে সঙ্গীতের এ শাখার নব জন্ম দিয়েছেন বাখ্।

এলিজাবেথ ভালভাবে বুঝে নেবার জন্যে জিজ্ঞেস করে, আমাদের গানে তো এখনও মেলডি আছে।

সরোজ ওর কথা শুনে হেসে ফেলে, মেলডি ছাড়া গান হবে কি করে। তবে তোমাদের কান এখন হার্মনি শুনতে বেশী অভ্যস্ত বলে আমাদের মেলডি-প্রধান সঙ্গীতকে একঘেঁয়ে বলে মনে হয়।

প্রমীলা চট্ করে বলে, আমার নিজেরই তো একঘেঁয়ে লাগে।

সরোজ প্রমীলার চোখে চোখ রেখে হাসে, তুমি যে মেমসাহেব!

প্রমীলা চটাং করে উত্তর দেয়, আমি মেমসাহেব হলে আপনি মডার্ন কেষ্ট।

সরোজ সহাস্যে জিজ্ঞেস করে, তার মানে?

—মেয়েদের সামনে বক্তৃতা দিতে পেলে আর আপনি কিছু চান না। আমার সামনের এই বোকা মেয়েটা নিশ্চয় মনে মনে ভাবছে আপনি কি পণ্ডিত লোক!

সরোজ দুষ্টুমি করে বলে, তবে রে মেয়ে, বলে দেব ইংরেজী করে কি সব বলছ।

প্রমীলা ছেলে মানুষের মত মাথা দুলিয়ে ব'লে, তাহলেই আড়ি হয়ে যাবে।

এতক্ষণ ওরা কথা বলছিল বাংলায়, পাছে এলিজাবেথ কিছু মনে করে তাই সরোজ তার সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করল, মিস্ হোপ তুমি বলেছিলে কিছু টিকিট বিক্রি করে দিয়ে আমাদের সাহায্য করবে।

এলিজাবেথ ব্যাগের থেকে একটা লিস্ট বার করে বলল, আমার সাধ্যমত করছি। আমি দশজনকে অনুরোধ করেছি টিকিট নেবার জন্যে তাদের মধ্যে পাঁচজন কথা দিয়েছে তারা নেবে, অন্যরা এখনও জানায় নি। তারপরে টিকিট নিয়ে যাব।

—দরকার থাকলে আমি এখনই তোমায় টিকিট দিয়ে দিতে পারি।

—না, আমি ওদের সকলের কাছ থেকে পাকা কথা না শুনে নেব না। তা ছাড়া সৌরেন কিছু টিকিট আমার জন্যে আলাদা করে রেখেছে।

—তাহলে ঠিক আছে।

লণ্ডনে ভারতীয় শো' করার এই বিপদ। দেশ থেকে কোন খ্যাতনামা শিল্পী গেলে অবশ্য অন্য কথা, তাদের শো'র সব রকম ব্যবস্থা করে ইম্প্রেসারিও। বিজ্ঞাপন পড়ে, কাগজের সমালোচনা দেখে সাধারণ দর্শক সেখানে ভিড় করে। কিন্তু এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোক ঢোকান বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভারতীয় মহলে টিকিট বিক্রি একরকম করা যায় না বললেই হয়। পড়া ও খাওয়ার খরচা মিটিয়ে ছাত্রদের কাছে এমন পয়সা থাকে না যে পাঁচ শিলিং দিয়ে এই ধরনের অ্যামেচার 'শো'-এর টিকিট কাটবে। আর যেসব ভারতীয় এখানে সংসার পেতে বসেছেন, রোজগার যাদের ভাল, তাঁরা ইচ্ছে করেই এ ধরনের অনুষ্ঠানকে এড়িয়ে চলেন। নকল সাহেবীআনার পাকাছাপ তাঁদের মনে, এসব হুজুগকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না।

এই সব কারণে টিকিট বিক্রি করতে পারে এদেশী বন্ধু বান্ধবীরাই বেশী। অনেকগুলো গুণ এদের। 'চেষ্টা করব' বললে সত্যিই চেষ্টা করে, মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে নাম কিনতে চায় না। এলিজাবেথ যে দশজনকে টিকিট বিক্রি করবে বলেছে তাদের মধ্যে অন্তত সাত আটজন টিকিট নেবে, এবং দু'খানার কম বড় একটা কেউ কেনে না, তাই বিশেষ করে এই সময় এদেশী বন্ধুদের খোঁজ পড়ে সবচেয়ে বেশী।

পীয়ের ইতিমধ্যে প্রায় কুড়িখানা বেশী দামের টিকিট বিক্রী করে দিয়েছে। ওর পক্ষে করাও অবশ্য সহজ, কারণ ও কাজ করে বেলজিয়ান দূতাবাসে। ওসব জায়গায় বড়লোকদের যাতায়াতই বেশী, অনুরোধ করলে দশ পনের শিলিং দামের টিকিট নিতে ওরা দ্বিধা করে না।

পীয়ের রিহার্সালে এসে রসিকতা করে সকলকে তাড়া মারে, তোমাদের নৃত্য নাট্য একেবারে প্রথম শ্রেণীর হওয়া চাই। তা না হলে আর আমার মুখ থাকবে না। অনেক পরিচিত লোক আসবে।

লীলা হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছে, নাচ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। তোমার বন্ধু-বান্ধবীরা সকলেই ঘনঘন করতালি দেবে। এখন অন্যদের সামলাও।

প্রমীলা ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নেয়, পীয়ের তুমি দেখে নিয়ো এবারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হবে গান। নাচ, সাজ পোশাক তার কাছে ফিকে হয়ে যাবে।

মীনাক্ষী মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল, বললে, আমি বলে রাখছি পীয়ের, বিশেষ করে তোমার বান্ধবীরা চিত্রাঙ্গদা দেখে তোমাকে ইণ্ডিয়ান ড্রেস্ জোগাড় করে দেবার জন্যে পাগল করে মারবে।

পীয়ের ইচ্ছে করে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেয়, তোমরা যেরকম নিজেদের ড্রাম পেটাচ্ছ, আমার কান কালা হবার যোগাড় হয়েছে।

প্রমীলা ফস্ করে বলে, তাও তো এখনও মাস্টার 'ড্রামার'-এর সঙ্গে তোমার কথা হয়নি।

সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, কে সে?

প্রমীলা নির্ভীক গলায় উত্তর দেয়, কেন, সরোজদা।

ওর কথার ধরনে অনেকে হাসলেও লীলা গম্ভীর হয়ে যায়, ক্ষুন্ন স্বরে বলে, সরোজদা সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলা তোমার উচিত নয় প্রমী।

প্রমীলা বাঁ চোখটা তুলে লীলার দিকে একবার তাকাল। কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তার মুখে ফুটে উঠল একটা বাঁকা হাসি তীব্র শ্লেষ মাখা।

আজকাল এই ধরনের ছোটখাট কথার মধ্যে দিয়েও দুই বোনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। আগে তারা প্রকাশ্যে কিছু বলত না, হয়ত ঝগড়া করত বাড়ি ফিরে গিয়ে, কিন্তু এখন পাঁচজনের সামনে নিজেদের মনের কথা ওরা প্রকাশ করে ফেলে। এক এক সময় ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে তারা দু'জনেই অবাক হয়, আশ্চর্য, ক্রমশ তাদের মন পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছে। ছোট বেলা থেকে পিঠোপিঠি এই দু'বোনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়তো হয়েছে। কিন্তু তা মিটে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যে। দু'জনের মধ্যে আকর্ষণ ছিল তীব্র। সে শুধু রক্তের সম্বন্ধের জন্যে নয়, তারা দু'জনেই ছিল অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। এতদিনের সেই মধুর সম্পর্ক কিরকম করে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বাইরে পাঁচজনের মধ্যে মিশে যাও বা হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিন কাটে, বাড়ি ফিরে গেলেই দু'জনের মধ্যে নীরবতার জমাট মেঘ ঘন হয়ে আশ্রয় নেয়। নিতান্ত ব্যবহারিক দু'চারটে মামুলী কথাবার্তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু আলাপ হয় না। তারা একই ঘরে একই খাটে একই ছাদের তলায় থাকে, খায়, শোয় কিন্তু মনে হয়, না থাকলেই যেন ভাল হত।

আগের মত আর লীলা সকলের সঙ্গে হৈ হৈ করে গল্প করতে ভালবাসে না। নিজের মনে চুপচাপ বসে থাকতে চায়।

আজও নাচ শেষ করে সরোজের ড্রইংরুমেই জানলার কাছে মাটিতে বসে ছবির ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল লীলা।

ঘরে ঢুকল অমিতাভ। লীলাকে একলা দেখে জিগ্যেস করল, লীলাদি একলা যে?

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না লীলার, তবু হেসে বললে, এমনি।

—ও ঘরে কফির জোগাড় হচ্ছে, তুমি যাবে না?

—রোজই তো করি, আজ না হয় অন্যরাই করুক।

—তা সত্যি। তুমি একলা কাজ করে করে অন্য সবাইকে কুঁড়ে করে দিয়েছ। কথা বলতে বলতে অমিতাভ এসে লীলার পাশে পা ছড়িয়ে বসল।

মনে মনে প্রমাদ গণল লীলা। এক্ষুনি হয়তো বক্‌বক্ করতে শুরু করবে। তবু অমিতাভর মুখে চোখে এমনই একটা সরলতা আছে যার জন্যে তার মনে আঘাত দিতে ইচ্ছে করে না লীলার।

অমিতাভ পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করল। যদি তোমার আপত্তি না

থাকে—

লীলা হাসে, সিগারেট খাবে তাতে আবার আপত্তি কি?

—তা নয়, তোমার সামনে খেতে কেমন যেন লজ্জা করে।

—কেন?

অমিতাভ চোখ নীচু করে বলে, আগে তোমায় কখনও বলিনি। কিন্তু অন্যদের বলেছি। আমার এক দিদি ছিল। বেঁচে থাকলে এতদিনে তোমার মত হত।

ঠিক এ ধরনের কথা শুনবে লীলা ভাবেনি। একটু চুপ করে থেকে বললে, ও, কতদিন মারা গেছেন?

—তখন ওর চোদ্দ বছর বয়স। আমার আট। সেই প্রথম শোক পেলাম। ওর কথা আজও ভুলতে পারি নি।

—দিদি তোমায় খুব ভালবাসত, তাই না?

অমিতাভর গলা ধরে আসে। ওই দিদিই আমার সব ছিল। দুজনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। দিদিকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতাম না। অথচ—

দুজনেই চুপ করে যায়।

অমিতাভ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমার মাকে জানেন তো?

লীলা অন্যের মুখে শুনেছিল। অমিতাভর মা এক বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রী। তবু ভাব দেখাল সে যেন জানে না।

—আমার মায়ের নাম মাধুরী দেবী, কথাটা বলেই অমিতাভ লীলার মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকায়। সেখানে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে জিজ্ঞেস করে, ছবিতে ওঁর অভিনয় দেখেন নি?

বলাবাহুল্য মাধুরী দেবী বাংলা চিত্র জগতে একজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী। বহুদিন ধরে তিনি ছবিতে নামছেন। আগে ছিলেন একচেটে নায়িকা, এখন করেন চরিত্রাভিনয়। সত্যিই তাঁর অভিনয় ক্ষমতা অসাধারণ।

লীলা উৎসাহ প্রকাশ করে বলে, ওঁর অভিনয় আমার খুব ভালো লাগে।

মাতৃগর্বে অমিতাভর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, অথচ মায়ের ইচ্ছে নয়, আমি ছবির লাইনে যাই। তাই আমাকে পড়াশুনো করার জন্যে এদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লীলা সস্নেহে বলে, মন দিয়ে লেখাপড়া কর। মায়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখ।

—চেষ্টা তো করছি। কিন্তু পারছি কিনা জানি না।

—কেন অমিতাভ?

অমিতাভ অন্য দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে, নিজেকে বড় একলা মনে হয়।

লীলা কথা বুঝতে পারে না, মায়ের জন্যে মন কেমন করে?

অমিতাভ ম্লান হাসে। সে বয়স এখন আর নেই, তবে—

—কি?

—কেন জানি না মনে হয় সবাই আমায় এড়িয়ে যেতে চায়। আমি বড় একলা লীলাদি।

অমিতাভর চোখ ছলছল করে, লীলা তাকে সান্ত্বনা দেয়, মিথ্যে মন খারাপ করতে নেই। ওটা তোমার মনের কমপ্লেক্স।

—হয়তো তাই, কিন্তু এ কষ্ট তো আজকের নয়। ছোটবেলা থেকে দেখছি। মায়ের পরিচয় পেলেই ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে, হাসে।

আমার বিশ্রী লাগত। ভাবতাম, এদেশে চলে এসে ওই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু পেলাম কই। এখানকার ভারতীয় মজলিসেও যে আমি একঘরে হবে বাস করি।

একথা অস্বীকার করবার নয়। অমিতাভর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হবার আগে লীলারাও তো তার বংশপরিচয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে রসালো আলোচনা করেছে। সে কথা মনে পড়তে নিজের কাছেই লীলা লজ্জিত বোধ করলো। মুখে বলল, বোকা ছেলে, মন খারাপ হলে আমার কাছে চলে আসিস, ভাবিস তোর দিদি এখনও বেঁচে আছে।

লীলার এই আত্মীয়তার সুরে অমিতাভ কিছুতেই চোখের জল থামাতে পারল না। লীলার পায়ের উপর হাত রেখে মনে মনে তাকে প্রণাম করল। অস্ফুটস্বরে বলল, আজ থেকে আমি তোমায় দিদি বলেই ডাকব।

বৎসরান্তে একবার করে লণ্ডনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে পরিচিত বহুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটে; এ অনেকটা দেশে থাকতে বিজয়ার পর সারা বছর দেখা না হওয়া আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার মত। কে টিকিট কিনবে আর কে টিকিট কিনবে না তাতো আর আগে থেকে জানা যায় না, তাই ডায়রীতে লেখা নাম ঠিকানা দেখে একবার করে ঢুঁ মারতে হয়। এসব কাজ ফোন করলে হয় না, এক কথায় কাটিয়ে দেবে। টিকিট না কেনার হাজার রকম ফন্দী করবে, তার চেয়ে সাক্ষাতে দেখা হলে জোর জবরদস্তি করে টিকিট গছিয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব।

সৌরেন আজ ঠিক করেই রেখেছিল রবিবারের ছুটির দিন সকাল বেলা সে যাবে ব্রেনীম ক্রেসেণ্টে তার পুরোন বাসায়। বেশ কিছুদিন সৌরেন এখানে ছিল। অল্প খরচে থাকার পক্ষে লণ্ডনে এ ধরনের ডিগ্‌স অনেক আছে। তিন থেকে সাড়ে তিন পাউণ্ড সাপ্তাহিক ভাড়া, বরাত ভাল হলে নিজস্ব ছোট কামরা পাওয়া যায় তাতে হাত পা ছড়াবার জায়গা খুব বেশী না থাকলেও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই থাকে, সরু একটা স্প্রীং-এর খাট, মাঝারি সাইজের আলমারী, এক কোণে কাজ করবার চেয়ার টেবিল। হয়ত এসব ঘরের ওয়াল পেপারগুলো নতুন নয়, হয়ত আসবাবপত্রে পালিশ পড়েনি অনেকদিন, তবু থাকতে খুব অসুবিধে হয় না, বিশেষ করে পয়সার অঙ্কটা ভাবলে। এ ছাড়াও ব্রেকফাস্ট আর ডিনার ওই পয়সাতেই খেতে পাওয়া যায়, ল্যাণ্ড লেডীর রান্না খুব সুস্বাদু না হলেও পেট ভরে যায় সহজে।

সৌরেনকে দরজা খুলে দিলেন ল্যাণ্ডলেডী নিজেই। বুড়ী মানুষ থপ থপে মোটা শরীর, পোশাকের ওপর এপ্রন পরা, চুলে স্কার্ফ জড়ানো। হেসে বললেন, সুপ্রভাত মিঃ লাহিড়ী, অনেকদিন বাদে তুমি এলে।

সৌরেন জানাল সে এসেছে তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। ল্যাণ্ড লেডী বললেন, নীচের বড় ঘরে যাও, সকাল থেকে ওইখানে বসে ওরা গল্প করছে।

সৌরেন আর কথা না বাড়িয়ে বড় ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। বুড়ীর কথা শুনলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে, কে বুঝবে সে একজন দজ্জাল ল্যাণ্ড লেডী। লণ্ডনের ডিগ্‌স্‌-এ যারা থেকেছে ল্যাণ্ড লেডীদের সম্বন্ধে তাদের সকলেরই এক ধারণা, এরা নাকি কিছুতেই ভাল হতে পারে না। এ অনেকটা বৌ-কাটকী শাশুড়ীর মত। এদের হাসি দেখলেও ভয় লাগে, মনে হয় মিছরির ছুরি।

নীচের বড় ঘরে চারজনের শোবার ব্যবস্থা। ভাড়াও কিছু কম, সেইজন্যে এই

ঘরটাই যেন এ বাড়ির বৈঠকখানা। বাড়ির বাসিন্দারা তো বটেই সেই সঙ্গে তাদের বন্ধু-বান্ধবরাও এসে এই ঘরে জড় হয়। চা আর সিগারেটের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। এক এক সময় চেঁচামেচির মাত্রা এত বেড়ে যায় যে বাধ্য হয়ে তাদের থামাবার জন্যে ল্যান্ড লেডীকে এসে দরজায় ঠক্ ঠক্ করে শব্দ করতে হয়। তর্ক থামে কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়, আবার একটু পরেই আগের মত চেঁচামেচি শুরু হয়।

সৌরেন থাকতেও যেরকম ছিল আজও ঠিক সেই রকম অবস্থা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখে বাজপায়ী এখনও লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, যদিও অন্যদের সঙ্গে সমান তালে তর্ক করে যাচ্ছে। বাঁড়ুজ্জ্যে শ্লিপিং স্যুটের ওপর একটা ছেঁড়া ড্রেসিং গাউন পরে সারা ঘরে পায়চারি করে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। বেঁটে কেষ্ট শালের মত করে গায়ে একটা পাতলা কম্বল জড়িয়ে ডেলী ওয়ার্কার থেকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছে, জমিদারী হারিয়েও বাঁড়ুজ্জ্যের দেহে যে এখনও নীল রক্ত বইছে তারই প্রমাণ করতে বেঁটে কেষ্ট বদ্ধপরিকর। আর এক দিকে শখের শিল্পী সমরেশ সাদা কাগজের ওপর কলম দিয়ে অন্যদের স্কেচ আঁকছে।

সৌরেনকে দেখে ওরা খুশী হল, চেয়ার দিয়ে বসাল কিন্তু, তবু তর্ক থামল না। তাকে সালিশী মেনে বেঁটে কেষ্ট বললে, তুমিই বল সৌরেন, এ শালা ইংরেজ জাতের সর্বনাশ হবে না? বেটাচ্ছেলে লেবার গভর্নমেণ্টকে সরিয়ে আবার সেই কনজার-ভেটিভদের ফিরিয়ে আনলে।

বাঁড়ুজ্জ্যে খনখনে গলায় চীৎকার করে ওঠে. সৌরেন, তুমি ওই বেঁটে বামনটাকে চুপ করতে বল, রাজনীতির অ আ বোঝে না গলা ফাটিয়ে এখানে সাম্যবাদ আনতে চায়, এত যে চেষ্টা করল একটা সিট্ পেলে? বলুক—

বেঁটে কেষ্ট ফোঁস ফোঁস করে, বললাম তো এ বেটাচ্ছেলেরা অধঃপাতে যাবে।

বাঁড়ুজ্জ্যে হেসে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তর্কে না পেরে এখন মুখ খারাপ করছে, তোমরাই শোন। ও নিজে তো একটা ইডিয়েট।

আর তুমি কি? একের নম্বর স্টুপিড।

বাজপায়ী হাঁ হাঁ করে ওঠে, Thus far and no further. যে ভাবে তোমরা এগুচ্ছো শেষকালে কথা ছেড়ে ঘুষির আশ্রয় নেবে দেখছি। এতদিন বাদে সৌরেন এল ওর সঙ্গে একটু কথা বল।

বাঁড়ুজ্জ্যে আগের স্বরেই বলে, সৌরেন তো এসেছে টিকিট বিক্রি করতে, তোমরা কেউ কিনতে চাও তো কেন। আমি বাবা গরীব মানুষ, পয়সা নষ্ট করতে পারব না।

সৌরেন এতক্ষণে কথা বলে, বছরে তো পাঁচবার তোমাদের কাছে আসি না, মাত্র একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, তাও যদি তোমরা সাহায্য না কর—

বেঁটে কেষ্ট এতক্ষণে ঝগড়া ভুলে গিয়ে বাঁড়ুজ্জ্যের কথায় সুর মেলায়, সংস্কৃতি এখন শিকেয় তোলা থাক, আমাদের কে সাহায্য করে তার ঠিক নেই, কি বলহে বাঁড়ুজ্জ্যে? পাঁচ শিলিং খরচা করলে দিব্য একদিন খাওয়া যাবে।

বাজপায়ী অপ্রস্তুত স্বরে বলে, তাহলেও সৌরেন যখন নিজে এসেছে—

বাঁড়ুজ্জ্যে আর বেঁটে কেষ্ট একসঙ্গে কথা বলে ওকে থামিয়ে দেয়, তাহলে তুমিই দুটো টিকিট কাটো না।

বাজপায়ী অম্লান হাসে, হাতে পয়সা থাকলে নিশ্চয় কিনতাম, জানইতো এক সপ্তাহের ভাড়া দিতে পারিনি ল্যান্ড লেডীকে, আমি তো ভাবছিলাম সৌরেনের

কাছ থেকে কয়েকটা পাউন্ড ধার চাইব।

সৌরেন হেসে ফেলে, ওরে বাবা, কাদের কাছে টিকিট বিক্রি করতে এসেছি।

—হতাশ হয়ো না বৎস, বাড়ুজ্জ্যে অভিনয়ের ভঙ্গীতে কথা বলে, এখনও সমরেশকে বলা হয়নি। ও হয়তো থানচারেক টিকিট কেটে আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারে।

নিজের নামের উল্লেখ শুনে সমরেশ উঠে দাঁড়ায়, সৌরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার সদ্য আঁকা একটা কার্টুন হাতে ধরিয়ে দেয়।

বিস্মিত সৌরেন জিজ্ঞেস করে, এটা দিয়ে কি করব?

গম্ভীর গলায় সমরেশ বলে, পাঞ্চ-এর অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো।

—তাতে লাভ?

—ওরা ছাপাবে। পারিশ্রমিক বাবদ যা টাকা দেবে তোমাদের সাংস্কৃতিক ফণ্ডে জমা করে দিয়ো। বলেই আর কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সমরেশ দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌরেনের বিমূঢ় অবস্থা দেখে অন্য তিনজন হো হো করে হেসে ওঠে।

সৌরেন ভেবে দেখে, সত্যিই আশ্চর্য, এ ছেলেগুলো এতটুকু বদলায়নি। লণ্ডনে এসে এদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার পর যেরকম এদের অদ্ভুত জীব বলে মনে হয়েছিল আজও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।

এলিজাবেথ আজ সকাল থেকে বাড়ির বার হয়নি। কথাই ছিল, সৌরেন দু'চার জায়গায় টিকিট বিক্রির চেষ্টা করে বাড়ি ফিরবে বারোটা নাগাদ, তারপর দু'জনে মিলে খেতে যাবে কোন রেস্তরাঁয়, সেখান থেকে রিহার্সালে। সৌরেনের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে ভারতীয় ছেলেদের সম্বন্ধে এলিজাবেথের শ্রদ্ধা অনেক বেড়েছে। সৌরেনের ব্যবহার শান্ত, সংযত। প্রগলভ সে মোটেই নয়, অথচ মেলামেশার মধ্যে কোথায় যেন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ আছে যা পাওয়া যায় না সমবয়সী ইংরাজ বন্ধুদের মধ্যে। হয়ত প্রথম দিকে সৌরেনকে দেখে মনে হয়েছিল তার মধ্যে জীবনের উচ্ছ্বাস কম, প্রাণশক্তির অভাব কিন্তু এখন মনে হয় সেটা বোধহয় একান্তভাবেই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে। জীবনকে দেখে ওরা অন্য চোখে। এক এক সময় মনে হয় সৌরেন বুঝতে পারে না পারিবারিক জীবন নিয়ে কতদূর পর্যন্ত আলাপ করা সম্ভব। ভাবের বশে নিজের বাড়ির সমস্ত কথাই সে বলে দিয়েছে, গোপন করার চেষ্টা করেনি। এলিজাবেথকেও নানারকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে যার উত্তর দিতে গিয়ে তাকে বিব্রত বোধ করতে হয়। এর জন্যে প্রথম প্রথম এলিজাবেথ বিরক্ত হত, কিন্তু এখন হয় না। বুঝতে পারে এও প্রাচ্যের জীবনধারার আর এক বৈশিষ্ট্য। ওদের বন্ধুত্ব পোশাকী নয়, সেখানে হৃদয়ের সম্পর্ক। বন্ধুর সুখে ওরা সুখী হয়, দুঃখে ওরা কাঁদে।

এলিজাবেথের মনে হল মিসেস হেরিং নীচে থেকে তার নাম ধরে ডাকছে। হয়তো টেলিফোন এসেছে কিংবা ধোপা। দরজা খুলে ওপরের বারান্দা থেকে এলিজাবেথ মুখ বাড়ায়, চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, মিসেস হেরিং আমাকে ডাকছেন?

মিসেস হেরিং হেসে বললে, হ্যাঁ মাই ডিয়ার, তোমার জন্যে এক ভদ্রলোক নীচে অপেক্ষা করছেন।

—আমি আসছি।

কে আসতে পারে এখন! এলিজাবেথ মনে মনে ভাববার চেষ্টা করল, কিন্তু কারুর কথাই মনে হল না। তবু ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে চুলটা ঠিক করে নিয়ে নীচে নেমে এল এলিজাবেথ।

দরজার সামনে মিসেস হেরিং-এর সঙ্গে হাস্যালাপরত বেঁটে ভদ্রলোকটিকে দেখেই বিতৃষ্ণায় এলিজাবেথের আপাদ মস্তক জ্বলে উঠল।

—সুপ্রভাত, ডার্লিং লিজি, কথা বললেন লিণ্ড্‌সে হোপ।

এলিজাবেথ মৃদুস্বরে কি উত্তর দিল শোনা গেল না, তার কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে মিসেস হেরিং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, আশ্চর্য মেয়ে তুমি মিস্ হোপ, তোমার এত বড় নামজাদা কাকার কথা একবারও আমাকে বলনি?

এলিজাবেথ শুক্‌নো হাসল, তাহলে ভুল হয়ে গেছে।

—তুমি কাকাকে ওপরে নিয়ে যাও, আর নয়তো নীচে ড্রইংরুমে বসতে পার। কেউ এখন নেই, খালি আছে।

মিসেস হেরিং-এর এ প্রস্তাবে খুশী হল এলিজাবেথ, অন্তত তার এই অবাঞ্ছিত অতিথিকে নিজের ঘরে না নিয়ে গেলেও চলবে।

লিণ্ডসে হোপ অমায়িক হেসে মিসেস হেরিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে নীচের বসবার ঘরে এসে বসল।

ঘরটা বড়, কিন্তু ধুলোপড়া ময়লা, বিশেষ ব্যবহার হয় না। কোচগুলো দেখলে বোঝা যায়, এককালে দামী ছিল, কিন্তু এখন অনেক জায়গায় স্প্রীং বসে গেছে. কোণের দিকে একটা পিয়ানো আছে. তবে কেউ তা বাজতে শোনেনি। নামেই এটা ড্রইংরুম, ছোটখাট গুদোম ঘর বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না। ভাড়াটেদের কোন আসবাব অপ্রয়োজনীয় মনে হলে তা এই ঘরে এসে আশ্রয় পায়।

বোধহয় দামী স্যুট নষ্ট হবার ভয়ে লিণ্ডসে হোপ সোফায় না বসে দাঁড়িয়ে রইল, এলিজাবেথ কিন্তু নিজেকে সংযত করার জন্যে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। অসহ্য নীরবতা, দুজনেই অপেক্ষা করছে কে কথা শুরু করবে প্রথম।

লিণ্ডসে হোপ একটা সিগারেট বার করে কেসের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে, লিজি, তুমি জান বোধহয়, তোমার খোঁজে আমি আর একদিন এ-বাড়িতে এসেছিলাম।

এলিজাবেথ কঠিন স্বরে বলে, আমি শুনেছি।

—তবু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করলে না।

—সময় পাইনি।

—ফোন করতেও পারতে।

এলিজাবেথ কোন উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে।

লিণ্ডসে হোপ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, কি বল।

এলিজাবেথ নীচের দিকে চোখ রেখে উত্তর দেয়, তুমি তো জান, বাবা চান না আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি।

—এখনও ওর মত বদলায়নি?

—না।

লিণ্ডসে হোপ দাঁত কড়মড় করে, ও একটা নির্বোধ, একগুঁয়ে, গেঁয়ো ভূত।

—তবু তিনি আমার বাবা।

লিণ্ডসে হোপ উত্তেজিতভাবে দুবার পায়চারি করে এলিজাবেথের পাশে সোফায় বসে পড়ে, তোমার বাবার সঙ্গে আমার কি নিয়ে ঝগড়া, তুমি তা ভাল করেই জান।

ছোটবেলা থেকেই আমি চেয়েছিলাম বড় হতে। ব্যবসা করব, দশজনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াব এই ছিল আমার স্বপ্ন। তোমার বাবা ছিলেন ঠিক তার উল্টো। চাষবাস করে জীবন কেটে গেলেই হল, সেইজন্যেই আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি। যা করতে চেয়েছিলাম, তা করেছি, আমি তো ভুল করিনি, ভুল করেছিল তোমার বাবা।

—সে তর্কের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

লিণ্ডসে হোপ ভাল করে এলিজাবেথের মুখটা নিরীক্ষণ করেন, একথা সত্যি, প্রথম জীবনে তোমাদের সঙ্গে আমি বিশেষ সদ্ভাব রাখতে পারিনি। কারণ তখন আমার ব্যবসা দাঁড় করাতে হচ্ছে। রাতদিন তাই নিয়ে খেটেছি। কিন্তু তারপর, কতবার আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছি, চিঠি লিখেছি। কোন ফল হয়নি।

ইচ্ছে না করলেও এলিজাবেথ উত্তর দেয়, আমরা ছোটবেলা থেকে জানি, বাবা তোমাকে খরচার খাতায় লিখে রেখেছিলেন।

লিণ্ডসে হোপ আবার জ্বলে ওঠে, তাই তো বলছি, চার্লস নির্বোধ। ও মনে করে সহজ সরল পথে সব কিছু করা যায়, বোঝে না, ব্যবসার পথ প্যাঁচালো। অনেক সময় হয়তো মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়, সকলেই তাই করে। ব্যবসাদার তো আর ধর্মযাজক নয়।

এলিজাবেথ নড়ে চড়ে বসে, আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ গায়ে পড়ে এসব কথা আমাকে বলতে এসেছ কেন?

—আমি চাই, তুমি আমার সঙ্গে কাজ কর।

—কোথায়?

—আমার দোকানে।

এলিজাবেথ বিস্মিত হয়, তাতে তোমার লাভ?

লিণ্ডসে হোপ অযথা চেঁচিয়ে ওঠে, লাভ আমার নয়, লাভ তোমার। কোম্পানী থেকে মোটা টাকা পাবে, লণ্ডনে ভাল ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে পারবে। গ্রাম থেকে তোমার বাবা, দাদা এসে উঠবে, এতে কার লাভ?

এলিজাবেথ স্বীকার করে, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

লিণ্ডসে হোপ অভ্যেসমত কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়, আমি অবিবাহিত, টাকা আছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্তু তবু নিজের বংশের কথা মনে পড়ে, তাদের জন্যে কি কিছুই করে যেতে পারব না, চার্লস আমাকে বুঝতে না পারুক, আমার বিশ্বাস, এখন তোমরা বড় হয়েছ, নিশ্চয় আমাকে বুঝতে পারবে। তোমার দাদা যখন ক্যানাডা চলে গেল, আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, সে নেয়নি, কিন্তু তুমি নিশ্চয় শুনেছ তোমার মার কাছে, ছোটবেলায় তুমিই ছিলে আমার সবচেয়ে প্রিয়।

মার কথা এলিজাবেথের মনে পড়ে যায়, বলে, শুনেছি, তুমি আমাকে কাঁধে করে বাড়ি থেকে গির্জায় নিয়ে যেতে। বিকেল বেলা সামনের মাঠে রবারের বড় বল নিয়ে খেলা করতে।

লিণ্ডসে হোপ উৎসাহিত হয়ে বলে, যেদিন ভাগ্যান্বেষণে বাড়ি থেকে পালিয়ে লণ্ডন চলে আসি, সেদিন ভাবতেও পারিনি, চিরকালের জন্য তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বিশ্বাস কর লিজি, একথা যত ভাবি, মনে বড় কষ্ট পাই। এখানে এসে চাকরি তুমি করছই, আমার ফার্মে করতে তোমার আপত্তি কি? মালিকের মতই তুমি সেখানে থাকবে।

এলিজাবেথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যদি বাবার কাছ থেকে অনুমতি

পাই, নিশ্চয় তোমার সঙ্গে কাজ করব।

—তার মানে? লিণ্ডসে হোপ তীক্ষ্ম চোখে তাকায়, তার মানে চার্লসকে তুমি চিঠি লিখবে!

—হ্যাঁ।

—সে মত দেবে না।

নির্বিকার এলিজাবেথ উত্তর দেয়, তাহলে আমিও তোমার ফার্মে যোগ দিতে পারব না। বাবার বিনা অনুমতিতে আমি কোন কাজ করি না।

—অনুমতি! লিণ্ডসে হোপের গলায় শ্লেষ ফুটে ওঠে, আজকাল সারাক্ষণ যে কতগুলো কালো ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও, তার জন্যেও কি বাবার অনুমতি নিয়েছ?

এলিজাবেথ সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, কে বললে সে কথা?

—আমি কচি খোকা নই, তোমার গতিবিধির ওপর আমার সযত্ন দৃষ্টি আছে। মনে রেখ, কালোদের সঙ্গে মিশলে সমাজে তোমার স্থান ক্রমশ নীচেই নেমে যাবে, ওপরে উঠবে না।

এলিজাবেথের অসহ্য মনে হয়, কর্কশ কণ্ঠে বলে, আমি পছন্দ করি না আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ মাথা গলায়, নিজের ভাল-মন্দ আমি ঠিকই বুঝি।

লিণ্ডসে হোপ সেই জাতের মানুষ, মুখের উপর উত্তর যে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, তাই নিজেকে সংযত করার জন্যে সে উঠে পড়ল, আমি এখন চলি। তবে আমার অফার দেওয়া রইল, যা ভেবে ঠিক করবে জানিও। গুড্ বাই।

এলিজাবেথ অস্ফুটস্বরে বলল, গুড্ বাই।

জোরে জোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লিণ্ডসে হোপ। প্রতি পদক্ষেপে দাম্ভিকতার ঔদ্ধত্য।

মীনাক্ষী আর পীয়ের গেল অতুলমামার বাড়ি।

বলা বাহুল্য, চিত্রাঙ্গদার টিকিট বিক্রি করতে।

পীয়েরের আসবার ইচ্ছে ছিল না, বলতে গেলে মীনাক্ষী তাকে একরকম জোর করে নিয়ে এসেছে, এই সুযোগে ওর সঙ্গে অতুলমামাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।

অতুলমামা অভ্যাসমত ড্রইংরুমে বসে ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়ছিলেন, মীনাক্ষী-দের দেখে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পীয়েরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁদের আলাপ জমে উঠল।

পীয়েরকে অতুলমামার ভাল লেগেছে দেখে মীনাক্ষী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, বললে, তোমরা বসে গল্প কর, আমি দেখি মামী কি করছে।

মিসেস আইলীন চৌধুরী সবেমাত্র কুকুরকে চান করিয়ে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে তার লোম শুকুচ্ছিলেন, মীনাক্ষীকে দেখে আড়ষ্ট হাসলেন, ডার্লিং মীনা, হঠাৎ তুমি এ অসময়ে?

মীনাক্ষী অপ্রতিভ না হয়ে বললে, এসেছিলাম আমাদের শো'-এর টিকিট বিক্রি করতে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কবে বলতো?

—সামনের শনিবার, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা।'

—ও নো, বলে আইলিন চৌধুরী যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, এ তোমাদের কি অন্যায় বলতো? বেছে বেছে এমন দিনে 'শো' করছ, যেদিন আমি যেতে পারব না।

কেন তিনি যেতে পারবেন না, তার কারণ শোনবার প্রবৃত্তি মীনাক্ষীর হল না, প্রতি বছর 'শো'-এর আগে মিসেস চৌধুরী ওই একই ধরনের বিলাপ করেন, যেন 'শো' দেখবার তাঁর খুবই ইচ্ছে, অথচ তিনি যেতে পারছেন না।

আইলিন চৌধুরী মীনাক্ষীকে অবশ্য ভরসা দিয়ে বললেন, অতুল নিশ্চয় তোমাদের 'শো'-এ যাবে, যতদূর জানি, শনিবার ওর কোন এনগেজমেন্ট নেই।

মীনাক্ষী বিশেষ আগ্রহ না জানিয়ে জবাব দেয়, দেখি উনি কি বলেন।

— না, দেখাদেখির কিছু নেই, অতুল যাবেই। আমি জানি, কোন ভারতীয় 'শো' ও সহজে মিস করে না। আইলিন চৌধুরী এবার হাসলেন, হাজার হোক, তোমরা ভারতীয়েরা বেশ হোমসিক, তাই না?

—হয়তো তাই।

আর কথা না বাড়িয়ে মীনাক্ষী মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল। ওঁকে বলতেও ইচ্ছে করল না যে, মীনাক্ষী আজ একা আসেনি, তার সঙ্গে পীয়ের আছে।

মীনাক্ষীকে দেখে অতুলমামা কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আইলিন আসছে নাকি?

মীনাক্ষী ছোট্ট উত্তর দিল, না, উনি শীলুকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

—তাহলে ও পীয়েরের সঙ্গে আলাপ করবে না।

—আজ থাক না, আর একদিন হবে। একটু থেমে মীনাক্ষী বলে, আমি বলতে এসেছিলাম, যদি তোমরা চিত্রাঙ্গদার কয়েকটা টিকিট নাও।

অতুলমামা সোৎসাহে বললেন, নিশ্চয় নেব, অন্তত চারখানা রেখে যাও।

—মামী কিন্তু যেতে পারছেন না, ওঁর অন্য কাজ আছে।

কথাটা শুনেই অতুল মামা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন, ধীর স্বরে বললেন, তোমার মামীমা তো কোনবারই যান না, টিকিটগুলো রেখে যাও আমি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে যাব।

পকেট থেকে এক পাউন্ডের নোট বার করে মীনাক্ষীর দিকে এগিয়ে দিলেন, ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা উঠে দাঁড়াল। অতুলমামা পীয়েরের সঙ্গে করমর্দন করে আন্তরিক স্বরে বললেন, আলাপ করে বড় খুশী হলাম, সময় পেলে মাঝে মাঝে এস। ইওরোপের নতুন মানুষদের কথা জানতে বড় ইচ্ছে করে।

অতুল মামাকেও পীয়েরের বেশ ভাল লেগেছে। সাদাসিধে মানুষ, ইওরোপীয় ধাঁচে নিজের জীবনটাকে গড়বার চেষ্টা করলেও এখনও ভারতীয় মনের ছাপ সেখানে সুস্পষ্ট।

রাস্তায় নেমে পীয়ের বলে, সত্যি মীনা, তোমার কথা শুনে ভাল করেছি, অতুল মামার সঙ্গে আলাপ না হলে বুঝতে পারতাম না কেন তুমি ওঁকে অত শ্রদ্ধা কর।

মীনাক্ষী পথ চলতে চলতে বাঁকা হাসি হাসে, ভাগ্যিস আইলিন চৌধুরীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি।

—তাহলে কি হত?

—ইংরেজ সম্বন্ধে তোমার যে খারাপ ধারণা তা আরও বদ্ধমূল হত। কেন জানি না ভদ্রমহিলাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।

টিউব স্টেশন থেকে পীয়ের বিদায় নিল, সন্ধ্যেবেলা সে দেখা করবে সরোজের ফ্ল্যাটে।

বাড়ি ফিরে জামা কাপড় বদলে সবেমাত্র মীনাক্ষী রান্নার যোগাড় করতে শুরু করেছে এমন সময় ফোন এল অতুল মামার, আমি একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই মীনা।

মীনাক্ষী মনে মনে শঙ্কিত হল, এতক্ষণ যাঁর বাড়িতে কাটিয়ে এসেছে হঠাৎ তিনি আসতে চাইছেন কেন?

ঢোক গিলে প্রশ্ন করে, বিশেষ কোন দরকার আছে কি অতুল মামা?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাড়িতে বললে না কেন?

—তখন ঠিক খেয়াল হয়নি, একটু থেমে বললেন, বেশীক্ষণ সময় নেব না, আমি একবার আসতে পারি?

—এস।

টেলিফোন রেখে দিয়ে মীনাক্ষী অনেক ভাবলে, কি হতে পারে, কেন অতুল মামা আসছেন, কিন্তু কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই সে খুঁজে পেল না।

অতুলমামা এলেন আধঘন্টার মধ্যে। ব্যস্তভাবে ওপরে এসে চেয়ারে বসলেন। মামুলী দু-চারটে কথার পর অতুলমামা আসল কথায় এলেন, জানি না একথা তোমায় বলা উচিত কিনা। কিন্তু আমি তোমার লোকাল গার্জেন, তাই যা বলা উচিত মনে হচ্ছে বলছি। যদি মনে কর শোনার দরকার নেই শুনো না, ভুলে যেয়ো একথা তোমায় আমি বলেছি।

অতুল মামার ভণিতা শুনতে ভাল লাগে না মীনাক্ষীর, তবু বিরক্তি চেপে হেসে বলে, কি বলবে তাই বল না।

অতুল মামা পাইপ ধরালেন, মীনাক্ষী, জীবনটাকে যত দেখছি তত মনে হচ্ছে এর জটিলতা যেন ক্রমশ বাড়ছে, আপাতদৃষ্টিতে যা সহজ বলে মনে হয় আসলে কিন্তু তা নয়।

—তুমি কি নিয়ে কথা বলছ?

অতুল মামা এক দৃষ্টিতে মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকালেন, পূব আর পশ্চিম দুটো আলাদা দেশ, সেখানে বাস করে দুটো আলাদা জাত, মেলে না, মিলতে পারে না। বুদ্ধি দিয়ে যেসব সমস্যার সমাধান করা সহজ, হৃদয় দিয়ে কিন্তু তা করা যায় না। আমি নিজে ভুক্তভোগী, তাই তোমাকে বলতে এসেছি।

মীনাক্ষী বিস্মিত হয়, কিন্তু কেন?

—বললাম তো, যদি দরকার না থাকে শুনো না। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।

মীনাক্ষী এবার হেসে ফেলে, কেন তুমি হেঁয়ালী করে কথা বলবার চেষ্টা করছ অতুল মামা, যা তোমার অভ্যেস নেই।

অতুল মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, এ বড় কঠিন সত্য।

—তাহলে তোমাকে ভরসা দিয়ে রাখি, আমাকে নিয়ে তোমার কোন ভয় নেই।

অতুল মামা উঠে দাঁড়ালেন, ভয়ের কথা নয় মীনাক্ষী, পীয়েরকে যদি আমার নিজেরই এত ভাল না লাগত, ছুটে এসে এ উপদেশগুলো তোমায় আমি দিতে আসতাম না। বড় চমৎকার ছেলে, বড় সরল বড় সহজ। ওকে উপেক্ষা করা শক্ত।

মীনাক্ষী খিল খিল করে হেসে উঠল, না মামা, সত্যিই তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, পীয়ের আমার বন্ধু, তার বেশী কিছু নয়।

অতুল মামা নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, হয়ত কথাগুলো না বললেই ভাল করতাম, কি জানি।

বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে তিনি নেমে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার কাজে লেগে গেল মীনাক্ষী। বেচারী অতুল মামার উদ্বিগ্ন মুখখানা মনে মনে চিন্তা করে সে হাসল, সত্যিই তাহলে পীয়েরকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে, তা না হলে মীনাক্ষীকে নিয়ে এত ভয় তিনি পেতেন না। আশ্চর্য, এতদিন ইওরোপে থেকেও ছেলেমেয়ের সহজ সম্পর্কটাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

রান্না করতে করতে মনে হল আজ সন্ধ্যেবেলা পীয়েরকে যখন সে অতুল মামার কথা বলবে কিছুতেই পীয়ের তার হাসি থামাতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত পেটে হাত দিয়ে সে খাটের ওপর শুয়ে পড়বে, সত্যিই কি ছেলেমানুষ পীয়ের। সামান্য কথায় কি মারাত্মক হাসে, ওর নীল চোখ দুটো দুষ্টুমিতে ছলছলিয়ে ওঠে।

কিন্তু অতুল মামা পীয়েরের সঙ্গে আলাপ করে এমন কি জানতে পেরেছেন যার জন্যে তিনি এতটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তবে কি পীয়ের তাঁকে কিছু বলেছে।

কেন জানা নেই মীনাক্ষীর মন একটা উজ্জ্বল আশায় ভরে উঠল। এতদিন পর্যন্ত পীয়েরের জন্যে মীনাক্ষী বন্ধুত্বের আসনটুকু নির্দিষ্ট করে রেখেছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল সে আসন বোধহয় যথাস্থানে পাতা হয়নি।

এ ভাবান্তর ঘটাতে সাহায্য করল একজন। সে অতুল মামা।

সেদিন ব্লেনহিম ক্রেসেণ্টের পুরোন আড্ডায় একটাও টিকিট বিক্রি করতে না পেরে বিফল-মনোরথে বাড়ি ফিরছিল সৌরেন, এমন সময় হঠাৎ পিকাডেলীর টিউব স্টেশনে দেখা হয়ে গেল একটি ছেলের সঙ্গে। প্রথমটা সৌরেন লক্ষ্য করেনি, কিন্তু ছেলেটি নিজে থেকে এগিয়ে এল, পেছন থেকে ডেকে বললে, এই যে সৌরীদা, কদ্দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হল।

সৌরেন ফিরে তাকিয়ে হাসল, কি খবর পল্টু!

এ ধরনের হঠাৎ দেখা হলে যেরকম অসংলগ্ন কথাবার্তা হয়ে থাকে, তাই হল। দুজনেই পরিচিত আত্মীয়স্বজনের কুশল প্রশ্ন করে; যদিও উত্তর শোনার জন্যে বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যায় না। মামুলী কথোপকথন।

কিন্তু তারই মধ্যে সৌরেন পল্টুর আপাদমস্তক ভাল করে লক্ষ্য করেছে, পরনে তার ভাল স্যুট, চেহারাও নিঃসন্দেহে আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়েছে, জিজ্ঞেস করলে, কোথায় আছিস?

পল্টু হাসল, সেই আগের জায়গায়।

—কোথাও কাজ পেয়েছিস?

—এখনও পাইনি, তবে চেষ্টায় আছি।

—তুই এসেছিস তো অনেকদিন।

পল্টু গলার টাইটা এঁটে নেয়, তা ছ' মাস হল বইকি।

এবার সৌরেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, কারণ এতদিনেও যখন পল্টু কাজ যোগাড় করতে পারেনি, নির্ঘাত টাকা ধার চেয়ে বসবে। তাই সৌরেন অযথা ব্যস্ততা

দেখায়, চালিয়ে, কাজ আছে।

পল্টু কিন্তু নাছোড়বান্দা, কোথায় যাচ্ছ সৌরীদা? সত্যি, মাইরি, কদ্দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা—

—বড্ড ঝামেলায় রয়েছি, আমাদের 'চিত্রাঙ্গদা'র শো হচ্ছে, তারই টিকিট বিক্রি করে বেড়াচ্ছি।

সৌরেন ভেবেছিল টিকিটের নাম শুনলেই পল্টু নিজে থেকেই পালাবে, যেমন আর সবাই পালাচ্ছে। কিন্তু তা হল না, পল্টু সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলে টিকিটের দাম কত?

সৌরেন শুকনো উত্তর দেয়, পাঁচ শিলিং।

—আমাকে দুখানা টিকিট দাও।

—কেন, কিনবি?

সৌরেনের বিস্ময় দেখে পল্টু হেসে ফেলে, আশ্চর্য হচ্ছ?

—হচ্ছি বইকি, সারা লণ্ডনে এতজনের কাছে গেলাম, কিন্তু কেউ তো যেচে টিকিট কাটেনি। একরকম জোর করে গছিয়ে আসতে হয়েছে। অথচ তুই—

পল্টু পাদপূরণ করে, চাকরি-বাকরি করি না, টিকিট কিনছি কি করে? একটু থেমে, সৌরেনের মুখটা ভাল করে দেখে নিয়ে পল্টু বলো যায়, এক দিদি পেয়েছি, সে কিনবে।

সৌরেন সত্যিই খুশী হয়, সে যেই কিনুক, টিকিট দুটো তোর হাতেই দিয়ে দি?

—দাও।

সৌরেন হাতের ব্যাগ থেকে টিকিট বার করে। পল্টু কি যেন ভাবছিল, বললে, এক কাজ কর সৌরীদা, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি দিদিকে ফোন করি, তাতে হয়ত তোমার দু-চারটে টিকিট বেশী বিক্রি হতে পারে।

—বেশ তো।

—আমি এখুনি ফোন করে আসছি।

পল্টু একরকম ছুটতে ছুটতে টেলিফোন বুথের দিকে এগিয়ে গেল।

সৌরেন একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য, এই সেই পল্টু। কলকাতায় তাদেরই পাড়ার ছেলে। ক্লাবে খেলাধুলো করত, পড়াশুনোয় মন্দ নয়, বাড়ির অবস্থাও মোটামুটি। সৌরেন বিলেতে চলে আসার পর মাঝে মাঝে পল্টু চিঠি লিখত, বিলেতের কথা জানতে চাইত। বলা বাহুল্য, সৌরেন কোন চিঠিটারই উত্তর দেয়নি। এ ধরনের এত চিঠি দেশ থেকে আসে যে, উত্তর দেওয়া সম্ভবও হয় না।

কিন্তু মাস কয়েক বাদে হঠাৎ এক চিঠি এল পল্টুর কাছ থেকে, চিঠির ওপর এডেনের ছাপ। সে লণ্ডনে আসছে। সৌরেনকে অনুরোধ করেছে, স্টেশনে আসবার জন্যে।

তখন সৌরেন অফিসে কাজ করছে, পল্টুকে সে বরাবর পাড়ার ছেলে হিসেবেই দেখেছে, তার বেশী আর কিছু নয়। কি পড়তে সে লণ্ডনে আসছে, কোন কথাই চিঠিতে লেখা ছিল না। টাকাই বা সে যোগাড় করল কোত্থেকে? ভেবে পেল না সৌরেন, তবু সে নির্দিষ্ট দিনে সেণ্ট প্যান্‌ক্রাশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হল।

ট্রেন থেকে নেমেই পল্টু সৌরেনের হাত দুটো সোচ্ছ্বাসে চেপে ধরল, তুমি যে আসবে, আমি ঠিক জানতাম, মাইরি সৌরীদা, দিব্যি দেখাচ্ছে তোমায়। গাল দুটো আপেলের মত গোলাপী হয়েছে যে।

সৌরেন শুকনো হেসে কাজের কথা পাড়ে, কোথায় উঠবি ঠিক করে এসেছিস?

পল্টু নির্বিকার উত্তর দেয়, না।

—তাহলে!

—কেন, তুমি তো আছ।

সৌরেন বোঝাবার চেষ্টা করে, এ ত আর কলকাতা নয়, লণ্ডন। আমি একটা সীট নিয়ে আছি, তোকে কোথায় ওঠাব? অবশ্য হোটেলে উঠতে পারিস, রাসেল স্কোয়ারের দিকে চেষ্টা করলে হয়ত সস্তায়—

পল্টু ফ্যালকা হাসে, টাকা কোথায়?

—তার মানে?

পল্টু আঙুল দিয়ে গুণে কি হিসেব করে, পাউণ্ড দশেক আছে।

—তাই নিয়ে তুই চলে এসেছিস?

পল্টু আগের মতই উত্তর দেয়, কি করব! কেউ যে আর টাকা ধার দিল না।

সৌরেনের রাগ হয়, তবে এলি কেন?

—বাঃ, জীবনে দাঁড়াতে হবে না!

—না খেতে পেয়ে মরবে এখানে, বুঝলে?

পল্টু কিন্তু এতটুকু ব্যথিত হল না, বললে, তুমি আর আমায় কত বকবে সৌরীদা, চেনা-অচেনা যত আছে সকলেই তো আমাকে গালাগাল করেছে। তারপর দেখ না, যখন চাকরি-বাকরি নিয়ে দেশে ফিরব, দেখবে শালারা সব মালা নিয়ে পেছনে ছুটবে।

সৌরেনের বাজে বকতে ভাল লাগে না, বলে, এখন কি করবি, তাই বল।

—তুমি ঘাবড়ো না সৌরীদা, তুমি যে স্টেশনে এসেছ এই আমার অনেক ভাগ্য। হাওড়া থেকে যেদিন ট্রেনে উঠলাম, সবাই-এর বাড়ি থেকে আত্মীয়স্বজন এসেছে দেখা করতে, আমার শালা কেউ নেই। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, দেখছি অনেকে কান্নাকাটি করছে। ট্রেন যখন ছেড়ে দিয়েছে দেখি প্ল্যাটফরমে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আসছেন, হাতে একটা গাঁদা ফুলের মালা, চিনতে পারলাম, আমার ট্র্যাভেল এজেণ্ট।

সৌরেন মুখ তুলে তাকাল।

পল্টু আগের মতই বলে যায়, ভদ্রলোক নতুন কোম্পানী খুলেছেন, আমি তার প্রথম খদ্দের, তাই মালা নিয়ে ছুটে এসেছেন। মালাটা ফস্‌কে গেল অবশ্য, কিন্তু সৌরীদা চোখে আমার জল এসে গিয়েছিল। ভাবতেও ভাল লাগল একজন তবু তুলে দিতে এসেছে। আবার তুমি এখানে নামিয়ে নিলে, এই তো অনেক।

সৌরেন এতক্ষণে কথা বলে, তাহলে উঠবি কোথায়?

—জাহাজে দুটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাদের জানা সস্তার আস্তানা আছে, সেখানেই যাব।

—ঠিকানা জানিস?

—না। সেখানে উঠে তোমায় চিঠি দেব। তারপর একদিন দেখা করা যাবে, কি বল?

সৌরেন সেদিন পল্টুর কাছ থেকে স্টেশনেই বিদায় চেয়ে নেয়। সারা রাস্তা সে ভেবেছে কিসের আশায় এ-ছেলেগুলো এখানে আসে, এরা কি মনে করে লণ্ডনে এলেই এক-একজন কেউকেটা হয়ে যাবে, খুব বেশী হলে হয়ত কেরানীর চাকরি করবে, বিশেষ করে পল্টুদের বাড়ির কথা জানে বলেই সৌরেনের এত খারাপ লাগছে,

নিশ্চয় ঝগড়া-ঝাঁটি করে চলে এসেছে। ক'দিন বাদেই এসে টাকা ধার চাইবে। যার পুঁজি মাত্র দশ পাউন্ড, সে আর ক'দিন টাকা ধার না করে লণ্ডনে থাকতে পারবে!

যথাসময়ে পল্টু চিঠি লিখেছিল, তার বাসার ঠিকানা দিয়ে।

প্রথমে সৌরেন ভেবেছিল দেখা করবে না, কিন্তু একদিন বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশনের কাছ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল পল্টুদের ঠিকানায় ঢুঁ মেরে গেলে হয়, এই অঞ্চলেই যখন সে থাকে!

অল্প খুঁজেই বাড়িটা পেয়ে গেল সৌরেন। লণ্ডনের বাড়িগুলোর একটা মজা, বাইরে থেকে দেখলে ভেতরের অবস্থা বোঝবার উপায় নেই। এক-এক রাস্তায় একই ধরনের বাড়ি, নম্বর জানা না থাকলে চেনা বাড়িও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

সৌরেনের বেলের উত্তরে যে ভদ্রলোক দরজা খুললেন তিনি ভারতীয়, অ-বাঙালী। হেসে আপ্যায়িত করলেন, কাউকে খুঁজছেন?

পল্টুর নাম বলল সৌরেন।

—সোজা ওপরে চলে যান, তিনতলায়, সিঁড়ির ডান দিকের ঘর।

ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরেন ওপরে উঠল।

সিঁড়িতে পা দিয়েই বুঝতে পারল ধাপগুলো সোজা নয়, এবড়ো খেবড়ো। তার ওপরে দড়ির কার্পেট শতছিন্ন, প্রতি পদক্ষেপে ধুলো উড়ছে। আলো নেই বললেই হয়, অন্ধকারের মধ্যে অতিকষ্টে রেলিং ধরে ধরে সে ওপরে ওঠে।

দরজায় টোকা মারতে পল্টুর গলা শোনা গেল, ভেতরে চলে এস, কাম্ ইন, অন্দর আইয়ে—

সৌরেনকে ঘরে ঢুকতে দেখে পল্টু আনন্দের আতিশয্যে লেপ ছেড়ে উঠে বসল, আরে সৌরীদা, তুমি? আমাকে খুব আশ্চর্য করেছ।

সৌরেন হাসল, কেন, তুই ভেবেছিলি আমি আসব না?

—তা নয়, তবে—

পল্টু ইচ্ছে করেই যেন কথাটা শেষ করে না।

সৌরেন ঘরের চারদিকটা দেখে। ছোট ঘর। তার মধ্যে তিনখানা খাট পড়েছে। হাঁটবার আর জায়গা নেই বললেই হয়। একপাশে একটা দেয়াল আলমারি, তারই মধ্যে যাবতীয় জিনিসপত্র, হয়ত দু-চারটে স্যুটকেস খাটের নীচে আছে।

পল্টু বললে, আমরা তিনজনই এই ঘরে আছি।

সৌরেন জিজ্ঞেস করে, অসুবিধে হয় না?

—হলে আর করছি কি?

—কত ভাড়া?

—দু' পাউন্ড দশ শিলিং।

সৌরেন ঠিক বুঝতে পারে না, একজনের?

পল্টু হো-হো করে হাসে, তুমিও যেমন, তিনজনের। সারা সপ্তাহে ওই টাকা দিই।

—বলিস কিরে? সৌরেন আশ্চর্য না হয়ে পারে না। বত্রিশ টাকা তিনজনে দিস?

পল্টু মুরুব্বি চালে পা নাড়ায়, তার উপর ব্রেকফাস্ট আর ডিনার।

—কি করে হবে, আমি তো বুঝতে পারছি না।

পল্টু আহারের ফিরিস্তি শোনায়, সকালে চা, টোস্ট, মাঝে মধ্যে কর্ন ফ্লেকস, ডিনারের সময় হাতে-গড়া রুটি, ডাল, খানিকটা তরকারি।

এত সস্তায় যে লণ্ডনে থাকা সম্ভব, সৌরেন তা সত্যিই জানত না। সবচেয়ে কমে সে থেকেছে ব্লেনহিম ক্রেসেণ্টে, তিন পাউণ্ড এক একজনের ভাড়া প্রতি সপ্তাহে। তার বদলে পায় শোবার বিছানা, প্রাতরাশ আর ডিনার। কিন্তু আজ যা পল্টু শোনাল, তা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত।

কৌতূহলী সৌরেন প্রশ্ন করে, এ-বাড়ির মালিক কে?

—এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। আমরা ডাকি মিঃ দারা বলে। মনে হয় ভদ্রলোক শিখ, তবে চুল দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন। এখন নিজের পরিচয় দেন শুধু ভারতীয় বলে।

সৌরেন নিজের মনেই বলে, জায়গাটা জানা রইল, তোর মত অনেক ছেলেই তো হুট্ করে এসে পড়ে, এখানে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

সেদিন সৌরেন পল্টুর কাছে ঘণ্টাখানেক গল্প করে চলে আসে, আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়েই বুঝতে পেরেছিল পল্টুর দুই স্যাঙ্গাত রোজ চাকরির জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পল্টু এখনও চুপচাপ বাড়িতেই বসে আছে। ওর মতে তিন-জনে একসঙ্গে বেরুলে পয়সা বেশী খরচা হবে, পুঁজি ফুরিয়ে যাবে শীগগির। তার চেয়ে দফে দফে চেষ্টা করা ভাল।

তবু সৌরেন জিজ্ঞেস করেছিল, তোর ইচ্ছেটা কি?

নির্বিকার পল্টু উত্তর দিয়েছে, কোন একজিকিউটিভ পোস্টের জন্যে ট্রেনিং নেব।

—কোন্ লাইনে?

—এখনও ঠিক করিনি।

—কোথাও দরখাস্ত করেছিস?

—না।

ওর কথার ধরনে সৌরেন বিরক্ত না হয়ে পারে না, শুধু এইটুকু বলে রাখি, ইংরেজ খুব কনজারভেটিভ জাত, ধরবার লোক না থাকলে এখানে কোন সুবিধে করতে পারবে না।

পল্টু কথাটা কানেই তোলে না, বলে, দেখি না চেষ্টা করে, মিথ্যে কেরানী হবার জন্যে তো এদেশে আসিনি।

—ওসব বলতে ভাল, কিন্তু যার পুঁজি দশ পাউণ্ড, তার মুখে ও-কথা মানায় না।

পল্টু কিন্তু দমলো না, আর-একটা পুঁজি আমার আছে, যা হয়ত অনেকের নেই।

সৌরেন ভুরু কোঁচকায়, কি সেটা?

—ambition. দেখ সৌরিদা, একদিন আমি বড় হব। বড় অফিসে কাজ করব, গাড়ি, বাড়ি সব করব। তার জন্যে কষ্ট করতে হবে বইকি।

সৌরেনের আর কথা শুনতে ভাল লাগে না, আচ্ছা আবার পরে দেখা হবে, বলে সে উঠে পড়েছিল। মনে মনে সে হেসেছে, এ ধরনের ambition একদিন তারও ছিল, কিন্তু কি হল? দেশে থাকতে কোনরকমে সুযোগ না পেয়ে পালিয়ে এসেছিল বিদেশে, এখানেও তো সেই এক অবস্থা। বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে ভারতীয় দূতাবাসে কেরানীর চাকরি না পেলে তাকেও রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত। এর ভবিষ্যতই বা কি? হয় এখানে এইভাবে পড়ে থাকা, না হয় দেশে ফিরে গিয়ে আবার চাকরির প্রথম ধাপ থেকে শুরু করা। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যেদিকেই তাকাও নৈরাশ্যের জমাট মেঘ দেশ থেকে বিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পল্টু নতুন এসেছে, তাই সে বড়াই করছে তার ambition নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় তাকেও নৈরাশ্য-

বাদীদের দলে নাম লেখাতে হবে। হয়ে দাঁড়াবে একের নম্বর সিনিক্‌।

এরপর দু'একবার পল্টুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়, চুলে তেল নেই। জামা কাপড়ের অবস্থা খারাপ, চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে, তবু সে হাসতে হাসতে বলেছে, জোর লড়াই চলেছে সৌরিদা, আমার ambition-এর সঙ্গে এখানকার সামাজিক পরিস্থিতির।

হয়ত সৌরেন জিজ্ঞেস করেছে, কে জিতবে মনে হচ্ছে?

আগের মতই পল্টুর নির্ভীক উত্তর, জিততে আমাকে হবেই, হার স্বীকার আমি কিছুতেই করতে পারব না।

সৌরেন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, এখন চালাচ্ছিস কি করে?

পল্টু হাসল, খুব অভাবে পড়লে ল্যায়ান্‌স্‌ এর দোকানে ডিশ্‌ ধুই, চলে যাচ্ছে কোনরকমে।

—তোর বন্ধুদের কি হল?

—দু'জনেই কাজে ঢুকে পড়েছে।

—কি কাজ?

—যা সবাই করে, কুলি কিংবা কেরানী।

কথাটা সৌরেনকে বিঁধল। মনে হল, পল্টু তাকেই আঘাত দিয়ে বলছে, বলে, দেখা যাক্‌ আমাদেরই দলে তোমায় শেষ পর্যন্ত নাম লেখাতে হয় কিনা?

পল্টু হাসতে হাসতে বলল তার আগে দেশে ফিরে যাব।

সৌরেন বিদ্রূপ করে, যাব বললেই বুঝি যাওয়া যায়, প্যাসেজের টাকা পাবি কোথায়?

পল্টু তবুও দমল না, জাহাজে খালাসীর চাকরি নেব। কিন্তু তবু বিদেশে এসে কেরানী হব না।

সৌরেনের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে পল্টু চলে গেল।

তার সঙ্গে আবার এতদিন বাদে এই পিকাডেলী স্টেশনে দেখা। সাজ পোশাক, চেহারা, সব কিছুর উন্নতি দেখে সৌরেন সত্যিই বিস্মিত হয়েছে। অনেক কথা জানবার ইচ্ছে হলেও সৌরেন চেপে রাখে, নিজে থেকে যেচে পল্টু টিকিট কাটতে চেয়েছে এইটিই তার কাছে বড় কথা।

টেলিফোন বুথ্‌ থেকে ফিরে এসে পল্টু হাসতে হাসতে বললে, মাইরি সৌরিদা, তোমার ভাগ্য খুব প্রসন্ন, দিদি তোমায় যেতে বলেছে।

সৌরেন মুখ তুলে তাকায়, কোথায়?

—কোথায় আবার, ওর বাড়িতে। ঠিকানা তোমায় লিখে দিচ্ছি। তবে কথা শুনে মনে হল তোমার খান দশবারো টিকিট ও নেবে।

সৌরেনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তাহলে তো বেঁচে যাই। টিকিট নিয়ে আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয় না, আমার টিকিট বিক্রির কোটা পুরো হয়ে যাবে।

—তবে আর দেরী নয়, আজ বিকেলেই চলে যেয়ো।

পল্টু সৌরেনের ডায়রীতে নাম ঠিকানা লিখে দিলে। ভদ্রমহিলার নাম মলিনা দাস।

এক একটা এমনই আশ্চর্য নাম আছে যা শুনলেই মনে হয়, অতি পরিচিত। কিছুতেই মনে পড়তে চায় না সাহিত্যের পাতায় ওই নামের কোন চরিত্রের সঙ্গে

পরিচয় হয়েছে, না বাস্তব জীবনে কারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। চাক্ষুষ দেখা না হলেও এ নামগুলো অন্যের মুখে বার বার শুনে মনে হয়, হয়ত বা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে। অবশ্য দেখা হবার পর সে ভুল ভেঙ্গে যায়।

আজ মলিনা দাসের নাম শুনে ওই একই ধরনের চিন্তা উঁকি মেরেছিল সৌরেনের মনে, কিন্তু ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হবার পর তার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল, শুধু নামটাই যে তার চেনা মনে হয়েছিল তা নয়, চেহারা দেখে বুঝতে পারল কলকাতার বহু জায়গায় এ ভদ্রমহিলাকে সে দেখেছে। উনি কে? তখনও বুঝতে পারেনি, আজও বুঝল না। তবে তিনি যে অসামান্যা রূপসী সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

মলিনা দাসের বয়স কত আন্দাজ করা কঠিন। টানা টানা কালো চোখ, কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো চুল। প্রসাধনের গুণে মুখে এখনও নবযৌবনের ঔজ্জ্বল্য। নিখুঁত সাদা দাঁত, হাসলে মুক্তোর মত ঝকমক করে। সৌরেনকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। আপনি পল্টুর বন্ধু? সহজ পরিষ্কার কথা বলার ভঙ্গি।

—বন্ধু ঠিক নয়, আমি ওর দাদার বয়সী।

মলিনা দাস কৌতুক করে হাসে, কত আর বয়স আপনার, খুব বেশী হলে ত্রিশ।

—তার চেয়েও কম।

—তাহলে আর 'আপনি' বলব না, বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট।

মলিনা দাসের কথা বলার তারিফ না করে উপায় নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সৌরেনের সঙ্গে তার আলাপ জমে উঠল। কলকাতায় সে কোথায় থাকে, কি করে, পরিবারে আর কারা আছেন, সব কথাই সে জেনে নিল অতি সহজে। অন্যের পেট থেকে যেন পাম্প করে কথা বের করে নেবার শক্তি আছে তার!

চা ঢালতে ঢালতে মলিনা দাস তরল কণ্ঠে জিগ্যেস করে, কলকাতায় তুমি আমায় কোথায় দেখেছ?

সৌরেন ভাববার চেষ্টা করে, ঠিক মনে করতে পারছি না।

—ক্রিকেট খেলার মাঠে?

—হয়তো হবে।

—তাহলে নিশ্চয় দেখেছ, আমি স্পেশাল গেস্ট-এর চেয়ারে বসে আছি কিংবা ঘুরে বেড়াচ্ছি প্যাভিলিয়নে আর আমার কোট হাতে করে বয়ে বেড়াচ্ছিল কলকাতার কোন এক প্রচণ্ড ধনী।

কথা বলতে বলতে মলিনা দাস হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—রেস কোর্স, সিনেমা, নাইট ক্লাব, হোটেলে, যেখানেই হোক যদি আমায় দেখে থাক, নিশ্চয় সঙ্গে দেখেছ কলকাতার অনেক নামকরা পুরুষকে।

সৌরেনের কোন কথা বলার ছিল না, সে শুধু ফ্যালফা করে হাসে।

মলিনা দাস নিজের মনেই বলে যায়, কলকাতার জীবন তো অনেক দেখলাম, বড় একঘেঁয়ে লাগছিল, তাই চলে এসেছি লণ্ডনে, দেখি কিছুদিন থেকে।

একটু থেমে সৌরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বলে, আমার কথা-বার্তাগুলো শুনতে অদ্ভূত লাগছে, তাই না?

—কই, না।

—বোকা ছেলে, মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি, তবু মুখে বলবে, 'না'—যাকগে ও-কথা, কি নাটক করছ তোমরা?

—চিত্রাঙ্গদা।

মলিনা দাস চোখ দুটো বড় বড় করে উৎসাহ দেখিয়ে বললে, তাই নাকি? খুব ভাল কথা। বেশ ভিড় হয়? অনেক লোক আসে? টিকিটের দাম কত?

অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে শুনে সৌরেন বিব্রত হয়ে পড়ে, লোক মানে, দেখুন টিকিট বিক্রি হলে, বেশী তো দাম নয়—

—ক'টা টিকিট আমায় কিনতে হবে?

সৌরেন এবার হাসে, তা আমি কি করে বলব।

মলিনা দাস ছেলেমানুষের মত কথা বলে, ক'খানা আছে তোমার ঝুলিতে?

তা প্রায় খান ষোল হবে।

—বেশ তো, সব ক'টাই রেখে যাও।

সৌরেন এতটা আশা করেনি। বেশী মাত্রায় খুশী হয়ে বলে, সত্যি আপনি নেবেন?

মলিনা দাস তুমি থেকে তুইতে নেমে এলেন, তুই কি ছেলেরে? আমি বলছি, বিশ্বাস করতে পারছিস না? তবে ধর, আগে টাকাটা দিয়ে দি।

ব্যাগ খুলে চার পাউণ্ডের নোট বার করে সৌরেনের দিকে এগিয়ে দেয়, তোদের থিয়েটার তো দেখতে যাবই, তার পরও মাঝে মাঝে আসিস এখানে। নিজের মুখে বড়াই করছি না, কিন্তু সত্যিই আমি ভাল মাছ রান্না করতে পারি, পল্টুকে জিজ্ঞেস করিস, ও অন্তত সাক্ষী দেবে।

কথা হয়ত আরও চলত, এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় কে টোকা মারল। দরজা খুলে দিতে এক সুদর্শন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, পরনে তাঁর যথেষ্ট দামী স্যুট। হেসে বললেন, অসময়ে বিরক্ত করছি না তো?

মলিনা দাস উত্তর দেয়, মোটেই না, তবে বেশিক্ষণ বসতে পারব না, এ'র সঙ্গে আমার বেরোবার কথা আছে। আলাপ করিয়ে দি, আমার বন্ধু মিঃ লাহিড়ী। আর উনি কলকাতার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী মিঃ সোম।

সৌরেন যদিও বুঝতে পারল না মলিনা দাস কেন তার সঙ্গে বেরোবার কথা বলল, তবু চুপ করে রইল।

মিঃ সোম সৌরেনকে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলেন, ভাববাচ্যে প্রশ্ন করলেন, এখানে কি করা হয়?

সৌরেনের আগেই উত্তর দিল মলিনা, নামজাদা স্কলার, রিসার্চ করতে এসেছে এখানে, আমার সঙ্গে কলকাতা থেকেই পরিচয়। বেচারী ক'দিন থেকেই বলছিল, সময় পাইনি। তাই আজ ওর সঙ্গেই খেতে যাব বলে ঠিক করেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না মিঃ সোম। আপনার সঙ্গে পরে একদিন দেখা হবে।

মিঃ সোম আর বেশিক্ষণ বসলেন না, দু-চারটে মামুলী কথা বলে বিদায় নিলেন। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে হাসতে লাগল মলিনা দাস, দুষ্টুমির হাসি। সোম সাহেবকে আজ আচ্ছা দিয়েছি। ঈর্ষায় জ্বলতে জ্বলতে যাচ্ছে। রাত্রে ওর ঘুম হবে না।

বিস্মিত সৌরেন প্রশ্ন করে, মিথ্যে এরকম বললেন কেন?

মলিনা দাস আরও হাসে, তুই নেহাতই বুদ্ধু। এমনি করে পুরুষ মানুষকে খেলাতে হয়, তোকে rival ভেবে ক্ষেপতে ক্ষেপতে ও পাগলা চলে গেছে। কালই দেখবি, দামী প্রেজেন্ট নিয়ে এসে হাজির হবে; যা, তোর মত রিসার্চ স্কলারের দেবার সামর্থ্য নেই। আমি সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখব, সোমের পছন্দর তারিফ করব, সে

আমায় নিয়ে যাবে দামী হোটেলে। এই তো নাটক!

সৌরেনের কান লাল হয়ে উঠেছিল, মলিনা দাস তাকে সোম সাহেবের rival করে দাঁড় করিয়ে দেবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। হাসবার চেষ্টা করে বলে, আপনি বেশ মজা করতে ভালবাসেন।

মলিনা দাস ভাষাটা শুধরে দেয়, মজা ঠিক নয়, খেলা করতে ভালবাসি, একেবারে আগুন নিয়ে খেলা।

শেষের কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মলিনা দাসের চোখের দৃষ্টি গেল বদলে। শিকারী পাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ঝিলিক একবার ফুটে উঠে আবার যেন মিলিয়ে গেল। নির্বাক দর্শকের মতই সৌরেন তা দেখলেও বোধহয় তার অর্থ বুঝতে পারল না। ইচ্ছে করেই চোখটা সরিয়ে নিল।

শুনতে পেল মলিনা দাস আগের মত সহজ গলায় বলছে, তোর কি আক্কেল রে, আজকে রিহার্সাল আছে বললি, যেতে হবে না? দিদির সঙ্গে আড্ডা মারলেই চলবে?

সৌরেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, হ্যাঁ, আজ আমি যাই। টিকিটগুলো কেনার জন্যে অনেক ধন্যবাদ—

—থাক তোকে আর পাকামি করতে হবে না। আবার কবে আসবি বল?

সৌরেন উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, চিত্রাঙ্গদা হয়ে যাক, তারপর আসব একদিন। কিন্তু 'শো'এর দিন নিশ্চয় আসবেন।

—আসব রে আসব, তা নইলে মিছিমিছি কেউ অতগুলো টিকিট কেনে। দেখিস না, একপাল সোম সাহেব সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ওর কথার ধরনে সৌরেন এবার প্রাণখুলে হাসে, নিজের অজান্তেই বলে, তোমার মত কথা বলতে আমি অন্য কোন মেয়েকে শুনিনি।

মলিনা দাস রাগাবার জন্যে বলে, কেন, চেহারাটার কথা বলতে বুঝি লজ্জা পেলি?

সৌরেন কিন্তু এবার লজ্জা পেল না, সজোরে হাসল, তোমার সঙ্গে কেউ কথায় পারবে না। প্রথম আলাপেই তুমি আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছ মলিদি।

মলিনা তাড়তাড়ি খেই ধরিয়ে দিয়ে বলে, এই কথাটুকু স্মরণ রাখলে খুশী হব যে, আমি তোর মলিদি।

সেদিন মলিনা দাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরোজদার ফ্ল্যাট পর্যন্ত সৌরেন শুধু এই নতুন আলাপ হওয়া মেয়েটির কথা ভেবেছে। এত সহজে যে একজন অপরিচিতকে এতখানি কাছে টেনে নেওয়া সম্ভব, তা তার ধারণায় ছিল না। যদিও তার মনে হয়েছে মলিনা দাসকে ঘিরে কিরকম যেন একটা রহস্য আছে। হয়ত তার জন্যে মনে মনে শঙ্কিতও হয়েছে, তবু ভাল লেগেছে তার সান্নিধ্য, তার এই সহজভাবে কাছে ডেকে নেওয়া।

রাজ দর্শনের আশায় সারবন্দী হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার দু'ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লণ্ডনবাসীর আমোদ প্রমোদের তালিকার একটি বিশেষ অঙ্গ। কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই আরও পাঁচ জন এসে সেখানে জড় হয়। প্রথমে যারা এসে ভিড় করে তারা হল বিশেষজ্ঞ, রাজবাড়ির খুঁটিনাটি খবর তাদের নখদর্পণে। কবে কোন সময় কাউকে না জানিয়ে স্বয়ং রানী যাবেন 'হ্যারডে'র দোকানে বাজার করতে কিম্বা কোনদিন সন্ধ্যেবেলা রাজকুমারীর বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে নাচতে যাবার কথা, এমনকি শিশু রাজপুত্ররাও কোন লর্ডের বাড়ি খেলতে যাবে তার খবরও এরা

রাখে। শুনলে মনে হয় এদের আত্মীয়স্বজন কাজ করে বাকিংহাম প্যালেসে, তাই রাজবাড়ির এই ধরনের বেসরকারী কর্মসূচী তারা আগে থেকেই জানতে পারে।

এতলোক দেখতে চায় বলে যখন সরকারী মিছিল বার হয় রাজপরিবারের সকলকে যেতে হয় ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। হুস করে মোটর চলে গেলে এই বিপুল জনতা খুশী হতে পারে না, তারা দেখতে চায় অতি মন্থর গতিতে সহাস্য মুখে রানী সোনায় মোড়া ঘোড়ার গাড়ী চড়ে তাদের সামনে দিয়ে যাবে। যে রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবার কথা, কত সকাল থেকে সেখানে লোক এসে জড় হয়, শুধু লণ্ডনবাসীই তো নয়, আশ-পাশের গ্রাম থেকেও গ্রামবাসীরা আসে।

আজকেও সেই ধরনের ভিড় জমা হয়েছিল রাস্তার ধারে।

অমিতাভ আর সরোজ যাচ্ছিল কাজে, আজ এক জরুরী মিটিং আছে ইস্ট এণ্ডের কোন এক প্রাইভেট স্কুলে।

সরোজ বিদ্রূপ করে বলল, এ এক জাত বটে, কিছুতেই আর রাজপ্রীতি কমে না, দ্যাখ কিরকম গাধার মত সব দাঁড়িয়ে আছে।

অমিতাভর কাছে সরোজ হল আদর্শ মানুষ। লেখা পড়া, কাজকর্ম সব কিছু তো করছেই তার ওপর কি পরিষ্কার মাথা। যে কোন বিষয় নিয়ে সে কথা বলতে পারে, কত সহজে আর একজনকে বুঝিয়ে দিতে পারে।

অমিতাভ হেসে সায় দিল, এ জাতের বারোটা বেজে গেছে, আর নতুন কিছু করতে পারবে না।

—ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরেজ, যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না বলে গর্ব করত, আজ তারা শুধু কৃপার পাত্র, রাজা রাণী নিয়ে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে।

অমিতাভ এ ধরনের আলোচনায় আনন্দ পায়, বলে, অথচ এ দেশে আসার আগে শুনেছিলাম ইংরেজর মত ভদ্রলোক খুব কম আছে।

সরোজের কণ্ঠে তীক্ষ্ম শ্লেষ, দোকানদারের জাত, তারা আবার ভদ্রলোক!

—শুনেছিলাম এরা ধার্মিক।

—সে এদের ভণ্ডামি।

—তবে এটা মানতে হয় সত্যিকারের ভাল সাহিত্য ইংরেজ সৃষ্টি করেছে।

—ওটাও ভুল ধারণা, সারা ইউরোপের মধ্যে এত বড় আনইনটেলেকচুয়াল জাত আর নেই।

সরোজদার ইংরেজ বিদ্বেষ এত তীব্র যে এক এক সময় অমিতাভর মনে হয় ইচ্ছে করেই সরোজদা এদের ছোট করে। অনেক দোষ থাকলেও ইংরেজদের যে কিছু গুণও আছে তাতো অমিতাভ স্বচক্ষে দেখেছে, কিন্তু কই সরোজদা তো তার উল্লেখ করে না।

আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু স্পোর্টস! আমার তো মনে হয় এদেশের ছেলে বুড়ো সকলেই স্পোর্টস নিয়ে বেঁচে আছে।

সরোজ রায় তাচ্ছিল্য স্বরে বলে, ইতিহাস খুললে দেখবে যতগুলো স্পোর্টস-এর রেকর্ড সব বিদেশীরা করেছে। অমিতাভ, তুমি ছেলে মানুষ, তোমাদের মত অনেকেই এদেশে এসে বাইরের চাকচিক্য দেখে ভুলে যায়। কিন্তু বুঝতে পারে না কত বড় ভণ্ড ইংরেজ, এরা প্রজাতন্ত্রের গর্ব করে, অথচ এদের রাজত্ব চালায় খুব অল্প সংখ্যক পয়সাওয়ালা লোক। এখানকার রাজনীতির চক্র যে কত জটিল ভেতরে না ঢুকলে বুঝতে পারবে না।

অমিতাভ চুপ করে যায়, বোঝে এ নিয়ে কথা বলা এখন ঠিক হবে না, সরোজদা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি হেঁটে ওরা চলতে শুরু করে, সামনেই টিউব স্টেশন।

সরোজ কিন্তু কিছুতেই নিজেকে থামাতে পারে না, বলে যায়, ইংরেজরা এমন ভাব দেখায় যেন এ পৃথিবী ওরাই সৃষ্টি করেছে আর ভগবান তাদেরই ওপর ভার দিয়েছেন এখানে রাজত্ব করার জন্যে। অথচ আসলে এরা ভেড়ার জাত, কোন মৌলিক আবিষ্কার-এর গৌরব এরা করতে পারে না, who had never produced great philosophers, great scientists or inventors অথচ এমনই ভাগ্য, স্রেফ টাকার জোরে আমাদের দেশের জমিদারদের মত সবরকম নূতন আবিষ্কারের ভাল ফলটুকু ভোগ করেছে।

সরোজ রায়ের মুখে এ ধরনের কথা এত শুনেছে যে অমিতাভর নতুন কিছু মনে হল না।

টিউব ধরে যথাসময় তারা এসে পৌঁছল নির্দিষ্ট জায়গায়।

আজ এখানে সকলে জড় হয়েছে এ অঞ্চলের ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে মিলিত হবার আশায়। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য তাদের বোঝানো সামনের বাই ইলেকশনে তারা যেন কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দেয়।

এরা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নয় তবে Sympathiser, এদের মধ্যে থেকে অনেকে অমিতাভর মত গিয়েছিল যুব উৎসবে। সেখান থেকে ফিরে এসে অবসর সময় রাজনীতির চর্চা করে।

সরোজের দলের ছেলেমেয়েরা সকলেই প্রায় এসে গেছে। এসেছে লীলা, প্রমীলা, এসেছে সৌরেন, এসেছে আরও অনেকে যারা হালে ঠিক পিঠ-চুলকানো সমিতির সভ্য নয় কিন্তু এদের রাজনৈতিক কাজের সঙ্গী। যেমন নিখিলদা।

নিখিলদা কলকাতার নামজাদা বনেদী বাড়ির ছেলে। প্রচুর সম্পত্তি। লণ্ডনে এসেছে ব্যারিস্টারী পড়তে। কিন্তু পড়ার চেয়ে তার বেশী মন এই রাজনীতিতে। ও শুধু Sympathiser নয়, কমিউনিষ্ট পার্টির পুরোপুরি সভ্য। আদা জল খেয়ে সে পার্টির কাজ করে।

বলতে গেলে এই নিখিলদার অনুরোধেই সরোজরা এসেছে ইস্ট এণ্ডের স্কুলে। এখানে তারা গান করবে, গল্প করবে, বন্ধুত্ব পাতাবে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে, তার-পর বক্তৃতা করবে নিখিলদা।

কিন্তু যাদের জন্যে এ মিটিং-এর আয়োজন তারাই এল না।

এল না পেগী নন্দী, ডারোথি আলির দল, এল না তাদের ভারতীয় স্বামীরা। যারা এল তাদের সংখ্যা খুব কম, কথাবার্তা শুনে মনে হল না, এ মিটিংকে তারা খুব ভাল চোখে দেখছে।

সরোজরা গান ধরল, বিভিন্ন ভাষার সমবেত সঙ্গীত। সব দেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কিছু গান, সেইগুলোই সরোজরা বেশী গায় এ ধরনের মিটিংএ, কিংবা আন্তর্জাতিক উৎসবে। ফরাসী, পোলিশ, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষার গান করে তারা শেষ করল ইক্‌বালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' গেয়ে।

যারা উপস্থিত ছিল সকলে হাততালি দিল কিন্তু ওই পর্যন্ত। নিখিলদার বক্তৃতা শোনার আগেই তারা ছটফট করতে লাগল বাড়ি যাবার জন্যে।

নিখিলদা বিরক্ত হলেন না, বুঝিয়ে বললেন, আপনারা ভারতীয়, এদেশের বর্ণ-বৈষম্য কেন মুখ বুজে সহ্য করবেন? আপনাদের নাগরিক হিসেবে যে অধিকার আছে জোর গলায় তার দাবী জানান, উপনির্বাচনে এমন প্রার্থীকে ভোট দিন যিনি আপনাদের ব্যথার ব্যথী হবেন।

কলকাতার বাবুরা হঠাৎ গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সৌহার্দ পাতাতে গেলে তারা যেরকম ভয়ে ভয়ে থাকে, নিজেদের মধ্যে গুজ গুজ করে, ঠিক সেই রকম, এই ইস্ট এণ্ডের ভারতীয়রা নিখিলদাদের মত শহুরে সাহেবদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে চাইল না।

নিখিলদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কিছু বলুন। তবুও ওরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে, অনেক কষ্টে একজন বলে, আপনাদের কথা তো শুনলাম, পরে ভেবে দেখব।

মেয়েদের মধ্যে এসেছিল শুধু লীলা আর প্রমীলা। এধরনের কথাবার্তা এদের মোটেই ভাল লাগছিল না। রাজনীতি নিয়ে কোনদিনই তারা মাথা ঘামায়নি, না দেশে, না বিদেশে। তবু আজ এখানে এসেছিল সরোজের অনুরোধে আর তাছাড়া খানিকটা কৌতূহলও ছিল। সে কৌতূহল পেগী নন্দী আর ডরোথি আলিদের স্বচক্ষে দেখবার।

লণ্ডনে এলে ইস্ট এণ্ডের অশিক্ষিত গরীব খালাসীদের কথা সকলেই শোনে। তাদের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছেও করে। জাহাজ থেকে পালিয়ে চাটগাঁই খালাসীরা লুকিয়ে এই অঞ্চলে আস্তানা গাড়ে, অনেকের কাছে পাসপোর্টও থাকে না, পোর্ট পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তারা চলে এসেছে। কিছু ভাগ্যান্বেষী ব্যবসা-দারও আছে, যারা বিক্রি করে নানারকম মশলা ধূপ চাটনি পাঁপড়। বিক্রি করে কাপড়ের টুকরো, কিছু সুতীর গেঞ্জী কিংবা, ওই ধরনের হোসিয়ারী কাপড় জামা। আবার অনেকে রেস্তরাঁয় কাজ করে, পয়সা হলে হয়ত চলে যায় অন্য পাড়ায়, ভালভাবে থাকে, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ইস্ট এণ্ডের গরীব পাড়ায় পাঁচ-ছয়জনে মিলে এক-খানা ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। সকলের পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়, হয়ত এক আধজন, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে প্রেম করে বিয়ে করে ফেলে। সেই ইংরেজ বধূই এই বাড়ির মক্ষিরানী।

এই মক্ষীরানীদের নাম দেখেছিল লীলারা ভোটার লিস্টে পেগী নন্দী, ডরোথি আলি প্রভৃতি। ভেবেছিল তাদের সাক্ষাৎ পাবে এ মিটিং-এ, না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

লীলা বলে, অমিতাভ, তোদের কথার যদি কোন দাম থাকে, মেম সাহেব দ্রৌপদী-দের একজনকেও আনতে পারলি না এখানে?

অমিতাভও মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল, বললে, আমার তো মনে হয় এ মিটিং-এ আসাই উচিত হয়নি।

—কেন?

—দেখছ না, এখানকার লোকেদের কোন ইনটারেস্ট নেই, ভয়ে ওরা এ মিটিং-এ আসেনি। ভোট দেবার সময় দেখবে সবাই গভর্নমেণ্টকে দিয়ে আসবে। চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

অমিতাভর কণ্ঠস্বরে অবাক হল লীলা, সে কিরে? সরোজদারা এখনও কথা বলছে।

অমিতাভ বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করে না, ও কথা বলায় কি লাভ, শুনে

শুনে আমাদের তো মুখস্থ হয়ে গেছে, আর কতবার শুনব? বলছি চল আমরা চলে যাই।

প্রমীলা বাধা দেয়, তা হয় না অমিত, সবাই একসঙ্গে যাব।

—বেশ তোমরা থাক, আমি চললাম।

দ্রুতপদে অমিতাভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমিতাভ কিন্তু বাড়ি ফিরল না। মিটিং থেকে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে সে ধরল সার্কল লাইনের টিউব, ইচ্ছে বেকার স্ট্রীটে গাড়ি বদলে নেবে কিংবা সেখানেই নেমে পড়বে।

মিটিং-এ থাকতে তার ভাল লাগছিল না। রাজনীতির নামে এধরনের ছেলেমানুষি তার কাছে বিরক্তিকর। এসব বিষয়ে তার মনের গভীরতা অনেক বেশী, সে কাজ করতে চায় প্রাণ দিয়ে যাতে অন্যের উপকার হয়। এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ?

এতক্ষণ মিটিং-এর মধ্যে বসে থাকতে ইচ্ছে না করলেও বাইরে বেরিয়ে এসে অমিতাভর নিজেকে বড় একলা মনে হল। এই বিরাট শহরে সে যেন একা, কেউ নেই। জনস্রোতের মধ্যে গা মিশিয়ে দিয়েও স্বস্তি বোধ করল না।

অবশ্য নিজেকে 'একলা' ভাবার মধ্যে কোথায় যেন একটা লুকোনো আনন্দ আছে। এও এক ধরনের অহমিকা যা দিয়ে মানুষ নিজেকে অন্যের কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে। কিন্তু এই একলা বোধের সঙ্গে যদি অসহায়তার দুঃখ এসে মেশে তখনই বুঝি সে দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না।

অমিতাভরও আজ নিজেকে বড় দুর্বল মনে হল, বড় অসহায়। যদিও এ অসহায়বোধ তার নতুন নয়, কলকাতায় থাকতেও কত রাত্রি সে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। তবু সান্ত্বনা পায়নি। তার নিঃসঙ্গ মন যে কী চায় তা নিজেই যদি সে বুঝতে পারত!

কতদিন মা তাকে জিগ্যেস করেছেন, কি তুই এত ভাবিস খোকা?

অমিতাভ হাসবার চেষ্টা করে উত্তর দিয়েছে, কিছু তো নয়।

—তবে কেন চুপচাপ বসে থাকিস ঘর বন্ধ করে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেশ, আনন্দ কর্, এই তো বয়েস।

—ভালো লাগে না, মামণি।

মায়ের চোখে জল এসে পড়ে, তুই আমার একমাত্র ছেলে, তোর মন খারাপ দেখলে আমার কি ভালো লাগে? এত যে পরিশ্রম করে রোজকার করছি, সে তো শুধু তোর জন্যে। তুই বড় হবি, মানুষের মত মানুষ হবি, এই তো আমি চাই।

—তা কি আমি বুঝি না মামণি?

মায়ের কণ্ঠ করুণায় ব্যাকুল হয়ে উঠে, তবে তুই এরকম কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিস কেন? কেন অন্য সমবয়সী ছেলেদের মত আনন্দ করে দিন কাটাস না?

অমিতাভরও চোখে জল এসেছে, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছে, আমি তোমায় বড় কষ্ট দিই, না মামণি?

মাধুরী দেবী ছেলেকে শিশুর মত কাছে টেনে নিয়েছেন, বল্ তোর কিসের কষ্ট, আমার কছে কথা লুকোস না, খোকা।

নিজের অজ্ঞান্তে অমিতাভর দীর্ঘশ্বাস পড়েছে, মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একলা মনে হয়।

—সে কি কথা, আমি রয়েছি, তোর মামারা রয়েছে, রমেন কাকা রয়েছে।

অমিতাভ থামিয়ে দিয়ে বলেছে, আমি জানি এ আমার পাগলামি। তোমার মত মা পেয়েছি, আত্মীয় স্বজন সবই তো পেয়েছি কিসের অভাব আমার?

মাধুরী দেবী সজল চোখে জিগ্যেস করেছেন, তবু—

—আমারই দোষ, আজও নিজেকে বুঝতে পারলাম না।

সেইদিন থেকে মাধুরী দেবী সাবধান হয়েছেন, সারাক্ষণ ছেলেকে নজরে নজরে রেখেছেন, শুধু তাই নয়, যে সব ছবিতে আউটডোরের কাজে বেশীদিন বাইরে থাকতে হবে সে সব ছবিতে কাজ নেননি। এর জন্যে হয়তো আর্থিক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু মনের দিক থেকে শান্তি পেয়েছেন অনেক বেশী।

অমিতাভর এই ভাবান্তর শুধু যে তার মায়ের চোখে পড়েছিল তাই নয়, এ বাড়ির যাঁরা শুভানুধ্যায়ী তাঁরা সকলেই প্রায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে রমেন কাকা।

রমেন কাকা অমিতাভর বন্ধু, মাধুরী দেবীর পরম সুহৃদ।

রমেন কাকা চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছেন, কেন এরকম হল বলত খোকার? আজকাল কোন বিষয়ে ওর আগ্রহ দেখি না।

মাধুরী দেবী দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছেন, ছোট বেলা থেকেই খুব হাসি খুশী ছিল ও, কিন্তু ওর দিদি মারা যাবার পর থেকে আস্তে আস্তে কেমন যেন বদলে গেল। সত্যি কথা বলতে কি এখন আমার ভয় হয়, তের চোদ্দ বছরের ছেলে, চুপচাপ ঘর বন্ধ করে বসে থাকে, বড় অস্বাভাবিক মনে হয়।

রমেন কাকা উঠে পায়চারী করেন, আগে প্রত্যেক দিন দু'বার করে আমার কাছে আস্‌ত আজকাল তো মোটেই আসে না। এমন কি এ বাড়িতে এলে কথাই বলতে চায় না। দু'চারটে উত্তর দিয়ে কোথায় পালিয়ে যায়।

—ভাবছি ডাক্তার ডাকব কি না।

রমেন কাকা সুচিন্তিত মতামত দেন, তার চেয়ে ওর বন্ধুবান্ধবদের ডেকে পাঠাও, বাড়িতে ওদের জন্যে একটা ক্লাব করে দাও। খেলাধুলা হই-চই-এর মধ্যে মেতে থাকলে মনে হয় ওর মন ভাল থাকবে।

যে কথা, সেই কাজ। রমেন কাকা আর মাধুরী দেবীর চেষ্টায় অতি সহজে অমিতাভর নীচের ঘরে গড়ে উঠল সানরাইজ ক্লাব। এল সেখানে পাড়ার ছেলেরা, আবার স্কুলের বন্ধুবান্ধবরাও। ঘরের মধ্যে খেলা হয় তাস, কেরাম, বাইরে ফুটবল, ক্রিকেট।

রমেন কাকা মিথ্যে বলেননি, ক'দিনের মধ্যেই দেখা গেল অমিতাভর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চোখে মুখে তার দীপ্তি, সকাল সন্ধ্যে সে মেতে উঠেছে ক্লাব নিয়ে। মাধুরী দেবীর উৎসাহও কম নয়, ছেলের আবদার মত ক্লাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনিও চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করলেন। রমেন কাকাও নিস্তার পাননি, অমিতাভ তাঁকে প্রেসিডেন্ট দাঁড় করিয়ে নানা কাজে অগ্রণী করে দিয়েছে।

খুব অল্প চেষ্টায় সানরাইজ ক্লাব নাম করে ফেলল। আস্তে আস্তে উৎসাহও কমতে লাগল মাধুরী দেবীদের। ছেলেদের হাতে সব ভার দিয়ে ক্রমশ তাঁরা সরে দাঁড়ালেন। আবার পুরোপুরি মন দিলেন চিত্র জগতে; নিশ্চিন্ত মনে 'আউটডোরের' কাজে বেরতে লাগলেন কলকাতার বাইরে।

ক্লাব কিন্তু চলতে লাগল পুরোদমে। নতুন নতুন ছেলে এসে যোগ দিচ্ছে, নতুন

থেকে নতুনতর তাদের চিন্তাধারা, শুরু হল আলাপ আলোচনা বিতর্ক সভা। ক্রমশ যেন বাইরে খেলতে যাবার উৎসাহ কমে এল সভ্যদের মধ্যে। চুপচাপ ক্লাবের ঘরে বসে খবরের কাগজ নিয়ে তারা আলোচনা করে, বিষয় হল রাজনীতি।

প্রত্যেকের জীবনে একটা বয়স আসে যে সময়ে বুদ্ধি পরিণত নয়, জ্ঞান অত্যন্ত পরিমিত, সে সময় তর্ক করার ঝোঁক নেশার মত পেয়ে বসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা অবুঝের মত তর্ক করে, কোন দিকে দিশা না পেয়ে অন্ধকারের মধ্যে মাথা ঠুকে মরে তবু নেশা ছাড়তে পারে না।

এই রাজনীতির নেশায় মেতে উঠল সানরাইজ ক্লাব। দল বেঁধে এরা যেতে লাগল মাঠে গরম গরম বামপন্থী বক্তৃতা শুনতে, বিভিন্ন দলের সঙ্গে মিশে ধর্মঘটীদের সাহায্য করতে লাগল তলায় তলায়। নেতাদের প্ররোচনায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রাচীর-পত্র লিখে লাগিয়ে দিয়ে আসতে লাগল দেয়ালে দেয়ালে।

মাধুরী দেবী যখন এসব কথা জানতে পারলেন তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। অমিতাভ নিজের মনকে পুরোপুরি তৈরী করে নিয়ে এই পথে নেমেছে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় তার রেজাল্ট খারাপ হল।

মাধুরী দেবী প্রোগ্রেস রিপোর্ট হাতে নিয়ে অমিতাভর ঘরে ঢুকলেন, এ কি করেছিস্ খোকা? আর একটু হলেই যে ফেল করতিস্?

অমিতাভ নির্বিকার উত্তর দিয়েছে, পড়াশুনো ভাল হয়নি।

—কেন?

—নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

মাধুরী দেবী বিস্মিত হলেন, এমন কি কাজ যার জন্যে পড়াশুনো করতে পারছিস্ না?

অমিতাভ হেসে বলেছে, তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না মামণি, তবে খুব বড় কাজ। হয়ত নিজের লেখাপড়া হবে না, কিন্তু যাতে আর পাঁচজন লেখাপড়া করতে পারে তার সুযোগ আমরা করে দেব।

সেদিন মাধুরী দেবী ছেলেকে আর কিছু বলেননি, চিন্তিত মনে নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন, ভেবেছেন এ ভুল তাঁরই। বাড়ির মধ্যে ক্লাব করে দিয়ে তিনি খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছেন, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, কি করে তিনি এতখানি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যে, বুঝতে পারলেন না নিছক খেলাধুলোর ক্লাব ক্রমশ রাজ-নৈতিক সঙ্ঘে রূপান্তরিত হয়েছে।

আরও বিপদের সঙ্কেত পেলেন বন্ধু পুলিস অফিসারদের কাছ থেকে। যখন শুনলেন অমিতাভর ওপর সরকার নজর রাখতে বাধ্য হয়েছে, আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠল। গভীর রাত্রে ঘুমন্ত পুত্রের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আলো জ্বালিয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে অমিতাভর সুন্দর মুখখানা দেখলেন। কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, খোকা!

অমিতাভ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল, মায়ের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল, জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা?

—একটা কথা তোকে বলতে এলাম বাবা।

অমিতাভ সবিস্ময়ে বলে, এত রাত্রে?

মাধুরী দেবী করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কথা দে আমি যা বলব তুই শুনবি, না বলতে পারবি না।

—না তো কখনও বলিনি।

মাধুরী দেবী প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, ধীর স্বরে বললেন, আমার ইচ্ছে তুই লণ্ডনে গিয়ে পড়াশুনো কর।

অমিতাভ আকাশ থেকে পড়ল, লণ্ডনে! তুমি কি বলছ মামণি?

—জানি তোকে ছেড়ে একলা থাকতে আমার কষ্ট হবে, কিন্তু আমার জন্যে তোর জীবনটা আমি নষ্ট হতে দেব না। বিলেত থেকে পাস করে এসে তুই বড় চাকরি নিবি, তখন আমি কাজকর্ম ছেড়ে তোর সঙ্গে থাকতে পারব।

অমিতাভ অন্যমনস্ক ভাবে বলে, বেশতো, ভেবে দেখি।

—না, আর ভাবতে পাবি না। আমি রমেন কাকাকে বলেছি তোর প্যাসেজ বুক করবার জন্যে।

অমিতাভ মা'র দিকে তাকিয়ে হাসল, সব ব্যবস্থাই যখন করে এসেছ তখন আমাকে আর বলবার কি দরকার ছিল, একেবারেই জাহাজে তুলে দিলে পারতে। ছেলের কথায় মাধুরী দেবী কষ্ট পেলেন, চোখে জল এল, কিন্তু অমিতাভ আর একটা কথাও বলল না।

তারপর যে-কদিন অমিতাভ কলকাতায় ছিল, মায়ের সঙ্গে দূরত্ব রেখেই থেকেছে, খোলাখুলি আর কোন কথাবার্তা হয়নি তাদের মধ্যে। শুধু রমেন কাকাকে বলেছিল, মায়ের দেখাশুনো করবেন, বেশী কাজ করতে দেবেন না।

রমেন কাকা গুরুজনদের মতই বলেছেন, মন দিয়ে লেখাপড়া করে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

—চেষ্টা করব, তবে কথা দিতে পারছি না।

—কেন?

—মনটাকে যে বুঝতে পারলাম না। কি যে সে চায়।

ইউরোপে এসে কয়েক মাস অমিতাভ ভালভাবেই পড়াশুনো করেছিল। কিন্তু যুব উৎসবে যোগ দিয়ে আবার লণ্ডনে ফিরে আসার পর থেকে কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কলকাতা জীবনের শেষের দিকে যে রাজনীতির মোহ তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, এখন যেন আবার তার আকর্ষণ প্রবলভাবে দেখা দিল। সে যোগ দিল সরোজদের দলে, ঘুরে বেড়াল নিখিলদার পেছনে, ছুটে বেড়াল এক মিটিং থেকে আর এক মিটিং। নিজের কাজ নিয়েই সে মেতে ছিল।

কিন্তু আজ হঠাৎ ইস্ট এণ্ডের মিটিং থেকে বেরিয়ে তার মনটা আবার বিগড়ে গেল।

মনে হল রাজনীতির নামে এ এক বিরাট প্রহসন। যাদের জন্যে মিটিং করা তাদের কোন হুঁশ নেই, অথচ ওরা মিথ্যে দরদ দেখিয়ে মরছে। এ মিথ্যের কি প্রয়োজন।

আশ্চর্য মানুষের চিন্তা।

একবার যে এই চিন্তার দোলন শুরু হল অমিতাভর মনে আর যেন তা থামতে চায় না। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত তা দুলতে থাকে।

কেন জানা নেই, তার মনে হল সারাজীবনটাই মিথ্যে হয়ে গেছে। এই যে লেখা-পড়া শেখবার জন্যে মা তাকে লণ্ডনে পাঠিয়েছেন সেখানেই তো মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। লেখাপড়া সে দেশেও শিখতে পারত। এখানে পাঠানো হয়েছে রাজ-নীতির কবল থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যে।

মা তাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন সব সত্যি কিন্তু তাঁর জীবনের আকর্ষণও তো কম নয়। চিত্রাভিনেত্রী হিসাবে তিনি অভিনয় করতে চান ভালো চরিত্রে। আরও নাম করতে চান দর্শকদের কাছে। অমিতাভ কি বোঝে না তাকে নিয়ে মায়ের কত অসুবিধা। সেজন্যে সে দুঃখ পায় কিন্তু কষ্ট পায় আরও বেশী যখন দেখে মা ছবির কাজ ছেড়ে তার মাথার কাছে এসে বসে থাকেন। কারণ অমিতাভ বোঝে এটাও এক ধরনের অভিনয়, এক ধরনের মিথ্যে।

এ মিথ্যের আশ্রয় তার মাকে নিতে হয়েছে আজ নয় বহুদিন আগে। বোধহয় অমিতাভর জন্মের পর থেকে। সন্তানের পিতৃ পরিচয় তিনি দিতে পারেননি। অমিতাভ ছোটবেলা থেকে শুনেছে সে পিতৃহীন। শুনেছে তার জন্মের আগে বাবা মারা গেছেন। ছোটবেলায় তার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু এখন বড় হবার পর তার মনে হয় মা সত্যি কথা বলেননি। হয়তো তার বাবা বেঁচে আছেন। হয়তো তাঁকে সে চেনেও অথচ পরিচয় জানে না। এইভাবে মিথ্যের মধ্যে দিয়েই তার জীবন শুরু হয়েছে।

লন্ডনে এসেও এ মিথ্যের কবল থেকে সে মুক্তি পায়নি। লেখাপড়ার নামে সে এখানে করেছে রাজনীতি, রাজনীতির নামে প্রহসন।

আর কতদিন তাকে এ মিথ্যের জের টেনে বেড়াতে হবে?

টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে অমিতাভ ধীর পদক্ষেপে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে। তার মনে হয় অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে শহরের বুকের উপর চেপে বসেছে। রাস্তার ধারে আলো জ্বলছে কিন্তু তার রশ্মি বড় কম। অন্ধকারের চাপে হয়তো তাও নিভে যাবে। পথ ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। আরও কতখানি হাঁটলে সে পথের শেষ দেখতে পাবে।

কিন্তু পথের শেষে কি আছে? মৃত্যু নয়তো!

একটা অজানা আশঙ্কায় সমস্ত শরীর তার কেঁপে উঠল। কালো ঠান্ডা মৃত্যুর শিহরণ অনুভব করলো। অব্যক্ত বেদনায় মন ভরে গেল। মৃত্যু, এই অনিবার্য পরিণতির দিকে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। নিঃশেষ হচ্ছে তার সৃষ্টির দম্ভ, সংস্কৃতির গরিমা, মহত্বের বড়াই। অমিতাভর মনে হল এই মৃত্যুই একমাত্র সত্য। আর সব মিথ্যে। মিথ্যে এ সমাজ এ সংসার, মিথ্যে এ জীবনের কলরব।

সামনের নির্জন গ্যাসপোস্টের নীচে কে যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু কে সে?

অমিতাভর বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল, অনেকখানি কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলে—একটি নারী। হয়তো একদিন তার রূপ ছিল কিন্তু আজ নেই। মৃত্যুর মতই মুখ তার পান্ডুবর্ণ, রক্তহীন।

কিন্তু পারল না, মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। কী করুণ মিনতি সে চোখে, কী অসহায় আকর্ষণ, বেঁচে থাকার কী অত্যুগ্র বাসনা!

জীবনের বেচাকেনায় সব কিছু হারিয়ে, বোধহয় নিজের শরীরটাকে মূলধন করেছিল, তাও গেছে। এখন সে নিঃসম্বল। তবু সে মরতে চায় না, বাঁচতে চায়, রাতের আঁধারে নিজেকে আবৃত করে এসে দাঁড়িয়েছে আলোর তলায়। অন্ধকারেও তার চোখ জ্বলছে—সে চোখে জীবনের জয়গান।

মেয়েটির সামনে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অমিতাভ।

তার চিন্তার দোলন গেল থেমে।

উপলব্ধি করল জীবনের মহিমা।

সরোজ আজ ইচ্ছে করেই রিহার্সাল রাখেনি।

আগামী কাল শো। সেন্ট প্যানক্রাশ্ হলে। লন্ডনের পেশাদারী মঞ্চে রবিবার ছাড়া প্রতিরাত্রে থিয়েটার হয় বলে কোন শৌখীন নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে ভাড়া পাওয়া যায় না। তাই সাধারণত এ ধরনের অনুষ্ঠান হয় টাউন হল ভাড়া নিয়ে। সারা লন্ডনে অবশ্য বহু সংখ্যক হল আছে, কলকাতার অনেক রঙ্গালয়ের সঙ্গেই এদের তুলনা করা চলে। শ' পাঁচ ছয় বসবার সিট, মাঝারি আকৃতির স্টেজ। সচরাচর সেটিং এখানে পাওয়া যায় না। ভাড়া পাওয়াও দুষ্কর। শৌখীন গোষ্ঠীকে সেটিং প্রয়োজন মত তৈরী করে নিতে হয়। না হয়ত কালো পর্দার ওপর দু'চার রকম নক্সা কেটে কাজ চালিয়ে নেয়।

লন্ডনের ভারতীয় মহলে সরোজ রায়ের প্রযোজনার যথেষ্ট নাম আছে। প্রত্যেক বছরই শো'এর টিকিট আগে থেকে বিক্রি হয়ে যায়, এবারও হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন রিহার্সালের ফলে নাচ গান শিল্পীদের রপ্ত হয়ে গেছে, তৈরী হয়ে গেছে সাজ পোশাক, এক কথায় বলতে গেলে প্রস্তুতি পর্বের বাকী আর কিছু নেই। বাকী শুধু অভিনয় রজনীর উত্তেজনা; যাতে সে উত্তেজনাকেও শিল্পীরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে, তাই আজ সকলকে সরোজ ছুটি দিয়েছে।

কিন্তু আজ রিহার্সাল না থাকলেও একবার না একবার সকলেই ঘুরে গেছে সরোজের ফ্ল্যাটে। কালকের অনুষ্ঠানে কাকে কি করতে হবে, কখন আসতে হবে, তারই সব জল্পনা কল্পনা করেছে।

তাদের দেখে সরোজ বলেছে, আজ দেখছি রিহার্সাল রাখলেই ভাল হত।

অমিতাভ তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছে, রাখা তো উচিতই ছিল। আমার যা ভয় করছে, কাল স্টেজের ওপর কি করব, বুঝতেই পারছি না।

নন্দিতা সেন ওকে ভরসা দিয়েছে, দেখে নিও সরোজ, এবারের শো'এ অমিতের নাম হবে সবচেয়ে বেশী।

—আপনি বড় বাড়িয়ে বলেন নন্দিতাদি, বেতালে পা পড়লেই হয়েছে আর কি, সবাই আমায় ক্ষ্যাপাবে।

নন্দিতা হেসে বলল, তোমায় নিয়ে সে ভয় মোটেই নেই। ভয় তোমার দিদিটির জন্যে।

কথা মিথ্যে নয়, লীলার জন্যে নন্দিতা এখন সবিশেষ চিন্তিত। মাঝে মাঝে ও বড় তাল ভুল করে, আর পরে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না। এতদিন বোঝা যায় নি। কিন্তু রিহার্সাল ক্রমে দানা বেঁধে ওঠায় লীলার এই ত্রুটি সকলেরই চোখে পড়ছে। নন্দিতা কতদিন লীলাকে বুঝিয়ে বলেছে, লীলা যে বোঝে না, তাও নয়। তবু কিছুতেই নিজের ভুল শোধরাতে পারে নি। প্রথম প্রথম নিজের তাল ভুল হলে অন্যেরা হাসলে লীলাও কিছু মনে করত না, হাসতে হাসতেই নিজেকে সংশোধন করে নিত। কিন্তু ক্রমশ ও যেন বদলে গেল, অন্যদের হাসি ঠাট্টা আর সহজ ভাবে নিতে পারল না। পাছে তার নাচ ভুল হয়, পাছে কেউ হাসে সেই ভয়ে সব সময় লীলা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তাল ভুল হলেও আগে ওর নাচের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ ছিল এখন তাও শুকিয়ে গেছে। নিজেরই ওপর তার বিরক্তি ধরে।

দু'একদিন সে বলেওছে, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও নন্দিতাদি, আমি পারছি না।

নন্দিতা বোঝাবার চেষ্টা করেছে, অত বেশী তাল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আগে যে রকম নাচছিলে সেরকম নাচো না।

—কিন্তু যদি ভুল হয়?

—আমরা ছাড়া কেউ তা ধরতে পারবে না।

লীলা তবু উৎসাহ পায়নি, কি জানি, আমার ভাল লাগছে না। শুধু নন্দিতা নয়, সরোজ, প্রমীলা দুজনেই নানাভাবে লীলার মনের জোর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। সকলে চলে যাবার পর সরোজ ইচ্ছে করে লীলাকে একান্তে ডেকে বলেছে, ও মেয়ে, আজকাল এত অন্যমনস্ক কেন?

লীলা ম্লান হেসে উত্তর দিয়েছে, অন্যমনস্ক আবার কোথায়?

—আবোলতাবোল কি এত ভাবছ, আমায় বল না।

লীলা চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, খারাপ লাগছে।

সরোজ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকায়, কেন?

—আমার জন্যে আপনাদের শো'টা না নষ্ট হয়ে যায়।

সরোজ হাসে, সে ভাবনা আমার, তোমার নয়। যা করতে বলা হচ্ছে করে যাও।

লীলা অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, আপনারা ভাবছেন আমাকে বাদ দিলে দুঃখ পাব, বিশ্বাস করুন, আর কোন ভাল মেয়েকে দিয়ে যদি আমার পার্ট করিয়ে নেন, তাতে সবচেয়ে খুশী হব আমি। সব রকম করে—

সরোজ থামিয়ে দেয়, তোমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি, আজেবাজে কথা না ভেবে ভাল করে নাচো। আমি বলে রাখছি, এই অর্জুনের পার্টই হবে তোমার বেস্ট্ পারফরমেন্স্।

লীলা এতক্ষণে সরোজের দিকে তাকায়, তার চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, সত্যি বলছেন?

সরোজ ঠিক সেই ভাবেই উত্তর দেয়, তুমি তো জান লীলা আমি মিথ্যে কথা বলি না।

সরোজের মত প্রমীলাও তাকে বুঝিয়েছে। রাতে বাড়ি ফিরে দুই বোনে সারা-দিনের পর প্রথম যখন নির্জনে কথা বলার সুযোগ পায়, খাবার টেবিলে কিংবা খাটে শুয়ে শুয়ে গল্প করে, তখন কথা প্রসঙ্গে ওই নাচের কথার অবতারণা করেছে প্রমীলা।

—নন্দিতাদির এত নাম, কিন্তু মুখে কোন এক্সপ্রেশন নেই।

কথাটা লীলার কাছে অদ্ভুত শোনাল। কি বলছিস তুই!

—সত্যি বলছি, ওর নাচ আমার একদম ভালো লাগছে না। বড্ড যেন পুতুলের মত।

লীলা প্রতিবাদ করেছে, সরোজদারা তো বলে—

—ওদের কথা ছেড়ে দাও। আমি তো রোজ রিহার্সাল দেখছি। তোমার পাশে চিত্রাঙ্গদা দাঁড়াতে পারবে না।

—যাঃ, তুই বড্ড বাড়িয়ে বলিস।

প্রমীলা কিন্ত দমবার মেয়ে নয় বলে, হয়ত ওর পায়ের কাজ ভালো। কিন্তু তোমার চোখ মুখের ভাব অনেক বেশী ফুটছে।

কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও লীলার শুনতে ভালো লাগে। যদি নাচের রাত্রে সত্যিই এমন হয় যে দর্শকরা 'চিত্রাঙ্গদা'র চেয়ে, অর্জুনের প্রশংসা

করে বেশী, তাহলে বড় মজা হবে। রিহার্সালের সময় যারা মুখ টিপেটিপে হাসে, তারা আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না। সকলের সামনে দিয়ে সগর্বে ঘুরে বেড়াবে লীলা।

ভাবতেই হাসি পেল লীলার। বোকার মত এ কি আকাশকুসুম রচনা করছে সে। এবারের 'চিত্রাঙ্গদায়' সত্যিই যার নাম হবে সে প্রমীলা। বড় চমৎকার গান করছে। নিজের বোন বলে নয়, লীলার স্থির বিশ্বাস, সরোজ ছাড়া আর কেউ প্রমীলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না।

তাই হয়তো লীলা বলেছে, আমার নাচ কি হবে জানি না তবে তোর গানের সুখ্যাতি করতে হবে সকলকে।

প্রমীলা চোখ বড় বড় করে জিগ্যেস করে, কেন?

—বাঃ ভাল গান করছিস বলে।

আর প্রমীলা দুষ্টুমি করে হাসে। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, রজত আমাদের সম্পর্কে যা বলে সত্যি।

—তার মানে?

—পারস্পরিক পিঠ চুলকানো সমিতি।

দুই বোনে প্রাণখুলে হো হো করে হাসে।

আজ রিহার্সাল ছিল না বলে যারাও বা এসেছিল সরোজের ফ্ল্যাটে একে একে সবাই চলে গেল। শুধু রয়ে গেল অন্তরঙ্গ ক'জন, যারা আজ এখানেই খেয়ে যাবে।

খাওয়া বলতে অবশ্য বিরাট কিছু নয়। খানিকটা মাংসর কারি আর স্লাইসড পাউরুটি; যাতে না রাত্রে বাড়ি ফিরে এদের আবার রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা করতে হয়। সরোজ নিজে মাংস রেঁধে রেখেছে। তাই বিশেষ কিছু করার নেই। খাবার আগে একবার গরম করে নিলেই চলবে।

তবু লীলা অভ্যাসমত রান্না ঘরেই ঢোকে। নোংরা ডিশ গ্লাসগুলো সাফ করে রাখতে। যদিও তাকে সাহায্য করার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে অনেকে কিন্তু লীলা তাদের আমল দেয় নি। বলেছে, সামান্য কটা বাসন ধোয়া, আমি ধুয়ে রাখছি। তোমরা নিজেদের কাজ কর।

লীলা ইচ্ছে করেই একলা থাকতে চেয়েছে, মিথ্যে বক বক করতে আর ভালো লাগে না। একরকম কথাবার্তা, একঘেয়ে হাসি ঠাট্টা, কেমন যেন বিরক্ত লাগে।

গরম জলে গুঁড়ো সাবান ফেলে অনেকখানি ফেনা তৈরী করল লীলা। ঘন কুয়াশার মধ্যে ফোটা একরাশ সাদা ফুলের মত পুঞ্জীভূত ফেনার বুদবুদ। দেখতে বেশ ভাল লাগে, এতটুকু নাড়া পেলেই আয়তনে বাড়ে আবার কখন হয় তো আপনা থেকেই খানিকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

লীলার মনে হল তার এই লণ্ডন জীবনের কথা। সে এসেছিল একা, অথচ আজ তার কত বন্ধু, কত পরিচিত জন। পোশাকী আলাপের কথা ছেড়ে দিলেও, যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। এদের মধ্যে অনেককেই তার ভাল লাগে। মীনাক্ষীকে, তার শিল্পী সুলভ জীবনযাত্রার জন্যে। কিন্তু ওর সঙ্গে কি পীয়েরের বিয়ে হবে? কি দরকার তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। ভাল লাগে সৌরেনকে, তবে তার প্যানপ্যানানিটাকে বাদ দিয়ে। এলিজাবেথটা সত্যিই বোকা,

তা না হলে সৌরেনের সঙ্গে এতটা বন্ধুত্ব সে পাতাল কি করে। ভাল লাগে জয় আর ডোরিয়াকে, তাদরে মধ্যে আছে একটা উচ্ছল প্রাণের জোয়ার। তবু সন্দেহ হয়, ভারতের জল হাওয়ায় তাদের প্রেম টিকবে কি না। ভাল লাগে অমিতাভকে, বেচারী বড় সরল। চাপা দুঃখের বোঝা তার বুকে, আশ্চর্য লাগে কি করে তার মা সব জেনে শুনেও এই ভাবপ্রবণ ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাল লাগে সরোজকে, কি সুগভীর পাণ্ডিত্য, অথচ কত সহজ মেলামেশা, সত্যি সরোজের সঙ্গে আলাপ না হলে, তার এ ধরনের সর্বজনীন ফ্ল্যাট না থাকলে, লণ্ডন জীবনকে বোধহয় সে এতখানি উপভোগ করতে পারত না। কিন্তু শুধু কি ওইটুকুই, সরোজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হবার পর থেকে তার জীবনের দিগবলয় কি আরও প্রসারিত হয়নি? তার ভাল লাগে প্রমীলাকে শুধু নিজের বোন বলেই নয়—

চিন্তার সূত্র কেটে গেল। বসবার ঘর থেকে মেয়েলী গলার গান শোনা যাচ্ছে, সুমধুর কণ্ঠস্বর, নিখুঁত সুরেলা গলা। গান করছে প্রমীলা। নিশ্চয় অন্যেরা সবাই বসবার ঘরে গিয়ে বসেছে, গান শুনছে। লীলার ইচ্ছে হল গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাড়াতাড়ি কল খুলে ডিশগুলো ধুতে শুরু করে দেয়।

গান শুনতে শুনতে লীলা কাজ করে, সত্যিই আজকাল প্রমী বড় সুন্দর গাইছে। কলকাতায় থাকতে কিছুতেই গান শিখতে চাইত না। মা কত মাস্টার নিয়ে এসে-ছিলেন, ও দু'দিন শিখেই তাদের সরিয়ে দিল অথচ এখানে সরোজের পাল্লায় পড়ে রীতিমত গায়িকা হয়ে পড়েছে।

হাতের কাজগুলো সেরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে লীলা এসে ঢুকল বসবার ঘরে। সকলে কার্পেটের ওপর বসে রয়েছে। কোণের টেবিল ল্যাম্পে একটা নীল আলো জ্বলছে, বাকী ঘরটা প্রায় অন্ধকার। প্রমীলা ফায়ার প্লেসের কাছে ঠেস্ দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করে খালি গলায় গান করছে। অদূরে সরোজ মেঝের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। বোধহয় সারাদিনের পর বড় ক্লান্ত। অন্যেরা চারদিকে বসে, যে যার সুবিধে মত হেলান দিয়েছে, চেয়ারের গায়ে কি দেয়ালে। কেউ বা টেনে নিয়েছে কোচের বালিশ। লীলা গিয়ে নিঃশব্দে এক পাশে বসল।

আশ্চর্য গান করছে প্রমীলা। এ যেন আর একজন মানুষ। এই ঘরোয়া বৈঠকের নীরব শ্রোতাদের কথা সে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে তার গান করার ক্ষমতা কত-টুকু। ভুলে গেছে আগামীকাল তাদের উৎসব, সামনে তার বিরাট পরীক্ষা। একের পর এক সে গানই করে চলেছে, রবীন্দ্র সঙ্গীত। ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় তার কণ্ঠে। প্রত্যেকটি শব্দ সে উচ্চারণ করছে অন্তরের দরদ দিয়ে, যেন বহুবার গাওয়া এই গানগুলির সম্পূর্ণ নতুন অর্থ আজই সে উপলব্ধি করেছে। যে প্রেরণার ফলে সামান্য অসামান্য হয়ে ওঠে, অসম্ভবও সম্ভব হয়, সঙ্গীত মহাসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয় সেই প্রেরণাই আজ প্রমীলাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সেই মহাসঙ্গীতের তরঙ্গ এসে আঘাত করল শ্রোতাদের প্রাণে, জাগল সেখানে নতুন তরঙ্গ, কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের পৃথক সত্তাকে হারিয়ে ফেলল তারা। বিস্মৃত হল দেশ আর বিদেশের ব্যবধান। বাধা আর নিষেধের গণ্ডী। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল আমিত্বের দম্ভ, যা এতদিন দুধকলা দিয়ে পোষা সাপের মত বেড়ে উঠেছে নিজেদের অজান্তে। এই প্রথম এতগুলি বিভিন্ন প্রাণ একখানা ছোট ঘরের মধ্যে বসে অনুভব করল পরস্পরের হৃদয়ের গভীরতা, উপলব্ধি করল জীবনের ছন্দ।

এই ছন্দকে খুঁজে পায় না বলেই মানুষে মানুষে এত পার্থক্য, এত বিচ্ছেদ, এত দ্বন্দ্ব।

অশান্ত সমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশির মধ্যে যে ছন্দ, যে ছন্দ খরস্রোতা তটিনীর ধারায়, নির্ঝরিণীর গতিতে, শ্রাবণের বর্ষণে, যে ছন্দ প্রকৃতির নির্দেশে আকাশে বাতাশে পরিব্যাপ্ত। পুষ্পে ফলে বৃক্ষে বিকশিত। যে ছন্দ পাখীর চঞ্চলতায়, পশুর স্বাভাবিক জীবন যাত্রায়, স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে প্রতি-ফলিত। যে ছন্দ শিল্পীর তুলিতে, গায়কের গানে, লেখকের লেখনীতে, নটীর নৃত্যে, কবির কবিতায় ঝঙ্কৃত। সেই একই ছন্দ মানুষের জীবন ধারায়; তাকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে পৃথিবীর আদি ও অনন্ত প্রাণীর সঙ্গে। দীক্ষিত করেছে সেই একই প্রাণধর্মে যার সচল সামঞ্জস্যের সন্ধান মানুষ খুঁজছে, তার সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে। হয়ত খুঁজে পায় আবার কখনও বা পায় না।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে যেন লীলার চিন্তাধারা থেমে গেল নির্মমভাবে। সঙ্গীতের মাধুর্য তাকে যে জগতে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে সে ফিরে এল এই কঠিন বাস্তবে। দেখল প্রমীলা গান শেষ করেছে, অনেরা হাততালি দিচ্ছে, প্রশংসা করছে।

লীলাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। প্রশংসা করল। কিন্তু তার অজান্তে চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ধারা। ঘরে আলো কম ছিল বলে কেউ লক্ষ্য করলো না, লীলা কাঁদছে; না পারার কান্না।

এতক্ষণ বিশ্বছন্দের যে মহিমা তাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল এক মুহূর্তে তা স্তব্ধ হয়ে গেল। পড়লো যতি।

একটা অব্যক্ত বেদনায় লীলার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ,মনে হল সরোজ, প্রমীলা, মীনাক্ষী, নন্দিতা, এরা এক জাতের, ও সে জাতের নয়। ওরা পারে লীলা পারে না। এতদিন অন্যদের চেয়ে নিজেকে অক্ষম মনে করে সে দুঃখ পায়নি। কিন্তু আজ মনে মনে প্রমীলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে গিয়ে সে নিজেকে বড় অসহায় মনে করল, বড় দুর্বল, যেন কৃপার পাত্রী। এই চিন্তাই তার মনে আঘাত হানল, কিন্তু এর চেয়েও বড় আঘাত এল পরের দিন।

আজ উৎসব।

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যানুষ্ঠান। সকাল থেকে মীনাক্ষী তার দলবল নিয়ে মঞ্চ সাজানোর কাজে লেগেছে। সামান্য কয়েকটা বাতিকের কাজ করা কাপড়, কিছু ফুল, আর কয়েকটা পীচ্‌বোর্ডে রং করা সেটের টুকরো বানিয়ে অত্যন্ত রুচিসম্মত ভাবে সে মঞ্চের উপর মণিপুর রাজ্যের পরিবেশ এনে দিয়েছে। গায়কের দলের সামনে শান্তিনিকেতনী ধরনে লাগিয়েছে দীর্ঘ হলদে কাপড়ের পার্টিশন। মঞ্চ সাজাতে যতটা সময় লাগবে মীনাক্ষী ভেবেছিল, তার প্রয়োজন হয়নি। অনেক আগেই কাজ শেষ হয়ে গেল।

ওকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে পীয়ের। আজ ওর অফিসের ছুটি। সকাল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে ছোটাছুটি করছে, কাজ করার ওর পরম উৎসাহ। কোথায় কোনটা লাগাতে হবে বুঝতে না পেরে লক্ষণের ফল ধরার মত জিনিস হাতে নিয়ে ঘুরছে মীনাক্ষীর পিছু পিছু। মাঝে মাঝে তারিফ করে বলেছে, মীনা, তোমার কাজ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একজন ম্যাজিশিয়ান। এত অল্পের মধ্যে

কেমন সুন্দর সাজিয়ে ফেললে।

মীনাক্ষী কাজ করতে করতে হেসে উত্তর দিয়েছে, তোমার মত কাঠখোট্টা লোক আমি একেবারে দেখিনি। আমাদের দেশের যে কোন ছেলেকে বল, সে এরকম সাজিয়ে দিতে পারবে।

পীয়ের সশব্দে হাসে, কেন তুমি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ? ডাক না তোমাদের সরোজ আর সৌরেনকে। আমি যাওবা তোমায় জোগান দিতে পারছি ওরা তাও পারবে না। স্যুটের সঙ্গে এমন সব উৎকট রঙের টাই পরে, তাইতেই বুঝে ফেলেছি কি মারাত্মক ওদের artistic sense।

—খুব যে নিজের বড়াই করা হচ্ছে?

পীয়ের তখনও হাসে, সে তো তোমাদের কাছেই শিখেছি।

মীনাক্ষী কপট বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, তার মানে?

—তোমাদের দলে মিশে দেখলাম, যে যার নিজের ড্রাম পেটাচ্ছে। প্রমীলার ভাষায় সরোজ হল মাস্টার ড্রামার। আমি দেখলাম, তোমাদের ওই গুণটা প্রথমেই আয়ত্ত করা দরকার, তা না হলে তোমার মত সুন্দরীর মনোরঞ্জন করব কি করে?

এবার মীনাক্ষীও না হেসে পারে না, সত্যি পীয়ের, এই ক'মাসে তুমি মানুষ হয়ে গেছ দেখছি। আর ছেলেমানুষটি নেই। বেশ ন্যাকা ন্যাকা কথা বলছ।

—যাক্, তোমার কাছে যখন সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি আর ভাবনা নেই। কাজও শেষ হয়েছে, চল কোথাও খেতে যাওয়া যাক্।

মীনাক্ষী অন্যদের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, ওদের কি বলব?

—সত্যি মিথ্যে যা তোমার খুশি। ওরা ঠিকই বুঝে যাবে আমরা খেতে গেছি। আর দেরি হলে আমার খাওয়াই হবে না।

—কেন?

—আমি তো এখন থেকেই excited হয়ে পড়ছি। আজ বিকেলে কত লোক আসবে, আমার পরিচিত জন পনের। তাছাড়া তোমার চেনা—অনেকেই। বিশেষ করে অতুল মামা।

পীয়ের অতুলমামার নাম করে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলে, উনি বড় চমৎকার মানুষ।

মীনাক্ষী চট্ করে পীয়েরের মুখটা একবার ভাল করে দেখে নেয়, সেখানে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে বলে, ও'রও তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।

—শুনে খুশী হলাম।

মীনাক্ষীরা খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরে এসে বাকী কাজগুলো শেষ করে ফেলেছে অনায়াসে। ততক্ষণে আসতে শুরু করেছে শিল্পীরা, আরম্ভ হল তাদের সাজানোর পালা।

এধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত যে সব ভুল চুক থাকে লণ্ডন বলে এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। যার যা আনবার কথা ছিল অনেকেই তা ভুলে গেছে। মনে পড়ছে সব মঞ্চে ঢোকবার সময়। যে জিনিসগুলো না হলে চলবে না, তা আনতে আবার ছুটছে বাড়িতে। আজ কথা ছিল প্রেক্ষাগৃহে ধূপ জ্বালানো হবে. জয় কথা দিয়েছিল সে পেটিকোট লেন থেকে সস্তায় একরাশ ধূপকাঠি কিনে আনবে। কিন্তু আজ বেমালুম ভুলে গেছে। ডোরিয়াকে নিয়ে সে দৌড়ল রাসেল স্ট্রীটে। ওখানকার দু একটা দিশী দোকানে বুঝি ধূপ বিক্রি করে। এমনকি সরোজেরও ভুল হয়েছে, প্রোগ্রামগুলো আনা হয়নি। বেশী সাবধানী বলে গতকালই সে প্রেস

থেকে ছাপা প্রোগ্রামগুলো আনিয়ে রেখেছিল বাড়িতে। আসবার সময় যথাস্থানে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিল জয় নিয়ে গেছে, অথচ জয়ও আনে নি, তার ধারণা সরোজদা ওগুলো নিজেই নিয়ে যেতে চায়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সৌরেনকে পাঠানো হল আনবার জন্যে।

বিকেল থেকে লোকজন আসতে শুরু করল। প্রথম দিকে অবশ্য পরিচিত বন্ধুবান্ধবরাই বেশী। খোঁজখবর নিতে এসেছে তাদের কিছু করার আছে কিনা। এদের মধ্যে প্রথম হল নিখিলদা। লণ্ডনে এমন কোন ভারতীয় অনুষ্ঠান হয় না যেখানে নিখিলদাকে মোড়লী করতে দেখা যায় না। ঠিক সময় মত এসে কালো শোরোয়ানী আর চুস্ত পরে দরজায় দাঁড়িয়ে যায়। অতিথিদের হাসি মুখে অভ্যর্থনা করে, যেন উৎসবের আয়োজন সে একলাই করেছে।

হয়তো কেউ জিগ্যেস করে, আরে নিখিল তুমি এখানেও আছ?

নিখিলদা উত্তর দেয় না শুধু হাসে। সেই অমায়িক হাসিটুকুতে বুঝিয়ে দেয়, সে না থাকলে চলবে কি করে।

নিখিলদা ছাড়া এসেছে বেঁটে কেষ্ট, বাজপায়ী বাঁড়ুজ্জে এণ্ড কোম্পানী। এরা টিকিট কাটেনি, সৌরেনকে ঠাট্টা করে ভাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শো'এর দিন ঠিক এসে পড়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে হাজির হয় সরোজের সামনে।

কথা বলে বেঁটে কেষ্ট। সব কাজ সেরে এলাম সরোজদা, তাই একটু দেরী হয়ে গেল আসতে।

সরোজ কাজে ব্যস্ত ছিল তবু জিগ্যেস করলে, কোথায় গিয়েছিলে।

নির্জলা মিথ্যে বলল বাজপায়ী। ডেলী ওয়ার্কারের অফিসে ঘুরে এলাম। ওদের Art Critic আসছে।

—আমি তো চিঠি পাঠিয়েছি সব প্রেসকে নিমন্ত্রণ করে।

বিজ্ঞের হাসি হাসে বাঁড়ুজ্জ্যে। শুধু চিঠি পাঠালে কি প্রেস আসে? নিজেরা গিয়ে বলতে হয়। বলা যায় না ডেলী হেরল্ডও আসতে পারে।

—তাই নাকি? সরোজ শুনে খুশী হল।

—এখন কি করতে হবে বলুন?

বেঁটে কেষ্ট সহজ গলায় বলে, আমরা তো বরাবর প্রোগ্রাম বিক্রি করি। সরোজদা, দিন আমাদের, দেখবেন সকলকে গছিয়ে ছাড়ব।

—সৌরেন গেছে আনতে। ওর কাছ থেকে নিয়ে নিও।

—ঠিক আছে। আর বলতে হবে না।

বাজপায়ী কোম্পানী গেটের কাছে ওৎ পেতে বসেছিল। সৌরেন ট্যাক্সি থেকে নামতেই তার হাত থেকে ছোঁ মেরে প্রোগ্রামগুলো তুলে নিল।

সৌরেন বিরক্ত হয়ে বলে, এ আবার কি হচ্ছে?

বাজপায়ী কোম্পানী হাসে, বাঃ আমরা যে প্রোগ্রাম বিক্রীর ভার নিয়েছি।

—কে ভার দিয়েছে।

—স্বয়ং কলির কেষ্ট। মানে তোর সরোজদা।

সৌরেন খেপে যায়। সব সময় ঠাট্টা আর ইয়ার্কি ভালো লাগে না। আমি যাচ্ছি সরোজদার কাছে, বলছি তোমাদের কথা।

বেঁটে কেষ্ট ত্বরিত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সৌরেনের হাতটা চেপে ধরে, কেন

মিথ্যে আমাদের ওপর রাগ করছিস, কোথায় এলাম তোদের সাহায্য করতে—

—সাহায্য না হাতি। বিনা পয়সায় শো' দেখবার মতলব আমি বুঝতে পারি না? তা না হয় দেখ। কিন্তু সরোজদার নামে যা তা বলছিস কেন?

বাড়ুজ্জ্যে একটা চোখ ছোট করে, ওপরের পাটির দাঁতে জিভ ঘষতে ঘষতে হেসে বলে, ও শালা আমাদের মুখের দোষ, ভদ্রভাবে যে কথাই বলতে পারি না।

সঙ্গে সঙ্গে বাজপায়ী শানাই-এর পোঁ ধরে, তুই জানিস, সৌরী, আসলে সরোজদাকে আমরা কিরকম রেস্‌পেক্ট করি, উনি তো আমাদের pride.

—সত্যি দাদার মত আমাদের স্নেহ করেন।

সৌরেন এদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বলে, খুব বুঝেছি বাবা, আমায় ছাড়, দেরী হয়ে যাচ্ছে। সরোজদা যখন বলেছে, তোমরা প্রোগ্রাম বিক্রী কর।

বেঁটে কেষ্ট কিন্তু তখনও ছাড়ে না। বলে, আমাদের দুঃখের কথা কেউ বোঝে নারে, তুই তবু খানিকটা বুঝতে পারবি। কেমন আনন্দে সব আছিস বলতো, পকেটে পয়সা আছে, থিয়েটার করছিস, মেয়ে বন্ধু নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিস। সত্যি, তোর টেস্ট আছে। কেমন মিষ্টি দেখতে মেয়েটাকে বাগিয়েছিস, কি যেন নাম ?

সৌরেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দেয়, এলিজাবেথ হোপ।

—খাসা নাম। আমি তো সবাইকে বলি, মেয়ে নিয়ে যদি বেরতেই হয়, ওই রকম মেয়ে চাই। যে দেখবে ট্যারা হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিস মাইরি।

—নিশ্চয় দেব। বলে আর ওদের কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সৌরেন ছুটে পালিয়ে যায়।

বাজপায়ী কোম্পানী খিল খিল করে হাসে, বলে, আহা লজ্জাবতী লতারে।

নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগে থেকে আসতে শুরু করল দর্শক। অতুলমামা এলেন তাঁর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। সামনেই দেখা হল পীয়ের-এর সঙ্গে। করমর্দন করে হাসলেন। অনেক আগ্রহ নিয়ে তোমাদের শো দেখতে এসেছি।

পীয়ের খুশী হয়ে বলে, দেখুন কিরকম লাগে। মীনা তো খুব পরিশ্রম করেছে।

—ও পাগলী মেয়ে।

পীয়ের হাসে, আমার তাই এক এক সময় মনে হয়।

দুচারটে মামুলি কথার পর, অতুলমামা আমন্ত্রণ জানালেন, হাঙ্গামা মিটে গেলে এস আমাদের বাড়ি।

—নিশ্চয়ই যাব।

এলিজাবেথ এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল তার অতিথিদের নিয়ে। নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের মূল বক্তব্য। বলছিল রবীন্দ্রনাথের কথা যেটুকু সে শুনেছে সৌরেনদের কাছে। তার আজ বড় ভালো লাগছে। এই প্রথম কোন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সে এইভাবে যুক্ত হতে পেরেছে। সত্যিই মনে হচ্ছে এ যেন তার নিজের প্রতিষ্ঠান।

ডোরিয়াকে কাছে পেয়ে সে মনের কথা গোপন করতে পারল না, বলল, আমি ভাবতে পারিনি ডোরিয়া এ ধরনের অনুষ্ঠানে এত আনন্দ পাওয়া যায়। মনে হচ্ছে এই ভারতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় না হলে এদের সম্বন্ধে আমার অনেক কিছুই

অজানা থেকে যেত।

এলিজাবেথের দিকে ভালো করে তাকিয়ে ডোরিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ভারতীয়েরা আমায় মুগ্ধ করেছে। আমার স্বামী বলে বলছি না, তবে জয়ের মত পুরুষ মানুষ যে কোন নারীরই কাম্য। যেমনি স্বভাব তেমনি এদের মন।

ডোরিয়ার চোখ দূরের স্বপ্ন দেখে, গাঢ় স্বরে বলে, তাইত অধীর আগ্রহে দিন গুনছি কবে আমি ওদের দেশে পেঁছব। স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ওদের দেখব। নিশ্চয় সে এক স্বপ্নরাজ্য।

ওদের কথা আরও চলত, রজত এসে পড়তে থেমে গেল। সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সেই পাইপ মুখে বাঁকা বাঁকা কথা।

উত্তর দিল এলিজাবেথ, House full আছে।

—আর কিছু না হোক প্রত্যেক বছর শো' করে, টিকিট বিক্রীর পদ্ধতিটা এরা আয়ত্ত করেছে।

—কেন এদের শো তো ভালো হয়।

রজত হাসল, এই প্রথম একজনকে একথা বলতে শুনলাম।

—আপনার ভালো লাগে না?

—না।

—তবে আসেন কেন কষ্ট করে?

—দেখতে। রজত বোস ইচ্ছে করে একটু থামে, নাটক নয়, এই Fools Paradise।

জবাব দিল ডোরিয়া। আপনার কথাগুলো বড় কড়া।

—আমি নিজে বোধহয় তার চেয়েও বেশী কড়া।

—যাক গে সে তর্কের এখন অবসর নেই। এইবার শো আরম্ভ হবে, মাপ করবেন, আমরা ভেতরে যাচ্ছি।

শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে ডোরিয়া এলিজাবেথকে নিয়ে চলে গেল। রজত সেইদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে, কেন জানা নেই তার মনে পড়ে যায় ছোট-বেলায় পড়া একটা কাহিনী, সেই ময়ূরপুচ্ছের গল্প।

শো আরম্ভ হবার দশ মিনিট আগে, হন্তদন্ত হয়ে পল্টু এসে ঢুকল গ্রীণরুমে, সৌরেনকে বললে, সৌরীদা শীগগির একবার বাইরে এস।

—কেনরে পল্টু।

—দিদি তোমার সঙ্গে দেখা করবে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

—এখুনি যে শো আরম্ভ হবে।

পল্টু সে কথায় কান না দিয়ে সৌরেনের হাত ধরে একটান দেয়। চল না, পাঁচ মিনিটের জন্যে। কী সেজেছে মাইরি, ঠিক রাণীর মত দেখাচ্ছে।

প্রেক্ষাগৃহে একান্তে গ্রীণরুমের সামনে একলা দাঁড়িয়েছিলো মলিনা দাস। পল্টু কিন্তু মিথ্যে বলেনি, সত্যি বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, সাদা সিল্কের কোট, সাদা জুতো, কানে গলায় রুপোর গয়না। বড় করে কালো কুচ-কুচে চুলের খোঁপা বেঁধেছে তাতেও রুপোর পদ্মফুল, তা থেকে ছোট ছোট ঝুমঝুমি ঝুলছে। চোখে সুরমা। ঠোঁটে চকচকে লিপস্টিক। একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

সৌরেনকে দেখে মলিনা দাস হেসে বললে, তোদের শুভকামনা জানাতে এলাম।

সৌরেনও হাসল। ধন্যবাদ। তুমি কি একলা এসেছ ?

—আমি বড় একটা একলা কোথাও যাই না।

—আর সব কোথায় ?

মলিনা দাস চোখ দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ওই যে দূরে কালো ডিনার স্যুট আর কালো বো পরে একপাল দাঁড়িয়ে আছে। পল্টু তুই যা ভাই লক্ষ্মীটি, ওদের বসিয়ে দে, বল আমি আসছি।

পল্টু চলে গেল।

সৌরেন মলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, বড় মিষ্টি দেখাচ্ছে তোমায়।

মলিনা দাস রসিয়ে রসিয়ে বলে, দেখিস প্রেমে পড়ে যাস না।

—তোমার কি মুখে কিছু আটকায় না।

—তোদের মত ছোঁড়াগুলোই আমার রূপে বেশী মজে যে। তাই সাবধান করে দিচ্ছি।

সৌরেন লজ্জা পেল না, হাসল, কবে তোমার সঙ্গে দেখা করব বল, নাটক কিরকম লাগল শুনতে হবে তো।

—যেদিন তোর খুশী। তবে আগে থেকে ফোন করে দিস, আবার কোন সোম সাহেবের সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হয়ে যাবে। তাহলেই তো ডুয়েল।

মলিনা দাস সৌরেনের হাতের উপর চাপ দিয়ে বললে। Wish you best of luck.

আর কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সারা গায়ে ঢেউ তুলে চলে গেল মলিনা দাস।

একে একে আলো নিবে গেল।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ। দর্শকরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে. এক্ষুনি নাটক শুরু হবে।

ফুট লাইটের আলোয় সামনের লাল পর্দা স্বল্প আলোকিত।

ওপাশে মঞ্চ; সেখানেও অন্ধকার। শিল্পীরা উৎকণ্ঠার মধ্যে মিনিট গুনছে। এখুনি তাদের দর্শকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হল, বড় সুন্দর সুর। সুখশ্রাব্য, মধুর। দুদিকে অন্ধকার মাঝখানে আলোকিত পর্দার ক্ষীণ ব্যবধান. এই সবটুকুকে বেষ্টন করে সুরের মূর্ছনা পাক খাচ্ছে। শ্রোতাদের মনে দোলা দিচ্ছে।

অতুলমামা নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, যে জীবন রঙ্গের তিনি নায়ক, সেখানেও তো এই অন্ধকার দানা বাঁধছে। একে একে নিবে গেছে আলো, এখন শুধু অপেক্ষা করে থাকা, শেষ বাতিটুকু কবে নিববে তারই প্রতীক্ষায়।

অন্ধকারের মধ্যে এক কোণ থেকে মেয়েলী হাসির একক রোল উঠে সকলকে সচকিত করে শূন্যে মিলিয়ে গেল। হাসছিল মলিনা দাস। তার জীবনেও হয়ত দু-চারটে বাতি নিবেছে, কিন্তু তা নিয়ে সে পরোয়া করে না, তাচ্ছিল্য করে হাসে। প্রশ্ন জাগে, এদের জীবনে কি কোন দিনই বাতি নিববে না ?

হাসি শুনে অন্ধকারেও যার চোখ শ্বাপদের মত জ্বলজ্বল করে উঠেছিল সে রজত বোস। কৃত্রিমতা সে চায় না, চায় না কৃত্রিম আলো। দিনের আলোর মতই রাত্রের অন্ধকারকে সে ভালবাসে, আঁধারের রূপে সে মুগ্ধ। তার মনে হয় একমাত্র

রাতের অন্ধকারের মধ্যেই মানুষ স্বাভাবিক হতে পারে, প্রকাশ করতে পারে নিজের সত্তাকে। আর অন্য সময় কৃত্রিমতার মুখোশ এ'টে বসে থাকে।

আলো নেবার পর থেকে অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করে অধীর আগ্রহে মঞ্চের দিকে চেয়ে আছে ডোরিয়া। অজানাকে জানবার বিরাট কৌতূহল তার মনে। কখন পর্দা উঠবে, কখন সে অচেনাকে চিনতে পারবে। তারই পাশে বসে এলিজাবেথ, কিন্তু তার চোখে ডোরিয়ার মত কৌতূহল নেই, আছে বিস্ময়। মাত্র ক'মাস সে এসেছে লন্ডনে, অথচ কি করে, এই অল্প সময়ের মধ্যে এক বিদেশী গোষ্ঠীর সঙ্গে এভাবে সে যুক্ত হয়ে যেতে পারল। ইতিপূর্বে হয়ত বিদেশীদের দু-একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সে যোগ দিয়েছে, কিন্তু সেখানে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেনি, কারণ বিদেশী হলেও তারা পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসী। হয়ত এসেছে স্পেন কিম্বা সুইডেন থেকে, কিন্তু আজকে এই ভারতীয় অনুষ্ঠানের সব কিছুই এলিজাবেথের কাছে নতুন বলে মনে হল। ধূপের গন্ধ, যন্ত্রসংগীতের টানা টানা সুর, নানারকম সাজ-পোশাক করা ভারতীয় দর্শক, এলিজাবেথকে শুধু বিস্মিতই করেনি, তার মনে জাগিয়েছে পুলক।

আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বাইরে পালিয়ে এসেছে পীয়ের। লবিতে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে, চোখে মুখে প্রবল উত্তেজনা। যদি পর্দা ঠিক সময়ে না ওঠে, যদি শো' খারাপ হয়, যদি দর্শক মীনাক্ষীর কাজের নিন্দা করে, সেই ভয়ে পীয়ের সঙ্কুচিত। এক এক বার মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছে পর্দা উঠল কি না, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলতেও সে অনিচ্ছুক, পাছে তার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়।

যথাসময়ে পর্দা উঠে গেল।

পীয়েরের আশঙ্কার কোন কারণই ছিল না। শুরু থেকেই নাটক জমে উঠল। মণিপুর রাজ্যের সুন্দর পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে সখীদের নিয়ে ঢুকল চিত্রাঙ্গদা। তাদের প্রাণের উচ্ছলতা প্রকাশ পেল নাচের ছন্দে, গানের ভাষায়। এল অর্জুন, চোখে মুখে তার পাণ্ডবের অহঙ্কার, উপেক্ষা করল বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার প্রেম। অভিমানিনী নারী রূপের ভিক্ষা চাইল দেবতার কাছে। এল মদন আর বসন্ত, তাদের কৃপায় রূপান্তর ঘটল চিত্রাঙ্গদার। সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীত মাধুর্যে, সম্মিলিত নৃত্যের নূপুর নিক্কনে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহকে মাতিয়ে দিয়ে পর্দা নেমে এল কিছুক্ষণ বিরামের জন্যে।

আলো জ্বলে উঠল। একটানা হাততালি চলল অনেকক্ষণ ধরে। শুরু হল নিজেদের মধ্যে কথোপকথন, প্রকাশ পেল ভাল লাগার উচ্ছ্বাস।

পীয়ের ইতিমধ্যে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছিল, সকলের মুখে বাহবা শুনে উত্তেজিত হয়ে ছুটল মঞ্চের দিকে। মীনাক্ষীর কাছে গিয়ে তার হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে, কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে বেশী কথা বলতে পারল না, শুধু বলল, Exquisite!

অধীর আগ্রহে মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করল, সত্যি বলছ পীয়ের?

পীয়ের-এর উত্তর শোনার আর প্রয়োজন হ'ল না। তার দুচোখ বয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। আনন্দাশ্রু।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পীয়ের বলেছে, মীনা তোমাদের শো যে এত ভালো হবে, সকলে দেখে এত আনন্দ পাবে, তা আমি মোটেই আশা করিনি, তাই

বোধ হয় এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

মীনাক্ষী মৃদু হেসে বলেছে, শো ভালো হবে আমি জানতাম, শুধু ভয় ছিল একজনের জন্যে, তার ভালো লাগবে কি না, বুঝতে পারিনি।

—কে সে?

—তুমি।

—কী বলছ মীনা।

মীনাক্ষী হাসল, সত্যি যা খুঁতখুঁতে তুমি, কিছুই পছন্দ হয় না।

—এ অভিযোগ নতুন শুনছি, নিজের ধারণা ছিল আমি বোধ হয় স্বল্পে সন্তুষ্ট, খুব সহজে খুশী হই।

—যাকগে সে কথা, পরে তর্ক করা যাবে। আমি যাই গ্রীনরুমে, দেখি কার কি করবার আছে। যেতে যেতে জিগ্যেস করল, ড্রেস সম্বন্ধে কোন suggestion?

পীয়ের একটু ভেবে নিয়ে বলল অর্জুনকে মানাচ্ছে না, অবশ্য তোমার কিছু করার নেই।

মীনাক্ষী থামিয়ে দেয়। আঃ লীলা শুনতে পাবে।

কিন্তু সকলেই বলছে, ওর পার্টটা ভালো হচ্ছে না। লীলার জায়গায় অন্য কাউকে নামালে দেখতে এ শো আরও কত চমৎকার হত।

—চুপ চুপ, পীয়ের, একথা যেন লীলার কানে না যায়। বড় কষ্ট পাবে।

মীনাক্ষী পীয়েরকে থামাল বটে, কিন্তু থামাতে পারলে না আর পাঁচজনকে যারা ফিস্ ফিস্ করে ওই কথাটাই বলতে এসেছিল স্টেজের ভেতর। অবশ্য লীলার সামনে তারা কিছু বলেনি, তাকে দেখলেই চুপ করে গেছে।

কিন্তু লীলা তো নির্বোধ নয়, এই ফিস্‌ফিসানির অর্থ বুঝতে তার বাকি রইল না। অতি দুঃখেও লীলার হাসি পেল অন্যদের বোকামি দেখে। মনে হল, তার যেন ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে, তাই অতি সাবধানে সবাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য, সরোজ প্রমীলা, মীনাক্ষী এরা পর্যন্ত তাকে দেখে থতমত খেয়ে যাচ্ছে, হাসছে অপ্রস্তুতের হাসি। কেন তারা সহজ হয়ে তার সংগে কথা বলতে পারছে না, জানাতে পারছে না তার নাচ খারাপ হয়েছে, লোকে নিন্দে করছে। মিথ্যে করে হেসে 'বেশ হচ্ছে' বলবার কী প্রয়োজন। লীলা তো কচি খুকি নয়। এটুকু বোঝবার বয়স তার নিশ্চয় হয়েছে।

লীলা ইচ্ছে করেই সকলের মাঝ থেকে সরে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পিছনের বারান্দায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কানে ভেসে আসছে লোকজনের কলরব। মনে হল, লীলা না থাকায় তারা খুশী হয়েছে, প্রাণ খুলে কথা বলছে। নিশ্চয় প্রশংসা করেছ নন্দিতার নাচের। প্রমীলার গানের, সরোজদার পরিচালনার, হয়তো বা মীনাক্ষীর মঞ্চসজ্জার। কে বলতে পারে, মদনের সাজে অমিতাভকে হয়তো অনেকের ভালো লেগেছে। এতক্ষণ লীলার উপস্থিতিতে যা বলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, এখন বলতে পারছে।

আবার শো আরম্ভ হ'ল।

অর্জুনের বেশে মঞ্চে নামতে তখনও দেরী আছে। লীলা অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়াল উইংসের পাশে।

সরোজ আর প্রমীলা সামনের দিকে পাশাপাশি বসে গান করছে, অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সমবেত সঙ্গীত, নাচছে নন্দিতা আর সুভদ্রা। বেশ মানিয়েছে

ওদের। লীলা এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করল মণ্ডসজ্জা, সাজ পোশাক, চেয়ে দেখল গানের দলে কে কোথায় বসেছে। বেচারী সৌরেন এক কোণায় পড়ে গেছে। জয় বসেছে মাঝামাঝি।

শুরু হল চিত্রাঙ্গদার একক নাচ, সেই সঙ্গে প্রমীলার গান। বড় মিষ্টি শোনাচ্ছে। মাইকে যেন প্রমীলার গলা আরও ভালো শোনায়। চোখ বন্ধ করে প্রাণভরা দরদ মিশিয়ে সে গান করছে। লীলা চুপ করে সেইদিকেই তাকিয়েছিল। সরোজ তার ডান হাতটা দিয়ে ধরে রেখেছে প্রমীলার বই, পাছে সে ভাষা ভুলে যায়। তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে আরও যেন নিবিড় হয়ে বসেছে। গান শেষ হতেই সরোজ প্রমীলার দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসল প্রশংসার হাসি, প্রমীলাও তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পণ্য করল না, চোখের ভাষায়।

লীলা যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল এইবার তার পালা, এখুনি তাকে মঞ্চে নামতে হবে অর্জুনের বেশে, শুধু ভাবছিল সরোজ আর প্রমীলার কথা, তাদের হাসি খুশী মুখ, সাফল্যের চাপা আনন্দ।

মীনাক্ষীর তাড়ায় তার চমক ভাঙ্গল, একি লীলা, তুমি এখানে? এইবার যে তোমার নাচ, যাও।

লীলা ইতস্তত উত্তর দিল, আমার নাচ? তাই ত! এই যে যাচ্ছি।

—হলদে চাদরটা কোমরে বাঁধনি যে?

লীলা উদাস স্বরে বলল, এনে দাও না মীনাক্ষীদি, বোধহয় গ্রীনরুমেই রেখে এসেছি।

লীলার কথা শুনে মীনাক্ষীর কেমন যেন সন্দেহ হয়, জিজ্ঞেস করলে, লীলা, তোমার শরীর ভাল আছে তো?

লীলা ছোট্ট উত্তর দিল, হ্যাঁ।

যথাসময়ে অর্জুনবেশী লীলা মঞ্চে প্রবেশ করল। প্রথম নাচটা সাধ্য মত সে নেচেছে, বিশেষ ভুল করেনি, কিন্তু চিত্রাঙ্গদাবেশী নন্দিতা সেনের একক নৃত্যের উত্তরে দ্বিতীয় বার নাচতে গিয়েই মনে মনে প্রমাদ গণল লীলা। কিছুক্ষণ আগে থেকেই তার মন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ প্রতিদিন রিহার্সাল দেওয়া বহুবার শোনা গানের একটা কলি তার মনকে আরও দূরে নিয়ে চলে গেল। লীলা ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল তার পরিবেশ, ভুলে গেল এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব।

ছন্দ পতন ঘটল, কেটে গেল পায়ের তাল।

চমকে উঠল লীলা, যখন তার সম্বিত ফিরে এল, উপলব্ধি করল, মাত্রা ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু কিছুতেই সে গানের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারল না। বিরুদ্ধ স্রোতে সাঁতার দেওয়ার মত এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। লক্ষ্য করল চিত্রাঙ্গদার চোখে প্রণয়িণীর দৃষ্টি নয়, সেখানে পরিচালিকার ভ্রূকুটি। দেখল, উইংসের পাশে মীনাক্ষী-দের মত যারা দাঁড়িয়ে, তারা সবাই সন্ত্রস্ত। অন্ধকারে দর্শকদের দেখা যাচ্ছে না, কে জানে তারা কি ভাবছে। এতটুকু সহানুভূতির আশায়, ভুল তালে নাচতে নাচতেই সে চাইল সরোজ আর প্রমীলার দিকে। তারা মুখ টিপে হাসছে।

কোনরকমে নাচ শেষ করে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে লীলা লজ্জায় অপমানে এক ছুটে গ্রীনরুমে গিয়ে আশ্রয় নিল।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল মীনাক্ষী, সহানুভূতি ভরা গলায় বলে, নিশ্চয় তোমার শরীর খারাপ হয়েছে লীলা।

লীলা চীৎকার করে উঠল, হয়নি, হয়নি। আমি ঠিক আছি।

—তবে যে—

—কেন নাচতে পারছি না, লীলার চোখে অসহ্য বিদ্রূপ, নাচতে জানি না বলে। মজা দেখবার জন্যে আমাকে অর্জুন সাজিয়েছিলেন কেন?

মীনাক্ষী বিস্মিত হয়, এসব কি বলছ লীলা?

—সবাই জানত আমি পারব না, তবু ঢং করে আমাকে অর্জুন সাজানো হয়েছে, আজ বুঝতে পারছি সরোজ, প্রমীলা, তুমি সবাই সমান।

—আঃ, মাথা ঠাণ্ডা কর। এখুনি আবার তোমার নাচ আছে।

লীলা কঠিন স্বরে জানাল, আমি আর নাচব না।

—সে কি, শো বন্ধ হয়ে যাবে? সবাই চেঁচামেচি করবে।

লীলার চোখে হিংস্র দৃষ্টি, তাতে আমার কি?

মীনাক্ষী ভয় পায়, বোঝাবার চেষ্টা করে, আজকের শো'টা কোনরকম—

—দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, আমায় একলা থাকতে দাও মীনাক্ষীদি।

মীনাক্ষী আস্তে আস্তে গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু সে কি করবে, এ বিপদের কথা কাকে জানাবে?

সরোজ মঞ্চের ভেতরে, তাকে জানাবার কোন উপায় নেই, জানলেও সে উঠে আসতে পারবে না। সরোজ ছাড়া আর কারুর কথা মীনাক্ষী ভেবে পেল না যে এসময় লীলাকে গিয়ে বোঝাতে পারবে।

ভাবল নিজেই আর একবার গিয়ে লীলাকে দেখবে, চেষ্টা করবে মঞ্চে নিয়ে আসতে, কিন্তু গ্রীনরুমের কাছে গিয়ে দেখল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া পেল না। নিরুপায় মীনাক্ষী মঞ্চের একান্তে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল সেই চরম মুহূর্তের জন্যে, যে সময়ে অর্জুনের গান হবে, অথচ অর্জুন মঞ্চে ঢুকবে না। বিস্মিত শিল্পীদের দেখে হাসির রোল উঠবে, অতি ধীরে নেমে আসবে পর্দা।

মীনাক্ষী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। চিত্রাঙ্গদার নাচ শেষ হল, অন্যরা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে, এইবার ডানদিক থেকে অর্জুনের ঢোকবার কথা, মঞ্চস্থ সকলেই সেইদিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গীতে গানের সুর বেজে উঠল, এইবার সরোজ গান করবে। কিন্তু তারপর, মীনাক্ষীর মুখ ভয়ে কালো হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, সরোজের গানের সঙ্গে সঙ্গে সাহাস্য মুখে অর্জুনবেশী লীলা প্রবেশ করল মঞ্চে। মীনাক্ষী চমকে উঠল, সে ভুল দেখছে না তো?

না, সত্যিই লীলা নাচছে, আগের মত এবারও তার তাল ভুল হল কিন্তু মোটেই বিমূঢ় হয়ে পড়ল না। নিজের খুশি মত কোনরকমে কাজ চালিয়ে দিয়ে সে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করল।

মীনাক্ষী ছুটে গিয়েছিল তাকে ধন্যবাদ জানাতে, কিন্তু লীলা কোন কথা বলতে দেয়নি, আবার গ্রীনরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত করতালিতে মুখর হয়ে উঠল সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ। মঞ্চের উপর এসে দাঁড়াল শিল্পীরা, নাচিয়ে, গাইয়ে, অন্তরালের কলাকুশলীর দল। শুধু একজন এল না, সে লীলা। মীনাক্ষী ছাড়া অবশ্য তার অনুপস্থিতি কেউ প্রথমটা লক্ষ্য করেনি। তখন ক্রমান্বয়ে হাততালি চলেছে। একবার

পর্দা নেমে আসে, আবার দর্শকদের হাততালির অনুরোধে উঠে যায়।

শেষবারের মত যবনিকা যখন পড়ল তখনও সরোজরা মুক্তি পেল না। মঞ্চের মধ্যে পরিচিত দর্শকরা উঠে এল, তাদের অভিনন্দন জানাতে। ইতিমধ্যে লীলার খোঁজও পড়েছিল, তবে তার দেখা কেউ পায়নি। ভেবেছিল নিশ্চয় অন্য কোথাও আছে।

সকলে চলে যাবার পর সরোজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, চল প্রমীলা, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও, মনে আছে তো? আজ জয় আর ডোরিয়াকে 'ফেয়ারওয়েল' ডিনার দেবার কথা।

প্রমীলা খুশী হয়ে বলল, মনে নেই মানে। রেস্তরাঁয় গিয়ে কি কি মেনু অর্ডার দেব তাও ঠিক করে রেখেছি।

—আচ্ছা পেটুক মেয়ে, যাও গিয়ে মেয়েদের তাড়া দাও। তুমি, লীলা, মীনাক্ষী আর নন্দিতা চারজন যাবে, জয় ডোরিয়া তো আছেই। ছেলেদের মধ্যে আমি আর নন্দিতার স্বামী মোট আটজন।

—অত হিসেব করতে হবে না, আমার মনে আছে। কই পীয়েরের নাম বললে না?

সরোজ হেসে ফেলে, ও পাগলা ঠিক যাবে। আর দেরি করো না, রাত হয়ে গেছে।

প্রমীলা চলে গেল গ্রীনরুমের দিকে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। মুখ তার বিবর্ণ, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, সরোজদা।

প্রমীলার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হল সরোজ, কি হয়েছে?

—লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। ও কোথাও গেছে কিনা জানেন?

—কই না। আমাকে তো কিছু বলেনি। কোথায় গেল?

প্রমীলা গম্ভীর স্বরে বলে, কেউ বলতে পারছে না। তবে আমার মনে হয় ও বাড়ি চলে গেছে।

—বোধ হয় বুঝতে পেরেছে ওর নাচ ভাল হয়নি। মীনাক্ষীদি বলছিল, ওর সঙ্গে রাগারাগিও করেছে।

—তাই নাকি? দাঁড়াও আমি দেখছি। চঞ্চল পদে সরোজ মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল। ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ অতিক্রম করে সে এসে দাঁড়াল লবীতে। কিছুসংখ্যক দর্শক তখনও ইতস্তত দাঁড়িয়ে গল্প করছে। চেনা লোক দেখে সরোজ লীলার কথা জিজ্ঞেস করল, কেউ তাকে দেখেছে কিনা, কিন্তু ঠিকমত উত্তর কারুর কাছ থেকেই পেল না।

এমন সময় বাইরে থেকে এসে ঢুকল অমিতাভ। সরোজকে দেখে বলল, লীলা-দির শরীরটা খারাপ, তাই তিনি বাড়ি গেলেন।

তবু একজনের কাছে খবর পেয়ে সরোজ আশ্বস্ত হল, জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে লীলার?

—আমায় বলেনি।

—তাহলে তুমি জানলে কি করে?

—বোধ হয় সঙ্গে টাকা ছিল না, তাই আমার কাছে থেকে একটা পাউন্ড চেয়ে নিলেন। আপনারা মঞ্চের উপর ছিলেন বলে বিরক্ত করতে চাননি। বললাম, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি, কিন্তু কিছুতেই সঙ্গে নিলেন না।

এতক্ষণে সরোজ বুঝতে পারল তার ভুল হয়েছে। প্রথম থেকেই লীলার খোঁজ করা তার উচিত ছিল। আজকের এ অনুষ্ঠানের অভাবিত সাফল্যের সমস্ত আনন্দ

এক নিমেষে মলিন হয়ে গেল।

মাথা নীচু করে ফিরে এল প্রমীলার কাছে। কিন্তু কথা বলতে পারল না। প্রমীলা সবই বুঝতে পারল, শুকনো গলায় বলে, সরোজদা, আপনারা খেতে যান, আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

সরোজ ধীর স্বরে বলে, ভাবছিলাম, নিজেই একবার যাব কিনা, যদি ওকে ধরে আনতে পারি।

—কোন লাভ নেই, লীলাকে তো আমি চিনি, যখন চটেছে এখন আর সহজে ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে না।

সরোজ সত্যি কথা বলে ফেলে, তোমরাই যদি না যাও রেস্তরাঁয় গিয়ে কি লাভ?

প্রমীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কি করবেন বলুন, আগে থেকে যখন বলা আছে আপনাকে যেতেই হবে। আমি ফিরে গিয়ে দেখি, যদি সম্ভব হয় লীলাকে নিয়ে আসব, তবে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না।

প্রমীলা চলে গেলে সরোজ ডোরিয়াদের নিয়ে উপস্থিত হল রেস্তরাঁয়, সকলের পছন্দ মত অর্ডার দিল খাবারের, চেষ্টা করল হাসিমুখে গল্প করার। কিন্তু পারল না। ক্ষণে ক্ষণে কথার সূত্র ছিঁড়ে গেল, কারুরই বুঝতে বাকী রইল না সরোজ আজ সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক, ভাবছে অন্য কথা।

পথে আসতে আসতে ট্যাক্সীতে মীনাক্ষীর পাশে বসে মৃদু আলাপের মধ্যে লীলার সব কথাই সে শুনে নিয়েছে। খেতে বসে ওই দুটি বোনের কথাই বার বার ভেবেছে। নিজেকে সে মনে করে তাদেরই পরিবারের একজন। কিন্তু আজ এ কি অনর্থের সৃষ্টি হল। কিসের জন্যে লীলা এতখানি মনে কষ্ট পেল যে কাউকে না জানিয়ে বিসদৃশভাবে চলে গেল বাড়ি। যদিও একথা ঠিক লীলার অভিমান বেশীক্ষণ টিকবে না, সব কিছুই সে ভুলে যাবে, আবার তারা আগের মত হাসবে, খেলবে, বেড়াবে। কিন্তু তবু সাময়িক হলেও এই মনোমালিন্যের মেঘ সরোজের আকাশকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

তার কানে ভেসে আসে উচ্ছ্বসিত ডোরিয়ার কণ্ঠস্বর, আপনাদের সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, আর ক'দিন বাদেই আপনাদের দেশের মাটিতে আমি পা দেব, সেখানকার উজ্জ্বল সূর্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে। সেখানকার মানুষের মধ্যে আমি খুঁজে পাব আপনাদেরই মত অকৃত্রিম বন্ধু, এখানকার মত সেখানে বাঁধব বাসা। আপনাদের প্রীতি ভালবাসার কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছে।

ডোরিয়ার কথার উত্তরে মীনাক্ষী কি যেন জবাব দিল, হেসে উঠল সকলে, হাসির ধাক্কায় চমকে উঠল সরোজ। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তাদের হাসির স্রোতে যোগ দিল।

এক সময় জয় বলল, লীলা প্রমীলা না থাকায় আসর আজ মোটেই জমছে না।

সায় দিল ডোরিয়া, বড় চমৎকার মেয়ে, ওদের বাদ দিয়ে আজকের ফেরায়ওয়েল ডিনার পুরো হল না।

নন্দিতা বলল, বেশ তো, কালকে সবাই মিলে কোথাও লাঞ্চ খাওয়া যাক। আমরা তো রাত্রে রওনা হব।

—আপনারা কালই প্যারিস যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, ফিরে যাই। সোমবার থেকে ওঁর অফিস আছে তো।

পীয়ের এতক্ষণ মীনাক্ষীর সঙ্গে মৃদু স্বরে গল্প করছিল, লাঞ্চের কথায় লাফিয়ে উঠল, যদি খেতেই হয় তবে আর রেস্তোরাঁয় নয়, মীনাক্ষীর ফ্ল্যাটে। নিজেরা রান্না করে খাওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গের ছেদ টানল মীনাক্ষী, আগে দেখ লীলার শরীর কেমন থাকে, কাল ওরা খেতে আসতে পারবে কিনা। তারপর যেখানে হোক ব্যবস্থা করলেই হবে।

জয় আর ডোরিয়াকে নির্বিঘ্নে ভারত যাত্রার জন্যে শুভকামনা জানিয়ে সে রাত্রের খাওয়া পর্ব শেষ হল।

অন্যদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে, নন্দিতাদের নিয়ে বাড়ি ফিরল সরোজ। বিশেষ কোন কথা না বলে চলে গেল নিজের ঘরে। আস্তে আস্তে জামা কাপড় খুলল, পরল স্লিপিং স্যুট আর ড্রেসিং গাউন। সোফার পাশে টিপয়ের ওপর টেলিফোনটা রাখা, সরোজ লীলাদের নম্বর ডায়াল করল, শুনতে পেল অন্যদিকে টেলিফোন বাজছে, কিন্তু কেউ তুলল না।

সরোজ চিন্তিতভাবে উঠে পড়ল। কি হল ওদের? দু'জনের কেউই কি বাড়ি নেই? গেল কোথায়? তার কি এখন একবার ওদের বাড়ি যাওয়া উচিত, কিন্তু তাতেই বা কি লাভ হবে?

সরোজ বাথরুমে মুখ ধুতে গেল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে সে চমকে উঠল। সমস্ত মুখে চিন্তার রেখা পড়েছে, কিন্তু এত ভাববার কি আছে? লীলা, প্রমীলা তার কে? লন্ডনে আসার পর তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বান্ধবী ছাড়া আর তো কিছুই বলা যায় না। তবে তাদের জন্যে এত মাথাব্যথা কেন?

লীলা বা প্রমীলার মনের কথা সে যতটুকু জানতে পেরেছে তাতে বুঝেছে, হয়ত সরোজের প্রতি তাদের গোপন দুর্বলতা আছে। থাকা অস্বাভাবিকও নয়, কিন্তু সরোজ, সে কি নিজেকে কখনও তলিয়ে দেখেছে, এই দুই বোনের কোন একজন তার মনের অন্তপুরে স্থান পেয়েছে কিনা?

সরোজ এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে নির্জন ঘরে আয়নার সামনে একলা দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার যাচাই করে নিল। কলকাতার এক বিরাট বনেদী যৌথ পরিবারের সে জ্যেষ্ঠ সন্তান। শুধু মুখের কথার জ্যেষ্ঠ নয়, জ্যেষ্ঠত্বের সব গুণগুলিই প্রকাশ পেয়েছিল ছোটবেলা থেকে যৌথ পরিবারে ভাই বোনের সংখ্যা কম ছিল না। সরোজ তাদের সকলের বড় দাদা। সকলের দায়িত্ব সে হাসিমুখে নিজের কাঁধে নিয়েছে, তাদের হয়ে কাজ করেছে। ছোটবেলা থেকে সে দেখেছে তাদের সুখী পরিবার। পেয়েছে তার বাবা কাকার উদার মনের পরিচয়। উপলব্ধি করেছে বয়োজ্যেষ্ঠাদের মহত্ত্ব, আর গর্ব অনুভব করেছে ছোট ভাই বোনদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে।

কিন্তু তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দিনের কালো মেঘ জমা হল বাংলার জমিদারদের আকাশে। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, বঙ্গভঙ্গ। স্বাধীনতা এল, কিন্তু তার জন্যে কম মূল্য দিতে হল না বাংলা দেশকে। সরোজদের পৈত্রিক জমিদারী গিয়ে পড়ল পাকিস্তানে।

একটা ধনী পরিবার রাজনীতির দুর্বিপাকে পড়ে হঠাৎ গরীব হয়ে গেল। দারিদ্র্যের প্রকাশ প্রকট হয়ে উঠল এদের মনে। এতদিনের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেল। কলকাতার বিরাট বাড়িতে পাঁচিল উঠল ঘিঞ্জি হয়ে। যে যার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। যারা পারল, যুগের হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল ঠিক, কিন্তু পারল না সরোজ। একভাবে তৈরী মনকে সে কিছুতেই সংকীর্ণ করতে

পারল না। বাস্তবের কঠিন আঘাতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। পালিয়ে এল সে লণ্ডনে। বাড়ির থেকে সে এক পয়সাও নেয়নি। ইউনিভার্সিটির নামকরা ছেলে, চলে এসেছিল স্কলারশিপ নিয়ে, এখন বড় চাকরি করছে, প্রতি মাসে দেশে টাকা পাঠায়। কিন্তু ওই পর্যন্ত, ফিরে যেতে চায় না। চায় না, ইচ্ছে করে না। লণ্ডনে এমন কোন মোহ নেই যার জন্যে সে এখানে পড়ে আছে, কিন্তু তাই বলে দেশে ফিরে কি করে সে তাদের বহু বিভক্ত জীর্ণ বাসভবনে ঢুকে দুঃস্থ আত্মীয় পরিজনের মধ্যে সুখে বসবাস করবে।

কলকাতায় থাকতে 'বড়দাদা'র বিশেষ আসনটি তার চলে গেলেও মনটাকে সে তেমনিভাবেই সযত্নে জিইয়ে নিয়ে এসেছিল লণ্ডনে। তাই এখানে কয়েক মাস থেকেই সে হয়ে পড়ল আর পাঁচজনের সরোজদা, পেল তাদের প্রীতি, ভালবাসা। কলকাতায় থাকতেও যেরকম সে ভাইবোনদের ভাবনা চিন্তা নিজের কাঁধে টেনে নিয়েছে তেমনি করে এখানকার পাতানো ভাই বোনদের নানা সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে হাসিমুখে।

লীলা, প্রমীলার ক্ষেত্রেও তার ভাবধারার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিজের আত্মীয়ার মতই এই দু'টি প্রবাসী মেয়েকে সে কাছে টেনে নিয়েছিল, অন্য কোনরকম চিন্তাকেই সে প্রশ্রয় দেয়নি। এ সত্ত্বেও যদি তারা কোনরকম ভুল করে থাকে, সরোজের দোষ কোথায় ?

মনে হল টেলিফোন বাজছে। সরোজ তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করল, হ্যালো, কে ?

ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আমি প্রমীলা।

—বল, আমি সরোজদা কথা বলছি। আমি টেলিফোন করেছিলাম। তোমরা কি বাড়ি ছিলে না ? লীলা কোথায় ?

এতগুলো উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে প্রমীলা ধীর স্বরে বলল, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

চমকে উঠল সরোজ, এখন ? এত রাত্রে ?

—না, কাল সকালবেলা।

—কি হয়েছে বল।

—দেখা হলে বলব।

—লীলা কোথায় ?

—শুয়ে পড়েছে।

সরোজ আর কি বলবে ভেবে পেল না, বেশ, কাল দেখা করব। কোথায়, তোমাদের বাড়ি ?

—হ্যাঁ।

প্রমীলা টেলিফোন কেটে দিয়েছে।

চুপ করে বসে রইল সরোজ। প্রমীলা ফোন না করলেই বোধ হয় ভাল করত। সারাটা রাত তাকে ভাবতে হবে, ঘুমতে পারবে না।

সরোজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দুশ্চিন্তার দীর্ঘ রাত্রি তার সামনে।

সত্যিই ভাল করে ঘুমতে পারল না সরোজ।

বার বার ঘুম ভেঙে গেছে, অনুভব করেছে অব্যক্ত বেদনা।

এ অনুভূতি তার নতুন নয়। এই একই ধরনের বেদনা সে অনুভব করেছিল

কলকাতায় নিজেদের বাড়িতে। যে রাত্রে তার বাবা কাকারা স্থির করলেন, এতদিনের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে দিয়ে যে যার নিজের সংসার গুছিয়ে বসবেন। সরোজ প্রতিবাদ করেছিল, কোন ফল হয়নি। অভিমানে রাত্রে না খেয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে ছিল কিন্তু ঘুমোতে পারেনি। বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণা ক্রমশ অজগর সাপের মত ফুলে উঠে তাকে বেষ্টন করে ধরেছিল। সরোজের মনে হয়েছিল তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আর যেন নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। সে কাল রাত্রির কথা আজও সরোজ ভুলতে পারেনি।

এ বেদনার উৎপত্তি শুধু দুঃখ থেকে হয় না, এর মূলে থাকে আশঙ্কা, থাকে ভয়। এতদিনের সম্পর্ক মিথ্যে হয়ে যাবে, অতি পরিচিতকেও দেখতে হবে নতুন চোখে, পরম স্নেহাস্পদের সঙ্গেও গড়ে উঠবে ব্যবধান। এই আশঙ্কাই সরোজকে কলকাতার বাড়িতে মুহ্যমান করেছিল।

আজও এই সুদূর বিদেশে ওই একই আশঙ্কা তাকে বিচলিত করেছে। সামান্য ক'মাসের মধ্যে লীলা আর প্রমীলার সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এখন তা যদি ভেঙ্গে যায়, এই চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলল।

সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে সরোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। জানত দেরি হলে নন্দিতারা উঠে পড়বে, তাদের সঙ্গে বসে টেবিলে খেতে হবে। এ অসহ্য! তাই টেবিলের উপর একটা ছোট চিঠি রেখে সে চলে গেল, পাছে প্রাতরাশের সময় তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে থাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরোজ অবশ্য প্রমীলাদের কাছে গেল না, কারণ তখন সবে মাত্র সাড়ে আটটা বেজেছে। এসময় গিয়ে হাজির হলে যে কোন মেয়ের পক্ষে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

একটা 'স্ন্যাক বারে' ঢুকে সরোজ গরম কফি খেল সেই সঙ্গে একটা বড় স্যাণ্ড-উইচ। পথে আসতে টিউব স্টেশনের সামনে থেকে সে একটা খবরের কাগজও কিনে-ছিল, কিন্তু উল্টেপাল্টে দেখেও পড়তে ইচ্ছে করল না।

আজ সকাল সকাল বলেই বোধহয় কফিবারে বিশেষ লোক ছিল না। জন দুই বুড়ো এক কোণায় বসে গল্প করছে, তাদের মধ্যে একজনকে সরোজের চেনা মনে হল, কাগজ বিক্রি করে। খালি ডিশ প্লেট তুলে নিয়ে যাবার জন্যে যে মেয়েটি কাজ করে সেও এক কোণায় দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছে। কোমরে সাদা 'এপ্রন' বাঁধা, মুখখানা মিষ্টি, বেশ লম্বা। কিন্তু একটু আগে যখন সরোজকে সুপ্রভাত জানিয়ে কথা বলল, বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে এসেছিল, বোধহয় সাতজন্মে দাঁত মাজে না। ঘুম থেকে উঠে দিব্যি 'লিপস্টিক' মেখে কাজে চলে আসে।

সময় যেন আর কাটতে চায় না, রেস্তোরাঁয় বেশী লোক থাকলে একটা সুবিধে তাদের লক্ষ্য করতে করতেই কোথা দিয়ে ঘণ্টা কেটে যায় বোঝা যায় না।

এক সময় সরোজ উঠে পড়ল। দোকানীর হাতে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চলল প্রমীলাদের বাড়ির দিকে। ওদের বাড়ি যত এগিয়ে আসে সরোজের বুকের উত্তে-জনাও তত বেড়ে যায়। কিভাবে সে কথা বলবে। যদি লীলা চটে গিয়ে থাকে কি করে তাকে বোঝাবে। প্রমীলা যে রাত্রে তাকে ফোন করেছিল সেকথা বলা উচিত হবে কিনা। যদি কোন কথা না ওঠে, তবে কি লীলার না বলে কয়ে মঞ্চ থেকে চলে আসা নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবে। কিভাবে সে ওদের বাড়ি ঢুকবে, মনের সব রকম আশঙ্কা উত্তেজনা চেপে রেখে কি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করবে।

এই দুটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে কতদিন যে সরোজ তাদের বাড়ি গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সকাল, বিকেল, দুপুর এমনকি মাঝরাত পর্যন্ত তারা সবাই মিলে হৈ চৈ আনন্দ করে গেছে; কিন্তু আজ কেন সেই বাড়ির দিকে যেতে এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠছে?

লীলাদের বাড়ির বেল টিপতে দরজা খুলে দিল ওই বাড়ির পরিচারিকা। সরোজকে সে চেনে, হেসে বলল, সুপ্রভাত মিঃ রায়।

সরোজ জানাল, সুপ্রভাত। আশা করি মিস চৌধুরীরা ঘরে আছেন?

—অত্যন্ত দুঃখিত, দু'জনের কেউই নেই।

আশ্চর্য হল সরোজ, বলল, সেকি?

—তবে ছোট মিস্ চৌধুরী আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন, বলেছেন আপনি এলে দিয়ে দিতে।

সরোজের আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না, কোনরকমে চিঠিটা নিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে প্রমীলাদের বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে এল।

কোথায় যেতে পারে ওরা, আর যদি কোথাও যাবারই ছিল সরোজকে আসতে বলল কেন? সব কিছুই তার কাছে হেঁয়ালির মত মনে হয়।

দ্রুতপায়ে ফ্রগ্ল্যান লেনের চড়াই ভেঙ্গে সরোজ চলল হ্যাম্পস্টেডের দিকে। খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে একটা সাপের মত আঁকা বাঁকা রাস্তা চলে গেছে তারই ওপর তিনকোণা ছোট এক টুকরো মাঠ, বেশ সাজানো বাগান, বসবার বেঞ্চি রয়েছে। সরোজ সেখানে বসে প্রমীলার চিঠিটা পড়তে শুরু করল। ঝরঝরে ইংরেজীতে লেখা মেয়েলী চিঠি।

মাই ডিয়ার সরোজদা,

একটু আগেই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম, এখন চিঠি লিখছি। ঘড়িতে রাত্রি একটা বেজে গেছে। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে আপনি আমাদের বাড়ি আসবেন, হয়ত লীলার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু আমি বাড়ি থাকব না। তাই এ চিঠি লিখছি।

আমার সব চেয়ে বড় দোষ সামনাসামনি কথা বলার সময় সবকিছু গুছিয়ে বলতে পারি না, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। তাই মনে হল এ চিঠিতে হয়ত সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে লিখতে পারব।

সেদিন শো'-এর পর আপনারা গেলেন রেস্তরাঁয়, আমি ফিরে এলাম বাড়ি। লীলা আগেই ফিরে এসেছিল। আমাকে দেখে অদ্ভুত ভাবে তাকাল।

আমি অপ্রস্তুত হেসে জিজ্ঞেস করলুম, হঠাৎ চলে এলি যে? সবাই তোর খোঁজ করছে।

লীলা বিদ্রূপ করে হাসিল, কেন, আমার গলায় মালা পরাবে বলে?

কিছু বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে গেলাম।

লীলা নিজে থেকেই প্রশ্ন করল, কি হল, খেতে গেলে না?

বললাম, না।

—ঢং করে আমার কাছে এসে বসে থাকার কোন দরকার ছিল না, সরোজের সঙ্গে গেলেই তো পারতে।

কি নিষ্ঠুর শ্লেষ লীলার কণ্ঠে শুনেছি তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। বিশ্বাস করুন সরোজদা, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত মনটা যেন তেতো হয়ে গেল। একটু আগেই যে আমরা চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ করেছি, এতদিনের পরিশ্রম আমাদের

আজ দেনা-পাওনার হিসেব করতে বসে মনে হচ্ছে পেয়েছি অনেক, কিন্তু সে তুলনায় দিয়েছি অনেক কম। ভুলেও মনে করবেন না পাওয়ার খাতা আমি মিথ্যে টাকা পয়সার হিসেবে ভরিয়েছি। জীবনে ওসবের দাম কতটুকু। কিন্তু পেয়েছি অপরিসীম স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি। পেয়েছি লীলার মত দিদি, আপনার মত বন্ধু।

যদি লণ্ডনকে আমার ভাল লেগে থাকে তার তো অনেকখানি জুড়ে রয়েছেন আপনি। ভবিষ্যতে এই বিরাট পৃথিবীতে কে কোথাও থাকব জানি না, কিন্তু যেখানেই থাকি যখনই এই লণ্ডনের কথা মনে পড়বে, মনে পড়বে আপনাকে, আপনার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, কথাবার্তা। অন্ধকার ঘরের মধ্যে গান করা। শীতের দুপুরে বেড়াতে যাওয়া। মনে পড়বে আপনার ছোটখাট হাসি-ঠাট্টা, গভীর পাণ্ডিত্য, উপদেশ। তখন মনে মনে আমি আপনাকে প্রণাম জানাব।

চিঠিতে এত কথা লিখলাম যাতে না আপনি আমাকে ভুল বোঝেন, আপনাদের সঙ্গে বেরবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন।

আমার একান্ত অনুরোধ এ চিঠি আর কাউকে দেখাবেন না। বরং ছিঁড়ে ফেলে দিলে খুশী হব।

আমার আন্তরিক ভালবাস ও শুভেচ্ছা রইল।

ইতি—
স্নেহধন্যা
প্রমীলা।

চিঠি পড়া শেষ করে সরোজ রায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এ তো চিঠি নয়, ঠিক যেন প্রমীলা নিজের মুখে কথা বলছে। এতটুকু মেয়ে অথচ কতখানি যুক্তি তার চিন্তায়, কি নিখুঁত চরিত্র বিশ্লেষণ।

চিঠিটা আবার পড়ল সরোজ।

সারাদিনই প্রায় সরোজ প্রমীলার কথাগুলো ভেবেছে। কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে যে আশংকা সে করেছিল তাই আজ কঠিন সত্যে পরিণত হয়েছে। এ ক'মাসে প্রমীলাকে সে যতটুকু চিনিছে তাতে বুঝেছে সহজে তার মত বদলানো যায় না। নিজের বুদ্ধির ওপর তার অবিচল বিশ্বাস, একবার মনস্থির করলে আর কোনরকম চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দেয় না যাতে ক্ষুদ্রতম অস্থিরতারও সম্ভাবনা আছে।

অথচ সরোজ নিরুপায়। কিছুই তার করবার নেই। নিছক দর্শক হিসেবে তাকে দেখতে হবে এই দুই বোনের বিচ্ছেদের নাটক। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? যেই হোক সরোজ নয়। কোন বিষয়েই সে পক্ষপাতিত্ব দেখায়নি। এমন কোন ভুল ধারণাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি যাতে এক বোন আর একজনের ওপর ঈর্ষান্বিত হতে পারে।

তবু কোথায় যেন একটা খোঁচ থেকে যায়। যুক্তি দিয়ে নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করলেও নিজের মনের কাছে সে রেহাই পায় না। যদি সত্যিই বিচ্ছেদ ঘটে, উপলক্ষ্য যে সেই, একথা সরোজ অস্বীকার করবে কি করে? এই চিন্তার পীড়ন থেকে সে সারাদিনে কিছুক্ষণের জন্যেও মুক্তি পেল না। বাড়িতে ফিরে গিয়েও অস্থিরভাবে সে পায়চারি করেছে, অসংলগ্ন আলাপ করেছে অন্যদের সঙ্গে। মনের উত্তেজনা কমাতে হয়ত বেরিয়ে গেছে বাড়ির বাইরে, কিন্তু সেখানেও শান্তি পায়নি। প্রকৃতির স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় নিজেকে আরও বিমর্ষ মনে হয়েছে, আবার বাড়ি

ফিরে এসেছে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

বিকেলের দিকে নন্দিতারা ফিরে গেল প্যারিসে। সরোজ তাদের তুলে দিয়ে এল, 'এয়ার টারমিনাসে' ধন্যবাদ জানাল এতখানি কষ্ট করে এসে চিত্রাঙ্গদাকে সফল করার জন্যে। কিন্তু সবটাই মনে হল যেন মুখের কথা, অন্তরের নয়। নন্দিতার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। নন্দিতা জিজ্ঞেস করেছিল, লীলারা কেমন আছে?

অন্যমনস্ক সরোজ উত্তর দেয়, ভালই।

—তুমি বড় চিন্তিত।

—তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

নন্দিতা হাসল, সরোজ রায়কে এরকম গম্ভীর মুখে বিশেষ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যাই হোক, কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এস না প্যারিসে।

অজান্তে সরোজের দীর্ঘশ্বাস পড়ল, আসব।

বিদায় নেবার আগে অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের মত নন্দিতা সেন বলে গেল, অত দমে পড় না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সরোজ হাত নাড়তে নাড়তে লক্ষ্য করল, নন্দিতার চোখে কৌতুক।

রাত্রের খাওয়া সরোজ বাইরে শেষ করে বাড়িতে ঢুকল। একলা নিজের জন্যে রান্না করতে কার আর ইচ্ছে করে। নন্দিতারা চলে গেছে, জয়ও ক'দিন থেকে আর এখানে নেই। দু'দিন বাদে তাদেরও যাত্রার পালা। ডোরিয়া আর ও সংসার গোছাতে ব্যস্ত।

বাড়ি একেবারে ফাঁকা। অন্ধকার ঘর। এ ক'দিন রিহার্সালের জন্য হৈ চৈ আনন্দে এ ফ্ল্যাট মুখর হয়ে থাকত অথচ আজ আশ্চর্য রকম স্তব্ধ। সারাক্ষণই নিজেকে সরোজের বড় একলা মনে হয়েছে এখন এই নির্জন ঘরের মধ্যে ঢুকে আরও যেন অসহায় বোধ করল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, রাত্রি আসছে। আরও একটা বিনিদ্র রজনী কাটাতে হবে, ভাবতেই বিশ্রী লাগল। সাধারণত সরোজ পান করে না। কিন্তু আজকের এই বিমর্ষ দিনটাকে ভোলবার জন্যে আলমারির ভেতর থেকে বার করল সযত্নে তুলে রাখা 'ব্র্যান্ডি'র বোতল। অল্প পরিমাণে গেলাসে ঢেলে সোডার অভাবে ঈষদুষ্ণ গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে সে অতি ধীরে চুমুক দিতে শুরু করল।

সরোজ ভেবেছিল খানিকটা পান করলে হয়ত মনটা ভাল হবে, কিন্তু তা হল না। আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কেমন যেন অবসাদ। কি করবে ভেবে না পেয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার আলো জ্বালাল। অন্য ঘরগুলো অন্ধকার করে রাখতে তার ইচ্ছে করল না, সব ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়-চারি শুরু করল এক ঘর থেকে আর এক ঘরে। কার্পেটগুলো বড় ময়লা হয়েছে, সময় করে একদিন পরিষ্কার করা দরকার। যে কোন দিন বাড়িওয়ালারা এসে দেখে যেতে পারে ঘরদোর তাদের ঠিক করে রাখা হয়েছে কি না। বক্স-রুমে অনেক মাল জমা হয়েছে, কাদের কে জানে। যখন কেউ বাড়ি বদলায়, কিম্বা লণ্ডন ছেড়ে ইংলণ্ডের অন্য কোথাও যায় সঙ্গে বাড়তি বাক্স থাকলে কাঁধে করে বয়ে বেড়াতে চায় না, কোথাও গচ্ছিত রেখে যায়। বহু পরিচিত জনই সেই কারণে সরোজদের এই গুদামঘরটা ব্যবহার করে।

নন্দিতারা যে ঘরটায় ছিল ছিমছাম করে সাজিয়ে রেখে দিয়ে গেছে। সরোজের দেখতে বেশ ভাল লাগল। এ কাজগুলো যেন মেয়েদের জন্যে, ওরাই পারে। দু'খানা

ঘর মিলিয়ে তিন খানা খাট, তার মধ্যে দুটো ডবল বেড। সব খালি পড়ে আছে।

নিজের ঘরে ফিরে এল সরোজ, হঠাৎ নজরে পড়ল টেবিলের এক কোণে চাপা একটা কাগজের টুকরো। জয় ইংরিজীতে দু' লাইন চিঠি লিখে রেখে গেছে। বক্তব্য সামান্য। পরশু দিন সকালের গাড়িতে জয় আর ডোরিয়া কণ্টিনেণ্ট রওনা হচ্ছে, সরোজ সময় পেলে যেন স্টেশনে আসে। আর ওরা যখন এখানে সন্ধ্যেবেলা সরোজের জন্যে অপেক্ষা করছিল সেই সময় লীলা ফোন করে। সে অনুরোধ করেছে, সরোজদা ফিরে এসে যেন লীলাকে ফোন করে।

চিঠিটা পড়ে সরোজ খুশী হল। হয়ত আজ সারাদিন ধরে সে যা নিয়ে ভয় পেয়েছে, তা মিথ্যে, অমূলক। হয়ত লীলা আর প্রমীলার মধ্যে যে ভুল বোঝা-বুঝির মেঘ জমা হয়েছিল তা কেটে গেছে।

সরোজ তাড়াতাড়ি টেলিফোন ডায়েল করল।

ওদিক থেকে নারী-কণ্ঠ ভেসে এল, হ্যালো।

—আমি সরোজদা কথা বলছি।

প্রমীলার কণ্ঠস্বর, লীলা আপনাকে খুঁজছিল, ডেকে দিচ্ছি।

একটু বাদে লীলা এসে ফোন ধরল, অত্যন্ত স্বাভাবিক গলা, সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন? ধরতে পারছি না।

সরোজ যতদূর সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, অনেকগুলো কাজ জমা হয়েছিল একে একে শেষ করলাম।

—তাই বলে আমাদের একবার খোঁজ নিতে নেই বুঝি?

সরোজ কিছু বলতে পারল না, হাসল।

—জয়ের কাছে শুনলাম আপনি নন্দিতাদের পোঁছতে গেছেন, আমাদের খবর দিলেন না কেন?

সরোজের নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর, তোমরা যাবে তা তো বলনি।

—যাক গে সে কথা, পরশু জয়দের তুলে দিতে স্টেশনে যাচ্ছেন তো? আমরাও যাব।

—বেশ তো, স্টেশনে দেখা হবে।

লীলার কণ্ঠে তরল উচ্ছ্বাস, আর কেউ আছে নাকি আপনার সঙ্গে?

—না।

—একলা বসে আছেন?

—ক্ষতি কি।

—চলে আসুন না আমাদের এখানে, মাংস রেঁধেছি।

সরোজ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, না, আজ থাক। খুব ক্লান্ত হয়ে আছি, তার ওপর কাল অফিস।

—তাহলে আর বিরক্ত করব না, বাই বাই।

—বাই বাই।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সরোজের বড় অদ্ভুত লাগল। লীলা কি তবে কিছুই মনে করেনি? প্রমীলার চিঠিটা সম্পূর্ণ মনগড়া? তা যদি না হবে এমন সহজ, স্বাভাবিকভাবে লীলা আলাপ করল কি করে? মনে মনে স্বীকার করল ঋষিরা যা বলে গেছেন তা ঠিকই, মেয়েদের মন বোঝা দেবতারও অসাধ্য।

আর যাই হোক, সে রাত্রে সরোজ নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারল।

স্টেশনে জয় আর ডোরিয়ার সঙ্গে এসেছিল অনেকে, শুধু সরোজের চোখ যাকে খুঁজছিল সে আসেনি। আসেনি প্রমীলা। এ আশঙ্কা অবশ্য সরোজ আগে থেকেই করেছিল। বরং প্রমীলা এলেই সে বিস্মিত হত। তবু মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত জয়দের সঙ্গে দেখা করতে সে আসবে।

সরোজের আসতে দেরী হয়েছিল। দেখল সৌরেন, লীলা, অমিতাভ আরও চেনা অচেনা অনেকে জয় আর ডোরিয়াকে ঘিরে গল্প করছে।

সরোজকে দেখতে পেয়ে জয় তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল, সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, আপনি এসেছেন বড় খুশী হলাম। না এলে দুঃখ পেতাম।

সরোজ জয়ের কাঁধে সস্নেহে চাপড় মেরে উত্তর দিল, বোকা ছেলে, আমি আসব না ভাবলি কি করে?

বিদায় নেবার সময় সাধারণত সকলেই যেমন ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে, তেমনি জয় চোখ ছলছলিয়ে বলল, আপনি না থাকলে লন্ডনে আমি থাকতেই পারতাম না, আপনার উপর এত উপদ্রব করেছি ভাবলে লজ্জা করে।

জয়ের আন্তরিকতায় সরোজেরও চোখে জল আসে, জয়ের করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানায়, দেশে ফিরে গিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হও, সুখে সংসার কর এই কামনা করি।

ততক্ষণে ডোরিয়াও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, মিষ্টি হেসে বলল, সরোজদা আপনাকে আমরা খুব মিস করব।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না, তবু সরোজ বলল, তোমার সামনে এখন অনেক কাজ। অন্য দেশে গিয়ে সংসার পাতা, সে ব্যস্ততার মধ্যে আর আমার কথা মনে থাকবে না।

—বেশ সেকথা আমার চিঠি থেকেই জানতে পারবেন।

সরোজ মৃদু হেসে জানাল, তোমাদের দুজনের জন্যেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল—ধন্যবাদ।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে যথাসময়ে ট্রেনে উঠে রুমাল নাড়তে নাড়তে জয় আর ডোরিয়া লন্ডন ছেড়ে কন্টিনেন্টের দিকে পাড়ি দিল।

এবার সকলের ফেরবার পালা, যে যার অফিসে যাবে। সরোজ ব্যস্ততা দেখিয়ে বলে,, আমার দেরী হয়ে গেছে, এখুনি ট্যাক্সি ধরতে হবে।

লীলা তখনও বোধ হয় ডোরিয়াদের কথা ভাবছিল, বললে, আজ ডোরিয়াকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। গোলাপী শাড়িতে বড় ভাল মানিয়েছিল।

সৌরেন কাছেই দাঁড়িয়েছিল, বললে, এতদিন ধরে ভারতে যাবে বলে জল্পনা-কল্পনা করছিল, আজ তার আশা পূর্ণ হয়েছে। ভাব দেখি, কি উত্তেজনা তার মনে।

ভাবপ্রবণ অমিতাভ গলাটা পরিষ্কার করে নেয়, ওদের দেখে আমারও দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কতদিন এখানে আটকে রয়েছি।

এসব কথা শোনার সত্যিই সরোজের সময় ছিল না, আমি তবে চলি।—বলে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

লীলা পেছন থেকে ডাকল, সরোজদা।

—কি হল?

—কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

—দেখি, এ সপ্তাহটা যাক।

লীলা নিজের মনে বলে, প্রমী আসবে বলেছিল, কেন যে এল না।

—আচ্ছা চলি।

লীলাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সরোজ দ্রুতপায়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল।

বার বার মনে পড়ল প্রমীলার কথা। সে যা চিঠিতে লিখেছে, মনেপ্রাণে তার অনুশীলন করবে। সত্যিই সরে দাঁড়াবে সরোজদের দল থেকে।

অনেক দিন আগে দেখা একটি ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল। প্রায় অন্ধকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে এক বিষণ্ণা নারীমূর্তি এগিয়ে চলেছে, শ্লথ গতি, অবসন্ন দেহ, করুণ চাহনি।

সরোজের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

প্রস্তুতির সময় হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে দিন কাটে, উৎসব হয়ে যাবার পর বেশ কিছুদিনের জন্যে সেই আনন্দ স্রোতে ভাটা পড়ে। সে বিয়ের আসর, পূজার মণ্ডপ, গানের জলসা যেখানেই হক না কেন। বিদেশ হলেও চিত্রাঙ্গদা নাট্যানুষ্ঠানের পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না।

এ ক'দিনের সম্মিলিত আনন্দের উচ্ছ্বাস হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, অনেক আলোর রোশনাই নিবে গেল দপ করে, প্রচণ্ড হাওয়ার বেগ থেমে গেল অদৃশ্য ইঙ্গিতে।

নন্দিতারা ফিরে গেছে প্যারিসে। জয় আর ডোরিয়া ভারতে। প্রমীলা স্বেচ্ছায় সকলের অজান্তে সরে গেছে আগের জীবন থেকে। সে থাকতে চায় একা, দলের থেকে পৃথক হয়ে।

সেই জন্যেই বোধহয় সরোজ রায় তার ফ্ল্যাটের আড্ডা ভেঙ্গে দিয়েছে। অনেকদিন বাদে আবার সে মেতে উঠেছে কাজ নিয়ে। ভোর বেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত করে বাড়িতে। আজকাল আর কোন বেলাই রান্না করে না সরোজ, খায় বাইরে। শনি রবিবার ছুটির দিনও সরোজকে এখন ধরা শক্ত। এদেশী বন্ধুদের কথা একরকম সে ভুলেই গিয়েছিল, আবার সেই পুরোন আলাপের সূত্রগুলো টেনে বার করে তাদের সংগে যোগাযোগ করেছে সরোজ। ছুটিগুলো এখন তাদের সংগেই কাটায়।

তা সত্ত্বেও পিঠ চুলকানো সমিতির সভ্যরা যে একেবারেই আসেনি তা নয়, তারা এসেছে, আগের মত গল্প করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সরোজের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।

তাদের মুখের কথা হল, সরোজদা বদলে গেছে।

কিন্তু কেন?

এ কেনর উত্তর কেউই ঠিকমত দিতে পারে না। এমন কি সরোজকে জিজ্ঞেস করলে সেও বোধ হয় পারবে না। প্রমীলার সরে দাঁড়ানোর সংগে এই ঘরোয়া আড্ডা ভেঙ্গে দেবার সম্পর্ক কোথায়? তবে কি শুধুমাত্র প্রমীলার জন্যে সরোজ এই আড্ডাকে প্রশ্রয় দিত। সরোজ জানে একথা সত্যি নয়। প্রমীলার প্রতি তার কোন বিশেষ আকর্ষণ কোনদিনই ছিল না। কিন্তু প্রমীলার চিঠি পড়ার পর থেকে সে বুঝেছে যদি আগের মতই তারা হৈ চৈ আনন্দ করে দিন কাটায় প্রমীলা দূরে থেকে সে কথা ভেবেও মনে কষ্ট পাবে। জেনেশুনে সরোজ প্রমীলার মনে ব্যথা দিতে চায় না তাই ইচ্ছে করেই নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে কাজের স্রোতে। বদলে ফেলেছে তার জীবনধারা।

এ ত গেল সরোজের কথা, কিন্তু ওই সংগে আরও অনেকের জীবনস্রোত ভিন্নমুখী

হয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। যেমন সৌরেন। 'সুইস কটেজে'র আড্ডা উঠে যাওয়ায় সে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এলিজাবেথের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে, তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরয়, খেতে যায়, অনেক রাত পর্যন্ত বসে গল্প করে। যেদিন এলিজাবেথ বাড়ি থাকে না, অন্য কোথাও চলে যায়, সৌরেন টেলিফোন করে মলিনা দাসকে। উনি ফাঁকা থাকলে ডেকে পাঠান। মলিনা দাসের সঙ্গে বেরলে একটা সুবিধে নিজের পয়সা খরচ হয় না। মলিনা দাস ভাল রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, নাম করা দোকানে ঢুকে বাজার করে, আবার ট্যাক্সী করে সৌরেনকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। মলিনা দাসের ফ্ল্যাটে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ। সোম সাহেবের মত ব্যবসাদার, পল্টুর মত ভাগ্যান্বেষী, কিম্বা ওই ধরনের আর কেউ।

রজত আর মারিয়ার কাছে বড় একটা যেতে পারে না সৌরেন। শো'-এর পর আর তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে টেলিফোনে দু' একদিন কথা হয়েছিল। মারিয়ার বুঝি নাচে খুব নাম হয়েছে, যাচ্ছে 'এডিনবারা ফেস্টিভালে' নাচতে। রজত অবশ্য তার নিজস্ব ধরনে বক্রোক্তি করতে ভোলেনি, স্কটল্যাণ্ডের মহা দুর্ভাগ্য যে লণ্ডনের ক্লাব-থিয়েটার থেকে নাচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রজতের কথাগুলো শুনতে আগে যাও-বা ভাল লাগত, আজকাল সৌরেনের কেমন যেন বিরক্ত লাগে। ওর ওই সবজান্তা হাসি আর অতি বিজ্ঞের মত মন্তব্য অসহ্য মনে হয়।

তার চেয়ে এলিজাবেথ কিম্বা মলিনা দাসের সঙ্গে সময় কাটানো অনেক ভাল।

সরোজদার ফ্ল্যাটের আড্ডা ভেঙ্গে যাওয়ায় আর একজন যার অসুবিধে হয়েছে সে হল অমিতাভ। তার নিঃসঙ্গ জীবনে প্রথম আনন্দের বার্তা এনে দিয়েছিল এই 'পিঠ চুলকানো সমিতি', এখানকার সভ্যদের মধ্যে সে পেয়েছিল সহানুভূতি, প্রীতি ভালবাসা, কিন্তু এখন তার আবার নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। কলেজের পর প্রতিদিন সে যেত সুইস্ কটেজে কিন্তু এখন সেখানকার দরজা বন্ধ হওয়ায় সে যায় লীলাদির কাছে। বিকেল থেকে গিয়ে গল্প করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায়। প্রমীলার সঙ্গেও দেখা হয়, তবে বেশীক্ষণ সে বসে না। আজকাল সারাক্ষণই সে ব্যস্ত, লণ্ডনের বাইরে কোথাও পড়তে যাবে তারই চেষ্টা করছে। অমিতাভকে পেয়ে বেঁচে গেছে লীলা। পড়াশুনো করার অভ্যেস ওর মোটেই নেই, অফিস থেকে ফিরে এসে একলা বসে থাকতে একেবারে পারে না। প্রমীলাকে না নিয়ে একলা বেরতে সে কোনদিনই পারেনি; আজও পারে না। চুপচাপ একলা বাড়িতে বসে সে কি করবে। তবু অমিতাভ এলে পাঁচ রকম গল্প হয়, বিশেষ করে অন্যদের চরিত্র বিশ্লেষণ। তবে এক এক সময় লীলার কেমন যেন সন্দেহ জাগে, অমিতাভ ঠিক মত পড়াশুনো করছে তো? না এই ভাবে গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করছে। অবশ্য সে কথা ভেবেই বা কি করবে?

সরোজদের আড্ডা ভেঙ্গে যাওয়ায় যার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি, সে মীনাক্ষী। মীনাক্ষী কোনদিনই লীলা প্রমীলার মত সরোজের ফ্ল্যাটে আসত না, অনেক ডাকাডাকি করলে যেত, প্রয়োজন মত কাজ করে দিয়ে আসত। তার বেশী আর কিছু নয়। মীনাক্ষী বরাবর নিজের মনে কাজ করে। আর্ট স্কুলের কোর্স তার শেষ হয়ে এসেছে, বাড়িতেও যা অনুশীলন করে, নিঃশব্দে। দেশে থাকতে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে বেশীক্ষণ গল্প করতে পারত না, সে অভ্যাস আজও বদলায়নি। একজনের সঙ্গে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে কোন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত কিন্তু দশজনের সঙ্গে আধ ঘণ্টার জন্যে আড্ডা মারতে সে রাজী নয়।

সেদিক থেকে পীয়েরের সঙ্গে ওর অনেক মিল। পীয়ের হাসিখুশী, আমুদে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভিড় দেখলে কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। পাঁচ জনের মধ্যে ও চুপ করে ভাল মানুষটির মত বসে থাকে। সকলের কথা শোনে, কোন মন্তব্য করে না। কিন্তু মীনাক্ষীকে একলা পেলেই পীয়ের মুখর হয়ে ওঠে। কে, কি ভাবে কথা বলছিল তার ক্যারিক্যেচার করে মীনাক্ষীকে হাসিয়ে মারে। অথচ এ ব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্যে অনাবিল হাস্যরস ছাড়া আর কিছু থাকে না, কাউকে আঘাত করার চেষ্টা করে না পীয়ের।

দুদিন হল অফিসের কাজে পীয়ের গেছে গ্লাসগো, কবে ফিরবে এখনও ঠিক নেই। বলেছিল ওখান থেকে চিঠি দেবে, হয়তো কাজের চাপে সময় করতে পারেনি।

দেশ থেকে আজ দুখানা চিঠি এসেছে। একখানা লিখেছেন দাদু, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বেড়াতে গেছেন ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে। ওখানে বেশ আনন্দে দিন কাটছে। লিখেছেন মীনাক্ষী সঙ্গে থাকলে আরও বেশী আনন্দ পেতেন, মীনাক্ষীও ওখানকার ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতে পারত।

দাদু নিজের হাতে চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন। মীনাক্ষী কলকাতায় থাকতে দাদুর হয়ে চিঠি লিখে দিত। এখন লেখেন (সুধা) বৌদি, মীনাক্ষীর মামাতো দাদার স্ত্রী। অসংখ্য বানান ভুল। তবে অক্ষরগুলো পরিষ্কার।

শেষের ক'লাইন পড়তে গিয়ে মীনাক্ষীর চোখে জল এল, যেখানে দাদু লিখে-ছেন: "বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। খালি ভয় হয় কৃপার পাত্র না হয়ে পড়ি। পর-মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় শাস্তি বোধহয় মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। আমার তো মনে হয় ও হল নরক যন্ত্রণা।

"অসুখের মধ্যে শুয়ে শুয়ে তাই প্রার্থনা করতাম, ঠাকুর তুমি আমায় মেরে ফেল, তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু আমায় পঙ্গু করে বাঁচিয়ে রেখ না।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি আমার কথা শুনেছেন। চোখ কান মাথা, সবই দেখছি ঠিক আছে। কোনটাই বিকল হয়নি।

"তুমি যখন দেশে ফিরবে, যদি বেঁচে থাকি আবার এই চোখ দিয়ে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পাব। এই কান দিয়ে তোমার সুমিষ্ট কথা শুনতে পাব, তা ভাবতেই বড় আনন্দ হচ্ছে।"

দাদু আরও অনেক কথা লিখেছেন, কিন্তু এই ক'টা লাইন বারবার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল, মনে পড়ল স্নেহময় দাদুর পবিত্র মখখানা।

আর একখানা চিঠি লিখেছে অনিলা। মীনাক্ষীর বান্ধবী। স্কুলে কলেজে ওরা একসঙ্গে পড়েছিল। সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পর অনিলার বিয়ে হয় বেশ পয়সাওয়ালা ঘরে। স্বামী বেসরকারী অফিসের বড় চাকুরে। ইতিমধ্যে দুটি ছেলে, একটি মেয়ে হয়েছে।

অনিলার ইচ্ছে বাচ্চাদের শ্বশুর শাশুড়ির কাছে রেখে কয়েক মাসের জন্যে বিলাত বেড়িয়ে যাবার। সবরকম খোঁজ খবর নেবার জন্যে প্রায়ই সে মীনাক্ষীকে চিঠি লেখে। ওর চিঠি পেলে মীনাক্ষীর হাসি পায়। অনিলার এদেশে আসার এক-মাত্র আগ্রহ কলকাতায় ফিরে গিয়ে যাতে সে বন্ধুমহলে চাল মারতে পারে, তাছাড়া আর কোন রকম বাসনা তার নেই।

পাতার পর পাতা লিখে সে মীনাক্ষীকে বোঝাবার চেষ্টা করে তার শ্বশুরবাড়ির বৈভবের কথা। জানাতে ভোলে না সমাজের কত সব নামজাদা বাড়িতে তাদের নিমন্ত্রণ হয়। কিন্তু সারা চিঠিতে যার নাম একবারও থাকে না সে বোধ হয় তার স্বামী।

চিঠি পড়লেই বোঝা যায় অনিলা আগে যেরকম ছিল আজও ঠিক সেইরকম আছে। বিয়ের রাত্রি থেকে স্বামীকে তার পছন্দ হয়নি। পছন্দ হয়নি তার চেহারা, তার অতি গম্ভীর চালচলন, তার অত্যন্ত বাস্তবধর্মী চিন্তাধারা। কিন্তু তাই বলে সে অসুখী হয়নি।

বউ হিসাবে সে শ্বশুর শাশুড়ির মন জয় করেছে, মা হিসাবে ছেলে-মেয়েদের সুখী করেছে। শুধু স্ত্রী হিসাবে স্বামীকে খুশী করতে পারেনি। তার জন্যে কোন দুঃখও নেই।

অনিলাদের কথা ভাবতে মীনাক্ষীর আশ্চর্য লাগে। দাম্পত্য জীবনের কী করুণ প্রহসন! অথচ অনিলাদের সংখ্যা তো কম নয়। কতকগুলো মিথ্যে ধারণাকে আঁকড়ে থেকে এরা দিন কাটায়। সারাটা জীবন অভিনয় করে, হাসি মুখে সুখী দাম্পত্য জীবনের ধ্বজা ওড়ায়।

দরজায় কে টোকা মারল।

মীনাক্ষী অভ্যাস মত ইংরেজীতে বলে, ভেতরে এস।

কোন সাড়া নেই।

নিশ্চয়ই কোনও অপরিচিত লোক, এঘরে আগে যে আসেনি।

মীনাক্ষী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখলে সামনেই পড়ে রয়েছে একটা স্যুটকেশ কিন্তু আর কাউকে দেখতে পেল না। কে এ স্যুট্‌কেশটা রেখে গেল? একটু আশ্চর্য হল মীনাক্ষী। বারান্দার দু'দিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তার ঘরের দেয়ালটা যেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে গেছে তারই আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে বলে মনে হল।

মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে?

আগন্তুক কোন উত্তর না দিলেও তার চাপা হাসি কানে ভেসে এল। ভরসা করে আরও এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হতে মীনাক্ষীও না হেসে পারল না। বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে, তুমি কখন ফিরলে?

ধরা পড়ে যাওয়া দুষ্টু ছেলের মত হাসতে লুকনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এল পীয়ের। বলল, এখুনি। সোজা স্টেশন থেকে আসছি।

—তার মানে, এখনও বাড়ি যাওনি?

—না, সটান বাক্স নিয়ে চলে এসেছি। তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে মনে হল একটু মজা করা যাক, সত্যি বলতো, বাক্সটা দেখে তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে কিনা।

মীনাক্ষী হাসল, ভয় ঠিক পাইনি, তবে একটু অবাক হয়েছিলাম নিশ্চয়।

পীয়ের কল্পনার জাল বোনে, নিশ্চয় তুমি ভাবছিলে কোন দুর্বৃত্ত এই বাক্সটা রেখে গেছে। কাউকে কোথাও না দেখতে পেয়ে যেই বাক্সটা খুলবে দেখবে তার মধ্যে রয়েছে একটা মড়ার মাথা, খান কয়েক পুরনো ম্যাপ আরও কতকগুলো জিনিস যা তুমি জীবনে দেখনি। ভয় পেয়ে ট্রাংক কল করে তুমি আমায় ডাকলে, তারপর আমরা দুজনে মিলে রাতের পর রাত চিন্তা করলাম, কিন্তু পুলিসের সাহায্য নিলাম না। অনেক গবেষণার পর গোপন সূত্রগুলো টেনে বার করে, সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা

দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়লাম আফ্রিকার উদ্দেশে। সেখানকার এক গভীর জঙ্গল থেকে আমরা হীরের খনি আবিষ্কার করতে চলেছি।

ওর কথা বলার ধরনে মীনাক্ষী শব্দ করে হাসে, সত্যি তুমি একেবারে ছেলেমানুষ পীয়ের। আমি ওসব মোটেই ভাবিনি, তবে এটা সত্যি তুমি যে হঠাৎ এসে পড়বে তা বুঝতে পারিনি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাক্সটা এক পাশে সরিয়ে রেখে পীয়ের মাথার টুপি আর ওয়াটার প্রুফটা খুলে রেখে দিল, বলল, মীনা, শিগগিরি এক কাপ কফি খাওয়াও, বড় ক্লান্ত লাগছে।

মীনাক্ষী কেটলীতে জল ভরতে চলে গেল। ওর ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট রান্নাঘর, একজন দাঁড়িয়ে থেকে গ্যাসের উনুনে রান্না করতে পারে।

মীনাক্ষী জাল-আলমারি খুলে দেখল 'কণ্টিনেণ্টাল' সসেজের একটা প্যাকেট রয়েছে। ওগুলো পীয়ের খেতে ভালবাসে। গরম জলে ফুটিয়ে দিলে নিশ্চয় খুশী হবে, পাউরুটি মাখন চীজ তো আছেই। একবার ভাবল ডিম ভাজবে কি না। পীয়েরকে না জিজ্ঞেস করে ঠিক হবে না, যা খেয়ালী ছেলে, একেবারে তৈরী করে নিয়ে গেলে হয়ত খাবে না।

ঘরে ফিরে এসে মীনাক্ষী দেখে ওর টেবিলের ওপর একটি অতি সুন্দর পুরু কাচের ফুলদানি। পীয়ের সবেমাত্র স্যুটকেস থেকে বার করে কাগজের মোড়ক খুলে টেবিলের ওপর রেখেছে।

মীনাক্ষী প্রশংসা করে বলল, বাঃ, বড় চমৎকার জিনিস।

মীনাক্ষী যে এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসবে পীয়ের বোধ হয় তা ভাবেনি, ইচ্ছে ছিল ওকে না জানতে দিয়ে ঘরের এক কোণে সাজিয়ে রাখবে. এখন ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হেসে বলল, এটা বেলজিয়াম কাটগ্লাসের তৈরী। আমাদের দেশে এ শিল্পের নাম খুব। তুমি আর্টিস্ট মানুষ, এর কদর আরও ভাল বুঝবে, তাই এটা তোমার জন্যে আনিয়েছি।

—সত্যি? কৃতজ্ঞতায়, খুশীতে চোখে জল ভরে এল মীনাক্ষীর। হাত দিয়ে স্পর্শ করে ফুলদানিটা দেখল ভাল করে, সাদা স্বচ্ছ কাচ. পুরু, চাকা চাকা খোদাই করা অনেকটা কুমীরের পিঠের মত। ওপরের দিকে ফিকে বেগুনী রঙের ইঞ্চিখানেক মোটা পাড়। নিখুঁত কাজ।

উচ্ছ্বসিত মীনাক্ষী বলল, অপূর্ব।

—তোমার পছন্দ হয়েছে মীনা?

এ কথার উত্তর না দিয়ে মীনাক্ষী পীয়েরের চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। চোখে মুখে প্রশান্ত হাসি।

—নিশ্চয় এর অনেক দাম।

পীয়ের জানাল, লণ্ডনে কিনতে গেলে বেশী দাম পড়ে। আমি তাই বেলজিয়াম থেকে আনিয়েছি। আমাদের অফিসের কাজে যে ভদ্রলোক ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে গ্লাসগো'য় এসেছেন, তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। যেদিন পেয়েছি, সেদিন থেকে মন ছটফট করছে কখন তোমাকে দেখাব বলে। তাই আর স্টেশনে নেমে তর সইল না সোজা এখানে চলে এলাম।

মীনাক্ষী সযত্নে ফুলদানিটা তুলে নিয়ে জল ভরে আনে। রাখে জানলার কাছে। অন্য ফুলদানি থেকে কতকগুলো ফুল এনে সাজিয়ে দেয়। সেই দিকে তাকিয়ে

থেকেই জিজ্ঞেস করে, তোমার জন্যে কি তৈরী করব বল।

পীয়ের বাধা দিল, এখন কিছু খাব না মীনা, শুধু গরম কফি।

—কেন?

—শরীরটা ভাল নেই। তোমার কাছে অ্যাসপিরিন আছে?

—আছে। কেন, মাথা ধরেছে?

পীয়ের আড়মোড়া ভাঙে, গা, হাত পায়ে ব্যথা।

মীনাক্ষী ওষুধ আর জল এনে দিল। কপালে হাত দিয়ে বললে, তোমার তো জ্বর হয়েছে।

—তাই নাকি? হওয়া বিচিত্র নয়। একটু থেমে বলল, আমি বরং বাড়ি ফিরে যাই। রাত্রিটা ভাল করে রেস্ট নিলে কাল ঠিক হয়ে যাবে।

—কফিটা খেয়ে যাও।

—দাও।

কফি খেয়ে পীয়ের আর বসল না, টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকিয়ে বাক্স হাতে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

পরের দিন সকালেই ফোন করে খবর নিল মীনাক্ষী। কেমন আছ পীয়ের?

ক্লান্ত পীয়ের উত্তর দিয়েছে, ভাল না মীনা।

—রাত্রে ঘুম হয়েছিল?

—না।

ডাক্তারের কাছে যাও।

—তাই ভাবছি।

একটু থেমে মীনাক্ষী জিগ্যেস করে, বিকেলের দিকে স্কুল ফেরত যাব কি তোমায় দেখতে?

পীয়ের খুশী হয়ে বলে, নিশ্চয় এস। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

—সঙ্গে করে আমার ওষুধের ব্যাগ নিয়ে যাব।

পীয়ের না হেসে পারে না, তোমার সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধ?

—হাসবার কিছু নেই। দেখবে কি রকম উপকার হয়।

মীনাক্ষী লক্ষ্য করেছে হোমিওপ্যাথির কথা উঠলেই এদেশের ছেলেমেয়েরা হাসে। বিশেষ করে পীয়েরও নাকি জীবনে এ চিকিৎসাপদ্ধতির নাম শোনেনি। প্রথম প্রথম মীনাক্ষী এদের কথাবার্তা শুনে আশ্চর্য হত। হবারই কথা। ছোট বেলা থেকে সে নিজের বাড়িতে দেখেছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। মা দাদু দুজনেরই ছিল এতে অগাধ বিশ্বাস। মীনাক্ষীর মা-র একটা চৌকো কাঠের বাক্স ছিল, তাইতে থাকত ওষুধের শিশি। মা শুধু ছেলে মেয়েদের নয় বাড়ির ঝি চাকর সকলের চিকিৎসা করতেন। ওই বাক্স থেকে ওষুধ ঢেলে খাওয়াতেন। অবশ্য দাদুর চিকিৎসা ক্ষেত্র ছিল আরও ব্যাপক। পাড়াপড়শীরাও এসে রীতিমত ওষুধ নিয়ে যেত তাঁর কাছ থেকে। তাছাড়া বড় অসুখের সময় কত নামকরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তাদের বাড়িতে আসতেন। তাই দেশে থাকতে মীনাক্ষী বুঝতেই পারেনি যে বিদেশে এ চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষ চল নেই। এখন ইউরোপে থেকে বুঝেছে হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির যেটুকু প্রসার তা আমেরিকাতে, কণ্টিনেণ্টের বেশীর ভাগ লোকের কাছে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আমার ওষুধের গুণ, কালকেই জ্বর ছেড়ে যাবে, তোমাকে ডাক্তারও ডাকতে হবে না। হাসপাতালে যাওয়ার ভয়ও নেই।

পীয়ের শুধু হাসল।

—চুপ করে ঘুমিয়ে পড়, আমি কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

মীনাক্ষীকে বেশীক্ষণ বসতে হল না, ক্লান্ত পীয়ের খুব সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল, ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে মীনাক্ষী পীয়েরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল।

ইটন স্কোয়ারের চারদিকে আলো জ্বলছে। রাত্রি নেমে এসেছে।

মীনাক্ষী বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যায়। পীয়েরের কথাগুলো তার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে।

সত্যি আশ্চর্য। দেশে থাকতে কোথা দিয়ে যে যুদ্ধটা কেটে গেল বোঝাই যায় নি। হয়ত কিছু জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল, বাজারে দাম গিয়েছিল চড়ে, কলকাতার শহরের আলোর জোর কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল কালো কালো টুপি পরিয়ে। জাপানী বোমাও পড়েছিল, কিন্তু সে মাত্র দু'চার দিনের জন্যে, তাও এমন বেশী কিছু নয়। অথচ ইউরোপে তার কী ভয়ঙ্কর প্রকাশ, যেসব ছেলেমেয়েদের কৈশোর কেটেছে ওই যুদ্ধের মধ্যে, সত্যিই তারা তৈরী হয়েছে একটা সৃষ্টি-ছাড়া জীবের মত। সুস্থ সহজ জীবনের কথা ভুলে গেছে, হয় তারা ভয় পায়, না হয় বেপরোয়া। কেমন যেন অস্বাভাবিক জীবন।

কিন্তু পীয়ের একলা থাকতে পারবে তো, যা ছেলেমানুষ, রাত্রে না ভয় পায়।

পীয়েরের কথা ভেবে মীনাক্ষীর মন মমতায় ভরে উঠল।

পীয়ের হঠাৎ এভাবে অসুস্থ হয়ে না পড়লে বোধহয় মীনাক্ষী এত অল্প সময়ের মধ্যে তার মনের কথা জানবার সুযোগ পেত না। পীয়েরের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে বরাবরই মীনাক্ষী লক্ষ্য করেছে পীয়ের অত্যন্ত সোজা মানুষ সহজ পথে চলে। তার মন উদার, অন্যদের কথা শোনে, তাদের মতামত বোঝবার চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় ছেলেমানুষী কাজে মেতে ওঠে। যখন সে ছেলেমানুষ তখন তাকে দেখলে সত্যিই কিশোর বলে ভুল হয়। কৈশোরের নিষ্পাপ চাঞ্চল্য তার চোখে, হাস্য-মুখর সকৌতুক মুখের চেহারা।

কিন্তু এই অসুখের মধ্যে পীয়ের-এর সেবা করতে এসে তার সঙ্গে অবিরাম কথা বলার সুযোগ পেয়ে মীনাক্ষী বুঝতে পারল এতদিন পীয়ের সম্বন্ধে তার যে ধারণা হয়েছিল, তা মোটেই সম্পূর্ণ নয়। তার একটা দিকই মাত্র সে দেখেছে।

সে দেখেছে হাসিখুশী আমুদে পীয়েরকে, কিন্তু তার পেছনে যে আর একজন পীয়ের লুকিয়ে আছে, যে পীয়ের অভিজ্ঞ, সমাজ সম্বন্ধে যার অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা, তাকে তো মীনাক্ষী কোনদিন দেখেনি। অসুখের মধ্যে এই নতুন পীয়ের-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মীনাক্ষী আশ্চর্য হল। তার মনে হল এ মানুষটা সম্পূর্ণ অচেনা। তাই বোধহয় অচেনাকে চেনবার আগ্রহ গেল বেড়ে।

পীয়ের মা বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা ধনী ব্যবসাদার। বেশীর ভাগ সময় ঘুরে বেড়িয়েছেন বাইরে বাইরে। প্রায় প্রত্যেক মাসে তাঁকে যেতে হত জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, আবার কখনও বা সুদূর কঙ্গোতে। ব্রাসেলসে থাকত পীয়ের আর তার মা। প্রাচুর্যের মধ্যে তাদের জীবন কেটেছে। অভাব তারা কোনদিন অনুভব

করেনি, দুঃখের ছায়া তারা এড়িয়ে গেছে বরাবর।

তাই বোধহয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদের জীবনকে নাড়া দিয়েছে এত বেশী। তেরো বছরের পীয়ের-এর জীবনে এনে দিয়েছে বিপ্লব। সে সময় পীয়ের রাতের পর রাত কেঁদেছে। তার মনের মধ্যে জেগেছে সংশয়। এ যুদ্ধ কি কোন দিন শেষ হবে? রক্ষা পাবে তাদের দেশ, তাদের দেশবাসী? যদি বা দেশ বাঁচে তারা কি বাঁচবে? পীয়ের, তার মা বাবা, তাদের ঘর দোর, বিষয় সম্পত্তি?

কিন্তু কে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে? এতদিন বিপদে পড়লে সে ছুটে যেত মা বাবার কাছে, তাঁরা বুঝিয়ে দিতেন, সংশয়ের নিরসন হত। কিন্তু ওই যুদ্ধের সময় তাঁরাও যে নীরব হয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলে কেউ কিছু উত্তর দিতে পারেন না।

এ তো শুধু বাবা মা নন, তাঁদের চেয়েও যাঁরা বড়, অভিজ্ঞ, সে তিনি ধর্মযাজক বা রাষ্ট্রনায়ক যাই হন না কেন, তাঁদের মনেও যে ওই একই ধরনের প্রশ্ন তোলপাড় করছে। কী করে তাঁরা এর সদুত্তর দেবেন।

প্রশ্ন, সংশয় আর সমস্যা।

কিশোর পীয়ের-এর ফুলের মত নিষ্পাপ নরম মন ছিঁড়ে গেল। উত্তরহীন জিজ্ঞাসা তাকে দংশন করল অহরহ।

সমস্ত ইউরোপ তখন মুখ বুজে সহ্য করছে জার্মানদের অমানুষিক অত্যাচার। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। সেই সংগে কেঁদেছে পীয়ের-দের মত তরুণ হৃদয় নিষ্ফল আক্রোশে।

কিন্তু এ কান্নার তো কেউ দাম দিল না।

এখনও পীয়ের জার্মান অত্যাচারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ভয়ে শিউরে ওঠে, বলে, মীনা, তোমরা হয়ত কাগজে পড়েছ জার্মান কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্পের কথা, কিন্তু কল্পনাও করতে পারবে না সেখানে বন্দীদের ওপর কি অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে।

পীয়ের চুপ করে কি যেন ভাবে, আবার বলতে শুরু করে, দিনটা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় রবিবার। মাসীর বাড়িতে গিয়েছি আমি আর মা। মাসীমারা থাকতেন ব্রাসেলস্ থেকে মাইল পনের দূরে। বছর তিনেক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছে, আমাকে স্নেহ করতেন। কিন্তু যুদ্ধ লাগার সংগে সংগেই মেসোমশাই ধরা পড়লেন, জার্মানরা তাঁকে বন্দী করে রাখল, ব্রাসেলস্-এর কন্‌সেণ্ট্রেশান ক্যাম্পে।

নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একবার থামল পীয়ের।

সেদিন মাসীমা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কারণ কথা ছিল জার্মান অফিসার আসবে তাঁর সংগে দেখা করতে, মেসোমশাই-এর খবর নিয়ে। তার আগে পর্যন্ত মেসোমশাই খান দুই চিঠি লিখেছিলেন ক্যাম্প থেকে, সবের মধ্যেই ছিল জার্মান সৈন্যদের ভাল ব্যবহারের কথা, সব চিঠিতেই তিনি লিখতেন, 'আমার জন্যে তুমি ভেব না হয়তো শিগগিরি আমাদের মিলন হবে।'

তাই জার্মান অফিসার আসছে শুনে আমরা মনে মনে খুশী হয়েছিলাম, হয়ত তারা মেশোমশাইকে ছেড়ে দেবে, তাঁর ব্যবহারে তারা খুশী হয়েছে সেই কথাই জানাতে আসছে।

মাসীমার নিরানন্দ জীবনে ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেয়ে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। মা আর মাসী একান্তে বসে প্রার্থনা করলেন। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন জার্মান অফিসার আসবে।

পীয়ের থেমে গেল।

মীনাক্ষী মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, তারপর?

পীয়ের নীরস কণ্ঠে বলল, অফিসার এল সন্ধ্যের কিছু আগে। মাসীমাকে ডেকে তার হাতে একটা বড় খাম দিল। মাসীমা সাগ্রহে সেটা খুললেন, ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল পাঁচটা নখ।

চমকে উঠল মীনাক্ষী, কিসের নখ?

পীয়ের দাঁতে দাঁত চেপে বলল, মেসোমশাই-এর। তাঁর এক হাতের পাঁচটা নখ ওরা সাঁড়াশী দিয়ে উপড়ে নিয়েছে। আমার আজও মনে পড়ে মীনা, মাসীমার সেই বেদনাভরা মুখখানা। চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ছে, চীৎকার করে তিনি কেঁদে উঠলেন। আমি বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শুনতে পেলাম তারই মধ্যে জার্মান অফিসার বলছে, তোমার স্বামী বড় একগুঁয়ে, আমাদের একটা কথাও শুনছে না, আমাদের গোপন খবর দিচ্ছে না। ওর হাতের নখগুলো উপড়ে এনে তোমায় উপহার দিয়ে গেলাম। যদি স্বামীকে বাঁচাতে চাও, তাকে লেখ, সব কথা আমাদের জানিয়ে দেবার জন্যে।

মাসীমা কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যাবার সময় সে অফিসার আরও বলে গেল, যদি এরপরও তোমার স্বামী কথা না শোনে, হয়ত জ্যান্ত তার গা থেকে ছালটা ছাড়িয়ে নিতে আমরা বাধ্য হব।

অফিসার চলে গেল। আমরা তিনজন ঘরের মধ্যে, কেউ কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। মা আর মাসীমা কি ভাবছিলেন জানি না, কিন্তু আমার দুর্ভাবনা শুরু হল বাবার জন্যে। বাবা তখনও জার্মানদের হাতে ধরা পড়েননি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ফ্রান্স আর স্পেনের সীমান্তে। ভয় হল যদি তিনি ধরা পড়েন, তাঁর ওপরও তো এইরকম অত্যাচার করবে। সেই সন্ধ্যে থেকে দিন রাত ওই চিন্তায় আমি পুড়েছি. উঃ, সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা, তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্পের বাইরে থেকেও কষ্ট আমরা কম পাইনি। নিষ্ঠুর জার্মানদের পদ্ধতি বড় চমৎকার। বন্দীদের শরীরের ওপর তারা অত্যাচার করেছে, আর আমাদের মনের ওপর। কথা শুনতে শুনতে মীনাক্ষীর চোখে জল এসে পড়েছিল। জিজ্ঞেস করে, শেষ পর্যন্ত তোমার মেসোমশাই-এর কি হল?

পীয়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্পেই তিনি মারা যান। মীনাক্ষী আঁচলে চোখ মোছে। পীয়ের সেইদিকে তাকিয়ে বলে, তুমি গল্প শুনে কাঁদছ মীনা, আর এসব আমাকে চোখে দেখতে হয়েছে। জার্মান অফিসার যাবার সময় যা ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল, তাও একেবারে মিথ্যে নয়।

—তার মানে?

—যুদ্ধে যখন জার্মানরা হেরে গেল, আমরা কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকেছিলাম, সেখানে দেখেছি জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ যে টেবিলে বসত, তার ওপর একটা টেবিল ল্যাম্প। বিশ্বাস কর, সে ল্যাম্পের শেড ওরা তৈরি করেছে মনুষের চামড়া দিয়ে।

মীনাক্ষী আর্তনাদ করে ওঠে, আর বলো, না পীয়ের, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পীয়ের এতক্ষণ খাটের উপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিল, উঠে পড়ল। মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

—মুখটা ধুয়ে আসছি।

—গরম কিছু খাবে?

—কফি খেতে পারি।

—ডাক্তার যেটা বারণ করেছে সেইটেই বুঝি খেতে ইচ্ছে করে?

পীয়ের বাথরুমের দিকে যেতে যেতে হেসে বলল, ওটা আমার স্বভাব মীনা।

এধরনের আলোচনা ওদের মধ্যে হয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা। পীয়ের শুধু তো তার নিজের কথাই বলেনি, সে সময়কারই ইউরোপের ছবি পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলেছে। আর সেই সঙ্গে প্রকাশ করেছে তার সুচিন্তিত মতামত। যার মধ্যে হয়ত নৈরাশ্যবাদ প্রকাশ পেয়েছে বেশি মাত্রায়।

বিশেষ করে পীয়ের যখন বলে এই যুদ্ধে একটা জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি। লোভ আর লালসা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে শক্তি যদি সহায় হয়, মানুষ আর তখন মানুষ থাকে না, সে জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে যায়। নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, মানুষ আগে জন্তু ছিল, কিন্তু যুদ্ধ দেখলে বোঝা যায় ছিল নয়, তারা আজও আছে। যে সভ্যতার আমরা বড়াই করি, সেটা শুধু বাইরের সাজপোশাক, সামান্য ধাক্কায় তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। একটু সুযোগ পেলেই আমাদের ভেতরকার পশুটা হিংস্র গর্জন করে বেরিয়ে আসে। তাইতো হতাশ হয়ে পড়েছি মীনা, এর কি প্রতিকার আছে? নিজেদের বড় অসহায়, বড় দুর্বল বলে মনে হয়।

মীনাক্ষী মন দিয়ে পীয়েরের কথা শুনছিল, বললে, তুমি যখন এভাবে কথা বল পীয়ের, তোমাকে দূরের মানুষ মনে হয়। যে পীয়েরকে আমি চিনি, এ যেন সে নয়।

পীয়ের সহাস্যে উত্তর দেয়, আমি সেই একটাই পীয়ের মীনা, যে পীয়েরকে তুমি চিনতে পার না সে এখনও অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। হয়ত পরশ পাথর খুঁজছে।

—আর যাকে আমি চিনি?

—সে এসব কথা ভুলে থাকতে চায়। হাসে, খেলে, গল্প করে, মানুষকে আনন্দ দেয়।

পীয়ের একটা সিগারেট ধরায়, মীনাক্ষী বুঝতে পারে এখনও ওর মনের মধ্যে ওই আগের কথাগুলোই পাক খাচ্ছে, তাই ইচ্ছে করে চুপ করে যায়।

পীয়ের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ বলতে শুরু করে, আমি একবার রোমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড় বড় সুন্দর প্রাসাদ, চমৎকার রাজপথ। অথচ তারই পাশে পুরনো দিনের ধ্বংসস্তূপ আর আজকের দিনের দারিদ্র্যের প্রকাশ। নোংরা বস্তি, ছেঁড়া, ময়লা জামাকাপড় পরা গরীব লোকজন, বিরক্তিকর পরিবেশ। তখন ভেবেছি কি করে এ অধঃপতন ঘটল, এত বড় একটা জাত যাদের এত বড় রোমান সাম্রাজ্য, কি করে এত নীচে নেমে এল। তখন কোন উত্তর পাইনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারি, তারও মূলে সেই আদিম লোভ আর লালসা। নিজেদের সাম্রাজ্য বজায় রাখতে নিপীড়িত মানুষের ওপর যে অত্যাচার তারা করেছিল, তার ফল ভোগ করছে আজ। কেন জানি না, আমার মনে হয় মীনা, আজ না হয় কাল সমস্ত ইউরোপের অবস্থা ওই রোমের মতই হবে। সাম্রাজ্যের কথা ভুলতে হবে সবাইকে, চলে যাবে জমিদারী, নির্ভর করতে হবে নিজেদের শক্তি আর সম্বলের ওপর। আজ থেকে হয়ত একশ' বছর পরে তোমার মত প্রাচ্য থেকে যে আসবে পাশ্চাত্যকে দেখতে, সে ইউরোপের প্রত্যেকটি রাজধানীতে গিয়ে দেখবে আজকের যা রোমের অবস্থা। পুরনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে হয়ত বড় বড় অট্টালিকাগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে। দাঁড়িয়ে থাকবে প্যারীর 'এফিল টাওয়ার', লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স, কোলোনের ক্যাথেড্রাল;

কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়।

মীনাক্ষী ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কেন?

—কালের নিয়ম।

—শুধুই কি তাই?

পীয়ের ফিরে এসে মীনাক্ষীর পাশে সোফায় বসে, বলে, তাছাড়া ওই যে বললাম, আমাদের ভেতরকার হিংস্র জন্তুটা চীৎকার করে যখন বেরিয়ে পড়ে, কে তাকে রুখে রাখবে, তার একমাত্র কাজ হল মনুষ্যত্বকে অপমান করা, উপহাস করা। সে তা সৃষ্টি করতে শেখেনি, শুধু ধ্বংস করতে জানে। তাইত মনে হয়, এ জীবন বড় অনিশ্চিত। আর দেখতে পাচ্ছ না, এই অনিশ্চয়তা আমাদের মনে, আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে। সেই জন্যেই আমরা অস্থির। উদ্দেশহীন জীবন-জিজ্ঞাসা।

মীনাক্ষী পীয়েরের হাতটা টেনে নেয়, সহানুভূতি ভরা গলায় বলে, আর এ প্রসঙ্গ নয় পীয়ের, এখনও তুমি দুর্বল।

পীয়ের মৃদু হাসে, তুমি শুধু শরীরটার কথাই ভাবছ, কিন্তু আমার মনটা যে আরও বেশি দুর্বল, তার উপর অস্থির, চঞ্চল।

—যখন বুঝতে পেরেছ নিজেকে শোধরাও।

—কিসের ভরসায় শোধরাব। যেটাকেই মজবুত খুঁটি বলে ধরতে গেলাম, সেটাই যে ভেঙ্গে পড়ল। যখনই ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনরকম পরিকল্পনা করতে চাই, দিশেহারা হয়ে পড়ি, বলতে পার বালির ওপর ঘর বেঁধে কি লাভ।

—তাই ভেবে তুমি ঘর বাঁধবে না?

পীয়ের মাথা নাড়ে, বাঁধব না পারব না বলে। আমার বন্ধুরা বলে, আমি এযুগের ছেলে নই। হয়ত এ-কথা সত্যি, কিন্তু সে তো হতে চাই না বলে। যে যুগের লক্ষণ হল অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঔদ্ধত্য আর বিদ্বেষ, আমি সে যুগের মানুষ হতে চাই না। আজ যারা ঘর বাঁধে কাল ঘর ভেঙ্গে যাবে জেনেও, আমি তাদের দলে নাম লেখাতে পারব না। কি দরকার এ প্রহসনের?

মীনাক্ষী ধীর স্বরে বলে, পীয়ের তুমি যে ভারতীয়ের মত কথা বলছ, আমরাও তো সহজে ঘর ভাঙ্গতে চাই না।

পীয়ের মীনাক্ষীর চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, তাই ত তোমাকে এত ভাল লাগে মীনা।

মীনাক্ষী কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়, দেখে, পীয়েরের চোখ সজল হয়ে এসেছে।

পীয়ের বলে, এও বোধ হয় আমার জীবনে আর একটা ট্র্যাজেডী, এতদিন পর্যন্ত কোন মেয়েকে আমার ভাল লাগল না, কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে করল না অথচ আজ যাকে ভালবাসলাম তাকে পাওয়ার কোন আশা নেই।

একটু থেমে আবার বলে, আমি নির্বোধ নই, বুঝি আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট সহানুভূতি প্রীতি আছে, কিন্তু এটাও বুঝি তুমি তোমার দেশকে ভালবাস, তোমার দাদুকে ঈশ্বরের মত ভক্তি কর। আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধা কর। তাদের সবাইকে ছেড়ে তুমি আমাকে গ্রহণ কর, এ প্রস্তাব আমি কিছুতেই করতে পারব না। এত বড় স্বার্থপর আমি নই মীনা।

মীনাক্ষীর কোন উত্তর দেবার ছিল না, কথা চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত যে এখানে এসে থামবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। জানলে এ প্রসঙ্গ সে আজ তুলতেই দিত না। পীয়ের কিন্তু থামে না, তখনও বলে, জান ত, আশা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না,

আমিও আশা করে থাকব। যদি তোমার সম্মতি পাই, তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্ট করব। প্রয়োজন হলে তোমার জন্যে এদেশ আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি। তোমাদের দেশে গিয়ে বাসা বাঁধব, সেখানেই কাজ করব। অবশ্য এটাও বুঝি এ ধরনের বিয়েতে সমস্যা অনেক তার মধ্যে তোমাকে না টানাই ভাল। বন্ধু হিসাবে তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ, আর বেশি লোভ না করা উচিত।

মীনাক্ষী যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে বলল, তুমি আজ বড় বেশি সেণ্টি-মেন্টাল হয়ে পড়েছে পীয়ের, আগে সুস্থ হয়ে ওঠ, পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে, কি বল?

পীয়ের মৃদু হাসল, বুঝল মীনাক্ষী ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাবার চেণ্টা করছে, তাই বালকসুলভ চপলতা দেখিয়ে বলল, আমার বড় খিদে পেয়েছে মীনা, শিগগির কিছু খেতে দাও।

সেইদিন থেকে বিপদে পড়ল মীনাক্ষী।

পীয়ের তো খুব সহজে তার মনের কথা উজাড় করে দিল মীনাক্ষীর সামনে। কিন্তু এখন সে কি করবে? কি উত্তর দেবে পীয়েরকে? সত্যি কথা বলতে কি, দেশ-বিদেশের ব্যবধান অতিক্রম করে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের কল্পনাও কখনও করেনি মীনাক্ষী। মনে প্রাণে সে ভারতীয়। এখানে এসে বিদেশীদের সঙ্গে সে মিশেছে। হয়ত মিশে আনন্দও পেয়েছে, কিন্তু সে সবই বন্ধু হিসেবে। তার বেশি অগ্রসর হবার বাসনা তার মোটেই ছিল না।

কিন্তু সেদিন পীয়ের-এর কথা শুনে মীনাক্ষীর মধ্যেকার যে চিরন্তন নারী হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। এ সেই রাজকুমারী, যে দিনরাত ঘুমিয়ে থাকে, যতদিন না রাজপুত্র এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তার ঘুম ভাঙ্গায়। ঘুম ভাঙ্গাতেই সে রাজ-পুত্রকে চিনতে পারে। বোঝে এরই জন্যে সে অপেক্ষা করছিল এতদিন ধরে। বিনা দ্বিধায় সে নিজের পরিবেশ ছেড়ে রাজপুত্রের সঙ্গে অচিন দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

পীয়ের যে তার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে, এবিষয় তো সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, সোনার কাঠির সন্ধান সে নিশ্চয় পেয়েছে।

ইচ্ছে করে মীনাক্ষী একদিন গেল না পীয়েরের কাছে। দেখা করল সরোজের সঙ্গে, সেখান থেকে গেল লীলাদের বাড়ী, তারপর অতুলমামার কাছে। ভেবেছিল পীয়েরের অসুখের কথা এদের কাছে বলবে, সুবিধে পেলে ওর বিষয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু পারল না।

কেন জানা নেই মীনাক্ষীর মনে হল মাত্র এই ক'দিনের মধ্যে ওদের সঙ্গে তার দূরত্ব গেছে বেড়ে। আগের মতই হয়ত লীলারা কথা বলল, কিন্তু মীনাক্ষী তাতে সাড়া দিতে পারল না।

অতুলমামা অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি এত ভাবছ? এই বয়েসে কপালে চিন্তার রেখা পড়ছে কেন?

মীনাক্ষী হেসে উত্তর দিয়েছে, না, কদিন খুব খাটুনি গেছে, শরীর বড় ক্লান্ত।

—পীয়ের সুস্থ হলে ওকে একদিন নিয়ে এস।

—নিশ্চয় আসব। ও তোমার কথা খুব বলে।

একলা বাড়ি ফিরে এসে মীনাক্ষী ভাববার চেণ্টা করেছে, কেন সে ওদের সঙ্গে আজ মিশতে পারল না। কেন নিজেকে মনে হচ্ছে অন্য জগতের মেয়ে। অস্বীকার

করবার নেই, এ অনুভূতি তার ভাল লাগছে। এ অকারণ পুলকের কারণ খুঁজতে গিয়ে সে বুঝতে পারে ওই সোনার কাঠির স্পর্শই তার মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়েছে।

তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল দুদিন পরে, পীয়ের যেদিন সুস্থ হয়ে এল তার সঙ্গে দেখা করতে। পরনে তার বহু পরিচিত পুরনো স্যুট। স্ট্রাইপ কাটা ঘন সবুজ টাই, চকচকে বাদামী জুতো। এ সাজে মীনাক্ষী তাকে কতদিন দেখেছে, আপত্তি তুলেছে 'টাই'-এর রঙ নিয়ে, ঠাট্টা করতে ছাড়েনি জুতোর রঙ বেমানান বলে। কিন্তু আজ মনে হল এত সুন্দর পীয়েরকে সে আগে কখনও দেখেনি। ওই স্যুট, ওই টাই, ওই জুতো কোনটাই বেমানান নয়। সব কিছুকে ছাড়িয়ে ফুটে উঠছে তার ব্যক্তিত্ব। তার হাসি-খুশী মুখখানা দেখে আজ আর তাকে মীনাক্ষীর ছেলেমানুষ বলে ভুল হল না, মনে হল, এ সেই চিরন্তন পুরুষ, যে একদিন সগর্বে এসে নারীর সামনে দাঁড়ায়, নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘোষণা করে, আমি তোমাকে গ্রহণ করতে চাই। তুমি এস, আমার হও।

মীনাক্ষী মুগ্ধ বিস্ময়ে পীয়েরের দিকে তাকিয়ে রইল। পীয়ের এগিয়ে এল, কোন কথা বলল না। মীনাক্ষীকে কাছে টেনে নিল, কাছে, আরও কাছে।

মীনাক্ষী বাধা দিল না, কিন্তু সে সহজ হতেও পারল না। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে ধরা দিল পীয়েরের বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে। ক্ষণিকের জন্যে এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল। কিসের যেন ভয়। এ ভয় সেই ভীরু বালিকার যে অন্ধকার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। এ আশংকা সেই কিশোরীর যে যৌব-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েও বিহ্বল বিস্ময়ে চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু এ সবই মুহূর্তের চিন্তা।

একটি গাঢ় চুম্বন।

মীনাক্ষীর সারা দেহে শিহরণ খেলে গেল। এ এক বিচিত্র অনুভূতি। শরীর তার শিথিল হয়ে এল, এলিয়ে দিল পীয়েরের হাতের উপর। বড় ভাল লাগল দেখতে পীয়ের-এর নীল চোখ, পাতলা নীল, ফিকে আকাশের মত স্বচ্ছ অথচ গভীর। সে চোখে কত ভাষা, কিন্তু তার মধ্যে লুকিয়ে নেই কোন জিজ্ঞাসা। আছে উত্তর। সেখানে জমা হয়নি সমস্যার মেঘ। সমাধানের আলোয় ফুটে রয়েছে প্রসন্ন হাসি। সুস্থ সবল জীবনের প্রতিচ্ছবি তার চোখে, সেখানে এক নির্ভীক আশাবাদের আলো।

অন্ধকার কেটে গেল।

মীনাক্ষী নিশ্চিন্ত মনে প্রবেশ করল এই নতুন রাজ্যে—যে রাজ্য শুধু দুজনের দেশ যে দেশে সে একা নারী। পীয়ের একা পুরুষ।

পীয়ের-এর গুঞ্জন শোনা গেল। তোমার ভাল লাগছে, মীনা?

মীনাক্ষীর চোখ সম্মতি জানাল।

আবার কিছুক্ষণের জন্য মধুর নীরবতা।

নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একসময় মীনাক্ষী মৃদুস্বরে বলে, দাদুকে চিঠি লিখব।

পীয়ের মুখ তুলে তাকায়, কেন?

দেখি উনি কি লেখেন? যদি অনুমতি দেন।

এতটা বোধ হয় আশা করেনি পীয়ের। শুধু বলল, তুমি আমার জন্যে লিখবে মীনা! যদি দেশ আর কালের বাধা আমাদের মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্যে দুঃখ করব না। তুমি যে আমায় গ্রহণ করতে রাজি হয়েছ, সেইটুকুই আমার পরম লাভ।

পীয়ের-এর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল, মীনাক্ষীরও চোখে জল।

কে বলবে এরা আলাদা দেশের মানুষ, আলাদা এদের সমাজ, আলাদা পরিবেশ।

সৌরেন আর এলিজাবেথ থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। ওল্ড ভিক মঞ্চে সেক্সপীয়রের হ্যামলেট।

কলকাতায় থাকতে সৌরেন বড় একটা থিয়েটার দেখেনি। শ্যামবাজারে যে চার পাঁচটি পেশাদার মঞ্চ আছে এবং সেখানে যে রীতিমত থিয়েটার হয় একথা সে জানত, বিজ্ঞাপনে দেখত বিভিন্ন নাটকের নাম, শুনত মা মাসীর কাছে খ্যাতনামা অভিনেতাদের কথা, কিন্তু ওই পর্যন্ত। থিয়েটারে গিয়ে নাটক দেখা আর হয়ে ওঠেনা। প্রথমত অনেক দূর, সেই শ্যামাবাজার যেতে হবে তার উপর টিকিটের দাম বড় বেশী। সৌরেন ভবানীপুরের ছেলে। নাকের ডগায় ভাল ভাল সিনেমা হল থাকতে, সস্তায় সিনেমা না দেখে অত দূরে গিয়ে বেশী পয়সা খরচা করে থিয়েটার দেখবে কেন ?

তাছাড়া ওর ধারণা ছিল থিয়েটার কখনও সিনেমার মত চিত্তাকর্ষক হয় না। মঞ্চের চেয়ে রূপালী পর্দার যাদু অনেক বেশী। শুধু সৌরেনের নয় তার বন্ধুবান্ধব সকলেরই ছিল ওই এক মত।

লণ্ডনে এসে আশ্চর্য হল সৌরেন। দেখল এদেশের লোক সিনেমার চেয়ে থিয়েটার দেখতে বেশী ভালবাসে। শুধু লণ্ডন শহরেই চল্লিশটার উপর থিয়েটার, রবিবার ছাড়া প্রতিদিন অভিনয় হয়। একমাস আগে থেকে টিকিট কেটে না রাখলে পাওয়া যায় না।

সিনেমা হলেরও ছড়াছড়ি, প্রায় বেশীর ভাগ জায়গায় দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ছবি দেখানো হয়। দর্শকেরা নিজেদের সুবিধা মত যে যখন পারে ঢুকে পড়ে। তবে লণ্ডনে লোক সিনেমা যায় সময় কাটাবার জন্যে, কিন্তু থিয়েটারের টিকিট কাটে আনন্দ পাবে বলে। মনকে প্রস্তুত করে তবে তারা নাটক দেখতে ঢোকে। মঞ্চের আভিজাত্য অনেক বেশী।

এলিজাবেথ গাঁয়ের মেয়ে বলেই বোধ হয় থিয়েটার দেখার ঝোঁক ওর আরও প্রবল। আগে নাকি সে লণ্ডনে আসত শুধু থিয়েটার দেখতে। ইদানীং সৌরেন যে দু-চারটে থিয়েটার দেখছে সে সবই এলিজাবেথের জন্যে। এলিজাবেথ সৌরেনকে না জানিয়ে থিয়েটারের টিকিট কেটে নিয়ে এসে হাজির হয়। অগত্যা সৌরেনকেও তৎপর হতে হয়েছে। সুবিধে মত নাম করা নাটকের প্রবেশপত্র সে আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখে, বলাই বাহুল্য দুজনের জন্যে। যে রকম আজ সে এলিজাবেথকে নিয়ে গিয়েছিল ওল্ড ভিকে হ্যামলেট দেখতে।

সৌরেন এই প্রথম মঞ্চের ওপর শেক্সপীয়ারের নাটক দেখল। অপূর্ব অভিনয়, অসাধারণ প্রয়োগ নৈপুণ্য, কী মহৎ নাটক! মুগ্ধ বিস্ময়ে সে দেখছিল রাজকুমার হ্যামলেটকে। নিজের অস্থিরমতিত্বের জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিভাবে সে এগিয়ে গেছে অনিবার্য ট্রাজিক পরিণতির দিকে। হ্যামলেটের আত্মবিলাপ শুনে সৌরেনের মন সহানুভূতিতে ভরে গেছে, তার দুঃখে সে কেঁদেছে, তার জীবনের ট্র্যাজিডি দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। কিন্তু সে বিমূঢ় হয়নি। এক মহৎ কারুণ্যে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

আজ সৌরেন বুঝতে পারল কেন শেক্সপীয়ারকে মহাকবি বলা হয়, কিসের জোরে তিনি তিনশ বছর ধরে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসন অলঙ্কৃত করে বসে আছেন। মনোজ্ঞ

অভিনয় না দেখলে সত্যিকারের শেক্সপীয়ারকে বোঝা যায় না। কে বলবে এ সেই হ্যামলেট যা কলেজে থাকতে সৌরেন পড়েছিল, যার প্রতিটি লাইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপকরা নীরস নাটকের পর্যায়ে একে নামিয়ে ফেলেছিলেন। কে বলবে এ সেই হ্যামলেট যা সে ছবির পর্দায় দেখেছে, কই তার মনকে তো এতখানি নাড়া দিতে পারেনি। আজ যখন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে হ্যামলেট বলছিল, To be or not to be, সৌরেনের মনে হল না শেক্সপীয়ারের নাটক শুনছে, মনে হল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থ যে আত্মা রয়েছে এ তারই উক্তি।

নাটক দেখে ফেরার পথে সারা রাস্তা এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ফিরেছে। এলিজাবেথের কিন্তু ওল্ড ভিকের এ প্রযোজনা খুব মনঃপুত হয়নি। সে বলছিল আগে কোন কোন বিশিষ্ট অভিনেতার হ্যামলেট সে দেখেছে, কোথায় কার বৈশিষ্ট্য। ক'বছর আগে শেক্সপীয়ারের জন্ম স্থানে 'স্ট্র্যাটফোর্ড অন এ্যাভনে' শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে হ্যামলেট নাটকের যে অভিনয় হয়েছিল তা নাকি আজও ভোলা যায় না।

এলিজাবেথ এত কথা বলল বটে, কিন্তু সৌরেন ভাবতেই পারল না আজ সে যে নাটক দেখল, তার চেয়েও ভাল, আর কি হতে পারে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল, পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল।

সৌরেন হাত মুখ ধুয়ে শোবার পায়জামা স্যুট পরে সোফার উপর গা এলিয়ে দিল। তখনও হ্যামলেট তার মনের অনেকখানি অধিকার করে রয়েছে। টেবিলের উপর একটা ভারতীয় 'এয়ার লেটার' রয়েছে, হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারল মায়ের চিঠি। সাধারণত মায়ের চিঠিতে একটাই প্রশ্ন. কবে সৌরেন দেশে ফিরছে। মেয়ের বাবারা নাকি ও'কে ব্যস্ত করে মারছে অথচ উনি কারুর সঙ্গেই পাকা কথা বলতে পারছেন না।

তবু সৌরেন চিঠিটা খুলল। এবার কিন্তু মা নতুন প্রস্তাব করেছেন, যদি এখন সৌরেনের ফিরতে দেরীই থাকে তাহলে ওর ছোট ভাই বীরেনের বিয়ে উনি আগে দিয়ে দিতে চান। চিঠি পড়ে মনে মনে খুশী হল সৌরেন, যাক এতদিনে তাহলে মা-র সুবুদ্ধি হয়েছে।

সৌরেনরা তিন ভাই, এক বোন। দাদার বিয়ে হয়েছে সৌরেনের বিলেত আসার আগেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওদের সুখের সংসার, তবে আলাদা থাকে। বৌদি এমনিতে বুদ্ধিমতী, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঠিক যেন বনল না। সৌরেনের বাবা বিচক্ষণ মানুষ, সংসারে ফাটল ধরার আগেই বড় ছেলেকে পৃথক বাসের সম্মতি দিলেন । ফলে আলাদা থাকলেও সদ্ভাব নষ্ট হয়ে গেল না। অবশ্য এ ঘটনা ঘটেছে সৌরেন চলে আসার পর।

এখন মায়ের ইচ্ছে বাড়িতে আর একটি বৌ আনা, খুব দেখেশুনে তিনি ভাল ঘরের মেয়ে আনবেন। অনেক দিন আশা করেছিলেন সৌরেন তাড়াতাড়ি ফিরলে তারই বিয়ে দেবেন, কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তিনি অপেক্ষা করে থাকতে রাজী নন, তাই ঠিক করেছেন 'মেজ'র আগে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে দেবেন।

সৌরেনের ভাই বীরেন কাজ পেয়েছে পোর্ট কমিশনারে, খুব একটা রোজগার না হলেও ভাল কাজ করলে উন্নতির আশা আছে।

সৌরেনের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। ভগ্নিপতি চা বাগানে কাজ

করে, ওরা থাকে জলপাইগুড়িতে।

কালই সৌরেন সম্মতি দিয়ে চিঠি লিখে দেবে। মা-র মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল, স্নেহময়ী জননীর প্রতিমূর্তি। সৌরেন বোঝে সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাকেই মা সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। এ ভালবাসার গভীরতা সে অনুভব করেছে ছোটবেলা থেকে। মনে আছে সৌরন যখন হাঁপানিতে ভুগত, বয়স তখন কতই বা হবে, নিস্তব্ধ রাত্রিতে মশারির মধ্যে উঠে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করত, তখন সারারাত তার মাথার কাছে বিনিদ্র রজনী কাটাতেন এই মা। রুগ্ন ছেলের সেবা করতে গিয়েই বোধ হয় এমনই এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মা ও ছেলের মধ্যে যা একান্তভাবেই তাদের দুজনের, যার মধ্যে প্রবেশের অধিকার আর কারুর ছিল না। শিশু সৌরেন যন্ত্রণায় অধীর হয়ে মাঝে মাঝে ব্যাকুলকণ্ঠে মাকে জিজ্ঞেস করত এ রোগ থেকে কখনও সে মুক্তি পাবে কি না। তার পিঠের ওপর মালিশ করতে করতে মা বরাবর আশ্বাস দিয়ে এসেছেন সৌরেন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠবে। মায়ের কথার ওপরই সে বিশ্বাস করে থাকত। সে বিশ্বাসের ফলও সে পেয়েছে, কয়েক বছরের মধ্যে সৌরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তবু মা তাকে বরাবর রুগ্ন ছেলেটির মত সযত্নে আঁচল দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। এ নিয়ে প্রথম প্রথম ভাই-বোনেরা হাসাহাসি করত, কিন্তু সৌরেন তাতে কিছু মনে করত না। কোথাও চেঞ্জে গেলে, বাবা হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন, সঙ্গে যেত অন্য ছেলেমেয়েরা, বাড়িতে থাকত মা আর সৌরেন। এক বাড়িতে থাকলেও ওদের জীবন যেন অন্য ছন্দে চলত।

কলেজে ঢুকে সৌরেন বুঝতে পারল অন্য ছেলেদের তুলনায় সে যেন অনেক কম স্বাবলম্বী, সব ব্যাপারেই সে নির্ভর করে অন্যের উপর। রজত ওকে বলত, তুই একটা মেয়েমানুষ।

তারপর থেকে সৌরেন নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করেছে, বুঝতে পেরেছে মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বুড়ো খোকা হয়ে বসে থাকলে চলবে না, সংসারে হাঁটতে গিয়ে সে প্রতিপদে হোঁচট খাবে।

বলতে গেলে সেই জন্যেই সে রোজগার করে সামান্য টাকা জমিয়ে চলে এসেছে সুদূর লণ্ডনে। সে জীবনটাকে দেখতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

এতদূর পর্যন্ত বেশ একটানা ভাবছিল সৌরেন, কিন্তু এইখানে তাকে থামতে হল। শুধু কি এইজন্যেই সে লণ্ডনে এসেছে; তার মনের কোণায় কোথাও কী ক্ষীণ আশা ছিল না যে এখানে এলে মীনাক্ষীর সঙ্গে আগের সেই সুন্দর স্বচ্ছ সম্পর্ক আবার ফিরে আসবে। লণ্ডনে আসবার আগে মীনাক্ষীর দাদু যখন তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, তুমি গিয়ে ভাই, মীনাক্ষীর দেখাশুনো করো, ও বেচারী একলা আছে তো। সৌরেন মনে মনে গর্ব অনুভব করেছিল, ভেবেছিল লণ্ডনে এসে সে মীনাক্ষীর অভিভাবক হয়ে বসবে। কিন্তু আশ্চর্য, এখানে এসে দেখল, মীনাক্ষী সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, তাকে দেখাশুনা করার কোন প্রয়োজনই নেই, বরং উল্টে মীনাক্ষীই তার খোঁজ-খবর করেছিল কিছুদিন। লণ্ডনের জীবনযাত্রার সঙ্গে সৌরেনকে পরি-চিত করিয়ে দেবার জন্যে।

সৌরেন আবার চিঠিটা পড়ল। মা তাহলে বীরেনের বিয়ে দিচ্ছেন, ভাবতেই হাসি পেল সৌরেনের। বীরেন ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা বয়স, এরই মধ্যে বিয়ে করে সংসারী হবে, দেশে থাকলে তার অবস্থাও হয়ত বীরেনেরই মত হত। লাল টুকটুকে

শাড়ি-পরা একটি মনের মত ছোট্ট বৌমা ধরে নিয়ে আসতেন। আমাদের দেশে বাপ-মা-র বয়স বাড়লেই কেমন যেন তাঁদের পুতুলখেলার শখ হয়। ছেলেমেয়েদের পুতুল সাজিয়ে দিব্যি তাঁরা খেলা করেন। সৌরেন ভাবে, যে মেয়েকে কখনও দেখিনি, যার বিষয়ে কিছু জানি না দু-চারটে মাত্র মন্ত্র আউড়ে হঠাৎ তাকে স্ত্রী বলে ঘরে নিয়ে আসব কি করে। অথচ তাই ত আসে, বীরেনও অমনিভাবেই বৌকে নিয়ে আসবে। সে বধূ বীরেনের সঙ্গে মিলতে পারুক বা না পারুক, সংসারের মধ্যে সে মিশে যাবে। এই পদ্ধতিই তো আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, এমনিভাবে তার মাও তো এ সংসারে এসেছেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর বাবা-মা-র দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে। দেশে থাকতে তাঁদের বিবাহিত জীবনের কথা সে কোনদিন ভাববার চেষ্টা করেনি। কিন্তু এই দূর দেশে বসে যখন সে তাঁদের কথা বিশ্লেষণ করে দেখে, মনে হয় বাবা আর মা-র মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশী। কিন্তু তা নিয়ে তো কোনদিন সংসারে মতান্তর দেখা দেয়নি, বাবার নির্দেশমত সংসার চলেছে। মা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিয়েছেন, এ মেনে নেওয়ার মধ্যে কোনরকম বাধ্যতা ছিল না। সেইভাবে চলে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। বংশের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে নির্মল ছন্দে প্রবাহিত হয়েছেন।

কিন্তু সৌরেন বিদেশে এতদিন থাকার পর এই জীবনটাকে কি মেনে নিতে পারবে? যদি সে বিয়ে করে, স্ত্রীকে সে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায়, পরিবারের এক-জন সভ্যা হিসাবে নয়।

লণ্ডনে না এলে এভাবে চিন্তা করার স্বাধীনতাও বোধ হয় সৌরেন পেত না। জীবনটাকে না দেখতে পেলে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বুঝত সে কি করে। মেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মেশবার সুযোগ না পেলে স্ত্রীকে সঙ্গিনী করার চিন্তা তার মাথায় আসত না।

এই অল্প সময়ের মধ্যে কতরকম মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হল। কিন্তু যার কথা ভাবতে তার অবাক লাগে সে বোধ হয় মারিয়া। সৌরেনের মনে পড়ে যায় সেই রাত্রের কথা, যেদিন মারিয়া তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল 'সোহো'র রেস্ত-রাঁয়। কোন রকম আপত্তি না শুনে সৌরেনকে 'ড্রিংক' করিয়েছিল, নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে। দেহ সম্বন্ধে ওর কোন রকম আড়ষ্টতা নেই, আর থাকবেই বা কেন? বিবস্ত্রা হয়ে যে মেয়ে ক্লাব-থিয়েটারে নাচে তার আবার লজ্জা কিসের।

প্রথমটা হয়ত মারিয়ার আচরণে সৌরেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কিছুটা ভয়ও পেয়েছিল। কিন্তু পরে নিঃসন্দেহে তার ভাল লেগেছিল মারিয়াকে। ভাল লেগেছিল তার বোহেমিয়ান জীবনযাত্রার মধ্যেও নারীমনের স্বচ্ছন্দ্য বিকাশ দেখে।

বিশেষ করে যেদিন এডিনবরা 'ফেস্টিভালে' যাবার আগে মারিয়া তাকে ফোন করে আমন্ত্রণ জানাল রেস্তোরাঁয় খাবার জন্যে। মারিয়া কিন্তু সেদিন বেশ দামী ফ্রক পরে এসেছিল, চিরাচরিত 'ব্লু' জিনের প্যান্ট পরে আসেনি। খেতে খেতে বলল, নিশ্চয় তোমাদের 'চিত্রাঙ্গদা' খুব ভাল হয়েছিল।

সৌরেন জিজ্ঞেস করলে, তুমি তো যাওনি, কি করে বুঝলে?

—বুঝলাম এই জন্যে যে রজত দেখে এসে থেকে সারাক্ষণ নিন্দা করছে, তার মানেই বুঝতে হবে শো তোমাদের ভাল হয়েছে!

মারিয়ার কথা শুনে সৌরেন সশব্দে হাসল, তুমি দেখছি রজতকে ঠিক বুঝে ফেলেছ।

—এতদিন একসঙ্গে রয়েছি, বুঝতে পারব না?

এক সময় সৌরেন প্রশ্ন করে, তুমি কতদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছ?

—আট সপ্তাহ।

—রজত একলা থাকতে পারবে?

—ও তো বলছে আমি চলে গেলে কিছুদিনের জন্যে অন্তত সে একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবে।

সৌরেন মারিয়ার মুখটা ভাল করে দেখে নিল একবার, এটা কি ওর মনের কথা?

মারিয়া দুষ্টমি করে হাসল, তা না হলে আর বলবে কেন? তবে যে জন্যে আজ তোমায় ডেকেছি শোন, যে দু' মাস আমি লণ্ডনে থাকব না তোমার ওই পাগলা বন্ধুটির মাঝে মাঝে খবর নিয়ো।

—সে আমি নিতে রাজী আছি, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। জানই তো রজত আমার একটা কথাও শোনে না।

মারিয়া অল্পক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়, উদাস স্বরে বলে, ঠিক সেজন্যে না সৌরেন, তোমার ডায়রী দাও, আমার এডিনবারা-র ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। যদি প্রয়োজন বোধ কর আমাকে চিঠি দিতে ভুল না।

সৌরেন মারিয়ার কথার ধরনে বিস্মিত হল, বলল, তোমাকে বড় উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে মারিয়া।

মারিয়া ঠিক আগের স্বরেই বলে, তোমার বন্ধুকে নিয়ে বিপদ কি জান? বড় খামখেয়ালী, এক একদিন এত 'ড্রিঙ্ক' করে যে সে সময় ওর মাথার কোন ঠিক থাকে না। সেই জন্যে ওকে একলা রেখে যেতে আমার ভয় করে।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ মারিয়ার সঙ্গে কথা হয়েছে সৌরেনের, শেষ পর্যন্ত সে মারিয়াকে কথাও দিয়েছিল তার অবর্তমানে রজতের দেখাশুনো করবে বলে। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে তার বার বার মনে হয়েছে, এ যেন আর একজন মারিয়া। এ লাস্যময়ী নর্তকী নয়, সোহোর বেহেমিয়ান শিল্পী নয়, এ সেই চিরন্তন নারী যার মন সতত করুণায় ভরা, যে অপরের ভাবনার বোঝা হাসিমুখে নিজের কাঁধে টেনে নেয়, অথচ প্রতিদানে সে কিছু চায় না।

মারিয়ার এই নরম দিকটার খবর না পেলে সৌরেনের কাছে সে ধাঁধার মতই থেকে যেত। যেরকম আজও একটা জীবন্ত ধাঁধা মনে হয় তার মলিনা দাসকে। মলিনা দাস বিচিত্ররূপিণী, তার কোন রূপটা যে সত্যি তা কেউই বোধ হয় বুঝতে পারে না।

বাড়িতে মাছের ঝাল রান্না করে মলিনা দাস যখন খাবার জন্যে সৌরেন পল্টুর মত আরও কয়েকজনকে ডেকে পাঠায় তখন তাদের সকলের কাছেই সে 'দিদি'। সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত সাদাসিধে শাড়ি পরে। নিজের হাতে পরিবেশন করে, সযত্নে তাদের খাওয়ায়। দুটো মাছ খাওয়ার পর সৌরেন তিনটে খেতে না চাইলে, মলিনা দাস তকে পীড়াপীড়ি করে, বলে, আর একটা তোকে খেতেই হবে, তা না হলে আড়ি হয়ে যাবে।

সৌরেন আপত্তি তোলে, সত্যি বলছি মলিদি, আর পারছি না।

—তাহলে বল দিদির রান্না তোর পছন্দ হয় নি।

—খুব সুন্দর হয়েছে। ঠিক মনে হচ্ছে আমাদের দেশের রান্না।

মলিনা দাস সৌরেনের প্লেটে আরও মাছ তুলে দেয়, আর কোন আপত্তি শোনা হবে না। খেতে হবে।

অগত্যা সৌরেনকে আরও খেতে হয়।

এ মলিনা দাসকে সৌরেন বুঝতে পারে। বুঝতে পারে মলিনা দাসকে যখন সে পল্টুর সমস্যা শোনে, মনে হয় দুই ভাই-বোনে যেন কথা বলছে।

—পল্টু, তোর ইন্টারভিউ কেমন হল?

পল্টু উচ্ছ্বাস চাপতে পারে না। এবার আর মুখ বুজে থাকিনি রে দিদি, ফাটিয়েছি। শালারা যে প্রশ্ন করে আমি মুখে মুখে জবাব দিই।

—দূর মুখ্যু, কি মনে হল তাই বল না। চাকরিটা পাবি?

—পাওয়া উচিত, তবে দেবে কি আর? হাজার হোক চামড়াটা যে কালো।

পল্টু হাতটা উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে বলে, এক একবার ইচ্ছে করে ছুরি দিয়ে গায়ের ছালটা ছাড়িয়ে ফেলি। তাহলে আর এদেশে চাকরির ভাবনা থাকত না।

মলিনা দাস কৌতুক করে বলে, শুধু এদেশে কেন, আমাদের দেশেও কী সাদা চামড়ার কম কদর? লণ্ডনে কিছু না পড়ে যে সব ছোঁড়ারা বিলাতী ছুঁড়ি বিয়ে করে দেশে ফিরছে, তারা তো স্রেফ বৌ দেখিয়ে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে।

কথা শুনে সকলে হেসে ওঠে।

পল্টু সমর্থন করে বলল, মাইরি দিদি তুই যে এক একখানা কথা ছাড়িস না, ঠিক যেন ঈশপস্ ফেবল্-এর নীতিকথা।

মলিনা দাস হেসে বলে, থাক তোকে আর ফাজলামি করতে হবে না আজ যে সব মক্কেলরা ইন্টারভিউ নিয়েছিল তাদের নাম ঠিকানাগুলো যোগাড় করে আনিস।

—কি হবে?

—দরকার আছে।

এ মলিনা দাসকে সৌরেন চিনতে পারে। চিনতে পারে দামী রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়ার পর মোটা অঙ্কের বিল চোকাবার জন্যে সৌরেন যখন পকেট থেকে টাকা বার করে আর মলিনা দাস তাকে ধমক দেয়, খুব টাকা হয়েছে বুঝি, আমার পেছনে টাকা ঢালছিস।

সৌরেন প্রতিবাদ করেছে, বাঃ, আমিই তো তোমাকে খাওয়াব বলে নিয়ে এলাম, আজকে মাইনে পেয়েছি, পকেটে টাকাও আছে।

—তারপর? বাকী সপ্তাহটা চলবে কি করে? হাওয়া খেয়ে থাকবি?

—তুমি যে কখন কি বল আমি বুঝতে পারিনা।

—বুঝে তোর দরকার নেই, ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মত থাকবি।

ওয়েটার এসেছিল, মলিনা দাস বিল মিটিয়ে দিল।

তারা দু'জনে বেরিয়ে এল রাস্তায়, অন্য দিনের চেয়ে মলিনা দাসের মুখ আজ গম্ভীর, কি যেন ভাবছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, পড়াশুনো করছিস, তোর পরীক্ষা কবে?

সৌরেন উত্তরটা এড়িয়ে যায়, এখনও দেরী আছে।

—যে কোন বিষয়ে হোক পাস করে দেশে ফিরিস। তা না হলে দেশে চাকরি পাওয়া মুশকিল।

সৌরেন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, জানি।

যে রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটছিল সেটা গিয়ে মিশেছে চৌরাস্তার মোড়ে। সেখানে পৌঁছে দু'জনে দাঁড়াল, ভাবল কোন দিকে যাবে। সামনে এগিয়ে গেলে টিউব স্টেশন। মলিনা দাসের বোধ হয় তখুনি বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ছিল না, বাঁ দিকের

অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ধরে তারা এগিয়ে চলল। কিন্তু সৌরেন মোটেই স্বচ্ছন্দ অনুভব করল না। তার মনে হল, যার সঙ্গে সে আজ হাঁটছে সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা। থমথমে গম্ভীর মুখ, চোখে সুদূরের স্বপ্ন। কথা বলছে সে ভারী গলায়, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব সৌরেন।

—কি ?

—এলিজাবেথকে তুই ভালবাসিস ?

এ প্রশ্ন শুনে সৌরেন চমকে ওঠে, নিজেকেও তো সে কোনদিন একথা জিজ্ঞেস করেনি। আজ হঠাৎ মলিনা দাসকে সে কি উত্তর দেবে। পাল্টা প্রশ্ন করল, একথা কেন জিজ্ঞেস করলে মলিদি ?

মলিনা দাস সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে চলতে বলল ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম এ বিষয়ে তোর সঙ্গে আলাপ করব, বেশী দূরে যদি এগিয়ে না থাকিস আর ওকে প্রশ্রয় দিস না।

সৌরেন বুঝতে পারে না, কেন মলিদি? ওর সম্বন্ধে কি তুমি কিছু শুনেছ ?

—না। এলিজাবেথ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই, সে নিশ্চয় ভাল মেয়ে, তা না হলে তোর পছন্দ হবে কেন। কিন্তু আমার অনুরোধ যেখানেই থাকিস না কেন নিজের দেশের কথা ভাববি। দেশের কথা, বিশেষ করে সেখানকার মেয়েদের কথা। তোরা ভাবতে পারবি না সৌরেন কি পাথর চাপা জীবন ওদের, এতটুকু আলো বাতাস খেলার উপায় নেই। জমাট অন্ধকারের মধ্যে তারা দিন কাটায় আর শিব ঠাকুরকে পুজো করে।

সৌরেন মলিনা দাসের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কোন কথা বলতে পারে না। মলিনা দাস আবার বলতে শুরু করে, কার যেন নাটকে পড়েছিলাম, হায় নারী, দাসত্ব করতেই তোমার জন্ম, প্রথমে পিতা, পরে স্বামী শেষে পুত্রের। সে অবস্থার পরিবর্তন আজও হল না। মেয়েদের এখন লেখাপড়া শেখান হচ্ছে, কিন্তু তার পর! কি সুযোগ তাদের দেওয়া হয়? বি এ, এম এ পাস করে সেই তাদের অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয় বিয়ের জন্যে। বিয়ে তো নয় কন্যাদায়। ম্যাট্রিক পাস, রোজগেরে ছেলেকে ছিপে তুলতে এম এ পাস মেয়েকেও যোগাতে হয় পণের টাকা। নারীত্বের এত বড় অপমান আর কোন দেশে এ রকম হয় না। মেয়ে হয়ে জন্মাবার যে কি যন্ত্রণা !

মলিনা দাসের কথাগুলো সৌরেনের মনকে স্পর্শ করে। মৃদুস্বরে বলে, চল এবার ফেরা যাক।

মলিনা দাস ফেরে, পূর্ণ দৃষ্টিতে সৌরেনের মুখে দিকে তাকায়, সে দৃষ্টিতে অনুনয় নেই, আছে আদেশ, বলে, যদি মানুষের মত মানুষ হোস, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারিস, দেশে ফিরে বিয়ে করবি। তাতে অন্তত একটা মেয়েও তো উদ্ধার হবে।

এ মলিনা দাসকে বুঝতেও অসুবিধা হয় নি সৌরেনের। এ সেই বিদ্রোহী নারী যে এতদিনের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস রাখে। এ সেই নারী যে নিজেকে অপমানিত, নির্যাতিত নারীজাতির একজন বলে মনে করে। কিন্তু তার জন্যে চোখের জল ফেলে না বরং যাদের সে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছে তাদের মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করে, আরো দশজনের সামনে।

কিন্তু মলিনা দাসের আর একটা দিক সৌরেনের কাছে ঘন তমসাবৃত। রাতের অন্ধকারে আজও তাকে মনে হয় রহস্যময়ী। যার কোন বন্ধন নেই, যার সঙ্গে আর

কারুর তুলনা করা যায় না, যার পরিচয় সে নিজে।

পাশের ঘরে খুট্‌খাট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় এলিজাবেথ এখনও ঘুমোয় নি। বড় চমৎকার মেয়ে। হয়ত কাউকে চিঠি লিখছে কিম্বা জামা কাপড় ইস্ত্রি করে রাখছে কাল সকালে অফিস যাবে বলে।

সৌরেন উঠে একটা সিগারেট ধরাল, এইটে শেষ করে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে। ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে। মায়ের চিঠির উত্তর ও কাল অফিসে বসে লিখবে। ইণ্ডিয়া অফিসে কাজ করার ওই সুবিধে, চিঠিপত্র লেখার প্রচুর অবসর। মনে হল দরজায় কে টোকা মারছে, হয়ত হাওয়ার শব্দ। দরজাটা অনেক সময় এমনিতেই নড়ে ওঠে। সৌরেন কুঁড়েমি করে উঠল না।

আবার টোকা পড়ল।

সৌরেন বলল, ভেতরে এস, দরজা খোলা আছে।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এলিজাবেথ।

—লিজি, তুমি!

—আমি ভাবলাম তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছ সৌরী।

—না, বসে আছি। তোমার ঘরে খুট্‌খাট্‌ আওয়াজ শুনছিলাম। মাঝখানের দেয়ালটা না থাকলে বেশ ভাল হত, কি বল?

এলিজাবেথ মৃদু হাসল, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।

এলিজাবেথ সৌরেনের পাশে এসে বসল, বাবা একটা চিঠি লিখেছেন।

—কি ব্যাপার?

এলিজাবেথকে চিন্তিত দেখায়, ঠিক বুঝতে পারছি না, তোমাকে তো বলেই ছিলাম কাকার সঙ্গে আমাদের পরিবারের সব সম্পর্ক অনেক দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাবা কোনদিন চাইতেন না আমরা কাকার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখি। অথচ আজকের চিঠিতে লিখেছেন ইচ্ছে করলে আমি কাকার সঙ্গে দেখা করতে পারি এবং তাঁর ফার্মে কাজ নিলে বাবা আপত্তি করবেন না।

—সত্যিই আশ্চর্য।

—আমার মনে হয় এই প্রৌঢ় বয়সে কাকা অনুতপ্ত হয়েছেন এমন ভাবে চিঠি লিখেছেন বাবাকে যে, তিনি আর সম্মতি না দিয়ে পারেন নি।

সৌরেন বলল, শুনেছি তোমার কাকা তোমায় খুব স্নেহ করতেন।

—হয় ত আজও করেন, জানি না।

—কি ঠিক করলে?

এলিজাবেথ গম্ভীর গলায় বলে, যাব একবার কাকার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু একা নয়, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

সৌরেন শুনে খুশী হল। তবু বললে, আমি যাব নিশ্চয়, তবে জানি না তোমার কাকা খুশী হবেন কি না আমায় দেখে।

—না হলে আমি নাচার। তবে একলা আমি যাব না, তোমাকে সঙ্গে থাকতে হবে।

এলিজাবেথ বোধ হয় কথাটা একটু জোর দিয়েই বলেছিল তাই সৌরেন ঠাট্টা করে বললে, যথা আজ্ঞা 'ইওর ম্যাজেস্টি।'

সকাল থেকে আজ কুয়াশা করেছে। লণ্ডনে অবশ্য কুয়াশা হওয়া বিচিত্র নয়, বলতে গেলে বার মাসের মধ্যে ন'মাস লণ্ডনবাসী কুয়াশার মধ্যে বাস করে।

সৌরেন আজ অফিসে এসে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলছিল। ঠিক হয়েছে লাঞ্চের পর তিনটে নাগাদ এলিজাবেথ আসবে ওর অফিসে, দুজনে মিলে যাবে 'হোপ্‌স ফ্যাশান হাউস'-এ। এলিজাবেথের কাকার দোকান মে ফেয়ারে, পার্ক লেনের ওপর, সৌরেনের অফিস থেকে পাঁচ সাত মিনিটের রাস্তা।

লণ্ডনে বেশীর ভাগ শৌখীন দোকান অবশ্য বণ্ড স্ট্রীট, পিকাডেলী আর রিজেণ্ট স্ট্রীটের ওপর। যদিও জনপ্রিয় দোকানগুলির সন্ধান পাওয়া যায় অক্সফোর্ড স্ট্রীট, নাইট্‌স্‌ব্রীজ, কেনসিংটন হাই স্ট্রীট আর স্ট্র্যাণ্ডে। কিন্তু বার্লিংটন আর্কেড্‌ বা শেফার্ট মার্কেট-এর মত কয়েকটা জায়গায় নামজাদা আভিজাত্য পূর্ণ দোকান আছে, এ সব রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড় কম তাই অনেক ধনী খদ্দের এখানেই বেশী বাজার করে।

হোপ্‌স্‌ ফ্যাশান হাউসও এই জাতের দোকান। সাধারণ লোকেরা জানে ওখানে ঢুকে কোন লাভ নেই, ওসব বড়লোকদের জায়গা।

সৌরেন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে বহুদিনই বাইরে থেকে এ দোকানটা দেখেছে। কাঁচের জানলায় এত সুন্দর করে মেয়েদের সাজপোশাকগুলো সাজিয়ে রাখে যে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দোকানের ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে যে সৌরেনের কখনও হয়নি তা নয়। কিন্তু একলা ঢুকতে যেন সাহস হয় না। আজ এলিজাবেথের সঙ্গে ফ্যাশন হাউসের ভেতরে গিয়ে বসবে, চারদিকটা দেখবে ভাবতেই সৌরেনের বেশ কৌতূহল হচ্ছিল। বিশেষ করে এই জন্যে যে লোকে বলে 'হোপ্‌স্‌' ফ্যাশান হাউসে শুধু যে নিত্য নূতন ফ্যাশানের জামা কাপড় পাওয়া যায় তাই নয় এখানে অনেকগুলি সুন্দরী তরুণী আছে যারা মডেলের কাজ করে। খদ্দের দেখতে চাইলে মেয়েরা তার পছন্দ মত জামা পরে সামনে দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। চারদিক ঘুরে দেখায় সেই পোশাকের বৈশিষ্ট্য কোথায়। এসব অবশ্য শোনা কথা, দোকানের ভেতরে ঢুকলে আজ সৌরেনের চোখ আর কানের ঝগড়া মিটবে।

কিন্তু এমনই মজা, মানুষ যেদিন ঠিক করে সে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলবে সেই দিনই যত দেরী হয়। সকাল বেলা যে টেবিলে বেশী কাজ পড়েছিল তা নয়, হঠাৎ ওপরওয়ালার কাছ থেকে পাঁচ ছ'খানা ফাইল এসে পড়ল তার মধ্যে তিনখানার ওপর লাল রং-এর জরুরী ফ্ল্যাগ আঁটা। ওগুলোর কাজ আজকেই সৌরেনকে শেষ করতে হবে।

সৌরেন মনে মনে প্রমাদ গুনল। কিন্তু সে নিরুপায়, অগত্যা মন দিয়ে কাজ করতে শুরু করে। আজ না হয় সে লাঞ্চ খেতে যাবে না, সে সময়টাও বসে বসে কাজ করবে।

সৌরেন এক একটা ফাইল ধরে তার ওপর নোট লিখতে লাগল। কতক্ষণ এভাবে লিখেছে সে জানে না। সবেমাত্র দু'খানা ফাইল-এর কাজ শেষ হয়েছে এমন সময় একটি ছেলে এসে দাঁড়াল তার সামনে। সৌরেন তাকে চেনে না, অদ্ভুত সাজ পোশাক। কোটের ঝুল লম্বা, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত; প্যাণ্টের তলার দিকটা বড় যেন সরু, মুখে অল্প বিস্তর গোঁফদাড়ি। বেশ কিছুদিন না কামালে যেরকম হয় আর কি।

ছেলেটি বললে, গুড মর্নিং।

ব্যস্ত সৌরেন উত্তর দিল, সুপ্রভাত, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?

—হ্যাঁ আমি জ্যাক ব্রেণ্ট-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সৌরেন জ্যাকের টেবিলে তাকিয়ে দেখল সে নেই, বলল, আমার মনে হয় জ্যাক কোথাও বেরিয়েছে।

—কখন ফিরবে?

—তা তো আমায় বলে যায়নি।

—ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মৃদু স্বরে বলল, আশ্চর্য, জ্যাক আমাকে আসতে বলে বেরিয়ে গেল?

সৌরেনের আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তবু বলল, ও যদি আসতে বলে থাকে আপনি অপেক্ষা করুন, হয়ত কোন জরুরী কাজ পড়েছিল তাই বেরিয়ে যেতে হয়েছে।

ছেলেটি তবুও অবুঝের মত কথা বলে, আমাকে জ্যাক আসতে বলল কেন? সে জানে আজ এখুনি অন্তঃত তিন পাউণ্ড না পেলে আমি বিপদে পড়ব।

—জ্যাক আপনার আত্মীয়?

—আমার দাদা।

সৌরেনের মনে পড়ে জ্যাক একদিন দুঃখ করে বলেছিল, তার ভাই তাদের পরিবারের একটি প্রব্লেম চাইল্ড।

—আপনার নাম?

—রবার্ট ব্রেণ্ট্।

—জ্যাক ফিরে এলে আমি তাকে বলব আপনি এসেছিলেন।

রবার্ট বিরক্তি ভরা গলায় বলে, কিন্তু টাকাটা যে আমার এখুনি চাই।

সৌরেন মুখ তুলে তাকায়, কি বলবে ভেবে পায় না। রবার্ট কিন্তু এক দৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির গলায় বলে, আপনি আমাকে তিন পাউণ্ড ধার দিন না।

সৌরেন আকাশ থেকে পড়ল, আমি?

তাতে কি হয়েছে! দাদা ফিরে এলে তার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।

সৌরেন বলতে পারল না যে এখনও সে জ্যাকের কাছ থেকে প্রায় দশ পাউণ্ড পাবে যা সে গত দু' মাসের মধ্যে ধার দিয়েছে। ফ্যালকা হেসে বলল, আমার সঙ্গে পয়সা নেই। থাকলে হয়ত দিতাম।

রবার্টের চোখে মুখে অবিশ্বাস, বললে, বেশ, আমার বিপদের সময় যদি টাকা না দাও তোমাকেও আমি ছাড়ব না, দেখে নেব।

কথার ধরনে সৌরেন বিস্মিত হল।

কিন্তু রবার্ট তখনও বলছে, তোমরা বিদেশ থেকে এসে আমাদের রুটি কেড়ে খাচ্ছ, বেশীদিন এরকম চলবে না।

সৌরেনের মাথার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, মনে রেখ তুমি ভারতীয় দূতাবাসে দাঁড়িয়ে কথা বলছ।

রবার্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তাতে কি হল?

—এইখানে চাকরি করে তোমার ভাই-এর মত অনেক ইংরেজ করে খাচ্ছে।

—এটা আমাদের দেশ। ভারতকে আমরা দয়া করে স্বাধীনতা দিয়েছি।

সৌরেন উঠে দাঁড়ায়, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তোমরা অনেকদিন আমাদের রক্ত শুষে খেয়েছে। এখনও যে তোমাদের সঙ্গে কমনওয়েলথ মারফৎ আমরা

সদ্ভাব রেখেছি সেটা আমাদের মহত্ত্ব!

রবার্ট যেন জ্বলে ওঠে, প্রত্যেকটি কথা ঘেন্না মিশিয়ে উচ্চারণ করে, যে দেশে এখনও অর্ধেকের বেশি লোক খেতে পায় না, শতকরা আশীজন মুখ্যু, যারা ভিখিরির মত সভ্য দেশের কাছে হাত পাতে তাদের মুখে আবার বড় বড় কথা।

সৌরেন আর ধৈর্য রাখতে পারে না, বেশ জোর দিয়ে বলে, বেরিয়ে যাও এ অফিস থেকে।

রবার্ট ঠিক এ ধরনের হুমকি আশা করেনি, থতমত খেয়ে যায়।

সৌরেন পুনরুক্তি করে, বেরিয়ে যাও, এ অফিসে দাঁড়িয়ে ভারতের নিন্দে শুনতে আমরা প্রস্তুত নই। শুধু আজ নয়, আর কোনদিন এ অফিসে তুমি ঢুকবে না। যদি ঢোক, তার জন্যে তোমায় কঠিন শিক্ষা পেতে হবে।

—আমি বলছিলাম কি,—

—আর কোন কথা নয়, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

রবার্ট ভয় পেয়েছিল, আর দ্বিরুক্তি না করে দ্রুত পায়ে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌরেন কিন্তু আর কিছুতেই কাজে মন দিতে পারল না। সমস্ত শরীর তার গরম হয়ে উঠেছে। ভারত সম্বন্ধে এ ধরনের কথাবার্তা দু' একটা কাগজে লেখে, সৌরেন তা পড়েছে। বিশেষ করে যারা সাম্রাজ্যবাদকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে, তারা এ ধরনের বক্তৃতাও দেয়। কিন্তু কারুর সঙ্গে সৌরেনের এ বিষয় নিয়ে সামনাসামনি কথা হয়নি, তাই রবার্টের কথায় সে আজ এতটা বিচলিত হয়েছে।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে জ্যাক ব্রেন্ট অফিসে ফিরল। সৌরেনের মুখে সব কথা শুনে মাথা নীচু করে বসে পড়ল চেয়ারে। বলল, আমার ভাই-এর আচরণের জন্য আমি যে কতখানি লজ্জিত তা তোমাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না সৌরেন, আমি তো তোমাকে বলেই ছিলাম, ও আমাদের প্রব্লেম চাইল্ড।

—চাইল্ড! তুমি কি বলছ জ্যাক ওতো একটা ডাকাত।

—বিশ্বাস কর, রবার্টের বয়েস বেশী নয়। কিন্তু এমন একটা দলে মেশে যাদের নাম হল 'টেডি বয়েজ'। এরা লেখাপড়া শেখে না, কাজ কর্ম করে না, যা করে তাও আইন বিরুদ্ধ। দেখেছ তো রবার্টের পোশাক। এডওয়ার্ডিয়ান আমলের লম্বা কোট আর রেন্ পাইপের মত সরু প্যান্ট। বড় বড় লম্বা চুল তার সঙ্গে দাড়ি গোঁফ। নিজেদের খেয়াল খুশিতে ওরা চলে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারে, চতুর্দিকে গুন্ডামী করে বেড়ায়।

সৌরেনের মনে পড়ে গেল দেশ থেকে আসার আগে, কলকাতায় সে শুনে এসেছে উঠতি গুন্ডাদের আবির্ভাবের কথা, যারা রকে বসে আড্ডা মারে, মেয়েদের দেখে টিট্‌কিরি দেয়, লেখাপড়ার সঙ্গে যাদের ভাশুর ভাদ্রবৌ-এর সম্পর্ক। বাবার হোটেলে দিব্যি আরামে দিন কাটায়, স্টুডিও মহলে চক্কর মারে। ভাল জামা কাপড় পড়ে চৌরঙ্গীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে পথচারীর পকেট মারে। লন্ডনের 'টেডি বয়'দের এরাই বোধ হয় ক্ষুদে সংস্করণ।

জ্যাক ব্রেন্ট সৌরেনের হাতদুটো ধরে সানুনয়ে বলে, দোহাই, সৌরেন, আমার ভাই-এর এই দুর্ব্যবহারের কথা উপরওয়ালাদের কাউকে জানিয়ো না, তাহলে আমার পক্ষে এখানে কাজ করা মুশকিল হবে। তুমি তো জান আমি দুঃস্থ লোক, এ চাকরি গেলে আমার আর কষ্টের অবধি থাকবে না।

সৌরেন ভরসা দিয়ে বলে, পাগল হয়েছ জ্যাক, একথা আমি বলতে যাব কেন?

জ্যাক সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে জানায়, সত্যিই, তুমি বড় ভাল লোক সৌরেন।

সৌরেন টেবিলের ফাইলগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তোমার ভাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করে একটাই অসুবিধা হয়েছে, এই জরুরী কাজগুলো করা হল না। অথচ তিনটের সময় এলিজাবেথকে নিয়ে আমায় বেরুতে হবে।

—তাতে কি হয়েছে, তোমার কাজগুলো বুঝিয়ে দাও আমি শেষ করে রাখব।

সৌরেন খুশী হল, তাহলে বড় উপকার হয়।

জ্যাক নিজেই ফাইলগুলো গুছিয়ে নিল, জিজ্ঞেস করল, তুমি খেয়েছ সৌরেন?

—না, সময় পাইনি।

—আমারও ক্ষিধে পেয়েছে, চল খেয়ে আসি। তুমি নির্ভাবনায় এলিজাবেথের সঙ্গে বেরিয়ো আমি বড় সাহেবের কাছে কাজ বুঝিয়ে যাব।

দু'জনে খুশী মনে গল্প করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ক্যানটিনের দিকে।

সৌরেন আর এলিজাবেথ যখন পার্ক লেনের 'হোপ্স্ ফ্যাশান হাউস'-এ এসে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে। রিসেপ্শানে সাদা চুলের যে তরুণী মেয়েটি বসেছিল এলিজাবেথের নাম শুনে সহাস্যে অভ্যর্থনা করে জানাল, আপনার জন্যে মিঃ হোপ অফিস ঘরে অপেক্ষা করছেন।

এলিজাবেথ বলল, আমার সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছেন, আমরা দুজনেই ও'র ঘরে যেতে পারি তো?

—আমি টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছি।

সৌরেন আর এলিজাবেথ দোকানের চারদিকটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, বড় সুন্দর করে সাজানো, নানা রং-এর পোশাক। কতরকম আলো, কাগজের ফুল লতা পাতা সব কিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এনে যিনি এ দোকান সাজিয়েছেন নিঃসন্দেহে তিনি উঁচুদরের শিল্পী। হয়তো শোনা যাবে প্যারিস থেকে এসেছিলেন এই কাজের ভার নিয়ে।

মেয়েটি জানাল, মিঃ হোপ আপনাদের দুজনকেই ডাকছেন।

—কোন দিকে যাব?

—চলুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটি সৌরেনদের নিয়ে একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে উঠে আধ তলায় ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় টোকা মারতে ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভেতরে এস।

মেয়েটি দরজা খুলে দিল, সৌরেন আর এলিজাবেথ ভেতরে ঢোকে। আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

লিণ্ডসে হোপ বেঁটে মানুষ, বিরাট টেবিলের ঘূর্ণায়মান নরম চেয়ারে বসে যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন, উঠে দাঁড়াতে তাঁর হাসিখুশী মুখখানা দেখা গেল। কাছে এগিয়ে এসে এলিজাবেথ-এর কপালে স্নেহ চুম্বন করলেন, লিজি ডারলিং, তুমি এসেছ আমি বড় খুশী হয়েছি।

এলিজাবেথ আলাপ করিয়ে দিল, আমার বন্ধু, মিঃ লাহিড়ী।

লিণ্ড্সে হোপ সৌরেনের করমর্দন করে বললেন, আমরা অপরিচিত নই,

আগেও এক দিন দেখা হয়েছে, কি বলুন ?

সৌরেন বললে, হ্যাঁ। আপনি বোধ হয় সেদিন প্রথম এলিজাবেথের খোঁজে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

তাঁরা তিনজনে ঘরের অন্য কোণায় রাখা সোফায় বসে আলাপ করতে শুরু করলেন। লিন্ড্‌সে হোপ এক সময় বললেন, বয়স বাড়ছে, শরীরের ওপর ক্রমশ বিশ্বাস হারাচ্ছি, তাই ত এক এক সময় নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। ধর হঠাৎ যদি আমি মারা যাই, এত বড় ব্যবসা আমি গড়ে তুলেছি, কে দেখবে? তোমরা আমার আত্মীয় হয়েও অন্যের ফার্মে সামান্য কাজ করবে কেন? এত তোমাদেরই প্রতিষ্ঠান, নিজেদের দায়িত্ব তোমরা বুঝে নাও।

এলিজাবেথ তার কাকাকে কয়েকবারই মাত্র দেখেছে, তাঁর সম্বন্ধে কোনরকম নিজস্ব ধারণা এলিজাবেথের মনে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। কিন্তু ছোটবেলা থেকে তার কাকার বিষয়ে যেসব কথা সে তার বাবা মা বা আত্মীয় স্বজনের কাছে শুনেছে তা যেমনি ভয়াবহ তেমনি অপ্রীতিকর। এলিজাবেথ জানত লিন্ড্‌সে হোপ একজন উদ্ধত পুরুষ, টাকার জোরে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করেন না। সেই কাকার মুখে আজ এই ধরনের ভাবপ্রবণ কথা শুনে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না।

সে মৃদুস্বরে জানাল, বাবাও লিখেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। লিন্ড্‌সে হোপের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, এতদিন বাদে আমি চার্লসকে বোঝাতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা করে আমি চলে আসি, যেদিন তুমি বললে বাবার অমতে এখানে কাজ করবে না, সেইদিনই চার্লস্‌কে আমি দীর্ঘ চিঠি লিখি আমার মনের কথা জানিয়ে। তারপর থেকে আমাদের পত্রালাপ শুরু, প্রায় খান দশেক চিঠির আদান প্রদান হয়েছে। সামনের সপ্তাহে তোমাকে নিয়ে যাব একদিন চার্লস-এর সঙ্গে দেখা করতে, কি বল ?

দীর্ঘ দিন বাদে বাবার সঙ্গে যে কাকার একটা মিলন হতে পারে একথা ভেবেই এলিজাবেথ মনে মনে খুশী হল। বলল, নিশ্চয় যাব।

ইতিমধ্যে পরিচারিকা কফি দিয়ে গিয়েছিল, লিন্ড্‌সে হোপ তিনটে কাপে পরিবেশন করে দিলেন।

কফি খেতে খেতে বললেন, আমার এতদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম নিজের পায়ে দাঁড়াব বলে। দাঁড়িয়েছি। চেয়েছিলাম চার্লস আর আমি এক সঙ্গে থেকে এতদিনের পরিশ্রমের ফলটুকু ভোগ করব, কিন্তু পারিনি। পারিনি চার্লসের জন্যে, সে রাজী হয়নি বলে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তাকে আমি বোঝাতে পেরেছি, ডার্লিং লিজি, তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাও, একসঙ্গে কাজ কর, আমার বিশ্বাস ক্রমে চার্লসকেও আমি এ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসতে পারব। সে আমার অংশীদার হিসেবেই এখানে যোগ দেবে।

এলিজাবেথ অধীর আগ্রহে বলে, তাহলে বড় ভাল হয় আঙ্কল্ লিন্ড্‌সে, আমাদের পারিবারিক দ্বন্দ্বের ওপর শেষবারের মত যবনিকা পড়ে যায়।

কথা বলতে গিয়ে এলিজাবেথের চোখে জল আসে। লিন্ড্‌সে হোপ তার কাছে উঠে গিয়ে ধীর স্বরে বলেন, ডার্লিং লিজি, আমার মনে হচ্ছে, সুদিন এসেছে। আমার এবারের চেষ্টা নিষ্ফল হবে না।

তারপর সৌরেনের দিকে ফিরে বললেন, মিঃ লাহিড়ী, আমাদের এ ধরনের

পারিবারিক কথাবার্তা শুনে হয়ত আপনি বিব্রত বোধ করছেন।

সৌরেন বলতে যাচ্ছিল তাকে নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই কিন্তু তাকে বলবার সুযোগ না দিয়ে মিঃ হোপ জানালেন, আর বেশীক্ষণ সময় আমাদের লাগবে না। এ ফার্ম সম্বন্ধে দু'চারটে কথা লিজিকে আমার বলা দরকার, আপনি যদি মিনিট দশেকের জন্যে বাইরে অপেক্ষা করেন—

সৌরেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, আপনারা কথা সেরে নিন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

সৌরেন দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সামনেই ছোট সিঁড়ি। উপরের এই ল্যাণ্ডিং থেকে দোকানটা যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। কী স্বপ্নালু পরিবেশ, কোথাও একটা আলো চোখে পড়ে না, এমনভাবে ইলেকট্রিক বাল্বগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে অথচ ঘরময় আলোর রশ্মি। সাদা নয়, রঙীন আলো। দোকানের মাঝ বরাবর যেখানে সাদা মার্বেলের 'ভেনাস'কে রাখা হয়েছে সেখানে তো আলো নেই বললেই হয়। প্রায়-অন্ধকারের মধ্যে সুন্দরী 'ভেনাস' লজ্জা নিবারণের জন্য অতি সূক্ষ্ম শিফনের বস্ত্র টেনে নিয়ে গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সৌরেন। বাইরে থেকে দোকানটা তার খুব বড় মনে হয়নি, কিন্তু এখন দেখল সরু লম্বা ঘরটা ভেতর দিকে চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। ইচ্ছে করে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরের দিকে সে চলে গেল, সুন্দরী মেয়েরা চারদিকে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে। বড় সুন্দর সাজ পোশাক, লোভনীয় চেহারা। বেশীক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করল সৌরেনের। মনে প্রশ্ন জাগল এরাই কি মডেল সেজে খদ্দেরের সামনে তাদের পছন্দ মত পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়? হয়ত তার জন্যে আলাদা কক্ষ আছে, সেখানে আলো আরো বেশী। হয়তো মঞ্চের মত উঁচু জায়গা আছে যেখানে এসে তারা দাঁড়ায়।

সৌরেনের হঠাৎ মনে হল 'রিসেপ্‌শানে'র সেই মেয়েটির সঙ্গে কে যেন চড়া গলায় কথা বলছে। ঝগড়া করছে নাকি? কৌতূহল হল সৌরেনের। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সেইদিকে।

যে লোকটি চড়া গলায় কথা বলছিল তার বয়স বেশী নয়, বড়জোর পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ। চাবুকের মত শরীর, চৌকো মুখ। দেখলেই মনে হয় বড় বেশী উত্তেজিত। চোখের তলায় বিশ্রী রকম কালি পড়েছে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালদুটো কাঁপছে।

সৌরেন শুনল মেয়েটি বলছে, বলছি তো মিঃ হোপ এখন ব্যস্ত, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

লোকটি দৃঢ় স্বরে বলে, কতদিন উনি পালিয়ে বেড়াবেন, দেখা তাঁকে করতেই হবে।

মেয়েটিও কঠিন হয়, বলছি তো উনি ব্যস্ত।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—না করলে আমি নিরুপায়, তবে তার সঙ্গে দেখা হবে না। আপনি যেতে পারেন। লোকটি রোষকষায়িত চোখে চারিদিকটা একবার দেখে নেয়, দাঁত কড়মড় করে বলে, দেখা আমি ওর সঙ্গে ঠিকই করব, আজ না হয় কাল, এখানে না হয় ও'র ফ্ল্যাটে। ও'র ফ্ল্যাট তো আর আমার অচেনা নয়।

—সে আপনার অভিরুচি।

লোকটি আর কোন কথা না বলে হনহন করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। সৌরেনের মনে হল দোকানের মেয়েরা লোকটির আগমনে খুশী হয়নি, কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তবে কি এ লোকটিকে এরা চেনে? কে জানে!

এ নিয়ে ভাববার বেশী সময় পেল না সৌরেন। একটু পরেই এলিজাবেথ হাসতে হাসতে নীচে নেমে এল, বলল চল সৌরেন, অনেকক্ষণ তোমায় কষ্ট দিয়েছি।

রাস্তায় নেমে সৌরেন জিজ্ঞেস করলে, কথাবার্তা সব পাকাপাকি হয়ে গেল?

—একরকম তাই। সামনের সপ্তাহে বাবার সঙ্গে গিয়ে আমরা দেখা করব, তারপর এ ফার্মে আমি নিযুক্ত হব একেবারে ম্যানেজারের পদে।

সৌরেন খুশী হয়, সত্যি?

এলিজাবেথ কেমন যেন অন্যমনস্ক স্বরে বলে, আমি নিজেই তো ভাবতে পারছি না। প্রতি সপ্তাহে কুড়ি পাউণ্ড আমি মাইনে পাব।

—তোমাকে আমার আন্তরিক শুভ কামনা জানাই।

সেদিন দোকান থেকে বেরিয়ে তারা ঢুকেছিল স্ন্যাক-বারে, চা খেতে। গল্পও করেছিল নানারকম, কিন্তু সৌরেন বুঝতে পেয়েছিল এলিজাবেথের কথা বলার একেবারে মন নেই। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সৌরেনও ওই অবস্থায় পড়লে নিশ্চয় বিচলিত হত। শুধু যে তাদের পারিবারিক বিচ্ছেদের পালা মিটতে চলেছে তাই তো নয়। এলিজাবেথের সামনে এখন উন্নতির সিঁড়ি। ধাপে ধাপে সে উপরে উঠে যেতে পারবে।

এক সময় সৌরেন বলল, মনে হচ্ছে কথা বলে তোমার চিন্তার আমি বিঘ্ন ঘটাচ্ছি।

এলিজাবেথ লজ্জিত স্বরে বলে, আমাকে মাপ কর সৌরেন। বাড়ির কথা ভাবছিলাম।

—তা আমি বুঝতে পেরেছি।

—তুমি বুঝতে পারছ না সৌরেন, বাবা আর কাকার কথা ভেবে আমি কি রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

—না হলেই আশ্চর্য তা। একটু পরে প্রশ্ন করল, তুমি তো আজ বান্ধবীর বাড়ি যাবে ডিনারে?

—হ্যাঁ, ভেরাকে অনেকদিন থেকে কথা দেওয়া আছে।

—কোথায় যেতে হবে,

—ওভালে, ক্রিকেট গ্রাউণ্ডের কাছে। ঘড়ি দেখে এলিজাবেথ বলল, চল এবার ওঠা যাক।

রাস্তায় বেরিয়ে ওরা বাসে ওঠেনি, ট্রেনেও চড়েনি, হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেছে। দুজনে পাশাপাশি চলেছে কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেনি। দুজনেই ভাবছে। এলিজাবেথ ভাবছে তার নতুন ভাগ্যোদয়ের কথা, আর সৌরেন ভাবছে, এর কি হবে। এলিজাবেথ এ দোকানে যোগ দিলে রোজগার বেড়ে যাবে, তা ছাড়া পদমর্যাদাও, তার পক্ষে প্রায়রী রোডের ভাঙ্গা বাড়িতে থাকা বোধহয় সম্ভব হবে না। হয়ত ভাল ফ্ল্যাট নিয়ে সে দামী পাড়ায় চলে যাবে। এলিজাবেথ মেয়েটা ভাল, টাকা পেয়েই সে যে একেবারে বদলে যাবে তা নয়, কিন্তু কাজের চাপে ব্যস্ত থাকতে সে বাধ্য হবে, কতটুকু সময় সে পাবে সৌরেনের সঙ্গে মেশবার। তাছাড়া এখন যেরকম তারা ছোট-

খাট রেস্তরাঁয় সস্তার কফি বারে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় সেরকম তো পরে পারবে না। এলিজাবেথের মর্যাদায় লাগবে। অথচ বড় হোটেল রেস্তরাঁয় এলিজাবেথকে নিয়ে খেতে যাবার সামর্থ্য কেরানী সৌরেনের কোথায়?

কারা যেন হেসে উঠল। টিট্‌কিরির হাসি। সৌরেন মুখ ফিরিয়ে দেখল ফুট-পাথের এক ধারে বেঞ্চির কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছেলে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসা-হাসি করছে।

সৌরেন অস্বস্তি বোধ করল।

এলিজাবেথ কিন্তু ইচ্ছে করে ওদের দেখিয়ে সৌরেনের হাতের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে হেসে বললে, ওদের গ্রাহ্য করো না।

—ওরা কারা?

—টেডি বয়েজ।

সৌরেনের খেয়াল হল তাই তো, এদেরও সাজ পোশাক জ্যাকের ভাই রবার্টের মতই অদ্ভুত ধরনের। কে জানে, ওদের মধ্যে রবার্ট ব্রেণ্টও আছে কিনা। কেমন যেন ভয় হল সৌরেনের। চলতে চলতেই ফিসফিস করে বলল, অদ্ভুত ছেলে। এলি-জাবেথ উত্তর দিল, অদ্ভুত নয়, সব বাঁদর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিশাপ।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পড়েছিল ওয়ারেন স্ট্রীট টিউব স্টেশনের কাছে। নর্দান লাইনের স্টেশন। ট্রেন ধরলে এলিজাবেথ সোজা চলে যেতে পারে 'ওভাল'-এ। ওইখান থেকেই তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিল।

সৌরেনের কিন্তু এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না। একবার ভাবলে রজতের কাছে যাবে, কিন্তু ও যা উড়নচণ্ডী ছেলে, এ সময় কি আর বাড়িতে থাকবে। মারিয়া লণ্ডনে থাকতে যাও বা বাড়ির মধ্যে সামান্যতম নিয়ম কানুন ছিল, ও এডিন-বারা চলে যাবার পর এখন তাও নেই। চিরকেলে বেহিসেবী রজত পুরোদমে বেপরোয়া জীবন কাটাচ্ছে।

রজতকে বাদ দিয়ে আর যার কথা মনে হল সে মলিনা দাস। অবশ্য এ সময় তাকেও বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবু একটা চান্স নেবার জন্যে টেলিফোন বুথে ঢুকে মলিনা দাসের নম্বর ডায়াল করল সৌরেন। একবার নয়, দু'বার। কিন্তু কথা বলা হল না, লাইন এন্‌গেজ্‌ড্‌।

কতক্ষণ আর সৌরেন অপেক্ষা করবে, আর যাই হোক বাড়িতে মলিনা দাস নিশ্চয় আছে। এই বেলা চলে গেলে দেখা হবে।

মোড়ের মাথা থেকে বাস ধরল সৌরেন। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, চারদিকে জ্বলে উঠেছে আলো। দেখতে বেশ লাগছে।

মলিনা দাসের বাড়িতে ঢুকতেই নীচে পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করে সৌরেন জানল তার অনুমান ভুল হয় নি। সত্যিই মিস দাস বাড়িতে আছেন, দুপুর বেলা লাঞ্চ খেয়ে সেই যে ঘরে ঢুকেছেন আর বার হন নি।

শিস দিতে দিতে উপরে উঠে গেল সৌরেন। মলিনা দাসের দরজায় গিয়ে টোকা মারল, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। আরো জোরে আঘাত করল সে, যদি বাথরুমে থাকে, শব্দ শুনতে না পায়। তাতেও সাড়া না পেয়ে সৌরেন চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে বুঝল দরজা ভেতর থেকে লক্ করা, চাবি বন্ধ। সন্দেহের আর অবকাশ রইল না, মলিনা দাস নিশ্চয় ভেতরে আছে। তাই আরো জোরে সে দরজায় করাঘাত

করল।

শুনতে পেল ভেতর থেকে চাবি খোলার আওয়াজ। দরজা খুলে মলিনা দাস বেরিয়ে এল।

সৌরেন হেসে প্রশ্ন করে, কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

—প্রায় তাই, মুচকি হাসল মলিনা দাস। কিন্তু তুই এ সময়, না বলে কয়ে?

—ফোনে তোমায় পেলাম না যে।

—পাবি কি করে? আমি রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছি।

—সে কি?

মলিনা দাস জড়ানো স্বরে বলে, বড় বেরসিক, অসময়ে বিরক্ত করে, তাই মাঝে মাঝে নামিয়ে রাখি।

সৌরেন মলিনা দাসের চালচলনে ক্রমেই আশ্চর্য হচ্ছিল, জিজ্ঞেস করলে, তুমি বুঝি ব্যস্ত ছিলে?

—খুউব ব্যস্ত, মলিনা দাস খিলখিল করে হাসে, দেখবি আয়।

সৌরেনকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মলিনা দাস তাকে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকেই সৌরেন হতভম্ব হয়ে গেল। কেমন যেন একটা দম বন্ধ করা আবহাওয়া, সিগারেটের ধোঁয়ায় আর মদের গন্ধে গা ঘিনঘিন করে ওঠে। টেবিলের ওপর বীয়ার আর হুইস্কির বোতল, কার্পেটের ওপর ডিশে ছড়ানো ভাজা মাংসের টুকরো, শুধু তাই নয়, বড় সোফার উপর উপুর হয়ে কে যেন শুয়ে রয়েছে, পরনে তার সার্ট আর একটা ছোট আন্ডার প্যাণ্ট।

সৌরেন শিউরে উঠল, ওখানে ও কে?

মলিনা দাস তখনও গা কাঁপিয়ে হাসছে, চিনতে পারলি না, সোম সাহেব।

—এই অবস্থায়?

—বেহুঁশ, মাতাল। আজ সারা রাতটা সাহেব বোধহয় ওই কোচেই পড়ে থাকবে। ভোরবেলা যদি হোটেলে ফিরতে পারে।

সৌরেন সভয়ে বলে, না বলে আসা আমার উচিত হয় নি। আমি এখন যাই। মলিনা দাস খপ্ করে সৌরেনের হাতটা ধরে ফেলে, দুর পাগল, কোথায় যাবি? একলা বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না, আমার সঙ্গে গল্প করবি আয়।

এতক্ষণে সৌরেন মলিনা দাসকে লক্ষ্য করে, নেশা এখন তাকেও পেয়ে বসেছে। গাল দুটো লজ্জা পাওয়া নববধূর গালের মত আরক্তিম, চোখে লোল কটাক্ষ। সে চাহনিতে শিকারীর শ্যেন দৃষ্টি নেই, আছে উচ্ছল জীবনস্রোতে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আনন্দ। সমস্ত শরীর তার শিথিল হয়ে এসেছে, শুধু ভেসে থাকার জন্যে যেন সৌরেনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। সৌরেন অনুভব করে মলিনা দাসের শ্বাস প্রশ্বাসের তাল দ্রুত হয়ে উঠেছে। অবাক বিস্ময়ে সে দেখল নারীর এই মোহিনী রূপ। যে রূপ পুরুষকে প্রলুব্ধ করে, আকর্ষণ করে তার রূপ শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। যে রকম বহ্নি আকর্ষণ করে পতঙ্গকে।

তাই মলিনা দাস যখন মক্ষীরাণীর মত গুণগুণ করে বলল, চল সৌরেন পাশের ঘরে যাই, আমার শোবার ঘরে, সৌরেন কোন আপত্তি করতে পারল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছু পিছু এগিয়ে গেল।

সৌরেন ভয়ে ভয়ে পাশের ঘরে ঢুকে চুপ করে কাঠের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে

রইল। এ ঘরে সে আগেও এসেছে, কিন্তু আজ মনে হল এ জায়গা তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ছোট্ট শোবার ঘর। ঘরের আয়তন অনুযায়ী একটুকরো জানলা, মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা। আগে থেকেই এ ঘরে আলো জ্বলছিল, গোলাপী রঙের কাগজের শেডের ভেতর দিয়ে রঙীন আলো সিলিং-এর ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। তবু সৌরেনের মনে হল বড় যেন ফাঁকা ফাঁকা। নীচু চওড়া খাট তার উপর ইঁট-রঙের সিল্কের চাদর। ঘরের কোণে একখানা বেতের চেয়ার।

মলিনা দাস ঘরে ঢুকেই নরম বিছানার উপর ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছিল। তখনও পা দুটো মাটি ছুঁয়ে রয়েছে, শরীরটা বিছানায়, মাথাটা বালিশে. আঁকা বাঁকা সরীসৃপের মত দেহ। মুখে তার দুর্বোধ্য হাসি, মিষ্টি স্বরে ডেকে বলে, আয় সৌরেন, আমার কাছে এসে বোস।

সৌরেন কিন্তু এতটুকুও নড়ল না, সে অনুভব করল হাত দুটো তার কাঁপছে, মনে হল এ যেন এক স্বপ্ন। পুরুষের মনের মধ্যে নারী দেহ সম্বন্ধে যেসব কামনা বাসা বেঁধে থাকে তা যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছে। সেইখানে উপস্থিত থেকেও সৌরেন মনে মনে ভুলে যেতে চাইল যে সে সেখানে রয়েছে। সেই নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে থেকে সে নিজের সত্তাকে বার করে নিয়ে যেতে চাইল জনবহুল রাস্তায়, ডুবিয়ে দিতে চাইল অতীতের কোন সুখ স্মৃতির মধ্যে। তার মনের কল্পনার সঙ্গে তাল রেখে কোথায় যেন মধুর যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে, যা সে শুনতে পাচ্ছে একা। তার আর মলিনা দাসের মাঝে যেন একটা স্বচ্ছ পর্দা নেমে এসেছে, মলিনা দাসকে সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আগের মত স্পষ্ট নয়।

—ওরকম বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? জুতো, কোট, খোল। এখানে এসে বোস।

মলিনা দাসের কথাগুলো আদেশের মত শোনাল, সৌরেনের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। বেতের চেয়ারে বসে জুতো দুটো খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখে, ইচ্ছে না থাকলেও কোট আর টাই খুলে চেয়ারের হাতলে ফেলে দেয়।

—এখানে আয়।

সৌরেন অতি সন্তর্পণে আড়ষ্টভাবে মলিনা দাসের পাশে গিয়ে বসে।

এতক্ষণে নেশা যেন আরও পেয়ে বসেছিল মলিনা দাসকে। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাবার জন্যে কোন রকমে সে বিছানার উপর উঠে বসে। সৌরেনের হাতের উপর মৃদু চাপ দিয়ে হাসল, অর্থহীন হাসি।

—তুই একেবারে ছেলেমানুষ। মলিনা দাস মাথাটা নীচু করে ব্লাউজের বোতামগুলো খোলে; তার মুখের ওপর চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে কালো মেঘের মত। কিন্তু বেশীক্ষণ সে বসে থাকতে পারল না, আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

নির্বোধের মত সৌরেন তাকিয়ে রইল মলিনা দাসের দিকে, দেখল তার নেশা-ধরা চোখ, মুখ, তার দেহ, তার চুল কিন্তু তাকে স্পর্শ করার কোন বাসনা তার মনে এল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল এর পর কি হবে তাই জানবার জন্যে।

মলিনা দাস জড়ানো গলায় বললে, তোর আজ খুব বরাত ভাল রে সৌরেন, আজ তুই আমায় যে অবস্থায় দেখলি, সচরাচর পুরুষ মানুষ সেভাবে আমায় দেখতে পায় না। তারা দেখতে চায়, মলিনা দাস মাতাল, বোতলের পর বোতল দামী মদ এনে খাওয়ায়, কিন্তু দেখতে পায় না, কেন জানিস?

মলিনা দাস থামে, চোখে মুখে তার বিজয়িনীর হাসি, মদ খেয়ে তাদের অবস্থা

হয় সোম সাহেবের মত, নিজেই মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু আমার কিছু হয় না। আজ দুপুর থেকে তো কত খেয়েছি, কিন্তু এখনও আমার নেশা হয় নি। মাথার মধ্যেটা মাঝে মাঝে চিন চিন করছে, ব্যস্, তার বেশী আর কিছু নয়।

মলিনা দাস সৌরেনের হাতটা টেনে নিয়ে কপালের ওপর ছোঁয়ায়, বুকের ওপর রাখে, বলে, শরীরটা বোধ হয় একটু গরম হয়েছে না? তোর হাতটা বেশ ঠাণ্ডা। অত দূরে কেন, আরও কাছে আয়।

সৌরেন কিন্তু পাথরের মত বসে থাকে।

মলিনা দাস এবার বিরক্ত হয়, এ আবার কি আদিখ্যেতা হচ্ছে, আমার কথা বুঝি কানে যাচ্ছে না?

সৌরেনের বুক ধড়ফড় করছিল। শুকনো গলায় বললে, আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

সৌরেন কোন উত্তর দেয় না।

—ও বুঝেছি, সোম সাহেবকে ভয় পাচ্ছিস, দূর বোকা, ও এখন বেহেড মাতাল, ডাকাডাকি করলেও ওর ঘুম ভাঙবে না। তুই নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি দুটো তিনটে পর্যন্ত আমার সঙ্গে শুতে পারিস। আয়, শো—

সৌরেনের সেই এক কথা, আমার ভয় করছে।

—ভয় কাকে? মলিনা দাসের কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনায়। নিমেষের মধ্যে সে যেন ফণা তুলে ওঠে, ভয় কি তোর আমাকে?

সৌরেন ঘামতে শুরু করে, কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

মলিনা দাস কর্কশ কণ্ঠে বলে এতই যদি ভয় কেন আসিস আমার কাছে? বেরিয়ে যা এখান থেকে।

সৌরেন বুঝতে পারে, তার ব্যবহারে মলিনা দাসের অহমিকায় আঘাত লেগেছে। যে মলিনা দাসকে পাবার জন্যে সোম সাহেবের মত নামজাদা বড়লোকরা অকাতরে পয়সা খরচা করে, যে মলিনা দাসের সঙ্গে রাত কাটাবার লোভে বিবাহিত পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের উপেক্ষা করে চলে আসে, সেই মলিনা দাসের সাদর আমন্ত্রণ সৌরেন প্রত্যাখ্যান করেছে। এ অপমান মলিনা দাস সহ্য করবে কি করে! এও বোধ হয় তার জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা, যাতে সে বুঝতে পারল, সংসারে এমন পুরুষও আছে যে মলিনা দাসকে দেখে ভয় পায়।

সৌরেন আর অপেক্ষা করল না, নিঃশব্দে উঠে গিয়ে জুতো দুটো পরে নিল। কোট আর টাই হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

মলিনা দাস তখনও তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, সমস্ত শরীর তার রাগে কেঁপে উঠছে।

সৌরেন কোনরকমে বললে, আমি চলি।

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন উত্তর এল, যাও।

সৌরেন কল্পনাও করতে পারে নি মলিনা দাসের কণ্ঠস্বর এতখানি কর্কশ হতে পারে, শুনল সে বলছে, আর কখনও আমার কাছে এস না।

এতক্ষণ সৌরেনের মনে হচ্ছিল এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই সে সবচেয়ে খুশী হবে, কিন্তু দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে একবার সে থামল, মনে হল মলিনা দাসের শেষের কথাগুলো যেন বড় বিষণ্ণ শোনাচ্ছে।

মলিনা দাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বলল, আমি বিশেষ

দুঃখিত।

—কোন কথা শুনতে চাই না, তুমি চলে যাও।

—পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

—না।

—টেলিফোনে খবর নেব?

—প্রয়োজন নেই।

—এই কি তবে আমাদের শেষ দেখা?

—হ্যাঁ।

সৌরেন আর কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল। তখনও সোফার উপর আগের মতই সোম সাহেব শুয়ে রয়েছে।

একবারে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ফাঁকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে সৌরেন স্বস্তি বোধ করল। এতক্ষণে যেন দুঃস্বপ্ন কেটে গেল।

পরের দিন কিন্তু ঘুম থেকে উঠে সৌরেনের নিজেকে বড় ছোট মনে হল। কেন সে কাল মলিনা দাসকে এত ভয় পেয়েছিল? মলিনা দাস তার কী ক্ষতি করতে পারত? কিছুই না। তবে কেন সৌরেন তার কথা শুনল না, কেন তার মোহিনী রূপকে অপমান করে চলে এল? ছিঃ ছিঃ মলিদি তাকে কি ছেলেমানুষই না ভেবেছে। চিন্তা করতেই সৌরেনের বিশ্রী লাগল। মনে মনে ঠিক করল, মলিনা দাসের সঙ্গে সে টেলিফোনে কথা বলবে। প্রয়োজন হলে তার সঙ্গে দেখা করে কালকের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু সারাদিনে দু' তিনবার চেষ্টা করেও মলিনা দাসকে ধরতে পারল না। বার বার নো রিপ্লাই হল।

পরের দিনও তাই।

সৌরেন ভেবেছিল মলিনা দাসের বাড়ি গিয়ে খবর নেবে। কিন্তু সময়ের অভাবে পেরে উঠে নি, বিশেষ করে আজও এলিজাবেথের জন্যে। এলিজাবেথ তার অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে যাচ্ছে। বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে। দু' একদিনের মধ্যে ওর কাকারও যাবার কথা। সেখানেই ওদের পারিবারিক মিলন ঘটবে।

এলিজাবেথের টুকিটাকি বাজার করবার ছিল, সেইজন্যে অফিসের পর সৌরেনকে নিয়ে সে বেরল। লণ্ডনে অবশ্য বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। সপ্তাহে এক আধদিন লোকের সুবিধের জন্য সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তাই বাজার করার খুব যে বেশী সময় পেল এলিজাবেথ তা নয়, তবু তারই মধ্যে বাড়ির লোকজনের জন্যে যে জিনিসগুলো না কিনলে চলবে না তাই সে চটপট করে কিনে ফেলল। এ দুদিন ওরা সন্ধ্যেবেলা আর বাড়ি ফেরে নি। খাওয়া পর্ব বাইরে চুকিয়ে তবে প্রায়রী রোডে ঢুকেছে।

সৌরেন লক্ষ্য করেছে, এ দুদিনই এলিজাবেথ খুশীতে ভরে আছে। তার মধ্যে এতখানি উচ্ছলতা সে আগে দেখে নি। এতদিন পর্যন্ত এলিজাবেথ পারতপক্ষে নিজের বাড়ির কথা বলত না, শুধুমাত্র তার কাকার সঙ্গে যে অন্যদের বনিবনা হয় না সেটুকুই জানিয়েছিল। কিন্তু এই শেষের দু'দিন তার মুখে আত্মীয় স্বজনদের কথা এত শুনেছে সৌরেন যে, মনে হচ্ছে তারা সকলেই যেন সৌরেনের পরিচিত।

মনে হচ্ছে, এলিজাবেথের বাবা প্রৌঢ় চার্লস হোপকে সে দেখেছে, সারাদিনের কাজের পর ড্রইং-রুমের ইজিচেয়ারে বসে থাকতে। মৌজ করে তিনি পাইপ টানছেন, চোখে নিকেলের চশমা লাগিয়ে পড়ছেন 'পাঞ্চ'-এর পুরনো সংখ্যা। পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে বাদামী রঙের বড় বড় লোমওয়ালা তাঁর আদরের কুকুর জেসপার। বাইরে খুটখাট সামান্য শব্দ হলেও সে কান খাড়া করে শুনছে।

এলিজাবেথের মা এখনও সুন্দরী, সাজ-পোশাকের শখ আছে পুরোমাত্রায়। বাড়ির কাজ ছাড়া অবসর কাটান ধর্মসম্বন্ধীয় বই পড়ে। মনে প্রাণে উনি খৃষ্টান। নিয়ম করে গির্জায় যান, গান করেন, পুরোহিতদের বাণী শোনেন। গল্প উপন্যাস পড়ার অভ্যাস ওঁর ছোটবেলা থেকে নেই। উনি পড়তে ভালোবাসেন যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের বিষয় 'মিরাকল' কাহিনী।

মতান্তর দুজনের মধ্যে যাই থাক না কেন, এঁরা সুখী দম্পতি। এঁদের দীর্ঘ-দিনের দাম্পত্য জীবন সুখ, শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধা স্বাদে ধন্য হয়েছে। তাই বোধ হয় এলিজাবেথ বাবা মা'র কথা বলতে এত গর্ব বোধ করে। এত আনন্দ পায়।

যাবার সময় এলিজাবেথ বলে গেল, সৌরেন, তোমার কথা আমি মাকে চিঠিতে লিখেছিলাম, এখন সামনাসামনি দেখা হলে সব কথা গুছিয়ে বলব।

সৌরেন দুষ্টুমি করে জিগ্যেস করেছে, কি বলবে?

—তা বলব না, শুনলে পরে তোমার মেজাজ গরম হয়ে উঠবে।

—সত্যি

—কেন তুমি বুঝতে পার না?

—কী জানি।

এলিজাবেথ স্পষ্ট করে বলে, তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে, লণ্ডন বাস আমার কাছে দুর্বিসহ মনে হত। শহরের এই দম বন্ধ করা জীবন মোটেই আমি পছন্দ করি না। You were so kind to me.

সৌরেন এলিজাবেথের হাতটা টেনে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলে, আর তুমি? সত্যি লিজি, এই ক'মাস মাত্র তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে কতদিনের যেন পরিচয়।

—আমারও ঠিক তাই মনে হয়, সৌরেন।

—তুমি এই ক'দিন লণ্ডনে থাকবে না। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না সন্ধ্যেগুলো কিভাবে কাটাব।

—কেন তোমার পুরনো বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে যাও।

—আর ভাল লাগে না।

এলিজাবেথ যেন এই কথাটুকু শোনবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। মৃদুস্বরে বলে, বেশ তোমার জন্যে আমি দু'দিন আগে ফিরে আসব।

সৌরেনের চোখ দুটো খুশীতে ঝলমল করে। কথা দিচ্ছ, লিজি।

এলিজাবেথ স্নিগ্ধ উত্তর দেয়, দিচ্ছি।,

এলিজাবেথকে স্টেশনে তুলে দিয়ে সৌরেন বাড়ি ফিরে আসে নি, গিয়েছিল মলিনা দাসের ফ্ল্যাটে। ক'দিন থেকে চেষ্টা করে টেলিফোনে ধরতে না পেরে মনটা কেমন যেন অস্থির হয়েছিল। ভেবেছিল, আজ দেখা না হলেও অন্তত একখানা চিঠি লিখে রেখে আসবে, নিজের ব্যবহারে সে যে অনুতপ্ত সে কথা জানিয়ে। কিন্তু মলিনা দাসের ফ্ল্যাটে পেঁৗছে সৌরেনকে হতাশ হতে হল।

পরিচারিকা জানাল, মিস দাস কন্টিনেন্টে বেড়াতে গেছেন।

সৌরেন বিস্মিত হয়, কবে?

—যে সন্ধ্যেবেলা আপনি এসেছিলেন, তার পরের দিন। কেন, আপনি জানেন না?

না, আমায় কিছু বলে নি।

সৌরেন চলে আসছিল, কি ভেবে প্রশ্ন করল, কবে ফিরবেন?

—বলে গেছেন দেড় সপ্তাহ বাদে।

—আশ্চর্য।

মলিনা দাস যে এভাবে না বলে কয়ে হঠাৎ কন্টিনেন্টে চলে যাবে তা সৌরেন ভাবতে পারে না। সে রাত্রেও তো মলিদি কোন আভাস দিল না। তবে কি হঠাৎ কোন কাজে চলে গেছে। কিন্তু এমনই বা কি কাজ থাকতে পারে মলিদির। মনে মনে সৌরেন স্বীকার না করে পারল না, সত্যিই আশ্চর্যময়ী এই মলিনা দাস।

বাড়িতে একলা ফিরে এসে চুপচাপ বসে থাকতে কেমন যেন বিরক্ত লাগল সৌরেনের। গত ক'মাসের মধ্যে একদিনও বোধ হয় সে এভাবে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা কাটায় নি। সরোজদার পিঠচুলকানো সমিতি উঠে যাবার পর তার বেশীর ভাগ সন্ধ্যা কেটেছে এলিজাবেথের সঙ্গে। হৈ হৈ হাসি গল্পের মধ্যে দিয়ে স্বপ্নের মত পাতলা দিনগুলো কেটে গেছে। সেইজন্যেই বোধ হয় আজ সৌরেনের এত বেশী করে মনে হচ্ছিল চলতে চলতে সময় যেন হঠাৎ থেমে গেছে। বড় ভারী বড় ক্লান্তিকর।

নীচে নেমে গিয়ে সৌরেন মীনাক্ষীকে ফোন করল।

ফোন ধরল মীনাক্ষী, সৌরেনের গলা শুনে বলল, কি ব্যাপার? অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি যে?

সৌরেন ছোট্ট উত্তর দিল, নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—এলিজাবেথের খবর কি? ভাল আছে?

—হ্যাঁ।

সৌরেন ইচ্ছে করেই বলল না এলিজাবেথ দেশে গেছে, প্রশ্ন করল, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আছ?

—কেন?

—তাহলে যেতাম।

মীনাক্ষী সহজ গলায় বলে, না, আমাকে পীয়েরের কাছে যেতে হবে, ওর শরীরটা ভাল নেই।

সৌরেন উদ্বেগ প্রকাশ করে, কি হয়েছে ওর?

—এমনি জ্বর।

—তুমি কি মনে কর আমার দেখা করা উচিত?

মীনাক্ষী স্পষ্ট উত্তর দিল না, সেরকম কিছু নয়।

দু'চারটে মামুলী কথা বলে টেলিফোন রেখে দিল সৌরেন। বুঝল, মীনাক্ষী চায় না তার সঙ্গে দেখা করতে।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সৌরেন উপরে না উঠে নীচে নেমে এল। অনেক সময় বিকেলের ডাকে যে চিঠিগুলো আসে করিডোরের টেবিলে তা সাজিয়ে রাখা হয়। খানকয়েক চিঠি পড়েও ছিল কিন্তু তার মধ্যে সৌরেনের কোন চিঠি নেই। পাশের বড় ঘর থেকে মেয়েলী কণ্ঠের হাসি শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয় 'রবিন্'দের গেস্ট এসেছে।

রান্নাঘরের দরজা খুলে মিসেস হেরিং বেরিয়ে এল, গুড্ ইভ্নিং মিঃ লাহিড়ী। এ সপ্তাহে দুধের দামটা বোধ হয় আপনি দিতে ভুলে গেছেন।

সৌরেন বলল, আমার ঠিক মনে ছিল না, কত হয়েছে বলুন তো।

—সাত শিলিং।

সৌরেন পকেট থেকে একটা দশ শিলিং নোট বার করে এগিয়ে দিল, চেঞ্জটা আপনার কাছে রাখবেন।

—ধন্যবাদ মিঃ লাহিড়ী।

বাইরের দরজায় কেউ বেল টিপল, মিসেস হেরিং দরজা খুলতে গেলেন। সৌরেন আর অপেক্ষা না করে উপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়. কানে ভেসে এল কেউ যেন তার নাম বলছে, মুখ ফিরে তাকাতেই মিসেস হেরিং সহাস্যে বলে, মিঃ লাহিড়ী, আপনার গেস্ট এসেছে।

সৌরেন বিস্মিত হল, এ সময় তো কারুর আসবার কথা নেই. কে হঠাৎ আসতে পারে।

ততক্ষণে রজত বোস করিডোরে ঢুকে পড়েছে।

সৌরেন খুশী হয়ে বলল, আরে রজত, তুই?

রজত মিটিমিটি হাসল, কিরকম তোকে অবাক করেছি বল?

—তা করেছিস, এই বোধ হয় প্রথম তুই আমার ঘরে এলি?

—তাও এলাম না বলে কয়ে। তবে একটু আগে ফোনে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম, তুই বাড়িতে আছিস কিনা।

—তাই নাকি?

দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে উপরে উঠে গেল। রজত জিজ্ঞেস করে, তোর সুন্দরী বান্ধবী তো এই বাড়িতেই থাকে, না?

হ্যাঁ, পাশের ঘরে।

রজত বাঁ চোখটা বড় করে তাকায়, মুখে তার অর্থপূর্ণ হাসি, দিব্যি আছিস। কই ডাক্ না।

—এলিজাবেথ লণ্ডনে নেই, আজই দেশে গেছে।

—তাই বুঝি বিরহে মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চল আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

রজত পাইপ ধরাল. 'মহাসাগরের নামহীন কূলে'—

সৌরেন বুঝতে পারে না, কি বলছিস?

—জীবন দেখবি চল।

সৌরেনের গলায় বিরক্তি ফুটে ওঠে, মিথ্যে হেঁয়ালী করছিস কেন. স্পষ্ট করে কথা বল না।

রজতের চোখে বিদ্রূপ চিক চিক করে, লণ্ডনে এতদিন এসেছিস দেখলি তো তার চাকচিক্য। যাকে অনন্ত যৌবনা উর্বশী বলে তোর মনে হচ্ছে, তাকে একবার ভাল করে কাছ থেকে দেখবি আয়, আর কিছু না হোক, মোহটা তোর কেটে যাবে।

—কি করে?

রজত জ্যোতিষীর মত গম্ভীর গলায় বলে, বুঝতে পারবি, যাকে তুই ষোড়শী ভাবছিলি সে বিগতযৌবনা।

সৌরেনের এসব কথা শুনতে যে খুব ভাল লাগছিল তা নয়, তবে একলা এ

বাড়িতে বসে থাকা তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। তাই রজতের প্রস্তাবে সে উৎসাহ দেখিয়ে বলে, চল আজ তোর সঙ্গেই বেরব।

রজত কিন্তু চেয়ার থেকে উঠল না, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, পকেটের অবস্থা কেমন?

সৌরেন ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বলে, আজ মাইনে পেয়েছি।

—পাউন্ড তিনেক সঙ্গে রাখিস, খরচা লাগবে।

—আছে। বলে সৌরেন আড়চোখে রজতের দিকে তাকায়।

রজত হাসল, আমি আজ একেবারে 'ব্রোক', পকেট গড়ের মাঠ। তাইতো তোর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি।

—আমি যদি তোর সঙ্গে না বেরতাম?

—অগত্যা ধার চাইতে হত।

সৌরেন তৈরী হয়ে নিয়ে রজতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বেশ অন্ধকার। রাস্তার আলো মনে হচ্ছে আরও বেশী হলে ভাল হত। প্রায়ই বড় বড় গাছের ছায়া পড়েছে। এ যেন আলো আর আঁধারের খেলা। দিনের আলোর মধ্যে যেসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, যেসব কল্পনাকে অবাস্তব বলে মনে হয় এমনি একটা পরিবেশে তারা যেন আরও দানা বাঁধে, মনে জাগিয়ে দেয় অজানাকে জানবার অতি উগ্র বাসনা। জমাট অন্ধকার হলে মনের এই দোলন থেমে যায়। সেখানে জেগে ওঠে সংশয়, যে প্রলোভন মাথা চাড়া দিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা করে তার পেছনে লুকিয়ে থাকে ভয়। তাইতো জমাট অন্ধকারকে মৃত্যুর মত কালো মনে হয়।

এই আলো ছায়ায় ঘেরা রাস্তায় তারা পাশাপাশি হাঁটছে। সৌরেন আর রজত। দুজনেই চুপচাপ। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু মন তাদের মৌন নয়, মুখর। সৌরেরনের জীবনের অনেকগুলো অন্ধকার জায়গা এই ক'মাসের মধ্যে আলোকিত হয়েছে। তাই অজানাকে জানবার আগ্রহ তার এত বেশী। কিন্তু রজতের মনে বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। আলো দেখলে সে হাসে, জানে তার নীচেই অন্ধকার সবচেয়ে বেশী।

সৌরেন মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, মারিয়া নেই বলে আজকাল বুঝি দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছিস?

রজতের সহজ উত্তর, পয়সা নেই তা আবার ওড়াব কি?

—কেন আজ মাইনে পাস নি?

—চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

সৌরেন বিস্মিত হয়, কবে?

—কিছুদিন হল।

—কেন?

—ভাল লাগে না। শুধু দুবেলা খাওয়ার জন্যে উদয়াস্ত চাকরি করা আমার কাছে যন্ত্রণা মনে হয়।

—না করেই বা উপায় কি!

রজত তার চলার গতি মন্থর করল, সম্পূর্ণ অচেনা কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে, মানুষ কেন চাকরি করে জানিস? কেন দিনরাত পয়সা বানাবার জন্যে খাটে? যাতে বুড়ো বয়েসটা তার সুখে কাটে, নির্ভাবনায়। তাই যৌবনটাকে সে উপেক্ষা করে, তার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে না। আমি ঠিক তার উল্টো দিক দিয়ে ভাবি সৌরেন,

যৌবনটাকে আমি উপভোগ করতে চাই। হৈ চৈ আনন্দের মধ্যে দিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই। কোনরকম বিধিনিষেধের মধ্যে আমি নিজেকে বেঁধে ফেলব না। আমি উন্দাম, আমি চঞ্চল। কথাগুলো শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও সৌরেনের ভাল লাগছিল। তবু জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু তারপর?

রজত হাসল, ভাবছিস বুড়ো বয়েসের কথা? হয়ত কষ্ট পাব, কিন্তু সে আর ক' বছর। তখন এই যৌবনের স্মৃতিই আমায় বাঁচিয়ে রাখবে। আবার কে বলতে পারে, বুড়ো হবার আগেও তো মরে যেতে পারি।

—আশ্চর্য তোর ফিলসফি।

—আমি কিন্তু মনে প্রাণে এই ফিলসফিতেই বিশ্বাস করি, ওটা শুধু আমার মত নয়, পথও।

আবার ওরা চলতে শুরু করে। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি জোরে চলে গেল বোধ হয় ট্যাক্সি। ট্যাক্সির গতি সৌরেনের মনে প্রশ্ন জাগাল, ওরা কি হেঁটেই যাবে? কিন্তু কতদূর তা তো রজত বলে নি, তাই জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি।

—মনে কর না নদীর ধারে কোথাও, টেম্‌সের কাছে।

—বাস ধরবে?

—না 'টিউব' নেব।

—ওখানে কারা থাকে?

রজত পাইপের ছাইটা ঠুকে ঠুকে ফেলে দিল, সেখানে আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই আমার ফিলসফিতে বিশ্বাস করে। ওমর খৈয়াম-এর মত বলে, 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে বেজায় ফাঁক।'

সৌরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রজত বুঝতে পারল ওদের আড্ডার কথা শুনে সৌরেন মনে মনে খুব আশ্বস্ত হতে পারছে না, তাই বুঝিয়ে দিয়ে বলে, ভয় নেই রে ওখানে তোর সঙ্গে দেখা হবে মাইকেলের, মাইকেল আর্টিস্ট, ছবি আঁকে। দেখা হবে লরা'র, খুব মিষ্টি দেখতে। পরিচয় হবে কানা জোনস্‌-এর সঙ্গে, ও বাজনা বাজায়। ওখানে আছে ফোটোগ্রাফার, আছে অভিনেতা অভিনেত্রী, আছে অনেকে, কিন্তু মজা কি জানিস তুই যখন প্রথম আমাদের আড্ডায় পা দিবি তখন থেকেই মনে হবে, এখানকার লোকগুলো তোর বহুদিনের পরিচিত।

সৌরেন ছোট্ট উত্তর দিল, হয়ত হবে।

রজত জোর দিয়ে বলে, হয়ত নয়, হবেই। কারণ—

রজত অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে,

> "মহাসাগরের নামহীন কূলে
> হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
> জগতের যত ভাঙ্গা জাহাজের ভীড়।
> মাল বয়ে বয়ে ঘাল হল যারা
> আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
> আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
> বুকের আগুনে ভাই,
> সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।"

রজত দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কবি বোধ হয় এদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু

আমার মনে হয়, এদের কোন দুঃখ নেই, এরাই সুখী। জীবনকে এরা উপলব্ধি করেছে।

সৌরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রজতের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল, কথা বলার সাহস পেল না।

চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের পর প্রায় দু' মাস কেটে গেছে।

মাত্র আট সপ্তাহের ব্যবধান অথচ এরই মধ্যে কত না পরিবর্তন ঘটেছে সরোজ রায়ের জীবনে। আজ তাকে দেখলে বোঝাই যায় না এ সেই সরোজ রায়, যে না থাকলে লণ্ডনে কোন রকম ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। ভাবা যায় না এরই ফ্ল্যাটে ক'দিন আগেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিহার্সাল আর আড্ডা চলত; তাদের হৈ চৈ এর মাত্রা বেড়ে গেলে উপর আর নীচের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা মেঝের উপর লাঠি ঠুকে সতর্কবাণী পাঠাত। 'সুইস কটেজের' এই সুপরিচিত হট্টগোলের ফ্ল্যাট হঠাৎ যেন গৃহস্থের বাসাবাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সেই সদাব্যস্ত আমুদে সরোজ রায় বদলে গেছে। বড় বেশী গম্ভীর, কেমন যেন মনমরা।

অন্যদের চোখে এ পরিবর্তন বিসদৃশ মনে হলেও সরোজ রায়ের নিজের তা মনে হয় নি। সে ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। তাদের যৌথ পরিবারের আনন্দোচ্ছল জীবনের উপর এমনি করেই একদিন পার্টিশানের কালো পর্দা নেমে এসেছিল, সেদিনও সরোজ এমনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, আর কলকাতায় থাকতে তার এতটুকু ভাল লাগত না। লণ্ডনে এসে এতগুলো ছেলেমেয়েকে নিয়ে যে দল সে গড়ে তুলেছিল তা যে এত তাড়াতাড়ি এমনিভাবে ভেঙ্গে যাবে সরোজ রায় ভাবতে পারে নি, কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন একটা লুকনো আশঙ্কা বরাবর ছিল। এ আশঙ্কা 'ভাঙ্গার' এ আশঙ্কা 'হারানোর', এ আশঙ্কা 'মিথ্যে হয়ে যাওয়ার।'

সরোজ রায় ছোটবেলা থেকে ছিল আদর্শবাদী। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব যে কারুণ্য অনেকের চোখে পড়ে না, সরোজ রায় তাকে খুঁজে বার করত, সশ্রদ্ধ চিত্তে তার কাছে মাথা নামাত। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতাকে কাটিয়ে সে চেয়েছিল মনুষ্যত্ব-লোকে উত্তীর্ণ হতে যেখানে সে বিচক্ষণতার নিষেধ না মেনে হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবে।

কিন্তু তার এই আদর্শবাদ হোঁচট খেল পারিবারিক দ্বন্দ্বের পাথরে। মনে সে কষ্ট পেয়েছে, পৈত্রিক বাড়িতে থাকতে না পেরে সে পালিয়ে এসেছে, তবু সে বিশ্বাস হারায় নি। লণ্ডনের সরোজ রায়কে আদর্শবাদী বলে চিনতে না পারলেও সে যে আশাবাদী একথা অতি বড় নিন্দুকেও অস্বীকার করতে পারে নি। সেইজন্যেই বোধ হয় তাকে এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে দেখে অন্যেরা এতখানি আশ্চর্য হয়েছে।

সরোজ রায় নিজেও বোধ হয় কম আশ্চর্য হয় নি, একটা অতি সামান্য কারণ থেকে যে এত বড় ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে তা সে ধারণাও করতে পারে নি।

আশাবাদী সরোজ রায় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। বিশেষ করে আরও এই জন্যে, যাদের সে ভাল বেসেছিল, স্নেহ ও প্রীতির চোখে দেখেছিল, সেই লীলা আর প্রমীলা দুই বোনের মধ্যে যে মন কষাকষির কুয়াশা জমে ঘন হয়ে উঠল তাকে কেন্দ্র করে, সে অভিজ্ঞতা সরোজের কাছে যেমনি অপ্রীতি-কর তেমনি পীড়াপায়ক।

দিনের পর দিন কাজকর্মের শেষে রাত্রে ফ্ল্যাটে বসে তার নিজেকে মনে হয়েছে

বড় রিক্ত, বড় অসহায়। অবুঝের মত তার চোখে জল এসেছে, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ করলে সরোজ রায় দেখতে পেত এ চোখের জলের সবটুকুই তার নিজের জন্যে নয়, তার অনেকখানিই বোধ হয় লীলা আর প্রমীলার জন্যে। এই প্রবাসী মেয়ে দুটিকে সত্যিই সে বোনের মত স্নেহ করত। সেই স্নেহের কোন রূপান্তর ঘটেছিল কিনা হয়ত বলা শক্ত, কিন্তু একথা সত্যি প্রমীলার চরিত্রের নির্ভীকতা, তার ঋজু বলিষ্ঠ মতামত সরোজকে অভিভূত করেছিল।

প্রমীলা সম্বন্ধে সরোজ যে আশঙ্কা করেছিল তা যে নির্ভুল প্রমাণ হল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। জোর করে সে যেন নিজেকে পৃথক করে ফেলল, পরিচিত জনের কাছ থেকে। স্থির করল 'কার্ডিফে' পড়তে যাবে সোশ্যাল সায়েন্স, মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতি, তারপরই তার যাওয়ার দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে ক'লকাতা থেকে অনুমতি আনিয়েছে, হাই কমিশনার অফিসে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেছে, ভর্তি হয়েছে 'কার্ডিফে'র কলেজে।

তারপর এল বিদায় নেবার পালা।

সেদিন শনিবার। সরোজ রায় একলা ড্রইং রুমে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল। আজ ছুটি, তবু ঘণ্টাখানেক বাদে বেরতে হবে, এক বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

দরজায় বেল বাজতে সরোজ রায় উঠে গিয়ে খুলে দিল, কিন্তু সামনে প্রমীলাকে দেখে তার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, একি, প্রমীলা, তুমি?

প্রমীলার মুখে ক্লান্ত হাসি, দেখা করতে এলাম সরোজদা।

—ঘরে এস।

—চলুন।

প্রমীলা স্বচ্ছন্দ গতিতে ড্রইং রুমে এসে সোফার ওপর বসল। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, চারদিকটা তাকিয়ে বলল, আমাদের মত ভূতের উপদ্রব কমে যাওয়ায় ঘরদোর বেশ পরিষ্কার রেখেছেন দেখছি। সত্যি, কি হুটোপাটিই আমরা করতাম। এতদিনে বোধ হয় শান্তি পেয়েছেন।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না। সরোজ প্রমীলাকেই লক্ষ্য করে। মাঝখানে, কিছু-দিন প্রমীলাকে তার বয়েসের চেয়ে অনেক বড় মনে হচ্ছিল, চাল চলন কথাবার্তা সবের মধ্যে কিসের যেন গাম্ভীর্য। কিন্তু আজ সে এসেছে আগের সেই ছোট্ট মেয়েটির মত যাকে দেখে সরোজ ঠাট্টা করে বলত, খুকী তুমি একলা একলা এলে কি করে এত দূর দেশে।

প্রমীলা হেসে বলত, আমাকে খুকী বললে কি হবে, আপনি নিজেই যে বুড়ো খোকা।

কিন্তু সরোজ আজ কিছুতেই প্রমীলার মত সহজ হতে পারল না, আড়ষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবে প্রমীলা?

প্রমীলা খিল খিল করে হাসল, কেন, তাহলে বুঝি আমার জন্যে রান্না করতে উঠবেন, আপনার যেমন বুদ্ধি। ওই জন্যেই তো বুড়ো খোকা বলি।

গায়ের কোটটা খুলে এক কোণায় রাখা ডিভানের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রমীলা চঞ্চল ছন্দে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি কিন্তু ধরেছেন ঠিক, সত্যি আমার খিদে পেয়েছে। দেখি আবার রান্নাঘরে কিছু আছে কিনা।

—কয়েকটা ডিম আর খানিকটা হ্যাম পেতে পার।

—তাহলেই হবে, আশা করি মাখন রুটি বাড়ন্ত নয়।

প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে অজান্তে সরোজের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যে বন্ধুর কাছে যাবার কথা ছিল টেলিফোন করে জানিয়ে দিল আজ সে যেতে পারবে না। কিছুক্ষণ বাদে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে প্রমীলা মহা উৎসাহে ডিম ফাটিয়ে তার মধ্যে হ্যামের টুকুরো দিয়ে অমলেট তৈরী করছে। সরোজ ঠাট্টা করে বলল, রান্নাবাড়ায় এত উৎসাহ তো আগে দেখি নি।

প্রমীলা কাজ করতে করতে উত্তর দিল, এখন থেকে একলা থাকতে হবে, লীলার ওপর ভরসা করলে তো চলবে না। এমন কি আপনার ওপরও না। অগত্যা হাত পুড়িয়ে রান্না শিখছি।

—কালকেই যাওয়া।

—হ্যাঁ, সকালের গাড়িতে।

সরোজ রায় সিগারেট ধরাল, যদিও কার্ডিফে আমি যাই নি, তবে শুনেছি জায়গাটা ভাল।

—ভাল হোক মন্দ হোক তাতে কিছু আসে যায় না, লণ্ডন নয়, ওটা অন্য জায়গা। তাইতেই আমি খুশী।

—সত্যিই তুমি খুশী প্রমীলা ?

প্রমীলা মুখ ফিরে তাকাল, সহজ গলায় বলে, হঠাৎ মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন ?

—নিজেকে তোমার একলা মনে হবে না।

—আমি তো বরাবরই একলা।

শেষের কথাটা বিষন্ন শোনাল প্রমীলার গলায়। সরোজ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, দেখে পেছন ফিরে প্রমীলা ডিম ভাজছে। ওর সাদা ব্লাউজের উপর মোটা কালো বিনুনিটা স্পর্শ করে বলে, মেয়ের তো বেশ চুল হয়েছে দেখছি।

প্রমীলা দুষ্টুমি করে উত্তর দেয়, দোহাই আর নজর দেবেন না, একেই তো আধ-খানা হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত না টিকটিকির ল্যাজ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রমীলা সরোজের ফ্ল্যাটে ছিল, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে নি, বুঝতে দেয় নি সরোজকে এই কার্ডিফে যাওয়া নিয়ে তার মনে কোনরকম দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু প্রমীলা ধরা পড়ে গেল একেবারে বিদায় নেবার সময়। যা সে কোনদিনই করে নি, হঠাৎ তাই করে বসল, বিনা ভূমিকায় সরোজের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল প্রমীলা।

প্রথমটা সরোজ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রমীলাকে আস্তে আস্তে উঠিয়ে নিয়ে বলে, এ আবার কি ছেলেমানুষি।

প্রমীলা কথা বলল ধরা গলায়, কেন, প্রণাম করতে নেই বুঝি।

—তা নয়, তুমি তো কখনও কর না।

—বিদায় নেবার সময় তো আগে কখনও আসে নি।

সরোজ দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, প্রণাম যখন করলে আমিও তোমাকে আশীর্বাদ করি, যে পথে যাচ্ছ, তাতে পূর্ণতা লাভ কর, নিজেকে বিকশিত করার যেন সুযোগ পাও।

প্রমীলা হাসবার চেষ্টা করে পারল না, চোখ তার ছলছল করছে, মৃদুস্বরে বলল, এখন তাহলে আমি যাই।

—এস।

প্রমীলা আর সরোজের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গেল, কিন্তু রাস্তায় নেমে একবার সুইস কটেজের এই অতি পরিচিত ফ্ল্যাটটার দিকে ফিরে না দেখে পারল না। মনে হল দোতলায় জানলার কাছে সরোজদা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই দিকে দেখছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্রমীলার। কিন্তু মনে মনে সে খুশী হল এই ভেবে যে নিজের দুর্বলতাকে সে কিছুতেই প্রকাশ হতে দেয় নি সরোজদার সামনে। এত সহজে যে বিদায়ের পালা মিটে যাবে সে সত্যিই ভাবতে পারে নি।

মানুষ যা ভাবে বাস্তবে বেশীর ভাগ সময় তার উল্টোটাই হয়। এ যে কতখানি সত্য তা আরও বেশী করে প্রমাণ হল সেই রাত্রে লীলার সংগে কথা বলবার সময়। এ কদিন ধরে প্রমীলার সব কিছু গোছগাছ করেছে লীলা নিজে, যা কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে এনেছে বাজার থেকে। বার বার করে সকলের কাছে বলেছে প্রমীলা যে তার পথ খুঁজে পেয়েছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে সে কথা জেনে তার কত আনন্দ। সেইজন্যে প্রমীলা ভেবেছিল লীলার চোখকে সে ঠিকই ফাঁকি দিতে পেরেছে, কেন যে সে এখান থেকে সরে যেতে চাইছে লীলা বুঝতে পারে নি।

কিন্তু আশ্চর্য সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে প্রমীলা দেখল ঘর অন্ধকার করে লীলা খাটের উপর মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। প্রথমটা প্রমীলা চমকে উঠেছিল।

আলো জেবলে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোর শরীর খারাপ নাকি রে ?

লীলা কোন উত্তর দিল না।

প্রমীলা তার মাথার উপর হাত রাখল, কি হয়েছে, বল, এরকম করে শুয়ে আছিস কেন ?

ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠল লীলা, ভাল লাগছে না।

—কেন ?

লীলা মাথা নাড়ে, আমি একলা থাকতে পারব না।

প্রমীলা হাসবার চেষ্টা করে, কি বাজে বকছিস।

লীলা এবার পাশ ফেরে, প্রমীলার হাতটা টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলে, আর কেউ না বুঝুক তুই তো জানিস প্রমী তোকে ছাড়া আমার একটা দিনও চলে না। তুইতো শুধু আমার ছোট বোন নোস, আমার বন্ধুও আমার—

প্রমীলা থামিয়ে দেয়, এখন কেন মন খারাপ করছিস। কালকে যাওয়া।

লীলা অবুঝের মত বলে, না তুই যাস না।

প্রমীলা এবার সত্যিই হাসে, তুই বোকার মত কাঁদছিস কেন। লণ্ডনে তো সবাই রইল, সরোজদা, মীনাক্ষীদি, অমিতাভ। আমিই বরং একলা পড়ে যাব কার্ডিফে। তাছাড়া বেশী দূরেও তো নয়, মাত্র চার ঘণ্টার রাস্তা। দরকার হলে তুই যাবি আমার কাছে। আর আমিও তো ছুটি থাকলেই চলে আসব।

লীলার কান্না কিন্তু থামল না। প্রমীলা তাকে আরও কত রকম করে বোঝাল, তবু তাকে শান্ত করতে পারল না।

লীলা সেই একই স্বরে বলল, আমার বড় ভয় করছে।

—কিসের ভয় ?

—জানি না।

কথাগুলো বড় করুণ শোনাল। লীলাকে মনে হল বড় অসহায়।

'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের পর থেকে এতগুলো দিন লীলারও খুব ভালভাবে কাটে নি। অনুভব করার শক্তি তার প্রমীলার মত সূক্ষ্ম না হলেও সে বুঝতে পারছিল প্রমীলা ইচ্ছে করে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। যদিও মুখে সে একথা কোনদিন বলে নি, একটি দিনের জন্যেও হাহুতাশ করে নি, তবু তার অন্তরের গোপন বেদনার স্থানটুকু সে যেন দেখতে পেয়েছিল অথচ তা চেষ্টা করেও দূর করতে পারে নি। কিন্তু এর কারণ কি।

একথা সত্যি 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের রাত্রে লীলা মনে কষ্ট পেয়েছিল, হয়তো অশিষ্ট ব্যবহারও করেছিল, কিন্তু সে সবই যে নিজের অক্ষমতার জন্যে। মাথা ঠাণ্ডা হবার পর সে কি এর জন্য অনুতপ্ত হয় নি? অনুশোচনার আত্মগ্লানিতে সে কি অস্থির হয়ে উঠে নি?

অথচ আশ্চর্য, কেউ তাকে বুঝতে পারল না, না প্রমীলা না সরোজদা। প্রমীলা সেইদিন থেকে প্ল্যান করতে শুরু করল লণ্ডনের বাইরে চলে যাবার। শেষ পর্যন্ত গেলও তাই। আর সরোজদা একেবারে যেন বদলে গেছে, সব সময় ব্যস্ত আর কেমন যেন অন্যমনস্ক।

যে তাকে বুঝতে পারল সে বোধ হয় অমিতাভ, প্রতিটি সন্ধ্যায় সে নিয়ম করে আসত লীলার সঙ্গে দেখা করতে। কাছটিতে বসে দরদভরা স্বরে বলত, দিদি কেন তুমি এরকম চুপচাপ বাড়ির ভেতর বসে থাক। কেন বেড়াতে বার হও না।

—ভালো লাগে না।

—কেন?

—একলা একলা আর কোথায় ঘুরে বেড়াব?

এ ধরনের কথা শুনলে অমিতাভ কষ্ট পেত, বলত, আজকাল তোমাদের কী হয়েছে বলত, যে যার নিজেরটুকু নিয়ে থাক, কেউ কারুর সঙ্গে মেশ না।

লীলা কোন উত্তর দেয় না।

—প্রমীলাদিও তো কত গম্ভীর হয়ে গেছে। আমি কিছু বুঝতে পারি না।

—ওকেই বরং জিগ্যেস করিস।

অমিতাভ মাথা নাড়ে। তাতে কোন লাভ হবে না। প্রমীলাদি আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না।

—কেন?

লীলার পায়ের উপর হাত বোলাতে বোলাতে অমিতাভ বলে, প্রমীলাদি তো তোমার মত আমায় ভালবাসে না।

—একথা কেন বলছিস।

অমিতাভ ম্লান হাসে, আমি জানি। আমি যে বুঝতে পারি। শুধু তো এখানেই নয়। কলকাতাতেও যে দেখেছি, সকলেই আমায় এড়িয়ে যায়। ক'জন আর তোমার মত আমায় কাছে টেনে নেয়, বল? সেইজন্যেই তো ঘুরে ফিরে তোমার কাছে আসি। আসি, আসতে ভালো লাগে বলে।

কথা মিথ্যে নয়। অমিতাভ যদি সত্যি এভাবে দিনের পর দিন লীলার কাছে না আসত, তার মন ভোলানোর জন্যে, নানারকম গল্প না করত তাহলে বোধ হয় লীলার পক্ষে লণ্ডন বাস ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠত। লীলার ফরমাশ মত অমিতাভ তার জন্যে বাজার করে এনেছে, এ'টো বাসনপত্র পরিষ্কার করে দিয়েছে, প্রয়োজন মত রান্না করেছে। শুধু তাই নয় ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে লীলার দেখা না পেয়ে হয়ত ফিরে

এসেছে, কিন্তু তার জন্যে পরে এতটুকু রাগারাগি করে নি।

প্রমীলা কার্ডিফে চলে যাবার পর অমিতাভকে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে লীলার উপর। তাই প্রত্যেকদিন টেলিফোন করে সে লীলার খবর নিত, সকালে বাড়িতে, কিংবা দুপুরে তার আফিসে। কতদিন দুপুরবেলা লীলা তাকে ডেকেছে অফিসের ক্যানটিনে লাঞ্চ খাবার জন্যে, কলেজের হাজারও পড়া থাকলেও সে তা অগ্রাহ্য করে ছুটে গেছে লীলাদের অফিসে। তারপর হয়ত আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে নি, কোন সিনেমায় ঢুকে ঘণ্টা তিনেক সময় কাটিয়ে আবার গিয়ে দেখা করেছে লীলার সঙ্গে অফিস ভাঙ্গার পর। এক সঙ্গে ফিরে গেছে লীলাদের বাড়ি, সেখানেই মুখ হাত পা ধোয়া, চা কফি এমন কি রাত্রের খাওয়া পর্যন্ত। বলতে গেলে এই এখন অমিতাভর দৈনন্দিন কর্মসূচী।

প্রথম যেবার প্রমীলা 'উইক এন্ডে'র ছুটিতে 'কার্ডিফ' থেকে লণ্ডনে বেড়াতে এল সেদিন তার সঙ্গে স্টেশনে দেখা করতে শুধু লীলা আর অমিতাভই যায় নি, সরোজ রায়ও গিয়েছিল। প্রমীলা ট্রেন থেকে নেমে ওদের তিনজনকে এক সঙ্গে দেখে খুশী হল, জড়িয়ে ধরল লীলাকে, চোখে তার জল। অনেকদিন পরে দুই বোনে বোধ হয় এমনি আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করতে পারল। এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিমান যা তারা মুখে ব্যক্ত করতে পারে নি, চিঠিতেও লেখে নি, এই আনন্দাশ্রুর মধ্যে দিয়ে তা যেন গলে নেমে গেল। এ দৃশ্য দেখে আনন্দ পেল সরোজ, মুগ্ধ হল অমিতাভ।

তারপর দুটো দিন যেন স্বপ্নের মত কোথা দিয়ে কেটে গেল। হৈ চৈ আনন্দের মধ্যে দিয়ে তারা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল সেই অতি মধুর ফেলে আসা দিনগুলো। চারজন মিলে স্টেশন থেকে সোজা খেতে গেল রেস্তোরাঁয়। যত না খাওয়া হল গল্প হল তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশীর ভাগই পুরনো দিনের কথা।

প্রমীলা বলল লণ্ডনের বাইরে না গেলে লণ্ডনকে বোঝা যায় না।

সরোজ ঠাট্টা করে, এই রে, মেয়ে যে জ্ঞানের কথা বলছে। লীলা তোমার বোনকে সামলাও।

—সত্যি বলছি সরোজদা, কার্ডিফে যাবার আগে আমি ভাবতেও পারি নি লণ্ডনকে আমি এতখানি ভালবেসে ফেলেছি। ওখানে সন্ধ্যে হলেই আমার মন পড়ে পিকা-ডেলী'র আলোগুলোর কথা। খাবার সময় বীফ স্টেক খেতে গিয়ে মনে পড়ে এখান-কার দিশী রেস্তোরাঁগুলোর রান্না। আর সেই সঙ্গে আমাদের পিঠ চুলকানো সমিতির কথা।

—বেশ তো, ফলাও করে লেখ না। সম্পাদকের নামে পাঠিয়ে দাও ডেলী এক্সপ্রেসে, ভারতীয়দের চোখে লণ্ডন এই হেডিং দিয়ে ওরা তোমার চিঠি ছাপিয়ে দেবে বলা যায় না এক গিনি পারিশ্রমিকও পেতে পার।

লীলা থামিয়ে দিয়ে বলে, যাই বলুন সরোজদা, আমারও লণ্ডন খুব ভাল লাগে। কিছুদিন থাকার পর আর বিদেশ বলে মনে হয় না।

সরোজ রায় জোর দিয়ে হাসে। তাইত তোমাদের দুই বোনকে আমি মেমসাহেব বলি।

প্রতিবাদ করল অমিতাভ, আমারও তো লণ্ডন ভাল লাগে, কিন্তু আমিতো আর সাহেব নই।

—কেন ভাল লাগে কারণ দাও।

—আমার মনে হয় লণ্ডনের সঙ্গে কলকাতার অনেক মিল আছে, কলকাতার চৌরঙ্গী, রেড রোড, গভর্নমেণ্ট হাউস-এর মত অনেক রাস্তা, অনেক জায়গা ছড়ানো আছে লণ্ডনে। তাই বোধ হয় লণ্ডনে থাকলে কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়। ভাল লাগে থাকতে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা গেল সুইস্ কটেজে সরোজের ফ্ল্যাটে। আবার সরোজ রায়ের ফ্ল্যাট আগের মত হাসতে লাগল। সারাটা দিন তারা ওইখানে কাটাল। গান করল সরোজ, করল প্রমীলা, আবার চারজনে একজঙ্গেও। সব গান যে একসঙ্গে গাওয়া হল তাও নয়, এক গান থেকে আর এক গানে চলে গেল। তাদের খেয়াল খুশির উচ্ছ্বাসে মূর্ত হয়ে উঠল কয়েকটা ঘণ্টা। ওদের চারজনেরই মনে আশঙ্কা ছিল এত-দিন পরে তারা যে এই মিলতে যাচ্ছে, এই মিলনী সার্থক হবে কিনা, সকলে সহজ হয়ে তাতে যোগ দিতে পারবে কিনা। এত সহজে এই মিলে যাওয়া সম্ভব হল দেখে তারা শুধু খুশীই হয় নি বুকের ওপর পাথরের মত যে চাপ জমা হয়েছিল তা সরে গেল। রাত্রেও তারা খেল বাইরে, ফিরে গেল লীলাদের বাড়ি। সেখানেও আড্ডা চলল অনেক রাত পর্যন্ত। সরোজ আর অমিতাভ যখন বাড়ি ফিরেছে ভোর হতে আর বোধ হয় বেশী দেরী ছিল না। অফুরন্ত গল্প করেছে তারা, কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বোধ করে নি।

পরের দিনই সকাল বেলা আবার তারা জড় হল সরোজের ফ্ল্যাটে। চারজনে মিলে বেরিয়ে গেল রিজেণ্ট পার্কে বেড়াতে। সেখানে নৌকা চড়ে ঘুরল, মাঠের উপর পা ছড়িয়ে বসে গল্প করল, খেতে গেল দামী রেস্তরাঁয়। আজ রাত্রেই প্রমীলাকে কার্ডিফের ট্রেন ধরতে হবে, কাল সকাল থেকে আবার তার ক্লাস। সেকথা মনে পড়লেই সকলের মন খারাপ হয়ে যায়। লীলা বলে, প্রত্যেক 'উইক্ এণ্ডে' তোকে আসতে হবে, তা না হলে আমাদের ভাল লাগবে না।

প্রমীলা ম্লান হাসে, ইচ্ছে থাকলেও কি আর প্রত্যেক সপ্তাহে আসা যায়? পড়া আছে, নতুন কোর্স, নতুন বন্ধু-বান্ধব, তাদের সঙ্গেও তো আলাপ করতে হবে, তাছাড়া কত খরচ—

—খরচের কথা তোকে ভাবতে হবে না।

প্রমীলা হাসে, তা আমি জানি, দুপুর বেলা লাঞ্চ না খেয়ে তুমি আমার ট্রেন 'ফেয়ার' জমাবে, এইতো? আগে রোজগার করতাম, এখন তো আর রোজগার করছি না, ছেলেমানুষি করলে চলবে কেন?

এ দুদিন আনন্দের মধ্যে কাটলেও সরোজের ইচ্ছে ছিল অন্তত কিছুক্ষণের জন্য প্রমীলার সঙ্গে একান্তে কথা বলার। জানতে চাইছিল 'কার্ডিফে' গিয়ে সত্যিই প্রমীলা খুশী হয়েছে কিনা। কথা বলার সুযোগ তারা পেল রবিবার দুপুর বেলা। খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরে লীলা গেল স্নান করতে। আর অমিতাভ ছুটল বাড়ি, সেখানে বুঝি কেক কিনে রেখে আনতে ভুলে গেছে, আজ রবিবার, দোকান পাট সব বন্ধ। কেক না নিয়ে এলে চা খাওয়াটা ঠিক জমবে না।

প্রমীলা লীলার নামে লেখা মার চিঠিগুলো খাটের উপর শুয়ে শুয়ে পড়ছিল, কলকাতার বাড়ির কথা ভেবে, বাচ্চাদের দুষ্টুমীর কথা জেনে খিল খিল করে হাসছিল। সরোজ পাশের ঘরের সোফা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি মেয়ে, অত হাসি কেন?

প্রমীলা হাসতে হাসতে এ ঘরে উঠে এল, বুকের উপর আঁচলটা সামলে নিয়ে

বলল, মা বেশ চিঠি লেখে, একখানা চিঠিতে রাজ্যের খবর। কুকুরের বাচ্চা হয়েছে থেকে শুরু করে আমাদের বুড়ো দরোয়ানের নাতনীর বিয়ে পর্যন্ত কোন খবর বাদ নেই।

সরোজ হাতের বইটার দিকে চোখ রেখে বলে, সে খবর না হয় পেলাম, এখন মেয়ে তোমার নিজের কথা বল দেখি।

—আমার আবার কি কথা?

—পড়াশুনোয় মন বসছে?

প্রমীলা দুষ্টুমী করে উত্তর দিল, মন বুঝি আপনার মত সুবোধ ছেলে যে বসতে বললেই বসবে। একটু জোর জবরদস্তি করে বসাতে হবে আর কি।

সরোজ বুঝল প্রমীলা কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে, বলল, হুঁ।

প্রমীলার চোখ দুটো হাসিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে, কি ভাবছেন?

—না, ভাববার তো কিছু রাখি নি।

কিছুক্ষণের জন্য দুজনেই চুপচাপ, কেউ কথা বলে না। অজান্তে প্রমীলার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অন্য দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে, আমার জন্যে অত কিছু ভাববার নেই সরোজদা, পথ আমি একটা পেয়েছি, কতদূর এগোতে পারব জানি না। কিন্তু মনে প্রাণে বুঝেছি এটা একটা পথ। আপনার সঙ্গে আলাপ না হলে এ পথের সন্ধান হয়ত আমি পেতাম না।

প্রমীলার কণ্ঠস্বর সরোজের হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়ে দিল, সেই জন্যেই তো আমার এত ভয়, যদি অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ তোমার মনে হয় তুমি ঠিক পথে আস নি, তখন কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে প্রমীলা?

—যদি এ ধরনের ট্র্যাজেডীই ঘটে আমার জীবনে, বিশ্বাস করুন আপনাকে তার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করব না, বুঝব ওইটেই আমার ভাগ্য।

তবু সরোজের মন মানে না, বলে এখনও কি একবার যাচিয়ে দেখে নেওয়া যায় না, পথটা ঠিক না ভুল?

প্রমীলা সহজ উত্তর দেয়, তার সময় এখনও হয় নি সরোজদা।

সরোজ প্রমীলার হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখে গাঢ় স্বরে বলে, আমার একটা অনুরোধ, যদি কখনও মনে হয় পথ বদলানোর প্রয়োজন, কোন রকম দ্বিধা কর না, লোকে হাসবে বলে ভয় পেয়ো না, নিজের স্বধর্ম অনুযায়ী নির্ভয়ে পথ বদলে নিয়ো।

প্রমীলা চোখ বুজে কথাগুলো শুনছিল, দুকোণ বেয়ে তার জল নেমে আসে, আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে সরোজদা। যখনই ভাবি আমি কি ছিলাম, আর এখন কি হয়েছি, তখনই তো আপনার কথা মনে পড়ে। কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে যখন ফিরিঙ্গিআনার নকল করে ঘুরে বেড়াতাম, ভাবতাম সেইটেই বুঝি জীবন, এখানে এসে, আপনার সঙ্গে মিশে বুঝলাম ওটা জীবন নয়। জীবনের নকল।

প্রমীলা থামে। সরোজ তার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি যখন এভাবে কথা বল প্রমীলা মনে হয় তুমি কত দূরের মানুষ।

সরোজের কথা প্রমীলার কানে যায় না, সে আগের সুরেই বলে যায়, আপনার হাত ধরে যে নতুন জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তাকে আমার বড় ভাল লেগেছে, একে আমি হারাতে চাই না। আবার যদি লীলার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাই সেই ময়ূরের পালক লাগিয়ে দাঁড়-কাকদের সঙ্গে মিশতে হবে, তা আর আমি পারব না। তাই তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছি যাতে ভবিষ্যতে নিজের মত করে

বেঁচে থাকতে পারি।

বাথরুম থেকে লীলা চেঁচিয়ে প্রমীলাকে ডাকল। এদের কথায় ছন্দ গেল কেটে, প্রমীলা চোখের জল মুছতে মুছতে সাড়া দিল, যাই।

সরোজ তখনও প্রমীলার বাঁ হাতটা ছাড়ে নি, নিজের কপালের উপর তার হাতটা রেখে বলল, আমি তোমাকে বুঝতে পারি প্রমীলা।

প্রমীলা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, তা আমি জানি।

—যদি কখনও তোমার কোন প্রয়োজনে আসি আমাকে জানাতে সঙ্কোচ বোধ কর না।

—জানাব। একটু থেমে বলে, যাই, লীলা ডাকছে।

এরপর আর তাদের বিশেষ কোন কথা হয় নি। লীলা বেরিয়ে এল স্নান সেরে, অমিতাভ ফিরে এল কেক নিয়ে। শুরু হল চা পর্ব। আবার পাঁচ রকম গল্প গুজবে সময় কাটিয়ে পথে রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে প্রমীলাকে সবাই মিলে তুলে দিয়ে এল 'কার্ডিফে'র ট্রেনে। হাসিমুখে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল প্রমীলা। ট্রেন ছাড়লে রুমাল নাড়ল। প্ল্যাটফরমে ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে, লীলা কাঁদছে, অমিতাভর চোখ দুটোও ছলছলে, শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সরোজ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রমীলার দিকে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার মনে হল, ট্রেন চলছে, সামনে তার রেল দিয়ে বাঁধা পথ, সোজা রাস্তা। পথ হারাবার ভয় নেই। প্রমীলাকে সে নিজে ওই জীবনের ট্রেনে বসিয়ে দিয়েছে, নির্ভাবনায় হাসিমুখে সে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরোজ নিজে কি পথ খুঁজে পেয়েছে। হঠাৎ ভেতরের দিকে তাকালে তার কি মনে হয় না সেখানে আলো আর আঁধারের খেলা, জানা আর অজানার দ্বন্দ্ব। যত দিন না মনের অন্ধকার ঘুচবে, ততদিন কি সে বুঝতে পারবে নিজেকে? তবে সে কোন ভরসায় প্রমীলাকে বলছিল ভুল বুঝলে সে পথে না যেতে। কে জোর করে বলতে পারে এইটে ভুল, এইটে ঠিক। নিজেকেই না বুঝে অন্যকে বোঝবার ভান করি আমরা কেন? কেন অকপটে স্বীকার করি না, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

সরোজদা চলুন, বাড়ি যাবেন না!

লীলার কথায় সরোজের চমক ভাঙেগ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, চল।

চিঠিটা এসেছিল সকালের ডাকে। মীনাক্ষী অবশ্য পড়ল রাত্রে বাড়ি ফেরার পর। এ সেই বহু আকাঙ্খিত দাদুর চিঠি। যে চিঠি পাবার আশায়, মীনাক্ষী দিন নেই রাত নেই ছটফট করেছে, পাছে দাদু তাকে ভুল বোঝেন, চিঠিতে মত না দেন এই আশঙ্কায় মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েছে, এমন কি এক সময় ভেবেছে, হঠাৎ এভাবে আবেগের বশে দাদুকে 'পীয়েরে'র কথা জানিয়ে চিঠি লেখা তার উচিত হয় নি।

শুধু তো মীনাক্ষী নয়, পীয়েরের মনেও এই চিঠির জন্যে কম দুর্ভাবনা ছিল না। সে শুকনো মুখে প্রায়ই মীনাক্ষীকে জিজ্ঞেস করত, তোমার দাদু যদি অবুঝ হন, এ বিয়েতে মত না দেন, তাহলে আমাদের কি হবে।

মীনাক্ষী কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারত না, বলত, দেখ না উনি কি লেখেন।

—আমি জানি তাঁর অমতে তুমি কোন কাজ করবে না।

একথায় মীনাক্ষী নীরব হয়ে যেত। দাদুর অমতে যে কোন কাজ করা সম্ভব তা সে আগে কখনও চিন্তাই করে নি, অবশ্য, চিন্তা করার কোন প্রয়োজনও হয় নি তাই

হঠাৎ আজ সে পীয়েরকে কি উত্তর দেবে?

পীয়ের চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টেনে উপরের দিকে ধোঁয়ার রীং ছেড়ে বলল, আমার কথা অবশ্য আলাদা, জানি এ ধরনের বিয়েতে আমার বাবা মা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু সেজন্যে আমি পরোয়াও করি না। তোমাকে ভালবেসেছি, বিয়ে করব, তাতে বাবা মা সম্মতি দিলে আমি খুশী হব, না দিলে আমি নিরুপায়। মীনাক্ষী মৃদুস্বরে জানাল, তোমার মত বলতে পারলে আমি খুশী হতাম পীয়ের কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মেয়ে, জান না সেখানকার মাটি কত নরম। এরপর থেকে ওরা প্রত্যেকদিন চিঠির আশায় বসে থাকত। দিনে তিনবার মীনাক্ষী পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করত তার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা। পত্র পাঠ যদি দাদু উত্তর দিতেন তাহলে অন্তত দিন চারেক আগে পাবার কথা। তাই বোধ হয় চিঠির জন্যে ওরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আজ শনিবার। সারাদিন ওরা বাইরে কাটিয়েছে। এই একটু আগে মীনাক্ষীকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে পীয়ের ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে গেল তার ফ্ল্যাটে।

মীনাক্ষী ক্লান্ত শরীরে উপরে এসেই দেখল টেবিলের উপর তার নামে আসা খামের চিঠি। বেশ পুরু, ভারতের স্ট্যাম্প, পেছনে দাদুর নাম লেখা। উত্তেজনায় মীনাক্ষীর বুক কেঁপে উঠল। যে চিঠির জন্যে এতদিন সে উন্মুখ হয়ে বসেছিল, সেই চিঠিই আজ তার হাতে। এরই মধ্যে আছে দাদুর মনের কথা। যার উপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ। কাঁপা হাতে খাম ছিঁড়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মীনাক্ষী চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

আদরের মীনা বাই,

হঠাৎ আমাকে ইংরেজীতে চিঠি লিখতে দেখে নিশ্চয় তুমি অবাক হবে। তবু লিখলাম এই ভেবে হয়ত তুমি এই চিঠিটা পীয়েরকে পড়াতে চাইবে।

যদি আমার চিঠি দিতে দু' একদিন দেরী হয়ে থাকে, সে অপরাধ আমার এই বয়সের। বুড়ো হয়েছি, সব কথা গুছিয়ে লিখতে বেশ সময় লাগে। এই দেরী দেখে মোটেও মনে কর না আমার মনস্থির করতে দেরী হয়েছে। একবার ভেবেও ছিলাম তোমার মনের চঞ্চলতাকে থামাবার জন্যে টেলিগ্রামে আমার সম্মতি জানাই। পরে ভেবে দেখলাম, না, কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার।

প্রথমেই বলি, পীয়ের সম্বন্ধে এত কথা তোমার লেখবার দরকার ছিল না। তুমি তার সঙ্গে দীর্ঘদিন মিশে তাকে পছন্দ করেছে, তাই থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি পীয়েরের মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে যা সাধারণ ছেলের মধ্যে দুর্লভ। তা না হলে তুমি বোধ হয় তাকে এতখানি আপনারজন বলে মনে করতে পারতে না। তোমাকে আমি যেভাবে মানুষ করেছি, তোমার পরিণত বুদ্ধির কথা যতটুকু আমি জানি তা থেকে বুঝেছি কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, কোনটা সৎ কোনটা অসৎ তা বোঝবার জ্ঞান তোমার যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। অতএব তুমি যখন পীয়েরকে পছন্দ করেছ আমার দিক থেকে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তোমার পছন্দের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছ এ ধরনের আন্তর্জাতিক বিবাহ সুখের হয় কিনা। তুমি বুদ্ধিমতী, কেন এ প্রশ্ন তোমার মনে উঁকি মেরেছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি তো মনে করি দাম্পত্য জীবনের সুখ নির্ভর করে প্রেম, প্রীতি ও সহানুভূতির উপর, তার সঙ্গে স্থান, কাল, পাত্রের কি সম্বন্ধ? আমার তো মনে হয় ক্রমবর্ধমান

সভ্যতার বিকাশ ক্রমশ আমাদের জীবনকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে।

আমি তোমায় অনুরোধ করব কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত চোখ দুটো বন্ধ করে কয়েকটা কথা ভাবতে। ভাব দেখি স্থান (space)-এর কথা, এ যে অনন্ত। অমরা দিশা হারিয়ে ফেলি, তাই তো নিজেদের বোঝবার সুবিধের জন্য সেই অখণ্ড spaceকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করেছি। শুধু পৃথিবীর কথা বলতে গেলে আমরা সৃষ্টি করেছি পাঁচটা মহাদেশের, তাকে আবার ভাগ করেছি বিভিন্ন রাজ্যে, তার মধ্যে প্রদেশ, আরও ছোট করে, জেলা গ্রাম। সেখানেও আমরা ক্ষান্ত হই নি, আরও ছোট করে এনে বলি আমাদের পাড়া, নিজেদের বাড়ি, আমার ঘর।

ঠিক তার উল্টো দিক দিয়ে একবার ভাব দেখি মীনা বাই। সুদূর লণ্ডনে যে ঘরে তুমি বসে রয়েছ চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, তুমি বুঝতে পারছ না তোমার পাশের ঘরে কি ঘটছে, মাঝখানে একটা দেয়ালের ব্যবধান। ভেঙে ফেল ওই দেয়াল, তখনই তোমার ঘর আর পাশের ঘর এক হয়ে যাবে।

এমনি করে যদি আমরা দেয়ালগুলো সরিয়ে নিতে পারতাম বাড়ির দেওয়াল, প্রদেশের দেয়াল, রাজ্যের দেয়াল। তখন শুধু পাঁচটা মহাদেশ ছাড়া আর কিছু থাকত না। তারপর ওই মহাদেশের দেয়ালগুলোও তুলে দিতে পারলে, আবার সেই অখণ্ড (space) আমাদের চোখের উপরে ভেসে উঠত, যার একপ্রান্তে থাকতে তুমি আর একপ্রান্তে থাকতাম আমি। দেশ-বিদেশের বাধা অতিক্রম করে একই ভূখণ্ডের উপর।

সময়ের বেলাও তো ওই এক কথা। আমরা সবাই জানি কাল নিরবধি। তবু আমাদের বোঝবার জন্যে তাকে আমরা যুগ হিসেবে ভাগ করেছি, ভাগ করেছি বর্ষ-পঞ্জীতে। তাতেও শান্ত না হয়ে সময়কে বেঁধেছি ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটায়, যেন আমাদের তৈরী ঘড়ির ধমক শুনে সময় চলছে।

যদি এইভাবে স্থান ও কালের অখণ্ডতা স্বীকার করতে পার তখন বুঝতে পারবে মানুষে মানুষে যে বিভেদের কথা আমরা ভাবি সেটাও শুধু এই দেয়ালের ব্যবধান। এখানে অবশ্য দেয়াল হল দেহ। দেহের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে পারলেই একাত্মা পরমাত্মায় গিয়ে মিলিত হয়। একজনের চৈতন্যের সঙ্গে আর একজনের চৈতন্যের মিলন হয়। সৃষ্টি হয় অখণ্ড চৈতন্যের।

জানি না সব কথা তোমায় গুছিয়ে বোঝাতে পারলাম কিনা, তবে আমার আসল কথা হল এই যে, মানুষে মানুষে সত্যিকারের ভেদ কোথাও নেই। সমাজ আর পরি-বেশের দেয়াল তুলেই আমরা স্বতন্ত্রতার গণ্ডি টানার চেষ্টা করেছি। যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাহে পুরুষ ও নারীকে এই গণ্ডির উপরে উঠতে হবে। যেখানে স্থান, কাল, পাত্রের কোন ব্যবধান থাকবে না, তাদের একমাত্র পরিচয় হবে একজন পুরুষ আর একজন নারী।

তোমার চিঠির শেষের দিকে পরিহাসচ্ছলে এক জায়গায় লিখেছ, ওদেশে ডিভোর্স-এর সংখ্যা এত বেশী যে মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ জাগে ওদেশের জল হাওয়ায় প্রেম আদৌ বাঁচতে পারে কিনা। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমার মনে হয় ইউরোপীয় প্রেমের নাম দেওয়া উচিত রূপজ প্রেম, অর্থাৎ রূপ থেকে যে প্রেমের উৎপত্তি। "লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট"। সেইজন্যেই বোধ হয় রূপের নেশা যেই কাটে আর তাদের ঘর করতে ইচ্ছে করে না, ঘর ভেঙে বেরিয়ে যায়। এই পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে তোমার বক্তব্য নির্ভুল, ওদেশে প্রেম বাঁচে না। কিন্তু আমি প্রশ্ন

করব আমাদের দেশেই বা তার ব্যতিক্রম দেখলে কোথায়, এ দেশে অবশ্য প্রেম রূপজ নয়, দেহজ। দেহ থেকে প্রেমের উৎপত্তি। দু'টি সম্পূর্ণ অজানা যুবক যুবতীর বিবাহ স্থির করলেন তাদের অভিভাবকরা, ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম যে আকর্ষণ তারা অনুভব করে তা বোধ হয় দেহের। সেইজন্যেই তো দেহের নেশা কেটে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমও উবে যায়। ঘর হয়ত আমরা ভাঙ্গি না, কিন্তু যেভাবে ক্লান্তিকর দাম্পত্য জীবন যাপন করি সেটা খুব সুখের নয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুধু ওদেশে নয় আমাদের দেশেও প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের ফলে ক্রমশ অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আজ যে পৃথিবী জোড়া ব্যাভিচার, সংশয়, সন্দেহ, নির্মম কামনার প্রকাশ তা এদেরই জন্যে। মাতৃগর্ভে থেকে তারা অনুভব করেছে এ পৃথিবীতে তাদের কেউ চায় নি, জন্ম তাদের কাছে যন্ত্রণা বলে মনে হয়েছে। তাই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ, প্রচলিত রীতি নীতির ক্ষেত্রে আনতে চায় তারা বিপ্লব। তাদের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই বলে এ বিক্ষোভের প্রকাশ বিষময় হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই বোধ হয় সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

মোটেও মনে করো না আমি নৈরাশ্যবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছি। ভেব না আমি বলছি নর ও নারীর মধ্যে পবিত্র প্রেম অসম্ভব। প্রেম তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন রূপ ও দেহকে অতিক্রম করে গুণকে আশ্রয় করে। আমি তার নাম দিয়েছি গুণজ প্রেম। যদি পুরুষ ও নারী পরস্পরের মধ্যে দেখতে পায় গুণের প্রকাশ, তাকেই বিকশিত করার জন্যে দু'জনে দুজনকে সাহায্য করে, লাখো অভাব অনটনের মধ্যে বাস করলেও সেই সুখী দম্পতি প্রেমের বন্যায় ভেসে চলে, তারাই এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক।

এক কথায় বলতে গেলে 'রূপ' আর 'দেহ' বাঁচে না, কিন্তু 'গুণ' বেঁচে থাকে। তাই গুণজ প্রেম অমর। একথা সত্যি আমাদের দেশের দেহজ প্রেম অনেক সময় গুণজ প্রেমে রূপান্তরিত হয়, যে রকম ওদেশে রূপ দেখে বিয়ে হলেও পরস্পরের মধ্যে তারা গুণকে খুঁজে বার করে।

আমি বিশ্বাস করি তোমার ও পীয়েরের মধ্যে যে প্রেম গড়ে উঠেছে তা ওই শেষোক্ত গুণজ প্রেম। সেই জন্যে আমার দিক থেকে কোন ভাবনার কারণ নেই।

কায়মনবাক্যে আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা সুখী হও, সুখী দাম্পত্য জীবনের মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে বিকশিত কর।

যদি প্রয়োজন বোধ কর, জানালে পীয়ের এবং তার পরিবারবর্গকে চিঠি লিখতে আমি রাজী আছি।

তোমরা আমার প্রীতি ও ভালবাসা নিয়ো।

ইতি

নিত্য আশীর্বাদক

দাদু।

পুনঃ—যদি চাও এ চিঠিটা অতুলকে দেখাতে পার। আশা করি সে আমার সঙ্গে একমত হবে।

চিঠি পড়তে পড়তেই মীনাক্ষীর চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। আনন্দে উত্তেজনায় তার শরীর থর থর করে কাঁপছে। দাদুর মতামত যে উদার তা সে জানত, কিন্তু সে উদারতার ক্ষেত্র যে কতখানি বিস্তৃত তা সে আগে বুঝতে পারে নি। তা না হলে কি করে সে ভাবতে পেরেছিল দাদু হয়তো মত নাও দিতে পারেন। কেন তার

মনে সংশয় জন্মেছিল যে দাদু বোধ হয় আন্তর্জাতিক বিবাহের পক্ষপাতি নন।

চিঠি পড়ে আনন্দে বিহ্বল মীনাক্ষী পীয়েরকে জানাবার জন্য টেলিফোন করল. কিন্তু কেউ ধরল না, বেজে বেজে নো রিপ্লাই হয়ে গেল। এখনও বোধ হয় পীয়ের বাড়ি পেশছয় নি।

পীয়ের দাদুর চিঠি পড়ে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে, এত সুন্দর করে উনি লিখেছেন, পীয়ের যা ছেলেমানুষ হয়তো এখুনি বলবে রেজিস্ট্রারকে নোটিস দেবার জন্যে। একথা ভাবতে কেন জানা নেই মীনাক্ষী মনের থেকে বিশেষ সাড়া পেল না। সত্যিই যদি পীয়ের-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়, আর তাহলে সে দেশে ফিরতে পারবে না। সম্পূর্ণ বিদেশিনী হয়ে যাবে। লণ্ডন বা ব্রাসেলস যেখানেই থাকুক না কেন দেশের সঙ্গে আর কতটুকু যোগসূত্র রাখা সম্ভব হবে। হয়তো দু'তিন বছর অন্তর একবার সে দেশে যেতে পারে। কিন্তু সে তো শুধু বেড়াতে যাওয়া।

একলা নির্জন ঘরে বসে দেশের জন্যে তার মন কেমন করতে লাগল, খারাপ লাগল ভাবতে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আর হয়তো বিশেষ দেখা হবে না। আজ কতজনের কথা তার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে দাদুর কথা, মামাদের কথা। চোখের উপর ভাসছে কলেজের বান্ধবীদের ছবি, কতদিন কত রাত তারা এক সঙ্গে কাটিয়েছে। মনে পড়ছে বর্ষার দিনের গঙ্গার কথা, কত না সাঁতার কেটেছে সেখানে। মনে পড়ছে পৌষ মেলার উৎসব-মুখর শান্তিনিকেতন, কত না মধুর স্মৃতি তার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে। মনে পড়ছে শরৎ-এর মেঘমুক্ত দার্জিলিঙ পাহাড়, সেখানকার স্বপ্নভরা রঙীন দিনগুলো।

টেলিফোনের আওয়াজে মীনাক্ষীর চিন্তার সূত্র কেটে গেল. কে আর এত রাত্রে ফোন করবে? রিসিভার কানে তুলতেই পীয়েরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মীনাক্ষী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, হঠাৎ তুমি ফোন করলে যে?

পীয়ের স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর দেয়, এমনি। তোমাকে ট্যাক্সী থেকে যখন নামিয়ে দিলাম আদর করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সারা রাস্তা ওই কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরেছি, তাই এসেই ফোন করলাম। মীনা, তুমি আমার হাজার হাজার চুমো নিয়ো।

মীনাক্ষী হাসল, সত্যি, তুমি আজও ছেলেমানুষ।

—তাইতো তোমাকে পেলাম। বুড়ো মানুষ হলে কি আর তুমি আমার দিকে ফিরে তাকাতে।

মীনাক্ষী একটু চুপ করে থেকে বলল, জান একটু আগে আমিও তোমাকে ফোন করেছিলাম।

—বিশ্বাস করি না। নিজে থেকে ফোন করা তোমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

মীনাক্ষী না হেসে পারে না, সত্যি আমি ফোন করেছিলাম পীয়ের।

—হঠাৎ?

—দাদুর চিঠি এসেছে।

পীয়ের নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, তোমার দাদুর চিঠি এসেছে, সত্যি বল? এতক্ষণ বল নি কেন? কি লিখেছেন উনি?

মীনাক্ষী পীয়েরের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারে তার মনের চঞ্চলতা। তাই সোজা উত্তর দেয়, দাদু মত দিয়েছেন।

পীয়েরের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, মত দিয়েছেন! দেরি দেখে আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম। কি লিখেছেন আমাকে বল না।

—খুব সুন্দর চিঠি, মস্ত বড়। ইংরাজীতে লেখা, কাল এসে তুমি নিজেই পড়তে পারবে।

পীয়ের ব্যস্ত হয়ে বলে, আমি এখুনি আসব মীনা?

মীনাক্ষী মৃদু স্বরে বাধা দেয়, পাগলামি করো না। খবর যখন ভাল, কালকে এসে ধীরে সুস্থে পড়ো।

—বেশ, কখন যাব বল।

—ন'টার পর। ততক্ষণে আমি অতুল মামার বাড়ি থেকে ডিউটি সেরে ফিরে আসব।

পীয়ের হাসল, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম, কাল রবিবার। আমার কিন্তু রাত্রে ঘুম আসবে না।

—বেশ তো। শুয়ে শুয়ে আমার কথা ভেব।

দু'জনেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

পরদিন চায়ের টেবিলে আইলীন চৌধুরী অভ্যাস মত যথারীতি দু'তিনটে হাসির গল্প বললেন। ও'র এ ধরনের গল্প শুনে মীনাক্ষীর কোনদিনই হাসি পায় না, কিন্তু আজ তার শুনতে খারাপ লাগল না। অতুল মামার সঙ্গে মীনাক্ষীও হাসল।

চা পর্ব শেষ হবার পর মেম মামী কিন্তু এক মিনিটের জন্যেও আর বসলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, তোমরা দু'জনে কথা বল, শীলু বেচারী আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে, ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।

মীনাক্ষী প্রশংসা করে বলল, আমার জানাশুনো লোকের মধ্যে আপনার মত কুকুরের শখ আর কারুর দেখি নি।

—শুধু শখের কথা নয় মীনা ডারলিং, ওদের ভালবাসতে হয়। নিজেদের পরিবারের একজন হিসেবে দেখতে হয়। বেচারীরা তো কথা বলতে পারে না, কত সময় ওদের প্রতি আমরা অবিচার করি।

বলতে বলতে মনে হল আইলীন চৌধুরীর চোখের কোণ দুটো চিক চিক করে উঠল। আর কথা না বাড়িয়ে 'বাই' 'বাই' বলে বিদায় চেয়ে নিয়ে শীলুর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে মীনাক্ষী অতুল মামাকে একলা পেল। অতুল মামাও যেন এই সময়টুকুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর মীনাক্ষী, বেশ হাসিখুশী মনে হচ্ছে।

মীনাক্ষী বিনা ভূমিকায় জানাল, দাদু একটা চিঠি লিখেছেন।

—কি ব্যাপার?

মীনাক্ষী চিঠিটা এগিয়ে দিল। অতুলমামা খুব মন দিয়ে চিঠি পড়লেন কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল না তিনি খুব খুশী হয়েছেন। পড়া শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, থমথমে গম্ভীর মুখে চোখ দুটো ছোট করে দূরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্থির করেছ পীয়েরকে বিয়ে করবে?

অতুল মামাকে এতখানি গম্ভীর হতে মীনাক্ষী আগে কখনও দেখে নি, আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?

—তোমার দাদুর সঙ্গে আমি একমত নই।

—কেন?

—আন্তর্জাতিক বিয়ে কখনও সুখের হয় না।

—কি বলছ তুমি?

অতুল মামা স্পষ্ট গলায় বলেন, তোমার দাদুর থিওরীকে আমি ভুল বলছি না, কিন্তু বাস্তব জীবনে ওর কোন দাম নেই। যদি আমার মত শুনতে চাও, আমি বলব এ বিয়ে করো না। যদিও জানি পীয়ের খুব ভাল ছেলে।

মীনাক্ষী কোন কথা বলতে পারে না, সে ভেবেছিল দাদুর চিঠি পড়ে অতুল মামা তাকে আরও উৎসাহ দেবে, কিন্তু সব যেন কি রকম গোলমাল হয়ে গেল। মনের অন্তঃপুরে একটা একটা করে আশার প্রদীপ সে অতি যত্নে জ্বালাছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়াও যেন নিবে গেল।

অতুল মামা এবার মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়েই বলেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে আমি বলছি, মিথ্যে আলেয়ার পেছনে ছুটে কোন লাভ নেই। দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে কর, সুখী হও। বিদেশে পড়ে থাকা যে কতখানি কষ্টের আমার অবস্থায় না পড়লে বুঝতে পারবে না।

অতুল মামার কথাবার্তার ধরনে মীনাক্ষীর মনে যে প্রশ্ন উঁকি মারছিল তা সে স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সুখী হও নি অতুল মামা?

অতুল মামা হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, চুপ করে গেলেন, তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, যদি সত্যি কথা জানতে চাও, বলব, না হই নি। সারা জীবনটা আমার নষ্ট হয়েছে। একথা আর কেউ জানে না। প্রথম তোমাকেই বললাম কারণ, দেখছি তুমিও আমার মত ভুল করতে যাচ্ছ, তাই। এদেশে আমার কি পরিচয়, নামহীন, গোত্রহীন একটা মানুষ, এদেশী সমাজ আমাদের নেয় না। দেশের লোকেরাও আমাদের এড়িয়ে চলে। বলতে পার এ জীবনে আনন্দ কোথায়?

মীনাক্ষী মৃদু স্বরে বলে, কিন্তু আইলীন মামী, তিনি তো—

অতুল মামার কপালের শির দুটো কাঁপে, ওর কথা ছেড়ে দাও, যত বয়স বাড়ছে মানুষটা যাচ্ছে একেবারে বদলে। যে আইলীনকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম সে নেই। কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। যে আইলীনকে তোমরা দেখছ সে আমার জীবনে একটা গলগ্রহ। নিজের স্বার্থ ছাড়া আজ আর কিছু সে বুঝতে চায় না।

—এ তুমি কি বলছ অতুল মামা!

—আজকের আইলীন ভাবে আমাকে বিয়ে করে তার জীবনটা নষ্ট হয়েছে। মনে করে নিজের জাতে বিয়ে করলে তিনবার ডিভোর্স করলেও সে সুখী হত। অন্তত জীবন ধারণের একটা অর্থ খুঁজে পেত সে। আমাদের এ দাম্পত্য জীবনটা তার কাছে মনে হয় নিরামিষ, নিরর্থক।

—মেম মামীকে দেখে তো তা মনে হয় না।

—অনেক কিছুই বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না মীনাক্ষী। তবে এইটুকু জেনে রেখ, আইলীন যদি আজ কাউকে ভালবাসে সে শীলু, আমি নই। এক এক সময় মনে হয় আমার চেয়ে শীলু অনেক সুখী।

অতুল মামা শেষের কথাগুলো এমনভাবে বললেন মীনাক্ষী কিছুতেই চোখের জল সামলাতে পারল না। তাঁর জীবনের করুণ ট্র্যাজেডীর কথা ভেবে মীনাক্ষীর মন ভরাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

যখন সে অতুল মামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল, তার মন থেকে সবটুকু আনন্দ যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুকনো মুখে অস্থির উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে কোন-রকমে সে বাড়িতে এসে পৌঁছল। পীয়ের তার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল,

স্বভাবসুলভ হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বলল, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে মীনা, আমাকে ন'টার সময় আসতে বলে নিজে ফেরবার নাম নেই।

মীনাক্ষী ছোট উত্তর দিল, চল, উপরে যাই।

—আগে তোমার দাদুর চিঠিটা দাও।

মীনাক্ষী চিঠি বার করে দেয়, পীয়ের পড়তে পড়তেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠে।

ওরা ঘরে ঢোকে।

চিঠি পড়া শেষ করে পীয়ের সানন্দে মীনাক্ষীকে জড়িয়ে ধরে, এখন বুঝতে পারছি মীনা, তুমি কেন দিনরাত দাদুর কথা এত করে বলতে। সত্যিই উনি অসাধারণ মানুষ। কি চমৎকার করে সব কথা বুঝিয়ে লিখেছেন।

পীয়ের এতক্ষণে লক্ষ্য করল মীনাক্ষী সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। মুখ তার বিবর্ণ, চোখে বোধ হয় জল।

—কি হয়েছে মীনা ?

মীনাক্ষী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। কিছু না।

পীয়ের ব্যস্ত হয়, কেন আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছ ? বল তোমার কি হয়েছে।

মীনাক্ষী তবু চুপ করে থাকে।

পীয়ের মীনাক্ষীর মুখখানা ভাল করে লক্ষ্য করে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি।

মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকায়।

—নিশ্চয় অতুল মামা তোমায় কিছু বলেছে, কিংবা আইলীন মামী। একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, কি বলেছে তাও জানি, বলেছে এ বিয়ে করো না।

পীয়েরের কথা শুনে মীনাক্ষী বিস্মিত হল, তুমি কি করে জানলে ?

পীয়ের তীক্ষ্ম স্বরে বলে, ওরা তো বাধা দেবেই, যারা নিজেরা সুখী হয় নি, তারা কি করে বলবে তুমি বিয়ে কর।

মীনাক্ষী প্রশ্ন করে, তোমারও মনে হয় ওরা সুখী নয় ?

—কি আশ্চর্য, এর আবার বোঝবার কি আছে। তোমার অতুল মামাকে দেখে বুঝতে পার না ? কতখানি হতাশা মানুষটার জীবনে। আমাদের দেশের কোন ছেলে হলে এ অবস্থায় মদ খেয়ে নিজের দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করত। উনি তাও পারেন না। তাই দুঃখের পরিমাণ বোধ হয় আরও বেশী।

মীনাক্ষী যেন ক্ষীণ আলো দেখতে পায়, প্রশ্ন করে, তাহলে ?

পীয়ের উঠে গিয়ে মীনাক্ষীর পাশে বসে, তার হাতটা নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, মীনা তোমার কাছে একটা অনুরোধ, জীবনে যারা পারে নি, হেরে গেছে, ভাল লোক হলেও তাদের কথায় বেশী কান দিয়ো না। তারা নিজেরা পারে নি বলে চায় না আর একজন পারুক। যদি উপদেশই শুনতে হয়, এমন লোকের কাছে শুনো যে জয়ী হয়েছে, মনে যার কোন গ্লানি নেই। যেমন তোমার দাদু।

মীনাক্ষীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, বলে, সত্যি পীয়ের অতুল মামার কথা শুনে কেমন যেন আমি দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না, কি আমার করা উচিত।

পীয়ের সহজ করে বুঝিয়ে দেয়, আর কোন উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নেই মীনা, তোমার দাদুর মতামতের জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। তা যখন পেয়ে গেছি আর আমি কোন চিন্তা করি না। আমার প্ল্যান তৈরী হয়ে গেছে। অফিস থেকে আমি ছুটি নেব, অনেক দিনের ছুটি আমার পাওনা হয়েছে। তোমাকে নিয়ে যাব

কণ্টিনেণ্ট বেড়াতে, বিশেষ করে ব্রাসেলস-এ। নিজের চোখে তুমি দেখো আমার আত্মীয় স্বজনদের, দেখো আমার সমাজ। যদি তুমি অপছন্দ কর মোটেও আমি বলব না ব্রাসেলস-এ থাকতে। যে দেশ তোমার ভাল লাগে সে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ যেখানেই হক না কেন সেইখানেই আমরা সংসার পাতব।

মীনাক্ষীর চোখ মুখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, সত্যি বলছ পীয়ের?

পীয়ের মীনাক্ষীকে আরও কাছে টেনে নেয়। মনে রেখ মীনা আমার জীবনের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে তুমি, আর একদিকে যাবতীয় সব কিছু। তুমি যাতে সুখী হও সেইটাই হবে আমার একমাত্র লক্ষ্য। তোমার আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে, নিজের দেশের মায়া কাটিয়ে তুমি আমাকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছ একথা যখনই ভাবি, আমার চোখে জল আসে।

মীনাক্ষী পীয়েরের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলে, ওভাবে কথা বলো না পীয়ের, আমার লজ্জা করে।

পীয়ের গাঢ় স্বরে বলে, কথা দাও, আর কোন রকম চিন্তা করবে না।

—না, করব না।

—যা কিছু ঠিক করব, আমরা দু'জনে।

—বেশ তাই হবে।

রজত মিথ্যে বলে নি।

সে রাত্রে সৌরেন রজতের সঙ্গে বেরিয়ে ল্যাম্‌বেথের এক প্রান্তে তাদের আড্ডায় না গেলে সত্যিই লণ্ডন জীবনের আর একটা দিক তার কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত, যে দিকটার কথা বেশীর ভাগ ইংরেজও জানে না। বিদেশী হয়েও সৌরেন যে ওখানকার বিচিত্র মানুষগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল সে শুধু রজতের জন্যে।

প্রথম চোটে অবশ্য ল্যাম্‌বেথের সংকীর্ণ গলিপথ বেয়ে জীর্ণ এক বাড়ির বেস্‌মেণ্টে ঢুকে সে অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিন্তু যখন দেখল এই আড্ডায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রজতের চোখ মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন সৌরেন ইচ্ছে করে নিজের মনের বিরক্তি চেপে রেখে চেষ্টা করল এখানকার অচেনা মানুষগুলোকে চেনবার।

ওরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে রজত এসেছে।

রজত সহাস্যে তার অভ্যর্থনাকে গ্রহণ করল, সৌরেনকে বলল, ওর নাম লরা। কেমন মিষ্টি দেখতে, না?

লরা অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছিল, তার কাছে বিদায় চেয়ে নিয়ে এগিয়ে এল রজতদের দিকে। বয়স কুড়ি, একুশ হবে, ছিমছাম শরীর। বড় বড় চোখ, রোদে পোড়া তামাটে রঙ, মাথায় তার সাদা চুল। রজতের কাছে এসে তার কাঁধের ওপর দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এতদিন আস নি কেন?

রজত লরার কপালের উপর চুমো খেয়ে উত্তর দিল, ব্যস্ত ছিলাম।

—শেষ কবে এসেছ বলত আমার কাছে?

—তা প্রায় মাস খানেক হবে।

লরা অভিমানের সুরে বলে, তার চেয়েও বেশী। হঠাৎ আজ এলে যে? মারিয়া কোথায়?

রজত অন্যমনস্ক স্বরে বলে, ও এখানে নেই।

লরার চোখ দুটো কৌতুকে হাসল, তাই তুমি এসেছ, আমি জানি মারিয়া পছন্দ করে না তোমার এখানে আসা।

রজত প্রতিবাদ করে কি যেন বলল, লরাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্যদিকে।

সৌরেন ওদের দেখছিল, খুব ভাল লাগছিল তা নয়, বিশেষ করে মনে পড়ছিল তার মারিয়ার কথা। ইস্ট এণ্ডের বাড়িতে মত্ত অবস্থায় একদিন সে ঠাট্টা করে বলেছিল, রজত সাদা চুলের মেয়েদের বেশী ভালবাসে।

সেদিন সৌরেন কথাটায় বিশেষ কান দেয় নি, আজ লরাকে দেখার পর সৌরেনের মনে হল, মারিয়া হয়ত ঠিকই বলেছিল।

সৌরেনকে কিন্তু বেশীক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হল না, সোনালী চুলের কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা যে লোকটি তার কাছে এগিয়ে এল তাকে হঠাৎ দেখলে রোমান ক্যাথলিক ফাদার বলে ভুল হয়। প্রশস্ত কপাল, মুখে প্রশান্ত হাসি, সস্তা দামের রিপু করা ঢিলে কোট প্যাণ্টের মধ্যে থেকে তার ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট।

নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমার নাম মাইকেল। এ আড্ডায় তোমায় বোধ হয় নতুন দেখছি।

সৌরেন হেসে বলল, হ্যাঁ, আজ প্রথম।

—কি পান করবে বল।

—আমি বিশেষ কিছু খাই না, তবে বীয়ার হলে আপত্তি নেই।

মাইকেল সৌরেনের কাঁধে হাত দিয়ে ঘরের অন্যদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, বীয়ার কেন, ভাল হুইস্কি আছে, চল।

—হুইস্কি আমি আগে খাই নি।

মাইকেল তার পিঠের উপর চাপড় মারে, খেলেই বুঝতে পারবে, ওটা অমৃত।

হুইস্কির স্বাদ সৌরেনের প্রথমটা ভাল না লাগলেও মনের জোর করে দু'এক ঢোক গিলে ফেলার পর খারাপ লাগল না। সে অনুভব করল আস্তে আস্তে হুইস্কির প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে তার শরীরের মধ্যে। মাইকেল অনেক কথা বলে যাচ্ছে, সব কথা যে শুনল তা নয়, তবে এটুকু বুঝল, মাইকেল আর্টিস্ট, ফুটপাথের ওপর ছবি আঁকে। ন্যাশানাল গ্যালারীর কাছে গেলেই ফুটপাথের ওপর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঘরের মধ্যে এতক্ষণ সজোরে অর্গ্যান বাজছিল, একেবারে পাশাপাশি না দাঁড়ালে কথা শোনার উপায় ছিল না। বাজনার তালে তালে কয়েকজন ছেলেমেয়ে নাচছিল মেঝের উপর। ঢিমে আলো, তার সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া। সব কিছু মিলিয়ে সৌরেনের মনে হচ্ছিল এ এক বিচিত্র পরিবেশ।

একটু বাদে রজত ফিরে এল তার কাছে, চোখে মুখে তার তৃপ্তির হাসি। যেন নিজের মনেই বললে, সত্যি, লরা একটা এঞ্জেল।

সৌরেন সে কথায় কান না দিয়ে হাতের গ্লাসটা দেখিয়ে বলল, তোর পাল্লায় পড়ে আমি হুইস্কি খাচ্ছি।

—বেশ করেছিস, কিছু পয়সা দে তো!

—কত?

—পাউণ্ড দু'এক।

সৌরেন দু'খানা নোট বার করে দেয়।

রজত স্মিত হেসে বলে, ধন্যবাদ। লরাকে এটা দিয়ে আসি। ড্রিংকস-এর চাঁদা। সেদিন কতক্ষণ সৌরেন ওদের আড্ডায় ছিল ঠিক তার মনে নেই। তৃতীয় পেগ হুইস্কি পানের সময় থেকেই নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। স্বপ্নালু ঘোরের মধ্যে তার মনে পড়ে সুন্দরী লরা একবার এসেছিল তার কাছে, টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল নাচের মেঝেতে; একে সৌরেন নাচতে ভাল পারে না, তার উপর পানীয়ের প্রভাবে মোটেই তার পা তালে পড়ে নি। কিন্তু আশ্চর্য তার জন্যে এতটুকু লজ্জা বোধ করে নি সৌরেন, বেশ ভাল লেগেছিল, কিছুক্ষণের জন্য অন্তত লরাকে কাছে পেতে।

হাসিতে চোখ উজ্জ্বল করে লরা বলেছিল, এর পর থেকে তুমি এখানে আসবে তো?

সৌরেন বলেছিল, আসব।

—তোমার বন্ধুটি বড় খামখেয়ালী। ওর জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। সোজা চলে এস আমার কাছে।

যতদূর মনে পড়ে হঠাৎ এক সময় বাজনা থেমে গেল, লরা যেন বিরক্ত স্বরে বলল, দেখেছ, কানা জোন্সটা কি রকম হিংসুটে।

—কে কানা জোন্স?

—ওই যে বাজনা বাজাচ্ছিল। তোমার সঙ্গে আমি নাচছি দেখে হিংসেয় বাজনা থামিয়ে দিল।

লরা খিল খিল করে হেসে সৌরেনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

তারপর কত রাত্রে সৌরেন বাড়ি ফিরেছে তার নিজেরই হুঁশ নেই। নিশ্চয় রজত তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

পরের দিন ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। মাথা ধরে রয়েছে, কপালের কাছে শির দুটো এখনও দপ্ দপ্ করছে। কালকের সব ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্নের মত মনে হল তার কাছে। রজত যেন তার চোখ বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল এক বিচিত্র রাজ্যে যেখানে সে কানামাছির মত চারদিকে ছুটে কারুর হদিশ না পেয়ে শরীরে মনে প্রচণ্ড অবসাদ নিয়ে ফিরে এসেছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তে খেয়াল হল অফিসের ছুটি থাকলেও ডাইং ক্লিনিং থেকে এখুনি কাচানো স্যুটখানা নিয়ে আসা দরকার, দোকান বন্ধ হয়ে গেলে দেড়-দিন আর পাওয়া যাবে না।

মুখ ধুয়ে কালকের জামা কাপড়গুলোই পরে নিল সৌরেন। চা না হয় সে বাইরে কোথাও খেয়ে নেবে। কিন্তু চুল আঁচড়ে পকেটে হাত দিতে গিয়ে সে চমকে উঠল। পকেটে টাকা নেই। কাল রজতকে সে দু' পাউণ্ড বার করে দিয়েছিল, তাছাড়া আরও দু'খানা নোট তার কাছে থাকবার কথা, কোথায় গেল সেগুলো? একবার মনে হল হয়ত কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে নেশার বশে নোটগুলো অন্য কোথাও সযত্নে তুলে রেখে বেমালুম ভুলে গেছে। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও সে পেল না।

যদি রজত নিয়ে থাকে। হয়ত রাত্রে দরকার পড়েছিল, সৌরেনের কাছ থেকে আরও দু' পাউণ্ড চেয়ে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে সৌরেন ফোন করল রজতকে। দু'চারটে মামুলী কথার পর সৌরেন টাকার প্রসঙ্গ তুলল। রজত জিজ্ঞেস করলে, আর কত টাকা তোর সঙ্গে ছিল?

—দু' পাউণ্ড, পাঁচ শিলিং। শিলিংটা আছে, নোট দুটো নেই।

রজত গম্ভীর স্বরে বলল, হুম্।

—হুম্ কি? আমার যে টাকার দরকার।

রজত স্পষ্ট গলায় বলল, তাহলে বোধ হয় লরা তুলে নিয়েছে।

সৌরেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, কি বলছিস তুই?

—ওর ওই এক বদ অভ্যাস। টাকা দেখলে লোভ সামলাতে পারে না।

—তার মানে লরা চোর?

রজত সহজভাবে বলে, চোর ঠিক নয়, পকেটমার। তবে তোর টাকা ও ফেরত দিয়ে দেবে।

সৌরেন বিরক্তি গোপন করতে পারে না, টাকাটা আজই আমার দরকার।

—বেশ। তাহলে ন্যাশানাল গ্যালারীর কাছে আয়; একটা নাগাদ। মাইকেলকে খুঁজে পাবি, ও ওখানে ছবি আঁকে, ফুটপাথের ওপর। মাইকেলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোকে ফেরত দিয়ে দেব।

মাইকেলকে খুঁজে পেতে সত্যিই কোন অসুবিধা হয় নি সৌরেনের। ফুটপাথের উপর হাঁটু গেড়ে বসে চক দিয়ে ছবি আঁকছিল মাইকেল। সেইদিনকার ডেলী এক্স-প্রেসে প্রকাশিত একটা কার্টুনের নকল, মার্কিন ইলেকশনের ব্যঙ্গচিত্র।

সৌরেনকে দেখে মাইকেল খুশী হল। বলল, এত শীগগিরই তোমার দেখা পাব আশা করি নি।

সৌরেন জানাল, রজত আমায় আসতে বলেছে।

—তাই নাকি? তবে ওর যা সময় জ্ঞান, ঘণ্টাখানেকের এধার ওধার হামেশাই হয়।

সৌরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আর দেখছিল মাইকেলের কাজ, খুব দ্রুত ও ছবি আঁকে, কাজ করতে করতে গল্প করে অনায়াসে। ওর পাশেই ওল্টান রয়েছে একটা টুপি, পথচারীদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাইকেলের ছবি আঁকা দেখে, কেউ বা দয়াপরবশ হয়ে দু' পেনি বা ছ'পেনি ছুঁড়ে দেয় টুপির মধ্যে। মাইকেল এ সময় ইচ্ছে করে অন্যমনস্ক হয়ে যায় পাছে ধন্যবাদ জানাতে হয়, কিন্তু বুদ্ধি ওর টনটনে, দাতা সরে গেলেই টুপির থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দেয়। হাসতে হাসতে সৌরেনকে বলে, কেন পয়সাগুলো সরিয়ে রাখলাম জান?

—কেন?

—লণ্ডনবাসীদের চেন না, যদি দেখে টুপিতে বেশ দু' পয়সা জমেছে তাহলে আর একটি পেনিও দেবে না।

সৌরেন না বলে পারল না, তুমি বেশ বিচক্ষণ।

মাইকেল হাসল, না হয়ে কি আর উপায় আছে? এইভাবে রুটি রোজগার করতে হবে তো?

খুব মন দিয়ে না শুনলে মাইকেলের কথা বোঝা মুশকিল, বিশেষ করে সৌরেনের পক্ষে। কারণ ও কথা বলে লণ্ডনের কর্কনি ভাষায়, সাধু ইংরিজীর সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাত!

মাইকেল এক সময় বলল, আমাদের সর্বনাশ করেছে কয়েকজন ডিটেকটিভ গল্প লেখক, তারা ফুটপাথের শিল্পীদের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করেছে ক্রিমিন্যালদের, গল্পকে রহস্যজনক করে সাজিয়ে তোলার জন্যে দেখিয়েছে আমরা অনেক টাকা রোজ-গার করি। সাধারণ লোক ওই সব গল্প পড়ে আমাদের ভুল বোঝে, সহজে কেউ টুপিতে

পয়সা দিতে চায় না।

ভাষা পুরোপুরি না বোঝা গেলেও মাইকেলের কথার ধরনটি বড় চমৎকার। অতি সহজে সে সৌরেনকে আপন জনের মত করে নিল।

—তাহলে তোমাদের চলে কি করে?

মাইকেল সগর্বে বলে, একরকম জোর করে ভিক্ষে আদায় করতে হয়। আমার পদ্ধতি কি জান?

বলেই মাইকেল যে ছবিটা আঁকা শেষ করেছিল তা মুছে ফেলে মন থেকে আর একটা ছবি আঁকা শুরু করল, বলল, এই আমার বুদ্ধি। ছবি এঁকে আমি বসে থাকি না। তাহলে কোন শিকার ধরতে পারব না, এই হচ্ছে মানুষের সাইকোলজি, আমাকে ছবি আঁকতে দেখলে তারা থমকে দাঁড়ায়, তবেই তারা পয়সা দেয়।

মাইকেলের এই স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা সৌরেন মনে মনে না করে পারল না। জিজ্ঞেস করল, কি রকম রোজগার হয় তোমার?

মাইকেল ছবি আঁকতে আঁকতে জবাব দিল, কোন ঠিক নেই। বর্ষার সময় বাইরে ছবি আঁকতেই পারি না। তখন আর রোজগার কোথায়? তবে বক্সিং ডে'র মত বিশেষ দিনে পাঁচ ছ' পাউণ্ডও রোজগার হয়ে থাকে। সারা বছর হিসেব করলে গড়পড়তা পাউণ্ড দু'য়েক সপ্তাহে রোজগার করি।

সেদিন রজত আসতে দেরি করায় মাইকেলের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিল সৌরেন, শুধু গল্প নয়, মাইকেল তাকে চাও খাইয়েছিল। সস্তার 'টি' স্টলে। ঠিক এ ধরনের কোন চরিত্রের সঙ্গে আগে আলাপ হবার সুযোগ হয় নি বলেই বোধ হয় মাইকেলকে সৌরেনের এতটা ভাল লেগেছিল। এরপর সে সুবিধে মত অনেকবার গেছে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে, তার জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনাও করেছে।

মাইকেল গরীবের ছেলে, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল শিল্পী হবার। বাপ-মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্যারিসে পালিয়ে গিয়ে সে ছবি আঁকা শিখেছে। মাইকেল ভাল শিল্পী। অন্তত নিজে সে তাই মনে করে, কিন্তু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা ছবির ক্যানভাস বগলে করে প্যারিস আর লণ্ডনের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে ঘুরেও কোথাও সে সুবিধে করতে পারে নি। ক্ষুধার তাড়না যখন তীব্র, এই ন্যাশা-ন্যাল গ্যালারীর সামনে দাঁড়িয়ে সে একদিন লক্ষ্য করল ফুটপাথে যেসব শিল্পী ছবি আঁকছে তাদের টুপিতে লোকে পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ নিজে সে প্রকৃত শিল্পী হয়েও খাবার পয়সা জোটাতে পারছে না। এত টাকা বাজারে দেনা হয়ে গেছে যে নতুন করে কারুর কাছে ধার পাওয়া একেবারে অসম্ভব। লজ্জা শরম ত্যাগ করে, মাইকেল সেদিন ফুটপাথের উপর হাঁটুগেড়ে বসে ছবি আঁকতে শুরু করেছিল।

আজও মাইকেল সেই ফুটপাথের শিল্পী। সে নামকরা শিল্পী হবার স্বপ্ন সে ত্যাগ করেছে, কিন্তু বেঁচে থাকার বাসনা এতটুকুও কমে নি।

মাইকেল বলে, প্রথম দিকে যে মনে কষ্ট পাই নি তা নয় কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম এই যে ভিক্ষে করে আমায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে তার জন্যে আমার তো কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার।

সৌরেন ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ?

মাইকেল হাসতে হাসতে বলে, ভবিষ্যতের কথা ভাববে বড়লোকরা, আমার তো সব চিন্তা দু' টুকরো রুটির। যেদিন জুটল, পেট ভরে খাই, না জুটলে আর উপায়

কি? যেদিন বেশী পয়সা রোজগার করি, টেনে মদ খাই, কখনও বা লরার কাছে যাই। এই করেই দিব্যি কেটে যাবে।

—তারপর?

মাইকেল মুখ তুলে তাকাল, তারপর আবার কি? একদিন মৃত্যু এসে আমার দরজায় টোকা মারবে, ব্যস্। সব ঝামেলে চুকে যাবে।

মাইকেলের সঙ্গে আলাপ না হলে সৌরেন সত্যি ভেবে পেত না, খাও দাও, আনন্দ কর এই ধরনের ফিলসফি নিয়ে কেউ থাকতে পারে। এখন সৌরেন বুঝতে পারে কোথা থেকে রজত এই জীবনের স্বাদ পেয়েছে। মাইকেল নয় ওদের দলের আরও দু'একজনের সঙ্গে আলাপ হবার পর সৌরেন দেখেছে ওদের সকলের গোত্র এক।

সেদিন রজত দেরি হলেও পরে এসেছিল। সৌরেনের হাতে দু' পাউণ্ডের নোট এগিয়ে দিয়ে বলে, লরা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, ও বিশেষ লজ্জিত।

মাইকেল বাধা দিয়ে বলে, মিথ্যে বলো না রজত, লরা লজ্জা পাবার মেয়ে নয়। তুমি নিশ্চয় অনেক চেঁচামেচি করে টাকাটা ফেরত নিয়ে এসেছ। এখনও লরা আমার পকেট থেকে টাকা তুলে নেয়, জান?

—সত্যি!

—আমি কি ভেবেছি জান, একখানা ভাল পোট্রেট এঁকে যাব, লরার পোট্রেট। ওর সুন্দর চেহারাটার ভেতর থেকে যদি ওর মনটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারি, ছবি আমার অমর হয়ে থাকবে।

রজত ঠাট্টা করে বলল, বলা যায় না সে ছবি ন্যাশানাল গ্যালারীর বাইরের ফুট-পাথে শোভা না পেয়ে হয়ত হলের মধ্যেই বিরাজ করবে।

লরাকে সৌরেন বুঝতে পারে নি, তার সম্বন্ধে রজত এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যে ধরনের কথা বলে তা থেকে লরা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা সহজ নয়। লরার সঙ্গে মেশবার সাহসও সৌরেনের ছিল না।

শুধু লরা কেন, ঝ্যাঁটার কাঠির মত লম্বা প্রস্থহীন দীর্ঘ স্টিভসকেও কেমন যেন আশ্চর্য মনে হয়েছে সৌরেনের। স্টিভস ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেই দেখে, কোন লোক পায়রাদের হাতে করে দানা খাওয়াবার চেষ্টা করছে, স্টিভস অমনি ছবি তোলার ভঙ্গী করে, হেসে বলে, খুব সুন্দর ছবি উঠেছে আপনার।

হয়ত ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হন, ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, আমিত ছবি তুলতে বলি নি।

স্টিভস পাল্টা চাপ দেয়, সে কি আপনি যে ইশারা করলেন আমায়।

—মোটেও না, আমি হাত নেড়ে পাখিদের ডাকছিলাম।

স্টিভস নিজের মনেই দুঃখ প্রকাশ করে, তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। মিছিমিছি আপনার ছবি তুলে এক শিলিং নষ্ট হল।

ভদ্রলোকের রুক্ষতা এবার কমে, স্টিভসের কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার চার্জ কত?

—মাত্র তিন শিলিং।

—আচ্ছা দাও। কপিটা নিয়েই যাই।

স্টিভস্-এর মুখ কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়, বলে, এখনি আমি রেডী করে দিচ্ছি।

ক্যামেরার পেছনে গিয়ে এইবার সে সত্যিকারের প্লেট ভরে। মুখে বলে, আগের ছবিটা তত ভাল আসে নি, আমি আর একবার ছবিটা নিচ্ছি। এর জন্যে অবশ্য আপনাকে বেশী পয়সা দিতে হবে না।

আশ্চর্য স্টিভস-এর শিকার ধরার ক্ষমতা, দূর থেকে চেহারা দেখে বলে দিতে পারে কোন মক্কেল তার জালে পা দেবে।

সৌরেন জিজ্ঞেস করেছিল, কারা তোমায় বেশী পয়সা দেয়?

স্টিভস হেসে জবাব দিয়েছে, বিদেশীরা। জোর করে চেপে ধরলে কিছুতেই না বলতে পারে না। একটু থেমে বলে, আমার বেশী লাভ টুরিস্ট পাকড়াতে পারলে। ধর কালই সে চলে যাচ্ছে প্যারিসে, সেখান থেকে অন্যান্য শহরে যাবে। আমি তাকে কথা দিই প্যারিসের ঠিকানায় ছবি পাঠিয়ে দেব, আসলে কিন্তু আদৌ আমি কোন ছবি তুলি না।

কথাগুলো শুনতে সৌরেনের ভাল লাগছিল না। বললে, এ তো জোচ্চুরি।

খনখনে গলায় স্টিভস হাসল, ওটা মনের ভুল। বাঁচতে আমায় হবে, সেইটেই বড় কথা, হাত পেতে ভিক্ষে চাইলে আইন বিরুদ্ধ বলে পুলিস আমায় ধরে নিয়ে যাবে। এ তো আমি বুদ্ধি খাটিয়ে রোজগার করছি, এতে কার কি বলবার আছে।

নির্লজ্জের মত কথা বলে স্টিভস, বিদেশীদের ছবি তুলতে গিয়ে সে যে তাদের কানে কানে রুপোজীবিনীদের ঠিকানা বলে দিয়ে দু-এক শিলিং বকশিশও আদায় করে, সে কথা জানাতেও এতটুকু দ্বিধা করে না।

সৌরেন ভেবে পায় না, রজত কি করে এদের সঙ্গে দিন কাটায়,, কি আনন্দ সে পায় এদের সংসর্গে। একদিন 'সোহো'র বারে বসে সে রজতকে সরাসরি এই প্রশ্ন করে। রজত চোখ তুলে মিটিমিটি হেসে বলল, জানতাম তোর ভাল লাগবে না, তুই যে অ্যারিস্টোক্র্যাট। ওই আড়ষ্ট কাঠদের সমাজে নাম লিখিয়েছিস।

সৌরেন বিরক্ত হয়ে বলে, কতগুলো চোর জোচ্চরের সঙ্গে মেশার যে কি বাহাদুরি আমি বুঝতে পারলাম না।

রজত বীয়ারের 'জাগে' লম্বা চুমুক দিয়ে বলে, আমি ওদের ভালবাসি। ভালবাসি, ওরা সহজ বলে, কোন রকম ভড়ং ওদের নেই।

—কিন্তু ওরা কি?

রজত সৌরেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, কেন তোমার কি মনে হয়?

সৌরেন তেতো গলায় বলে, মানুষ নয়, পশু।

রজত এক চুমুকে বাকি বীয়ারটুকু শেষ করে, ওই জন্যেই তো ওদের ভালবাসি।

—তার মানে।

—কারণ ওরা পশুর মতই থাকে, একবারও চেষ্টা করে না নিজেকে অন্যভাবে চালাতে, যে রকম তোমরা নিজেদের চালাও।

সৌরেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

রজত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, টেবিলের উপর একটা চাপড় মেরে বলে, মানুষের definition কি জান ত? Man is a rational animal. মানুষ সেই জাতের পশু যার বিচারবুদ্ধি আছে, বিবেকবোধ আছে। কিন্তু আমাদের ভেতরকার ওই পশুত্বটাই কি বারবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নৃশংসতা দেখেও কি এই প্রত্যয় দৃঢ় হয় নি যে আমরা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নই? দেখ নি আমাদের দেশে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার নামে সেই জন্তুটির আস্ফালন? তবে আর

মিথ্যে rationality-র মুখোশ পরার চেষ্টা করা কেন?

সৌরেন ভাবতে পারে নি রজত এতখানি বিচলিত হবে। এখন তাকে বাধা দিতে সৌরেনের ভয় করে।

রজত দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে যায়, বিজ্ঞানের এত উন্নতির কথা আমরা শুনি, সভ্যতা আর সংস্কৃতির ঢাকের শব্দে কান আমাদের কালা হবার যোগাড়। কিন্তু মানুষের কি উন্নতি হয়েছে বলতে পার? সেই আদিম যুগের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের কতটুকু তফাত? শিশু জন্মায়, খায়-দায়, বড় হয়। একদিন দেহের কান্না উপলব্ধি করে, সংসার পাতে, ছেলেমেয়ে হয়, তারপর মৃত্যু। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ঈর্ষা, দ্বেষ, মোহ, আনন্দ, ভয়, এইসব অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সেদিনের মানুষকেও যেতে হয়েছে, আজকের মানুষও যাচ্ছে। আনন্দে আমরা হাসি, দুঃখে কাঁদি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে হয়ত আমাদের বসবাসের সুখ-সুবিধা হয়েছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, তার বেশী আর কিছু না। এতটুকু স্বার্থে আঘাত লাগলেই আমাদের ভেতরকার পশুটা গর্জন করে বেরিয়ে আসে।

সৌরেন আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু এ থেকে তুমি বলতে চাইছ কি?

রজত দৃঢ় স্বরে বলে, আমি বলতে চাই, ওই মাইকেল, ওই লরা, ওই স্টিভস্, ওই কানা জোন্স, ওরা পশুর মত থাকে বটে, তার জন্যে দুঃখ করে না, মিথ্যে ভদ্রলোক সাজার ভান করে না। ওদের মধ্যে একটা সত্য আছে। সে সত্যটা হয়ত অমার্জিত, হয়ত স্থূল, কিন্তু তবু সেটা সত্য। আমি সেই সত্যটাকে ভালবাসি।

পয়সাটা চুকিয়ে দিয়ে রজত উঠে দাঁড়াল। সৌরেনকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। দুই বন্ধুতে পাশাপাশি হাঁটে, সৌরেন বুঝতে পারে রজত একেবারে অন্যমনস্ক। সে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে।

এক সময় রজত হঠাৎ বলতে শুরু করে, আমাকে বোঝা তোর পক্ষে সম্ভব নয়, শুধু তুই কেন কেউই তো আমায় বোঝে না। ওরা সবাই মনে করে আমি ছন্নছাড়া, আমি মাতাল, আমি দুশ্চরিত্র। তাদের কোন অভিযোগই আমি অস্বীকার করছি না। স্বীকার করছি সব কটা দোষই আমার আছে. এবং থাকবেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, কিন্তু কেন? কই. সে কথা তো একবার কেউ ভেবে দেখল না।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছিল তিন-কোনা দ্বীপের মত ছোট্ট একটুকরো পার্কের মধ্যে। তিন দিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে. সামনের খালি বেঞ্চিতে দুজনে গিয়ে বসল। সৌরেনের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে রজত ধরায়। বলে. তুই ত দেখেছিস, মারিয়া আর আমি এক সঙ্গে থাকতাম, মারিয়া চলে গেছে, এখন ঘুরছি লরার সঙ্গে। দেহ ছাড়া আর কোন রকম সম্পর্ক ওদের সঙ্গে আমার নেই। ওরাও সেটা জানে। সেই-জন্যেই ওদের আমার ভাল লাগে।

সৌরেন বিশ্বাস করতে পারে না, তুই বলতে চাস মারিয়ার সঙ্গে তোর কোনরকম হৃদয়ের সম্পর্ক নেই?

রজত বিজ্ঞের মত হাসে, ওসব কল্পনা-বিলাস আমার নেই, শুধু আমার নয়, আমাদের দলের কারুর নেই। সেইজন্যেই আমাদের নিয়ে তোদের কোন ভয়ের কারণও নেই, কারণ তোরা জানিস আমরা পশু। পছন্দ না হলে আমাদের এড়িয়ে যাবি। শক্তি থাকলে শাসন করবি, কিন্তু ভয় তাদের নিয়ে, যারা সারাটা জীবন কাটাচ্ছে অভিনয় করে।

কথাটা নতুন শোনাল সৌরেনের কানে, কিসের অভিনয়?

—নিজের মনের ইচ্ছাকে চেপে রেখে ওরা সমাজের নির্দেশ মেনে চলে, যে যা নয় সেইটেকেই বড় করে তুলে ধরছে অন্যদের সামনে। তার জন্যে বাহবা পাচ্ছে, মনে মনে ভাবছে কত না মহৎ তারা।

সৌরেন বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে, এ ছাড়া উপায়ই বা কি?

রজতের মুখে বিদ্রূপ ফুটে ওঠে, শুধু এই কথাটি মনে রেখ সৌরেন, তুমি পাঁচ-জন দশজন কি তারও বেশী লোককে ধাপ্পা দিতে পার। কিন্তু পারবে না নিজেকে ধাপ্পা দিতে। তখন আসে অনুশোচনা, এ অনুশোচনা আত্মগ্লানির।

রজত সেদিন অনেক কথা বলে গেল, অবশ্য বক্তব্য তার একটাই, মিথ্যের অভিনয় করে মানুষ কখনও সত্যের স্বাদ পেতে পারে না। সেই সূত্র টেনে এক সময় সে উত্তেজিত স্বরে বলে, বিশ্বাস কর সৌরেন, আমি বইয়ে পড়া কোন থিওরী আওড়াচ্ছি না, নিজের জীবন দিয়ে এ কথাগুলো আমি উপলব্ধি করছি। কেন এ দেশে এসে-ছিলাম জানিস? খুব ভাল করে জীবনটাকে দেখতে, অনেক দেখেছি, কিন্তু এখনও আমার সাধ মেটে নি, আরও দেখতে চাই। একটু থেমে বলে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, দেশে থাকতে কূপমণ্ডূকের মত কি রকম চুপটি করে বসেছিলাম।

সৌরেন বাধা দিয়ে বলল, অথচ দেশে থাকতে আমরা তো ভাবতাম তুই আমাদের চাইতে কত বেশী practical, কত কি জানিস।

রজত হাসল, জেনেছিলাম ঠিকই, তবে ভাল কিছু নয়। জীবনের মন্দ দিকটা। তুই তো জানিস, আমাদের joint family খুব বড় না হলেও বাবারা চার ভাই এক সঙ্গে থাকতেন। বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, তাই দুঃস্থ পরিবারবর্গের সংখ্যাও কম ছিল না। পরিচয়টা গোপন করেই বলি, আমার এক আত্মীয়া, গুরুজন ত বটেই, শ্রদ্ধেয়াও। হঠাৎ বিধবা হলেন বাইশ বছর বয়সে, কোলে তাঁর দুটি অপোগণ্ড শিশু। আমি তখন চোদ্দ বছরের ছেলে। বিধবাকে সান্ত্বনা দিত সবাই, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। তাঁর মন ভোলাবার জন্যে গল্প করতাম, খেলতাম। ক্রমে বুঝতে পারলাম তিনি আমায় স্নেহ করেন। কিন্তু কবে যে সেই স্নেহ অন্যরূপ ধারণ করল আমি নিজেও তা বুঝতে পারি নি। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। রাতের পর রাত তাঁর আহ্বানের প্রতীক্ষায় আমি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে বেশীর ভাগ সময়ে বাড়িতেই থাকতাম, শুধু তাঁর সঙ্গ পাবার লোভে। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম আমি তাঁকে ভালবেসেছি। আমার মন প্রাণ দেহ সব তাঁকে সমর্পণ করেছি। কিন্তু আশ্চর্য, বাচ্চারা বড় হয়ে উঠছে দেখে তিনি ক্রমশ আমার কাছ থেকে সরে গেলেন। বুঝলাম আমাকে নিয়ে এতদিন তিনি খেলা করেছেন, শখ মিটিয়ে আমাকে ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন পাথরের দেবতার কাছে। শুরু হল বাড়িতে পুজো-আর্চা, দান, ধ্যান, উপোস, পালন করা শুরু হল ব্রত, আমি দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম এই প্রহসন। শরীরের ভেতরটা জ্বালা করত। এক একবার মনে হত বিধবার ভড়ং করা ঘুচিয়ে দিই, কিন্তু পরে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে চলে এলাম বিদেশে। উঃ সৌরেন, এ ভণ্ডামির কি লাভ বলতে পারিস? তাইত বলি, মারিয়া কি লরা ওদের আমি বুঝতে পারি। ওরা অনেক সৎ। ওরা যা ওরা তাই।

কথা বলতে বলতে মনে হল রজতের গলা ভারী হয়ে এসেছে, চোখের কোল দুটোও যেন চিকচিক করে উঠল।

সৌরেন সহানুভূতি-মাখা স্বরে বলে, কই, এ কথা ত তুই আগে কখনও বলিস নি।

—বলবার মত কথা ত নয়।

—তুই যে ভগবানে বিশ্বাস করিস না, তাহলে অন্তত মনে শান্তি পেতিস। রজত রূক্ষস্বরে বলে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় সৌরেন, হয়ত তোমাদের ভগবান আছেন। কিন্তু আমি তাঁকে পছন্দ করি না। এই পৃথিবী, এই মানুষ, এই জীবজন্তু যদি তাঁরই সৃষ্টি হয়, সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করতে আমি অক্ষম। কী করে যে তাঁকে তোরা ভালবাসিস!

রজতের প্রত্যেকটি কথা এত স্পষ্ট, এত ধারালো, এত সত্যপ্রতিজ্ঞ যে সৌরেন আর কোন উত্তর দিতে পারল না, নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল রজতের থমথমে মুখের দিকে, বোঝবার চেষ্টা করল তার অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে লণ্ডনের বুকে।

যে ক'দিন এলিজাবেথ লণ্ডনে ছিল না সৌরেন প্রায় রোজই গেছে রজতের সঙ্গে দেখা করতে। হয় তারা মিলিত হয়েছে 'সোহো'র অতি পরিচিত কফি বারে কিংবা লরাদের আস্তানায়, আবার কখনও বা ট্রাফালগার স্কোয়ারের পাথরে বসে দুজনে লক্ষ্য করেছে স্টিভ্‌স্‌-এর ব্যবসায়ী কায়দা। আর নয়ত মাইকেলের কাজে সাহায্য করার জন্যে রজত যখন পথচারীদের সামনে টুপি বাড়িয়ে দিয়ে পয়সা সংগ্রহ করত, অদূরে দাঁড়িয়ে থাকত সৌরেন। দেখত তার এতদিনের বন্ধুকে নতুন পরিবেশে, নতুন উদ্দীপনায়।

এই প্রথম সৌরেন বুঝতে পারল কেন এতদিন রজতকে তার ছন্নছাড়া বলে মনে হয়েছে। রজতের ভেতরের সঙ্গে বাইরের কোন পার্থক্য নেই। সে মনে যা ভাবে মুখে তাই বলে, কাজে তাই করে। যুক্তি দিয়ে বিচার না করে কোন কথাকেই সে সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নয়। সংস্কারের দোহাই পেড়ে যারা যুক্তিহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়, রজত তাদের উপহাস করে। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ বিচারের মাপকাঠি তার নিজের মনে, অন্যের ধার-করা দাঁড়িপাল্লায় সে সত্য মিথ্যে ওজন করতে নারাজ। সেইজন্যেই বোধ হয় বাইরে থেকে দেখলে সবাই রজতকে ভুল বোঝে, যেরকম সৌরেনও এতদিন বুঝে-ছিল।

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের আর পাঁচটা ছেলের মতই মামুলি চিন্তাধারা সৌরেনের, সে চিন্তাধারায় কোন মৌলিকতা ছিল না। সৌরেনের পৃথিবী ছোট, কত-গুলো ধারণার বশে নিজের মনেই সে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই ধারণাগুলো বিশ্বাসযোগ্য কিনা এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি তার মনে এতদিন। কিন্তু রজতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেশার পর তার সেই ছোট্ট পৃথিবীতে জিজ্ঞাসার ঝড় উঠল। শান্ত প্রকৃতির রাজ্যে হঠাৎ ঝড় ওঠে নিমেষের মধ্যে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়, কিন্তু এ বিশৃঙ্খলতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। ঝড় বয়ে যাবার পর মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ উদ্ভা-সিত হয়ে ওঠে। সৌরেনের চিন্তারাজ্যের ঝড়ও তার মনের বহু আবর্জনাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার মনের আকাশে কতগুলো প্রশ্ন তারার মত জ্বলতে লাগল দিবারাত্র।

যে প্রশ্ন তাকে সবচেয়ে বেশী উদ্ব্যস্ত করে তুলল সে বোধ হয় মানুষের এই চিরন্তন প্রশ্ন, নিজেকে জানবার একান্ত বাসনা। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সৌরেন ভাববার চেষ্টা করেছে কে সে? কী তার পরিচয়? অমুকের ছেলে, অমুকের ভাই, এই যদি তার পরিচয় হয় তবে কি তার নিজের সত্তার কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচয় নেই?

আত্মীয়তার সমস্ত বন্ধন থেকে রজত নিজেকে মুক্ত করেছে, নিজেকে উপলব্ধি করার জন্যে। রজতের সংগে তুলনা করে নিজেকে বড় ছোট মনে হল সৌরেনের। এতদিন পর্যন্ত সে যে সমাজের বেড়া আর সংস্কারের ধমক শুনে দিন কাটিয়েছে, সে কথা ভাবতেই মনে মনে সংকুচিত হয়ে উঠল। গুরুজনদের সে বরাবর ভক্তি করেছে, কখনও যাচিয়ে দেখে নি সে গুরুজন ভক্তি পাবার যোগ্য কিনা। ছোটদের সে স্নেহ করেছে, ভেবেও দেখে নি সেখানে মনের সাড়া আছে কি না। নিজেকে বিচার করতে গিয়ে সৌরেন দেখল রজত যা বলে তা মিথ্যে নয়। মা, দাদা, ভাই, আত্মীয় স্বজন কারুর সংগেই ত সে মন খুলে মিশতে পারে নি। কোথায় যেন একটা মিথ্যের আবরণ রয়ে গেছে। এই যে স্নেহ প্রীতি ভালবাসা যা মানুষের জীবনের পরম সম্পদ তাও তো তা হলে নির্ভেজাল নয়। প্রয়োজনের খাতিরে সেখানেও যে আমরা খাদ মিশিয়ে থাকি। রজতের জোরালো মতামতগুলো সৌরেনের চিন্তাধারায় যে তরংগের সৃষ্টি করেছিল, তারই বিপরীত দিকে সাঁতার কাটতে গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ল সৌরেন। মনের মধ্যে দেখা দিল অবসাদ।

তবে কি এলিজাবেথের সংগে তার যে আলাপ গড়ে উঠেছে তাও শুধু বাইরের? এ আলাপের কি কোন গভীরতা নেই? শুধু লোক-দেখানো প্রেমের অভিনয়। এলি-জাবেথকে না পেলে সত্যিই কি তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে! কই, মনের দিক থেকে কোন সাড়াই তো সে পেল না। বিপুল বিস্ময়ে আত্মসমীক্ষায় প্রবৃত্ত হল সৌরেন। মনে মনে ভাবল, রজতের সংগে এভাবে না মিশলেই বোধ হয় ভাল হত।

ইতিমধ্যে একদিন দেখা হয়েছিল পল্টুর সংগে। এখনও তার চাকরি হয় নি, কিন্তু আশাও ছাড়ে নি সে, আগের মতই জোরের সংগে বলে, তুমি কিছু ঘাবড়ো না সৌরীদা, একটা না একটা ঢিল ঠিক লেগে যাবে, কম ইণ্টারভিউ ত দিই নি।

পল্টুর কথা শুনলে সত্যিই আশ্চর্য হয় সৌরেন। বাংলা দেশের দমে-পড়া আব-হাওয়ায় মানুষ হয়েও কোথা থেকে এই উজ্জ্বল আশাবাদকে সে বাঁচিয়ে রাখল মনের মধ্যে।

—তোর চলছে কি করে?

পল্টু প্রাণখোলা হাসি হাসল, চলে যাচ্ছে কোনরকমে। আজকাল এক নতুন ফন্দি বার করেছি, আমাদের হোস্টেলের মালিক দারা সিং-এর শাকরেদি করছি।

—তার মানে?

—ওর হয়ে বাজার করে দি, ফাইফরমাশ খাটি। তাই থাকা-খাওয়াটা এখন বিনা পয়সায়। আর এদিক ওদিক ছোটখাট কাজ করে হাতখরচাটা চালিয়ে নি, আর কি।

সৌরেন কথার খাতিরে জিজ্ঞেস করে, এতদিন চেষ্টা করেও কোথাও সুবিধা করতে পারলি না?

পল্টু সহজ গলায় উত্তর দিল, দু-এক জায়গায় যে পাই নি তা নয়, তবে বিশেষ কোন prospect নেই।

সৌরেন ইচ্ছে করেই ঠুকে কথা বলে, হ্যাঁ, তুই তো আবার আমাদের মত কেরানী হবি না।

—মরে গেলেও না। মজা কি জান, মলিদি ছাড়া কেউ আমাকে বুঝতে পারে না। কি আমার স্বপ্ন, কি আমি হতে চাই।

সৌরেন অনেকদিন থেকেই মলিনা দাসের কোন খবর পাচ্ছে না বলেই জিজ্ঞেস করল, তোমার দিদিটি কোথায়?

—ফ্রান্সে।

—একলা?

—তুমিও যেমন, দিদি কখনও একলা থাকতে পারে! সোম সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। এই তো কালই আমি চিঠি পেয়েছি। দিন কয়েক বাদেই লণ্ডনে ফিরছে।

অন্যমনস্ক সৌরেন হঠাৎ বলে, কি জানি, তোমার দিদিটিকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না।

পল্টু হাসল, সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা না করাই তো ভাল। তারপর নিজের মনেই বলে, দিদি ফিরে এলে ক'দিন বেশ খাওয়া-দাওয়া হবে।

সৌরেনের আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না, বলে, চলি পল্টু, আবার পরে দেখা হবে।

পল্টু হাত নাড়ল, হয়ত দিদির ফ্ল্যাটেই, বাই, বাই।

পথ চলতে চলতে সৌরেন চিন্তা করছিল মলিনা দাসের কথা। সোম সাহেবকে সে দু চোখে দেখতে পারে না, এ কথা সে সৌরেনকে একবার নয়, বারবার জানিয়েছে। অথচ তারই সঙ্গে বেড়াতে চলে গেল ফ্রান্সে। আর কিছুই নয়, সোম সাহেবের আছে টাকা, আছে পদমর্যাদা। মলিনা দাস বিনা খরচায় এতখানি আনন্দ পাবার সুযোগ ছাড়বে কেন? সোম সাহেব বোকা নয়, মলিনা দাস যে তাকে পছন্দ করে না এ কথা সে নিজেও জানে, তবু একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে আর পাঁচজনের চোখে ঈর্ষা জাগিয়ে ঘুরে বেড়াবার লোভ সে সামলাতে পারে না।

সৌরেন মিলিয়ে দেখল রজতের কথা নির্ভুল। প্রয়োজনের খাতিরে নিজেদের সুবিধেমত আমরা অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নি। তার সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ওই একই কারণে পল্টু মলিনা দাসকে দিদির আসনে বসিয়েছে, যদি তাকে দিয়ে কিছু সুবিধে হয়। কে বলতে পারে, পল্টুকে ভাই হিসেবে কাছে টেনে নেওয়ার পেছনে মলিনা দাসের আর কোন মতলব আছে কি না।

ঠিক এভাবে সমালোচনা করে আগে কখনও ভাবতে শেখে নি সৌরেন, কিন্তু এখন, রজতের অনুকরণে চিন্তা করতে গিয়ে ক্রমশ যেন জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। ইচ্ছে করে সে একদিন দেখা করতে গিয়েছিল ব্রেনহিম ক্রেসেণ্টের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। সেই বেঁটে কেষ্ট, সেই বাজপেয়ী, সেই বাঁড়ুজ্জে, আগের মত ঘরে বসে আড্ডা মারছে, হো-হো করে হাসছে। এক-এক কথায় যে-কোন রাজনৈতিক মতবাদকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। কি প্রচণ্ড কলরব, কি যুক্তিহীন তর্ক!

আধ ঘণ্টার বেশী বসতে পারল না সৌরেন।

বেঁটে কেষ্ট ঠাট্টা করে বললে, কি সাহেব, এখুনি উঠছ? আমাদের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করছে না?

বাজপেয়ী কথার চিমটি কাটল, নিশ্চয় তোর সুন্দরী বান্ধবী এ-পাড়ায় কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তাই তুই সময় কাটাতে আমাদের আড্ডায় ঘুরে গেলি।

একজন কেউ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, বিয়েটা কবে দাদু?

আরও কি সব যেন তারা বলল, হাসল নিজেদের মধ্যে, সৌরেন কিন্তু কোন কথায় কান না দিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

ভাবতে আশ্চর্য লাগল, একদিন সে নিজেও ওই বেঁটে কেষ্টদের মতই ছিল। ওইভাবেই আড্ডা মেরেছে, সকলকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে, পাঁচজনের নামে কুৎসা রটিয়েছে। ভাগ্যিস সে এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল, তা না হলে আজও নিজেকে

বোঝবার চেষ্টা করত না সে। রজতের মতই তার মনে প্রশ্ন জাগল, কেন এই বে'টে কেষ্টর দল বিদেশে আসে? কেন তারা কলকাতায় বসে রকবাজি করল না? এত কষ্ট করে এত দূর দেশে এসেও এদেশের কোন ভাল জিনিসটাকেই এরা নিল না। এক-খানা ছোট্ট ঘরের মধ্যে কলকাতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে পায়রার মত নিজেরা বকম বকম করে। চোখ খুলে পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে দেখার শক্তি নেই। ভালকে ভাল বলে স্বীকার করার সাহস নেই মনে। যেসব কুসংস্কার, ভুল ধারণা, মিথ্যে অহংকার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সেগুলোকেই সযত্নে মনের মধ্যে পুষে রেখে ফিরে যাবে কলকাতায়। তখন হয়ত বিলেতফেরত বলে আগের মত রকে বসে আড্ডা মারতে অহমিকায় বাধবে, কিন্তু মিথ্যে ইন্টেলেকচুয়ালের ভান করে কফি-হাউসে বসে এই রকমই পরনিন্দা আর পরচর্চা করতে এতটুকু তাদের লজ্জা করবে না।

ঠিক এই রকম যখন সৌরেনের মনের অবস্থা, হঠাৎ এক সন্ধ্যায় টেলিফোন এল মীনাক্ষীর কাছ থেকে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

মীনাক্ষীর শান্ত মধুর কন্ঠস্বর, আজ সন্ধ্যায় খালি আছ সৌরেন?

আছি, কেন বল।

—আমার বাড়িতে এস, একটা সুখবর দেবার আছে।

তুমি যখন নিজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ নিশ্চয় আসব।

—একথা এখনও কাউকে জানাই নি, ভাবলাম তোমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, তুমি আমায় ঠিক বুঝতে পারবে।

সৌরেন ছোট্ট উত্তর দিল, সে আমার সৌভাগ্য।

অনেকদিন বাদে মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বর আগের মতই মিষ্টি শোনাল সৌরেনের কাছে। বড় সহজ, সরল। আজ সন্ধ্যেবেলায় বিশেষ কিছু তার করবারও নেই, মনে মনে সে খুশী হল মীনাক্ষীর কাছ থেকে এ আমন্ত্রণ পেয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে প্রশ্ন জাগল, মীনাক্ষী তাকে কি সুখবর দিতে চায়।

মীনাক্ষীর সুখবরটি যে কি হতে পারে, তা মনে মনে আঁচ করে রেখেছিল সৌরেন, তাই সন্ধ্যেবেলা মীনাক্ষী যখন জানাল পীয়েরকে সে বিয়ে করবে বলে মনঃস্থির করেছে, সৌরেন এতটুকু বিস্মিত হল না। শুধু বিস্মিতই নয়, মনের দিক থেকে বিচলিতও সে হয় নি। কিছুদিন আগে হলেও এ-সংবাদে নিশ্চয় সে মর্মাহত হত। যে মীনাক্ষীর সঙ্গে তার যৌবনের উন্মেষে আলাপ হয়েছিল, যার সঙ্গলাভের আশায় কলকাতায় তাদের বাড়ি প্রতি সন্ধ্যায় সে হাজিরা দিয়েছে, যাকে পাবার লোভে সুদূর লণ্ডন পর্যন্ত সে ছুটে এসেছিল, আজ সেই মীনাক্ষী একটি বিদেশী ছেলেকে স্বামিত্বে বরণ করতে যাচ্ছে শুনেও এতটুকু ব্যথিত হল না, বরং প্রসন্নমুখে বলল, কনগ্র্যাচুলেশন।

—আমি জানতাম তুমি শুনে খুশী হবে; আগের সেই অতিপরিচিত মেয়ে-টির মত মীনাক্ষী খুশীতে উজ্জ্বল চোখ তুলে কথা বলল।

মীনাক্ষীকে দেখতে বড় ভাল লাগল সৌরেনের, সারা দেহে তার চঞ্চলতার জোয়ার। এক সময় বলল, মনে পড়ে মীনাক্ষী, কি ছেলেমানুষ আমরা ছিলাম, তোমাদের মামার বাড়ির অন্ধকার ছাদে বসে যখন তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতাম। তখন কে ভেবেছিল এত দূর দেশে এসে আবার আমাদের দেখা হবে।

অন্যমনস্ক মীনাক্ষী নিজের মনে বিভোর হয়েছিল, সৌরেনের কথা কানে যেতেই উত্তর দিল সে দিনগুলোও বড় চমৎকার কেটেছিল সৌরেন।

কথাটা আশ্চর্য শোনাল সৌরেনের কানে, তোমার তাই মনে হয় নাকি!

মীনাক্ষী বড় বড় চোখ মেলে তাকাল, কেন তোমার মনে হয় না?

সৌরেনের চোখ-মুখের চেহারা হঠাৎ যেন বদলে গেল, মুখে ফুটে উঠল অতি বিজ্ঞের হাসি, বলল, আমার মনে হয় ওগুলো ছেলেমানুষি।

মীনাক্ষী জোর দিয়ে বলে, হক না ছেলেমানুষি, তাতে ক্ষতি কি! হয়তো ওই ছেলেমানুষিরও দরকার ছিল, নিজেকে বোঝাবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে, যে আজকে যা করছি সেটা ছেলেমানুষি নয়।

আড়ষ্ট হাসল সৌরেন, ওইখানেই আমরা ভুল করি মীনাক্ষী, বর্তমানটা সব সময় আমাদের বিভ্রান্ত করে। কে বলতে পারে আজকেও আমরা ছেলেমানুষি নিয়ে মেতে নেই?

সৌরেনের কথাগুলো বড় তির্যক শোনাল। মীনাক্ষী অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত স্বরে বলে, আমি বুঝতে পারছি সৌরেন, তুমি ভাবছ আজ আমি যে ঘর বাঁধার সংকল্প করেছি সেটাও ছেলেমানুষি। এ সংশয় আমার মনেও ছিল, তাই দাদুকে চিঠি লিখেছিলাম। দাদুর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে বুঝেছি আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

মীনাক্ষীর দাদুকে সৌরেন কোনদিনই বুঝতে পারে নি, মনে হত কিরকম যেন বেয়াড়া ধরণের কথাবার্তা। কোন কথাই সোজা ভাবে বলেন না, মীনাক্ষীর সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করতে যাওয়া উনি যে পছন্দ করেন না তা সৌরেন মনে মনে ভাল করেই জানত। মীনাক্ষীর সেই দাদু যে পীয়েরের সঙ্গে বিয়েতে সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন তা জেনে কিছুটা অবাক হল সৌরেন। তবু সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, মীনাক্ষী তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, জীবনে অভিজ্ঞতাও পেয়েছ অনেক রকম, তাই মনে হয় না আমাদের দেশের মামুলি মেয়েদের মত ভাবপ্রবণতার বশে কোন বেঠিক কাজ করে বসবে। তবে এইটুকুই অনুরোধ—মোহকে প্রশ্রয় দিয়ো না। যদি কোনদিন মনে হয় ভুল করেছ তা স্বীকার করার সৎ সাহস যেন থাকে।

মীনাক্ষী কোন কথা না বলে একদৃষ্টে সৌরেনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সৌরেন অস্বস্তি বোধ করে, কি দেখছ?

—তোমাকে।

—তার মানে?

মীনাক্ষী মৃদু হাসল, তুমি যে কখনও এ রকম গুছিয়ে কথা বলতে পারবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

—তোমার সামনে আর কথা বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? বরাবর তুমিই ছিলে বক্তা, আমি শ্রোতা।

—আমি তা বলি নি সৌরেন, ঠিক এ ধরণের কথা তুমি আগে কখনও বলতে না। কেন জানি না আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এতদিন লণ্ডনে থেকে তুমি সিনিক হয়ে গেছ।

সৌরেন সগর্বে বললে, সিনিক কি না জানি না, তবে আগের মত আর ভাবাবেগের বশে কাজ করি না। সব কিছুই যাচিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

মীনাক্ষী স্থির গলায় বলল, কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় আমাদের পক্ষে

তা বিচার করে বোঝা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুক্তিবাদীরা যতই বড়াই করুন কার্যকারণ সম্বন্ধ বার করতে গিয়ে অনেক সময় তাদেরও যে হার মানতে হয়, তুমি আমি তো কোন ছার।

সৌরেন মীনাক্ষীর কথাগুলো ভাল করে না শুনেই উত্তর দিল, সে তুমি যাই বল মীনাক্ষী, বুদ্ধির আলোতে পথ চলতে শিখে বুঝতে পারছি যে হৃদয়ের রাজত্ব বড় গোলমেলে। যুক্তিহীনতার দোহাই দিয়ে অনেক আবর্জনা সেখানে এসে ঢুকে পড়ে। আমি তা থেকে মুক্তি পেতে চাই। মানুষ হতে চাই।

সৌরেনের শেষের কথাগুলোয় বিষাদের সুর বেজে উঠল।

ইচ্ছে করে উঠে পড়ল মীনাক্ষী, প্রসঙ্গ বদলে বলে, তোমার জন্যে মুরগীর কারি রেঁধেছি, নিয়ে আসি। তুমি তো মুরগী খেতে খুব ভালবাসতে।

সৌরেন হাসে, এখনও মনে আছে!

—আমি সহজে কিছু ভুলি না।

মীনাক্ষী খাবার আনতে গেল পাশের ঘর থেকে। সৌরেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, পীয়ের আসবে না?

—বোধ হয় না, এলেও রাত করে। লণ্ডনের বাইরে গেছে।

—অফিসের কাজে?

—হ্যাঁ। পরশু থেকে ওর ছুটি।

—তাই নাকি, বিয়েটা কবে?

মীনাক্ষী ততক্ষণে ডিশ নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে, আস্তে আস্তে বলল, কাউকে বলতে পাবে না কিন্তু, কথা দাও।

সৌরেন হেসে বলল, না, বলব না।

—এই সোমবার আমি আর পীয়ের কন্টিনেন্ট যাচ্ছি, বেড়াতে। বিশেষ করে বেলজিয়ামে, ওর বাবা মার সঙ্গে আলাপ হবে। তারপর লণ্ডনে ফিরে এসে বিয়ে করব।

—সোমবার ক'টায় ট্রেন? স্টেশনে যাব তোমাদের 'সী অফ্' করতে।

—কেন মিথ্যে কষ্ট করবে। আমাদের ইচ্ছে কাকপক্ষীকে জানতে না দিয়ে চলে যাওয়া।

সৌরেন ডিশের উপর মাংস তুলে নিতে নিতে বলে কিন্তু আমি যে জেনে গেলাম।

মীনাক্ষী শান্ত চোখ মেলে, উত্তর দিল, ইচ্ছে করেই যে বললাম তোমায়। মীনাক্ষীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে সৌরেন বিস্মিত হল সে চোখের দৃষ্টিতে আন্তরিক সহানুভূতি, কত কথাই সে যেন আজ বলতে চায়। অতি ধীর স্বরে বলল, আমি জানি সৌরেন, তুমি আমাকে বরাবর ভুল বুঝেছ। আমার কথা ভেবে মিথ্যে অভিমানে কষ্ট পেয়েছ, সবই আমি বুঝি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝি আমাদের ভেতরকার অন্তর্লীন মহত্ত্বকে মহাপ্রাণতার পর্যায়ে ফুটিয়ে তোলার জন্যে যে করুণাধারার প্রয়োজন তার সন্ধান তুমি বা আমি কখনও পাই নি, পাই নি বলে আমাদের জীবনস্রোত এক হতে পারে নি।

মীনাক্ষী চুপ করে যায়, চোখে তার জল ভরে আসে, সামলে নিয়ে বলে, আমার দিক থেকে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই নেই। তোমার অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে যদি আমাকে স্বীকার কর আমি খুশী হব।

মীনাক্ষীর আন্তরিকতায় অভিভূত হল সৌরেন, বলল, তোমার কথা আমার

মনে থাকবে মীনাক্ষী।

খাওয়াদাওয়ার পর সৌরেনকে বিদায় দেবার সময় মীনাক্ষী সংযত কণ্ঠে বলল, আর একটি অনুরোধ তোমার কাছে, জীবনের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন হীনতা, দীনতা, নীচতা অসারতা, সব আছে, কিন্তু ওইগুলোকেই চরম সত্য বলে ভেব না। তাহলেই ভুল করবে। এ কথা এই জন্যে তুললাম, তুমি একটু আগেই বলছিলে হৃদয়ের চেয়ে 'বুদ্ধির ওপর তোমার বেশী আস্থা। কিন্তু আমি ঠিক তার উল্টো দিকটাই ভাবি। কেন আমি পীয়েরকে এত ভালবাসি জান ওর মধ্যে পেয়েছি আমি সেই শক্তির পরিচয় যা তাকে পারিপার্থিবক অসারতা কাটিকে সত্যিকার মনুষ্যত্বলোকে উত্তীর্ণ করতে পারবে। পীয়ের সব সময় হৃদয়ের ডাকে সাড়া দেয়, বিচক্ষণতার নিষেধ সে মানে না।

মীনাক্ষীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ সৌরেন ওই কথাগুলো ভেবেছে। কি আশ্চর্য, রজত যা বলে, মীনাক্ষী ঠিক তার উল্টো কথাগুলো বলে গেল। অথচ একথা সত্যি এগুলো মীনাক্ষীর মুখের কথা নয়, মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে বলেই সে সৌরেনকে অনুরোধ করেছে মানুষের অন্তর্লীন মহত্ত্বকে ভুলে না যেতে, কিন্তু কোন পথটা ঠিক? যুক্তিবাদী রজতের মত প্রতি পদক্ষেপ বিচার করে সে এগিয়ে চলার চেষ্টা করবে, না মীনাক্ষীর মত হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বিচক্ষণতার হুমকি না মেনে জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে!

কিন্তু এ নিয়ে আর বেশী চিন্তা করার সুযোগ পেল না সৌরেন। নিজের বাড়িতে পেশছে দেখল দরজা খোলা, ভেতরের বারান্দায় মিসেস হেরিং দাঁড়িয়ে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সৌরেনকে ঢুকতে দেখে মিসেস হেরিং উত্তেজিত স্বরে বললেন, ইনিই মিঃ লাহিড়ী, তিনতলায় থাকেন।

ভদ্রলোক বললেন, গুড্ ইভনিং মিঃ লাহিড়ী। আপনার সঙ্গে দু'একটা দরকারী কথা আছে।

সৌরেন ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে দরকার? কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

মিসেস হেরিং বলে দিলেন, উনি পুলিসের লোক।

সৌরেন চমকে উঠল, পুলিস, কি ব্যাপার?

—আপনারা ড্রইং রুমে গিয়ে বসুন ওখানে কেউ নেই।

অজানা আশঙ্কায় সৌরেনের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে না পুলিস আসার কি কারণ হতে পারে। ড্রইং রুমে ঢুকে তারা পাশাপাশি সোফার উপর বসল।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, মিস্ এলিজাবেথ হোপকে আপনি চেনেন?

পুলিসের লোকের মুখে এলিজাবেথের নাম শুনে আরও ভয় পেল সৌরেন, কেন তার কি হয়েছে?

—তাঁর কিছু হয় নি, মিসেস হেরিং-এর কাছে শুনলাম তিনি এখন লণ্ডনে নেই।

—না। এলিজাবেথ তার গ্রামের বাড়িতে গেছে।

—কবে?

—গত শনিবার।

—ফেরবার কথা?

—আগামী রবিবার সন্ধ্যেবেলা।

ভদ্রলোক নোট বই-এ উত্তরগুলো লিখে নিচ্ছিলেন। সৌরেন কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, যদি আপত্তি না থাকে বলবেন কি মিস্ হোপের বিষয়ে এসব খবর নিচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোক নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, কেন, আপনি কাগজে পড়েন নি?

—কি!

—মিস্ হোপের কাকা খুন হয়েছেন।

সৌরেনের শরীর অবশ হয়ে যায়, কাকা মানে, মিঃ লিণ্ডসে হোপ, মে ফেয়ারে যাঁর দোকান?

—হ্যাঁ, উনিই।

এলিজাবেথ সম্বন্ধে আরও দু'চারটে প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। যাবার সময় একটা কার্ড দিয়ে বলে গেলেন, মিস্ হোপ লণ্ডনে এলেই যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গুড নাইট।

গুড নাইট।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর সৌরেন কিন্তু আর উপরে উঠল না। ছুটল ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেড টিউব স্টেশনের দিকে, খবরের কাগজের সন্ধানে। সত্যিই তো আজ সারাদিনে তার কাগজ পড়ার সময় হয় নি।

দু'তিনখানা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় লিণ্ডসে হোপের ছবি বেরিয়েছে, সেই সঙ্গে তার হত্যার বিবরণী। রিপোর্টগুলো গুছিয়ে নিলে এই দাঁড়ায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক লিণ্ডসে হোপ পরশুদিন সন্ধ্যেবেলা দোকান থেকে ফিরে নিজের মে ফেয়ারের ফ্ল্যাটে স্নান করছিলেন, রাত্রে কোথাও ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। এই সময় কোন এক অপরিচিত আগন্তুক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। পরিচারিকা আগন্তুকের কাছ থেকে কার্ড নিয়ে উপরে যায়, লিণ্ডসে হোপ তখন সবে স্নান সেরে বেরিয়ে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পরিচারিকার হাত থেকে কার্ডটি নিয়ে বিরক্ত স্বরে লিণ্ডসে হোপ বলেন, বলে দাও এখন আমার ওর সঙ্গে দেখা হবে না, আমি ব্যস্ত।

পরিচারিকা জানায়, ভদ্রলোক বড় কড়া মেজাজের, উনি বলছেন দেখা না করে যাবেন না।

লিণ্ডসে হোপ রেগেই বলেন, না, না। এখন দেখা হবে না।

পরিচারিকা আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসে, আর আগন্তুককে মৃদু স্বরে তার প্রভুর বক্তব্য জানায়।

ভদ্রলোক কিন্তু সে কথায় কান দিলেন না, দাঁত কড়মড় করে বলেন, আজই আমি লিণ্ডসে হোপের সঙ্গে দেখা করব। এখুনি।

আগন্তুক অভদ্রভাবে পরিচারিকাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। পরিচারিকা এ ধরনের ব্যবহার মোটেই আশা করে নি। প্রথমে সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই আগন্তুকের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে ওঠে এবং চেঁচিয়ে বলে, দোহাই আপনার, ওপরে যাবেন না।

বলা বাহুল্য, তাতে কোন ফল হল না, পরিচারিকা উপরে উঠবার আগেই আগন্তুক লিণ্ডসে হোপের ঘরে ঢুকে গেছে।

লিণ্ডসে হোপ তখনও ড্রেসিং গাউন পরে দাঁড়িয়ে, আগন্তুককে দেখে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

পরিচারিকা ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার বাধা না মেনে এ ভদ্রলোক জোর করে ওপরে উঠে এসেছেন।

লিন্ডসে হোপ নিজেকে সংযত করে গম্ভীর গলায় বলেন, ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি।

পরিচারিকা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চলে আসে। তারপর সে রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। এ ঘরে লিন্ডসে হোপও আগন্তুকের মধ্যে কি কথা হয় সে জানে না। প্রায় আধঘণ্টা বাদে হঠাৎ তার মনে হয় যেন বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল। পর পর তিনটে গুলী ছোঁড়ার শব্দ। পরিচারিকা ভীত হয়ে পড়ে। হাতের কাজ রেখে দিয়ে ভয়ে ভয়ে সে বাইরের ড্রইং রুমের দিকে এগিয়ে যায়। সে জানত লিন্ডসে হোপ প্রচন্ড বদরাগী লোক, হয়ত আগন্তুকের এ অনধিকার প্রবেশ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ওঁর আলমারিতে যে সব সময় রিভলবার থাকত তাও পরিচারিকার জানা ছিল। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে।

কিন্তু ঘরের কাছে এসে সে দেখে দরজা খোলা, অতি সন্তর্পণে ভেতরে ঢোকে। একটু এগিয়েই বুঝতে পারে, কোচের ওপর লিন্ডসে হোপ অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, ঘরে আর কেউ নেই। আগন্তুক পালিয়েছে। সোফার কাছে গিয়ে প্রভুর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। ছুটে গিয়ে টেলিফোনে পুলিসকে খবর দেয়।

খবরের শেষে জানান হয়েছে পুলিসের তদন্ত চলছে, এবং তারা মনে করে খুব শিগগির হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারবে।

সৌরেন লন্ডনে এসে থেকে, প্রায়ই কাগজে পড়েছে কোন না কোন হত্যাকান্ডর কথা। খুন, রাহাজানি, ডাকাতির লোমহর্ষক বিবরণী যে খবরের কাগজ যত বেশী দিতে পারে তার বিক্রি ও-দেশে তত বেশী। লন্ডনে পকেটমার ছিঁচকে চোর এ সব নেই সত্যি কথা, কিন্তু নৃশংস হত্যাকান্ড প্রায়ই ঘটে থাকে। অবশ্য পুলিসও খুব তৎপর, অপরাধী ধরা পড়ে, তার সাজা হয়।

আগে সৌরেনের মনে হত এই সব উত্তেজনাপূর্ণ খবরগুলো আদৌ সত্যিকারের ঘটনা কি না। কাগজ বিক্রির ফন্দি করে কাগজওয়ালারা হয়ত এই সব গল্প বানিয়ে লেখে। কিন্তু লিন্ডসে হোপের হত্যাকান্ডের কথা পড়ে সে ভুল তার ভেঙ্গে গেল। রক্তমাংসের এ মানুষটাকে সে চিনত, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, শুধু তাই নয়, এলিজাবেথের সে কাকা। মানুষটা আজ খুন হয়েছে, কারণ এখনও জানা যায় নি। তার জীবনের সঙ্গে কি রহস্য জড়িয়ে আছে কে বলতে পারে।

এ হত্যাকান্ডের বিষয় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে এলিজাবেথের কথা। বড় সহজ সরল মেয়ে, কাকার সঙ্গে তাদের বাড়ির মিলন ঘটতে যাচ্ছে ভেবে কত আনন্দই না সে পেয়েছিল। অথচ এরই মধ্যে এ কি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। শুধু তাই নয়, এলিজাবেথদের বাড়ির সকলকেই বোধ হয় পুলিস জেরা করবে। জানতে চাইবে তাদের পারিবারিক মনোমালিন্যের কথা, হয়ত কাগজে সে সব বিবরণী প্রকাশ পাবে। মনে মনে সৌরেন এলিজাবেথের জন্যে বড় বিচলিত হয়ে পড়ল।

পরের দিন ভোরবেলা তার দরজায় টোকা পড়তে ধড়মড় করে উঠে পড়ল সৌরেন। ড্রেসিং গাউনটা গায় দিয়ে ঘুমভরা চোখে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ।

এলিজাবেথের মুখ শুকনো, বড় ক্লান্ত হাসি। সৌরেন জিজ্ঞেস করল, তুমি

কখন এলে লিজি?

—এখুনি। একটু থেমে প্রশ্ন করে, কাকার খবর তো শুনেছ?

সৌরেন ছোট্ট উত্তর দেয়, হ্যাঁ, কাগজে পড়লাম।

—শুনলাম পুলিসও এসেছিল।

—কে বললে তোমায়?

—মিসেস হেরিং। একটু বাদেই আমি যাব পুলিসে রিপোর্ট করতে। একটু ইতস্তত করে এলিজাবেথ বলে, যদি তোমার সময় থাকে আমার সঙ্গে যাবে?

সৌরেন জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় যাব।

এলিজাবেথ অন্যমনস্ক সুরে বলে, কেন জানি না আমার বড় ভয় করছে।

সৌরেন এলিজাবেথকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে, চেয়ারে বসায়, ভরসা দিয়ে বলে, এতে তোমার কি করবার আছে? পুলিস যা প্রশ্ন করবে তুমি তার সত্যি উত্তর দেবে। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক?

—ঠিক তা নয় সৌরেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ, হাজার হক লিণ্ডসে হোপ আমার কাকা, যদি তদন্তের ফলে তার জীবনের—

এলিজাবেথ থেমে যায়।

সৌরেন বলে, আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি লিজি। আমার মনে হয় না এ নিয়ে এত কিছু ভাববার আছে।

এলিজাবেথ অন্য কথা ভাবছিল, বলল, কাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল অন্তত তিন দিন উনি গ্রামের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে কাটাবেন। কিন্তু চার পাঁচ ঘণ্টার বেশী থাকতে পারেন নি। বললেন, তাঁর খুব বেশী কাজ। লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে। তখনই ওঁর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল উনি খুব বেশী চিন্তিত কোন বিষয় নিয়ে। আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম, কোন উত্তর দিলেন না।

সৌরেন প্রশ্ন করে, তোমার বাবা, কাকার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন?

—রাজী ঠিক হন নি, তবে আগের থেকে নরম হয়েছিলেন অনেকটা। কথা ছিল দিন-পনের বাদে বাবা লণ্ডনে আসবেন, তারপর ঠিক হবে আমরা কাকার ব্যবসায় যোগ দেব কিনা।

একটু থেমে এলিজাবেথ নিজের মনেই বলে, এক সময় নিজেকে বড় 'আন্‌লাকী' মনে হয়।

—কেন?

—কিছুই করতে পারলাম না, যাও বা কাকার সঙ্গে একটা যোগাযোগ হল, তাও কি রকম নষ্ট হয়ে গেল। এ সবের মধ্যে আমার না যাওয়াই উচিত ছিল।

সৌরেন গম্ভীর স্বরে বলে, এ ধরনের সেন্টিমেন্টাল কথা তোমার মুখে শুনব আশা করি নি লিজি। জীবনে যা ঘটবার, তা ঘটবেই, তুমি আমি তার কি করতে পারি। আমি তোমায় বলছি মাথা ঠাণ্ডা করে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। তা'ছাড়া আমি তো তোমার পাশে রয়েছি।

এলিজাবেথ সৌরেনের হাতটা আঁকড়ে ধরে, সত্যি সৌরেন, লণ্ডনে আসার পথে সারা ট্রেন আমি শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। তুমি না থাকলে আমি বোধ-হয় ভরসা করে এই বিপদের কথা জেনেও একলা এখানে আসতে পারতাম না।

সৌরেন গাঢ় চুম্বন এঁকে দিল এলিজাবেথের কপালে। বলল, সুইট লিজি, আমিও তো এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

এলিজাবেথের চোখে জল এসে পড়েছিল, সামলে নিয়ে বলল, চল এবার তৈরি হয়ে নেওয়া যাক।

—আমি মিসেস হেরিংকে বলছি, দুজনের ব্রেকফাস্ট আমার ঘরেই দিয়ে দেবার জন্যে।

এর পর থেকে ক'দিন ধরে সৌরেন এলিজাবেথকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। হয়তো পুলিস স্টেশনে, কখনও বা তাদের নির্দেশ মত লিন্ডসে ফ্যাশান হাউসে, দু-একটি কর্মচারিণীকে সনাক্ত করার জন্যে, এমন কি একবার লিন্ডসে হোপের মে ফেয়ারের ফ্ল্যাটেও তাদের যেতে হয়েছিল। পুলিসকে সব রকম সাহায্য করার চেষ্টা করেছে এলিজাবেথ, কিন্তু সব সময় তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভাব ছিল, কিসের যেন আশংকা। সাহসে ভর দিয়ে ইনস্পেক্টারদের সঙ্গে কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে সে বড় অসহায় বোধ করত। পরামর্শ চাইত সৌরেনের কাছে।

সৌরেন এলিজাবেথকে দেখছে অনেকদিন ধরে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও যথেষ্ট। কিন্তু এই আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন না হলে সৌরেন বোধ হয় এলিজাবেথকে এত গভীরভাবে চিনতে পারত না। এতদিন এলিজাবেথকে সে জানত সহজ আর সরল মেয়ে বলে, কিন্তু সংসারের তিক্ততার সামনে সে যে এতখানি দুর্বল তা সে বুঝতে পারে নি। অসহায়া কিশোরীর মত একমাত্র অবলম্বন হিসেবে সৌরেনকে সে যে সারাক্ষণ আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তা বুঝতে পেরে সৌরেন শুধু তাকে কাছেই টেনে নিল না, তার সব দায়িত্বও স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধের উপর নিল। কিন্তু সৌরেনের কোন সময় মনে হয় নি এ কর্তব্যের ভার সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ে চড়া বৃদ্ধের মত বোঝা হয়ে তার কাঁধের উপর চেপে বসেছে। বরং এলিজাবেথকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে তার মনে নতুন করে ভরসা জাগিয়ে সে অনাবিল আনন্দ পেয়েছে।

শুধু এলিজাবেথকে বুঝতে পারাই নয়, আর একটা সত্য সৌরেন উপলব্ধি করেছে এই ক'দিনে। রজত আর তার সংগীদের সঙ্গে মিশে যে নতুন ধরনের চিন্তাধারার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তা যেন ক্রমে দূরে সরে গেল। সৌরেনের মনে হল রজতদের ফিলসফি তর্ক করার জন্যে ভাল, কিন্তু তাকে কাজে লাগানো যায় না। হয়ত ওমর খৈয়ামী ধরনে বলা সহজ 'নগদ যা পাও হাত পেতে ন্যও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক,' কিন্তু জীবনের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারে তারাই, যারা কাপুরুষ। আজ তার ওপর যে এলিজাবেথের প্রগাঢ় বিশ্বাস, যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, তাকে সে অস্বীকার করবে কোন মুখে? রজতদের মত নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা ভেবে সে যদি এলিজাবেথের দায়িত্ব গ্রহণ করতে না চাইত তবে কি জীবনের বেচাকেনায় তার ক্ষতির অংকটাই বেশী হত না?

প্রথম দিকের উত্তেজনা কেটে যাবার পর লিন্ডসে হত্যাকাণ্ডের চাঞ্চল্য যখন অনেকখানি সহজ হয়ে গেল সকলের কাছে, তখন সৌরেন আর এলিজাবেথ দু'জনে উপলব্ধি করল বিপদের সমুদ্র তাদের দু'জনকে সংসারের নিশ্চিন্ত তীরে একত্রিত করে দিয়ে অনেকখানি দূরে সরে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা বাঁচল। স্বপ্ন দেখল ঘর বাঁধার।

সৌরেন এক সময় প্রশ্ন করে, ঠিক বুঝতে পারি না ক'লকাতায় গিয়ে তুমি

থাকতে পারবে কিনা।

—কেন পারব না?

—ঠিক এখানকার মত ব্যবস্থা তো আমাদের দেশে নেই, জীবনটাও অন্য ধরনের। শেষকালে আমাকে দোষ দিয়ো না।

এলিজাবেথ উঠে এসে সৌরেনের পাশে বসল, আমি জানি, তোমাকে দোষ দেবার কোন সুযোগ পাব না আমি।

—কি করে জানলে?

—ডোরিয়ার কাছ থেকে যে আমি চিঠি পাই।

—তাই নাকি, কই তুমি তো আমায় আগে বল নি।

এলিজাবেথ ব্যাগের মধ্যে থেকে চিঠি বার করতে করতে বলে, ডোরিয়া যখন লণ্ডন থেকে যায় আমি ওকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলাম, ভারত কি রকম লাগছে, সে কথা আমাকে জানাতে। প্রথম চিঠি ও লেখে জাহাজ থেকে, সবে তখন 'রেড সী'তে ঢুকেছে, লিখেছিল বেজায় গরম। ভারতও যদি এই রকম গরম হয়, তা'হলে ওখানে থাকা কণ্টকর হবে। দ্বিতীয় চিঠি ও লেখে কলকাতায় পেঁাছে, পথে বম্বে শহরে হোটেলে থেকে খুব খুশী হয়েছিল ডোরিয়া, মুগ্ধ হয়েছিল সে জয়ের ভারতীয় বন্ধুদের আতিথেয়তায়। কলকাতায় পেঁাছে জয়ের পরিবারে পরিচিত হয়ে সে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছে। বিশেষ করে লিখেছিল জয়ের বাবা-মায়ের কথা। তাদের মনের মধ্যে কোন রকম সংকীর্ণতা সে দেখতে পায় নি। অবশ্য শহরের কয়েকটা জিনিস তার অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব সে দেয় নি।

সৌরেন খুশী হয়ে বলল, যাক, ডোরিয়া যে কলকাতায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে জেনে বড় ভাল লাগল। জয়ের কোন চাকরি হয়েছে কিনা লিখেছে?

—না, এখনও হয় নি। তবে জয় কয়েক জায়গায় ইণ্টারভিউ দিয়েছে।

এলিজাবেথ এবার নিজের মনে হাসে, হাতের চিঠিটা দেখিয়ে বলে, এই হল ডোরিয়ার তৃতীয় চিঠি। একটা জায়গা তোমায় পড়ে শোনাই, বড় মজা করে লিখেছে। এলিজাবেথ পড়তে শুরু করে,

...সত্যি লিজি, এখন তুমি আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। পুরোপুরি আমি হিন্দু ঘরের বউ। খুব গুছিয়ে শাড়ি পরতে শিখেছি। আগের মত আর পিন দিয়ে আটকে রাখতে হয় না। যেদিন এ বাড়ির মেয়ে-নাপিত এসে আমার পায়ে লাল রঙের একটা বর্ডার দিয়ে দেয়, দেখতে বড় মজার লাগে। এ বাড়ির মেয়েরা বলে আমার পায়ে রঙ লাগালে খুব সুন্দর মানায়। জান লিজি, আমি আর চুল খুলে থাকি না, সারাক্ষণ খোঁপা বেঁধে রাখি, সকাল থেকে সন্ধ্যে জয়ের আত্মীয়-স্বজনরা আমায় দেখতে আসে, আবার পাড়ার বন্ধুবান্ধবরাও। এরা সকলেই সাজ-পোশাকের প্রশংসা করে, এক এক সময় নিজেকে রানীর মত ভাগ্যবতী বলে মনে হয়। এতজনের প্রশংসাধন্য হব তা কি আগে কখনও আমি ভাবতে পেরেছিলাম?

এলিজাবেথ এই পর্যন্ত পড়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি, ডোরিয়া সত্যিই সুখী হয়েছে।

সৌরেন মৃদু হেসে বলে, ডোরিয়ার ওই চেহারা দেখে যদি সবাই রানী ভেবে থাকে তা'হলে তো তোমাকে দেখলে নিশ্চয় অপ্সরী ভাববে।

এলিজাবেথ সকৌতুকে বলল, ঠাট্টা করছ বুঝি।

সৌরেন তার হাতের উপর চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বলে, তোমার মত সুন্দরী মেয়ে এ দেশেও যে বিরল। সে কথা তুমিও তো বেশ ভাল করেই জান। তোমার পাশে আমাকে দেখলে বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।

—আঃ সৌরেন, তুমি ভারী দুষ্টু।

সৌরেন হেসে বলল, অনেকদিন বাদে আজ তোমাকে আগের মত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে লিজি, চল বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

সৌরেন ভেবে নিয়ে বলে, চল না, সরোজদার ফ্ল্যাটে গিয়ে নক করি। অনেকদিন দেখা হয় নি। যদি বাড়িতে থাকে গল্প করা যাবে।

এলিজাবেথ উৎসাহ প্রকাশ করে, বেশ, তাই চল। আমি এখনি তৈরি হয়ে আসছি।

সৌরেনরা 'সুইস কটেজে'র ফ্ল্যাটে গিয়ে পেঁছিল সন্ধ্যার একটু আগেই। তখনও রাস্তায় আলো জ্বলে ওঠে নি।

দরজা খুলল অমিতাভ, চোখে মুখে তার খুশিতে উপচে পড়া হাসি। দেখে মনে হল এতক্ষণ কোন হাসির গল্পে মেতে ছিল, ঘন্টির শব্দ শুনে দরজা খোলার জন্য ছুটে এসেছে।

সৌরেনদের দেখে আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল। সৌরীদা, কতদিন বাদে তুমি এলে, মিস হোপ তুমিও আমাদের ভুলে গেছ। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এস।

ভেতরে ঢুকে সৌরেন জিগ্যেস করে সরোজদা কোথায়?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অমিতাভ চেঁচিয়ে ডাকে সরোজদা, দেখে যান কারা এসেছে।

সরোজও চেঁচিয়ে উত্তর দিল, এ ঘরে নিয়ে আয়।

বাইরের ঘরে সরোজ আর লীলা কার্পেটের উপর বসে ছুরি দিয়ে ফলের খোসা ছাড়াচ্ছিল। সৌরেনদের দেখে সহাস্যে অভ্যর্থনা করল।

এলিজাবেথ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার, বিকেলের চা পর্বের আয়োজন চলছে নাকি?

উত্তর দিল লীলা। রাতের জন্য ফ্রুট সালাড করা হচ্ছে।

—আজ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান নেই তো?

—সে রকম কিছু নয়, তবে প্রমীলা আসছে সন্ধ্যার ট্রেনে এখানে উইকেন্ড কাটাতে।

সৌরেন সোৎসাহে বলে, তাই নাকি? কখন আসছে প্রমীলা? খুব ভাল হয়েছে আজকে এসে পড়ে। ওর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে।

এতক্ষণে কথা বলল সরোজ, শুধু দেখাই হবে না সৌরেন, এক সঙ্গে বসে ডিনারও খাবে।

সৌরেন বাধা দিয়ে বলে, না না, তা হয় না, আমরা রবাহুতের মত খেতে বসে গেলে—

—থাক তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না। যা বলছি কর, কাজে লেগে পড়।

এ ঠিক সেই আগের সরোজদা, কর্তৃত্ব করা যেন তাকেই মানায় সবচেয়ে বেশী। গম্ভীর গলায় বলে, অমিত, তুই বাজারে যা, কয়েকটা জিনিস কিনে আনা দরকার। এলিজাবেথ তুমি লীলাকে সাহায্য কর, একেবারে এ-ক্লাশ ফ্রুট সালাড হওয়া চাই। সৌরেন বাসনগুলো মেজে ফেল।

সৌরেন হাসতে হাসতে বলে, ও তো আমার বাঁধা কাজ।

—আমি মাংস চড়িয়ে দিচ্ছি।

লীলা ব্যস্ততা দেখিয়ে বলে, দোহাই আপনার, সরোজদা। মাংসের স্বাদ তৈরি করতে গিয়ে একশো রকমের গুঁড়ো লঙ্কা ছেড়ে দেবেন না। তা'হলে আর বেচারী এলিজাবেথ মুখে দিতে পারবে না।

সরোজ তাকেও থামিয়ে দেয়, যে যার হাত চালিয়ে কাজ কর। সব কিছু যাতে আটটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ন'টার সময় স্টেশনে যেতে হবে প্রমীলাকে আনবার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুইস কটেজের ফ্ল্যাটে আবার সেই আগের মত হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কে বলবে অনেকদিন বাদে আজ তারা মিলিত হয়েছে সরোজের বাসায়। আগের মত সেই হাসি ঠাট্টা গল্প-গুজব।

সরোজ রান্না করতে করতে গান করছে গুন গুন করে। সৌরেন ডিশ ধুতে ধুতে তাল দেবার চেষ্টা করছিল।

লীলা পাশের ঘর থেকে হুঁশিয়ার করে দিল দেখো সৌরেন সংগীত-প্রীতি দেখাতে গিয়ে ডিশ ভেঙ্গে ফেলো না, গেরস্তর ক্ষতি হবে।

সৌরেন হেসে উত্তর দিল, আমার সে খেয়াল আছে, ভয় তোমাদের নিয়ে, দেখো মেয়েলী গল্প করতে করতে একবারের জায়গায় তিনবার নুন দিয়ে ফেলো না ফ্রুট স্যালাডে, তা হলে আর মুখে দেওয়া যাবে না।

অমিতাভ বাজার করে ফিরল আধঘণ্টার মধ্যে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসেছে, অথচ একটা জিনিসও ভোলে নি। ফর্দ মিলিয়ে বাজার করেছে।

সরোজ চেঁচিয়ে বলল, ফুল মার্কস ফর অমিতাভ।

সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলল সৌরেন, হিপ হিপ হুররে।

ওদের চেঁচামেচির ধরনে হেসে উঠল সকলে।

এলিজাবেথ এক সময় মৃদুস্বরে বলল, তুমি হয়তো জান না লীলা, এতদিন বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে আমার দিন কেটেছে, আজ এখানে এসে খুব ভাল লাগছে।

লীলা বলল, তোমরা এসেছ বলেই এত জমেছে আজ। নইলে আমাদের চুপচাপই কাটে।

—ঠিক মনে হচ্ছে সেই 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের রিহার্সালের সময় যে রকম আমরা আনন্দ করতাম, আজও যেন সেই রকম আনন্দ করছি।

লীলা অন্যমনস্ক সুরে বলে, সত্যি, সেই সুখের দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

—আবার একটা উৎসবের আয়োজন করলে হয়।

এলিজাবেথের কথায় ছেলেমানুষী সুর, সে যে কিছু ভেবে কথাটা বলেছে তা বলে মনে হয় না। শুনে লীলা না হেসে পারল না। সরোজকে উদ্দেশ্য করে বলল, শুনছেন এলিজাবেথ কী বলছে?

—কি? সরোজ মুখ তুলে তাকাল।

—আবার কোন নাটকের রিহার্সাল শুরু করতে।

সরোজও হাসল, নাটক? কী উপলক্ষ্যে?

উত্তর দিল অমিতাভ, সে একটা উপলক্ষ্য খুঁজে বার করলেই হবে। আমি কিন্তু এলিজাবেথকে পূর্ণ সমর্থন করছি। একটা কিছু করা দরকার, বড্ড যেন কি রকম মিইয়ে গেছি আমরা।

বেশ কিছুক্ষণ এই নিয়ে পরামর্শ চলল, দেখা গেল সত্যি কথা বলতে কি, কারুরই বিশেষ অমত নেই। কোন একটা অনুষ্ঠান হলে মনে মনে সকলেই খুশী হয়।

শুধু সরোজ আপত্তি তুলে বলে, ভাঙ্গা হাটে আর কী আসর জমবে?

সমবেতভাবে সকলে উত্তর দেয়, নিশ্চয় জমবে। আজ প্রমীলা এলে ওকে বলা যাক, মনে হয় প্রত্যেক উইকেন্ডে প্রমীলাও রিহার্সাল দিতে পারবে।

—তা হলে অবশ্য আমার আপত্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে সৌরেন সোচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল, থ্রি চিয়ার্স ফর সরোজদা। অন্যরাও সাড়া দিয়ে বলে, হিপ হিপ হুররে।

শুধু উচ্ছ্বাসই নয় সবাই মিলে আলোচনা শুরু করে দিল, কী ধরনের অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে পরিশ্রম বেশী হবে না, অথচ বেশ হৈ চৈ করা যাবে। বাইরে কোন হল ভাড়া নিয়ে খরচা বাড়িয়ে লাভ নেই, তার চেয়ে কারুর বাড়িতেই ঘরোয়া-ভাবে আয়োজন করা ভাল। বেশী বাইরের লোক না ডেকে, চেনাশোনার মধ্যে থেকে শিল্পী নির্বাচন করতে হবে।

এ আলোচনা হয়তো চলত অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু হঠাৎ একটা টেলিফোন আসায় তা বন্ধ হয়ে গেল।

টেলিফোন এসেছিল কার্ডিফ থেকে।

সরোজ ইঙ্গিতে অন্যদের চুপ করিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, হ্যাঁ, আমি সরোজ রায় কথা বলছি। হ্যাঁ, বলুন। কার মেসেজ? ও মিস চৌধুরী আজ আসতে পার-বেন না? কি হয়েছে ওর? ভাবনার কিছু নেই তো ঠিক আছে, মিস চৌধুরীকে বলবেন আমরা চিঠি দেব। খবর দেওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

সরোজ আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

তার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে লীলা উদ্বিগ্ন স্বরে জিগ্যেস করল কী হয়েছে প্রমীলার?

সরোজ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, প্রমীলার জ্বর হয়েছে। ও ভেবেছিল লণ্ডনে আসতে পারবে তাই আগে কোন খবর দেয় নি, কিন্তু ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বারণ করেছে। ওর হোস্টেল থেকে মেসেজ দিল।

—ভয়ের কিছু নেই?

—বলল তো না। সামান্য জ্বর, সামনের সপ্তাহে লণ্ডনে ঠিকই আসতে পারবে।

নিমেষের মধ্যে কলরব থেমে গেল। যে আনন্দস্রোত জোয়ারের তেজে ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠছিল, হঠাৎ যেন তাতে ভাঁটা পড়ল। যে গৃহ সারি সারি প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে জ্বলছিল, হঠাৎ যেন দমকা ঝড়ের ফলে তা অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে গেল।

অনেক দূর থেকে ক্লান্ত স্বর ভেসে এল সরোজের। আর রাত বাড়িয়ে

কি হবে? রান্না তো হয়েই গেছে, যে যার খেয়ে নাও।

একবারও কেউ উত্তর দিল না। সবাই চুপ করে বসে থাকে।

পরের সপ্তাহেও প্রমীলা লণ্ডনে আসতে পারল না। শুধু তাই নয়, খবর এল শরীর আরও খারাপ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ সংবাদে সরোজরা চিন্তিত হয়ে পড়ল, স্থির হল লীলা আর অমিতাভ কার্ডিফে গিয়ে প্রমীলার সঙ্গে দেখা করে আসবে, খোঁজ খবর নেবে ডাক্তারদের কাছে। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় সরোজ ওদের সঙ্গে যেতে পারবে না।

কিন্তু সরোজ কার্ডিফে গেলেই বোধ হয় ভাল করত। লীলাদের পাঠিয়ে মনে সে এতটুকু শান্তি পায় নি, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে কখন তারা ফিরে আসবে কি খবর দেবে তাই জানবার জন্যে। প্রমীলার জন্যে তার মন যে এতখানি চঞ্চল হয়ে উঠবে তা সরোজ রায়ের নিজেরই জানা ছিল না। এই প্রথম সে বুঝতে পারল প্রমীলার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ এতদিন গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে আর কারুর তুলনা করা ভুল। সরোজের জীবনে প্রমীলার স্থান স্বতন্ত্র, সে একক বোধ হয় অদ্বিতীয়।

লীলারা কিন্তু ফিরে এল নিশ্চিন্ত মনে, চিন্তিত সরোজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, না, সত্যিই ভাবনার কিছু নেই সরোজদা। পেটে সামান্য যন্ত্রনা আছে?

—তবে আর হাসপাতালে গেল কেন?

—ডাক্তাররা বলছেন গ্যাসট্রিক পেন। আগেও এখানে থাকতে কত সময় পেট ব্যথা করছে বলে শুয়ে থাকত, মনে নেই? সেই ব্যথাটা কার্ডিফে গিয়ে বেড়েছে আর কি। প্রমীকে তো আমি জানি, শরীর সম্বন্ধে কোনদিন যত্ন নেয় না, জোর করে আমি খাওয়াতাম তাই খেত। হোস্টেলে একলা ছিল, সময় মত খাওয়া-দাওয়া করে নি।

সরোজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যাক, শীগগিরই সেরে উঠবে তা হলে।

—হ্যাঁ, খুব বেশী হলে আর এক সপ্তাহ।

—তা হলে আর কলকাতায় এ নিয়ে চিঠি লেখার দরকার নেই, কি বল?

লীলা শঙ্কিত কন্ঠে বলে, পাগল হয়েছেন, অসুখের কথা শুনলেই মা টেলিগ্রাম ছেড়ে ঘন ঘন টেলিফোন করতে শুরু করবেন।

অমিতাভ মনে করিয়ে দিল, সরোজদা, আপনাকে একবার দেখা করতে যাবার জন্যে বলেছে প্রমীলাদি।

লীলাও জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আপনাকে যেতেই হবে। সামনের সপ্তাহে।

সরোজ ইচ্ছে করে আগ্রহ প্রকাশ করে না, ভাল যখন আছে আমি আর গিয়ে কি করব।

—না, না, ও বিশেষ করে যেতে বলেছে।

—দেখি, আবার অফিসের কাজ আছে তো।

—বুধ আর শনি, দু'দিন দেখা করতে দেয়। আপনি সামনের বুধবারেই ঘুরে আসুন।

যদিও সরাজ মুখে কিছু বলল না, মনে মনে স্থির করে নিল খুব একটা ঝামেলায় না পড়লে সামনের বুধবার সে যাবে প্রমীলার কাছে। অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিলেই হবে, সকালের গাড়িতে গিয়ে বিকেলে হাসপাতালে দেখা করে

সন্ধ্যের ট্রেনে লন্ডনে ফিরে আসবে।

সরোজ ভেবেছিল প্রমীলার জন্যে কিছু ফুল কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু হাসপাতালের কাছাকাছি চেষ্টা করে খুঁজেও কোন ফুলের দোকান না পাওয়ায় শুধু হাতেই তাকে দেখা করতে যেতে হল। রুগীদের সঙ্গে দেখা করার সময় বাঁধা আছে তাই ভিজিটারস্ কার্ড দেখাতেই ভেতরে নিয়ে গেল। দোতলা বিরাট হাসপাতাল, গেট দিয়ে ঢুকে ডান দিকের বড় হলে প্রমীলার বেড। বিরাট লম্বা ঘর, পালিশ করা কাঠের মেঝে, সাদা রঙের জানলা, পর পর লোহার খাট সাজান রয়েছে।

নার্স সরোজকে নিয়ে গিয়ে প্রমীলার খাটের কাছে চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দিল। দু'খানা পর্দার পার্টিশান টেনে এনে ওদের আড়াল করে দিল যাতে কথা বলার সুবিধে হয়।

সরোজ হাসি মুখে প্রমীলাকে দেখছিল। মুখখানা তার শুকনো, কিন্তু টানা টানা বড় চোখ দুটো খুশীতে উজ্জ্বল। তেল না পড়ায় মাথার চুলগুলো শুকনো। আলগা করে দুটো বিনুনি বেঁধেছে। কালো চুল, লালচে দেখাচ্ছে। পরনে তার সাদা রঙের হাসপাতালের জামা, ইওরোপীয়ান ড্রেসে বেশ দেখতে লগছে প্রমীলাকে।

প্রমীলা সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, আপনি এসেছেন—আমি খুব খুশী হয়েছি, সরোজদা। কদিন থেকে আপনারই কথা মনে পড়ছিল।

সরোজ স্মিত হেসে বলে, তা না হয় পড়ল, কিন্তু শরীরটা খারাপ করলে কি করে? শুনলাম সময় মত খাওয়া-দাওয়া করছিলে না।

—বাঃ, শরীর খারাপ বুঝি কারুর করতে নেই।

সরোজ প্রমীলাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলল, তোমাকে কিন্তু অনেক ফ্রেশ দেখাচ্ছে। হাসপাতালে এসে শরীরটা বিশ্রাম পেয়েছে, খুব খাটছিলে বোধ হয়, না?

প্রমীলা উত্তর দিতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল. কি জানি। কেন যে শরীরটা বিগড়ে বসল। একটু থেমে বলে, যাক গে ওসব কথা, নিজের কথা ভাবতে আর ভাল লাগে না। বলুন লন্ডনে কিরকম আপনার দিন কাটছে?

—খুব মন দিয়ে কাজ করছি।

—সে জানি। কিন্তু সোশ্যাল লাইফ?

—নেই বললেই হয়।

প্রমীলা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে, কেন আপনি এমন করে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন বলুন তো? লীলারাও সেদিন দুঃখ করছিল। কি হয়েছে আপনার?

সরোজ বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কথা ভাবছিল, ইচ্ছে করে প্রমীলার নকল করে বললে, নিজের কথা ভাবতে আর ভাল লাগে না।

প্রমীলা হাসল। সেই সঙ্গে সরোজও।

এক সময় প্রমীলা জিজ্ঞেস করে, মীনাক্ষী আর পীয়ের নাকি কন্টিনেন্ট চলে গেছে?

—হ্যাঁ, দিন কয়েক আগে।

—তারপর কোনও খবর পেয়েছেন?

—না।

—ওরা কি বিয়ে করবে?

—হয়তো।

প্রমীলা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সরোজকে দেখে, কি হয়েছে আপনার আজ? কাটা কাটা ছোট উত্তর দিচ্ছেন।

সরোজ কথা না বলে শুধু মিষ্টি করে হাসল।

প্রমীলা নিজের মনে বলে যায়, জানেন ডোরিয়ার একটা খুব সুন্দর চিঠি পেয়েছি, ওরা সুখী হয়েছে। ভারতের জীবনটাকে ভালবেসেছে।

মাঝখান থেকে সরোজ প্রশ্ন করল, তাই নাকি?

—কেন, আপনি ওদের কোন চিঠি পান নি?

—পেয়েছি, একটা জয়ের চিঠি, সরোজ থেমে যায়।

—কি লিখেছে?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। এখনও জয় চাকরির সুবিধে করতে পারে নি। তা ছাড়া ও বোধ হয় কলকাতায় থাকতে চাইছে না। অবাক হলাম এই জন্যে যে সারা চিঠিতে কোথাও ডোরিয়ার কথা ও লেখে নি।

—আশ্চর্য। প্রমীলা নিজের মনেই কি যেন ভাবে।

সরোজ গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করে, জান প্রমীলা, এতদিন একটা সত্য উপলব্ধি করেছি যে, নিজেকে বোঝা বড় শক্ত।

প্রমীলার মনে হল এ এক সম্পূর্ণ অচেনা কন্ঠস্বর চমকে ফিরে তাকাল সে। চোখা-চোখি হতে দেখে সরোজ তারই দিকে চেয়ে আছে। কি গভীর দৃষ্টি।

—প্রমীলা, তুমি যখন এবার সুস্থ হয়ে উঠে লণ্ডনে আসবে, অনেকগুলো কথা তোমাকে বলতে হবে।

—কি কথা, সরোজদা?

—নিজের কথা। এতদিন ভাবতাম জীবনটাকে খুব খুঁটিয়ে দেখেছি, বুঝেছি, আমার মন কি চায়, আর কি চায় না। কিন্তু এখন সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

প্রমীলা সহানুভূতিভরা গলায় প্রশ্ন করে, কেন এসব আবোলতাবোল ভাবছেন?

সরোজ ম্লান হাসল, আবোলতাবোলই বটে। সময় হলে একদিন হয়তো তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব।

সরোজের বাঁ হাতটা খাটের উপরেই ছিল, প্রমীলা সযত্নে তুলে নিল বুকের কাছে, স্থির নিষ্কম্প গলায় বলল, আমি বুঝতে পারি, সরোজদা। প্রমীলার কথার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই, অথচ স্পষ্ট করে সে সরোজকে জানিয়ে দিল তার মনের অবস্থা প্রমীলার মোটেই অজানা নয়। বিস্মিত সরোজ তাকিয়ে রইল এই মেয়েটির দিকে, কে বলবে একদিন সে এই প্রমীলাকে কিশোরীর মত চঞ্চলা ভেবেছিল, ভেবেছিল অপরিণত বুদ্ধির প্রকাশ তার কথায়, ব্যবহারে, কাজে। কিন্তু সেই প্রমীলা যে এত সহজে মনের অলি-গলি পেরিয়ে অন্তঃপুরের ঠিকানা খুঁজে বার করবে তা সে ধারণাও করতে পারে নি।

কথা বলতে গিয়ে সরোজ থেমে গেল, প্রমীলার চোখে নীরব জলধারা তাকে মুহূর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এক অচেনা রাজত্বে যেখানে শুধু দুজনের দেশ। যেখানে সমাজ সংসার মিছে হয়ে যায়, অসার মনে হয় জীবনের কলরব, শুধু চোখের ভাষায় যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্তরের কথা, অনুভব করা যায় হৃদয়ের গভীরতা।

নার্স এসে খোঁজ নিয়ে গেল প্রমীলার কিছু দরকার আছে কিনা।

ছন্দ কেটে গেল। নিজেদের সামলে নিল ওরা।

প্রমীলা বলল, নার্সটি বড় ভাল।

সরোজ ছোট্ট উত্তর দিল, কিন্তু বেরসিক।

—এখন তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু ওদের মহত্ত্বের কোন তুলনা হয় না। জানেন সরোজদা, রাত্রির অন্ধকার যখন নেমে আসে, ওই নার্সরা শব্দ না করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে যেদিন ঘুম আসে না, তার ওপর পেটে যন্ত্রণা হয়, ওদের হাসি-খুশী মুখগুলো দেখলে মনে অনেকখানি সাহস পাই। তখন মনে হয় ওরাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, ওরা আমাদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে চলে যাবে না, অন্ধকারের অনিশ্চয়তায় ত্যাগ করবে না।

সরোজ সহজ গলায় বলে, অবশ্য ওই তো ওদের কাজ। নার্স যখন হয়েছে অসুস্থের সেবা তার ধর্ম।

প্রমীলা নিজের বিনুনি দুটো নিয়ে খেলা করছিল, বললে, আমি ঠিক তা বলি নি, সরোজদা। হাসপাতালে না থাকলে বুঝতে পারবেন না, রাত্রি যত গভীর হয়, বিনিদ্র রজনী কাটাবার ভয়ে নিজেকে শিশুর মত অসহায় মনে হয়, কত রকমের চিন্তা তখন মাথায় এসে ভিড় করে। হয়ত দেখি পাশের ঘরে নাটক চলছে মৃত্যুর হাত থেকে একটি রুগীকে বাঁচাবার জন্যে ডাক্তার আর নার্সদের লড়াই, কে জিতবে আগে থেকে তো বলা যায় না। তখন মনে হয় আপনারা সবাই কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন, আর আমি শুধু জেগে, একা, একেবারে একা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি কখন ভোরের আলো ফুটে উঠবে। এক একদিন থাকতে না পেরে নার্সকে ডেকে আনি। বলি, সিস্টার, যা হোক কিছু তুমি বল, এ নিস্তব্ধতা আমার কাছে অসহ্য। সিস্টার কি বলে জানেন?

—কি?

—এই হচ্ছে মানুষের অসহায়তার সব চেয়ে করুণ কান্না।

দেখা করবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সরোজকে উঠে পড়তে হয়, বলে, আশা করি সামনের সপ্তাহে তোমার সঙ্গে লণ্ডনে দেখা হবে।

প্রমীলা ছলছল চোখে উত্তর দেয়, আমিও সেই আশা করে থাকব, সরোজদা।

কথাটা সামান্য, তবু সরোজের চোখে জল এল। কোন রকমে সামলে নেবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে প্রমীলার কথাগুলো, সে একা। আজও হয়ত ঘুমের প্রতীক্ষায় সে রাত জেগে বসে থাকবে, চিন্তা করবে সরোজদের কথা, কখন ভোর হবে তারই জন্যে প্রহর গুনবে। হয়তো গল্প করার অছিলায় নার্সকে ডেকে এনে পাশে বসাবে।

প্রমীলার কথা চিন্তা করে সরোজের মন আর্দ্র হয়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গেল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, অমায়িক ব্যবহার, সরোজকে বুঝিয়ে বললেন, আমার মনে হয় না মিস চৌধুরী সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ আছে। আমি ও'র কাছ থেকে যতদূর জেনেছি, পেটে যন্ত্রণা অনেকদিন থেকেই হয়। রোগ যখন ধরা পড়েছে, খুব তাড়াতাড়ি আমরা সারিয়ে তুলতে পারব। তবে—

সরোজ জিজ্ঞেস করে, থামলেন কেন? বলুন।

ডাক্তার হাসলেন, রুগীকে একটু বাধ্য হতে হবে। মানে সময়মত খাওয়া-দাওয়া করা। নিয়মমত কিছু দিন চলা এবং ভাবনা চিন্তা একটু কমানো।

—শেষের কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

—আমি দেখেছি, রুগীর যদি মানসিক অশান্তি থাকে, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠে, এ ধরনের গ্যাসট্রিক যন্ত্রণা বড় তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। আশা করি মিস চৌধুরীর এই ছোট জীবনে সে ধরনের কোন ঘটনা ঘটে নি।

সরোজ স্মিত হেসে বলে, আমি যতদূর জানি, না।

সরোজ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসছিল, ডাক্তারও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করেন, আপনিই তো লণ্ডনে ভারতীয় নাটকের প্রযোজনা করেন? মিস চৌধুরীর মুখে আপনার নাম আমি শুনেছি।

সরোজ হাসল, সেসব অ্যামেচার শো।

—মনে হয় মিস চৌধুরী আপনার কথা শোনেন।

হয়ত হবে। ডাক্তার সরোজের কাঁধের উপর একটু হাত রাখেন, মিস চৌধুরীকে সময়মত বোঝাবেন, উল্টো-পাল্টা চিন্তা করে নিজের মনকে উনি যেন ক্ষত-বিক্ষত না করেন।

সরোজ বিস্মিত হয়, এ কথা কেন বলছেন?

—উনি মনে করেন এ পৃথিবীতে উনি একেবারে একা, সম্পূর্ণ অসহায়।

ডাক্তারের কথার মধ্যে একটা উদ্বেগের সুর।

লিণ্ডসে হোপের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে রহস্য নাটকের শুরু হয়েছিল তার উপর যবনিকা পড়ল প্রায় দু সপ্তাহ বাদে যেদিন তামাটে রঙের ছ' ফুট লম্বা জর্জ শেরউড্ স্বেচ্ছায় গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করল লিণ্ডসে হোপের হত্যাকারী হিসেবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ আর সৌরেন, খুশী হল দোকানের কর্মচারীরা যাদের মধ্যে অনেককেই পুলিস জেরা করে করে অস্থির করে তুলেছিল।

জর্জ শেরউডের জবানবন্দী থেকে হত্যা রহস্যের মীমাংসা হলেও যেসব পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হল, তার সমাধান করা একরকম দুঃসাধ্য বলেই মনে হল সকলের কাছে। জর্জ লিণ্ডসে হোপের যে ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছে তা পড়লে মনে হয় লিণ্ডসে হোপ শুধু ধূর্ত ব্যবসাদার নয়, সে একজন শয়তানের অনুচর। তার ফ্যাশান হাউসের যেসব সুন্দরী মেয়েদের রাখা হয়েছিল মডেল হিসেবে, তারা দোকানের জন্যে শুধু খদ্দেরই যোগাড় করত না, রাত্রি কাটাবার মত পয়সাওয়ালা মক্কেলও খুঁজে নিত তাদের মধ্যে থেকে। সেটাও ছিল লিণ্ডসে হোপের ব্যবসার একটা অঙ্গ। এর জন্যে সে লণ্ডনের বুকের উপর দু'খানা ফ্ল্যাট রেখেছিল, মেয়েদের সঙ্গে সময় ঠিক করে নিয়ে বহু বিখ্যাত ধনীই রাত্রি কাটাতে যেতেন এইসব ফ্ল্যাটে। এর থেকে লিণ্ডসে হোপের রোজগারও ছিল প্রচুর এবং তার জন্যে নিত্যনতুন সুন্দরীদের আমদানি করত দেশবিদেশ থেকে।

জর্জ শেরউডের ছবি কাগজে দেখে সৌরেন চমকে উঠল, লিজি, এ ভদ্রলোককে আমি আগে দেখেছি।

এলিজাবেথও কম বিস্মিত হল না, কোথায়?

—তোমার কাকার দোকানে।

—কবে?

যেদিন প্রথম আমরা গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, মনে আছে এই ভদ্রলোক কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছিল লিণ্ডসে হোপের সঙ্গে দেখা করবে বলে।

—তারপর?

সৌরেন একাগ্রমনে ভাববার চেষ্টা করে, দোকানের কর্মচারীরা ওকে দেখা করতে দিল না। ভদ্রলোক রেগেমেগে চলে গেল, যতদূর মনে পড়ছে যাবার সময় বেশ শাসিয়ে বলেও গেল, লিণ্ডসে হোপের ফ্ল্যাটে গিয়েই সে দেখা করবে।

সৌরেনের অনুমান মিথ্যে নয়। জর্জ শেরউড্ সত্যিই সেদিন লিণ্ডসে ফ্যাশান হাউসে গিয়েছিল একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে। শেরউড্ সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, কাজ হল বিলিতী ওষুধ ক্যানভাস করে বেড়ানো। ইংলণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ওকে ঘুরে বেড়াতেই হয়, তা ছাড়া দরকার পড়লে ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ডেও পাড়ি দিতে হয় হামেশা। বাড়িতে তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, এডিথ্, বয়স ত্রিশ। দশ বছর তারা সুখে দাম্পত্যজীবন কাটিয়েছে, আট বছরের একটি ছেলে। মাস কয়েক আগে, জর্জ তখন ফ্রান্সে, এডিথ চিঠি লিখল লিণ্ডসে ফ্যাশান হাউসে সে একটি কাজ পেয়েছে, নেবে কি না। প্রথমে জর্জ অনুমতি দেয় নি, কিন্তু পরে এডিথের পীড়াপীড়িতে সম্মতি দিতে সে বাধ্য হয়।

প্যারিস থেকে ফিরে এসে জর্জের মনে হল এডিথ এই ক' মাস কাজ করে অনেকখানি বদলে গেছে, আগের মত সংসারে তার মন নেই ছেলেকে যত্ন করে না, তা ছাড়া টাকা খরচা করছে একটু বেশী মাত্রায়।

জর্জ এ নিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিল, সবই যদি খরচা কর তবে আর রোজগার করে কি লাভ?

এডিথ সহাস্যে উত্তর দিয়েছে, আর কটা মাস যেতে দাও। দেখবে আমি কত বেশী রোজগার করি। আমাদের মালিক বড় চমৎকার লোক, যে ভালো কাজ করে, তার যাতে উন্নতি হয় সেদিকে সব সময় লক্ষ্য রাখেন।

—কি যেন নাম?

—লিণ্ডসে হোপ।

এই প্রথম শেরউড লিণ্ডসের নাম শুনল তার স্ত্রীর মুখে, কিন্তু তখন ভাবতেও পারে নি এই মানুষটাই প্রতিদিন প্রলোভন দেখিয়ে এডিথকে ক্রমশ পাপের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য অসৎ পথে চলার লক্ষণগুলো চাপা রইল না, প্রকট হয়ে উঠল। শুধু এডিথের জীবনে নয়, তাদের এতদিনের সুখের সংসারে। শুরু হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি। আর এতটুকু শান্তি রইল না ওদের জীবনে। চোখের সামনে ছেলেটা ক্ষয়ে যেতে লাগল, কোন বাবার পক্ষেই এসব সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই রাগের মাথায় জর্জ একদিন এডিথকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি চাও? কেন এভাবে আমাদের সংসারটা ভেঙে দিচ্ছ?

স্বামীর এ কঠিন উক্তিকেও এডিথ গায়ে মাখল না, ব্যবহারিক গলায় বলল, আমার তো মনে হয় না, আমি অন্যায় কিছু করছি।

—তুমি কি বুঝতে পারছ না ছেলেটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে?

এডিথ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তোমারও তো ছেলে, তুমি দেখলেই তো পার। এ

উত্তর শুনে জর্জ বিমূঢ় হয়ে যায়, আস্তে আস্তে বলে, বিয়ের পর থেকেই দশ বছর আমরা এই বাড়িতে বাস করছি। পাড়ার সবাই ঈর্ষা করত, আমাদের এই সুখী, সুস্থ জীবনের দিকে তাকিয়ে। অথচ আজ—

এডিথ কঠিন স্বরে পদপূরণ করে, বাড়িতে থাকতে এক মিনিটও আমার ভাল লাগে না। ভগবান জানে কবে আমি এখান থেকে মুক্তি পাব।

জর্জ স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে স্থির গলায় প্রশ্ন করে, সত্যি তুমি মুক্তি চাও?

—হ্যাঁ, চাই।

স্বামীকে এতখানি রূঢ়ভাবে আঘাত করতে এডিথ এতটুকু দ্বিধাবোধ করল না। দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে জর্জ শেরউড সেদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, এ সবই কি লিণ্ডসে হোপের জন্যে? ওই শয়তানটার কি শরীরে এতটুকু দয়া মায়া নেই, জন্তুর বেহদ্দ ওই বুড়োটা।

এডিথ উত্তেজিত স্বরে বলে, দোহাই তোমার, ওরকম ছোটলোকী ভাষায় কথা বলো না। লিণ্ডসে হোপকে আমি ভালবাসি।

এ ঘটনার পরদিন জর্জ শেরউডের সুইজারল্যাণ্ড যাবার কথা। লিণ্ডসে হোপকে টেলিফোন করে দেখা করল কোন এক রেস্তরাঁয়। লিণ্ডসে হোপ উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ. জর্জকে সে আমলই দিতে চাইল না। শেরউড ধরা গলায় বলেছিল, আমার স্ত্রীকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমাদের জীবনটা আপনি নষ্ট করে দেবেন না।

লিণ্ডসে হোপ যেন আকাশ থেকে পড়ল, তোমাদের জীবনকে আমি নষ্ট করতে যাব কেন?

—আমার স্ত্রী এডিথ আপনাকে ভালবাসে।

—আমি তার কি করব, আমি নিজে তো আর তাকে ভালবাসি নি।

জর্জ শেরউড যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে বলেছে, আপনি বুঝতে পারছেন না। শুধু এই কারণে আজ আমার ঘর ভেঙে যাচ্ছে।

লিণ্ডসে হোপ কপট সহানুভূতি দেখায়, সেজন্যে আমি দুঃখিত।

—আমার ছেলেটা অযত্নে অবহেলায় কি রকম যেন—জর্জ কথা শেষ করতে পারে না।

—আমি বুঝতে পারছি না, কেন এসব কথা আমায় বলতে এসেছ। যদি ভেবে থাক এর জন্যে আমি তোমাকে টাকা দেব তা হলে ভুল করেছ। তবে হ্যাঁ, এডিথ যদি তোমার ছেলের ভরণপোষণের জন্য কোন টাকা দিতে চায় আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

জর্জ দাঁত কড়মড় করে বলে, ওই পাপের পয়সায় আমি থুথু দিই।

সদম্ভে সে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আসে, এডিথকে এ বিষয়ে কোন কথা না জানিয়ে সোজা চলে যায় সুইজারল্যাণ্ড। সেখানে সে পিস্তল কেনে, ফিরে এসে শোনে এডিথ আজকাল বেশীর ভাগ রাত কাটাচ্ছে লিণ্ডসে হোপের সঙ্গে। ছেলেকে নিয়ে গেছে জর্জের বোন। এর পর আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি জর্জ শেরউড। কয়েকবার সে চেষ্টা করেছিল লিণ্ডসে হোপের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু সুযোগ পায় নি।

অবশেষে একদিন ঝিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে লিণ্ডসে হোপের ফ্ল্যাটে সে তার

মুখোমুখি দাঁড়াল। যার জন্যে সে তার বউকে হারিয়েছে, তার মুখ থেকে কোন যুক্তিই সে শুনতে চাইল না, পর পর তিনবার গুলী ছুঁড়ে সে নিজের হাতে শাস্তি দিল শয়তানকে।

প্রথমে সে সংকল্প করেছিল লিন্ডসে হোপকে খুন করে পুলিসের কাছে ধরা দেবে, কিন্তু পারল না। তার মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিল প্রৌঢ় লিন্ডসে হোপকে সে যখন সরিয়ে ফেলতে পেরেছে হয়ত এডিথ আবার আগের মত তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে রাজী হবে। তাই এ দু' সপ্তাহ সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও এডিথের সঙ্গে দেখা করেছে, তাকে বোঝাবারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। যেদিন জর্জ বুঝতে পারল এডিথকে আর ফেরানো যাবে না, সে এখন দেহপসারিণীর পর্যায়ে নেমে গেছে, তখন আর কালবিলম্ব না করে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এখন তার কেস চলছে, রায় কি বেরবে কে বলতে পারে। সাধারণ নিয়মে খুনের দায়ে তার অভিযুক্ত হবার কথা, কিন্তু একটা কথা যা নাড়া দিয়েছে বিচারক আর জুরীদের মন তা হল জর্জের অবিচলিত প্রেম এডিথের প্রতি। বার বার করে সে কোর্টের সকলের কাছে আবেদন করেছে, তোমরা আমার মৃত্যুদণ্ড দাও, এত চেষ্টা করেও যখন এডিথকে ফিরে পেলাম না, আর এই বয়সে একলা বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই।

জর্জ শেরউডের চরিত্র শুধু বিচারকদেরই বিস্মিত করে নি তা অভিভূত করেছে জনসাধারণকে। তার জন্যে সমবেদনা জানিয়েছে দেশের যুবক মহল, তার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে বিবাহিতা মেয়েরা।

এলিজাবেথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, জর্জ শেরউড আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে, তা না হলে কে বলতে পারে কাকার কথায় রাজী হয়ে আমরাও হয়ত অজান্তে ওর এই পাপ ব্যবসার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়তাম।

সৌরেন মাথা চুলকে বলে, আমি একটা কথা বুঝতে পারি না, তোমার কাকা হঠাৎ বুড়ো বয়সে তোমার বাবাকে অংশীদার হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন কেন?

—আমার মনে হয় কাকা অতি ধূর্ত লোক ছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই পাপ ব্যবসার কথা আর গোপন নেই, অনেকেই জেনে গেছে। হয়ত একদিন পুলিসের নজর পড়বে তাই চেয়েছিলেন বাবাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের ওঁর ফার্মে ঢুকিয়ে ফেলতে। আমাদের গাঁয়ে বাবার সম্মান খুব, সকলেই জানে তিনি সত্যনিষ্ঠা ধর্মভীরু মানুষ। তাই কাকা ভেবেছিলেন বাবার নামটাও এ সঙ্গে যুক্ত থাকলে কেউ আর তাঁকে সন্দেহ করার সাহস পাবে না।

সৌরেন সায় দিয়ে বলে, তুমি ঠিক ধরেছ লিজি, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে।

এলিজাবেথ সৌরেনের গলাটা জড়িয়ে ধরে গাঢ়স্বরে বলে, তুমি না থাকলে আমি কি করতাম সৌরেন?

—কি আবার করতে, কাজ করতে, খেতে, ঘুমোতে।

এলিজাবেথ আবদেরে সুরে বলে, তাও বোধ হয় আমি পারতাম না সৌরেন। সত্যি, শুধু তোমার জন্যে এত বড় বিপদের মধ্যে পড়েও আমি এতটুকু বিচলিত হই নি। তোমার মাথাটা আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা।

—শেষ পর্যন্ত রাখতে পারি, তবে তো।

এলিজাবেথ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়, আমি জানি, তুমি পারবে। একটু থেমে

বলে, আমার জীবনে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা, সত্যিই যদি কাকার ব্যবসায় যোগ দিতাম, হয় ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোথায় ভেসে যেতাম কে বলতে পারে। শুনেছি টাকা মানুষের লোভ ক্রমশ বাড়িয়ে দেয়, আমিও হয়ত লোভী হয়ে পড়তাম। ভগবানকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে এই সব কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন নি। শুধু তাই নয়, তোমাকে চিনিয়ে দিলেন কত সহজে।

সৌরেন সায় দিয়ে বলে, সে কথা আমিও ভাবি। সাধারণ বন্ধুত্ব, মামুলি আলাপ, তারই মধ্যে থেকে কি ভাবে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কেমন করে প্রেম এসে বাসা বাঁধে, আগে থেকে কেউ বুঝতে পারে না।

—আমি আরও খুশী হয়েছি এ জন্যে, তোমাকে বাবার খুব ভাল লেগেছে, সত্যি কথা বলতে কি ভারতীয়দের সম্বন্ধে আগে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না।

এলিজাবেথের বাবা চার্লস্ হোপ্ ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে দুদিনের জন্যে এসেছিলেন লণ্ডনে, সেই সময় এলিজাবেথ সৌরেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেয়। ভদ্রলোক শান্ত প্রকৃতির মানুষ, গ্রাম্য জীবনের সরলতাকে তিনি ভালবাসবেন। শহরের চাকচিক্যে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। সৌরেনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে-ছিলেন, এদিকের ঝামেলা চুকলে লিজিকে নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এস, ইংলণ্ডকে যদি দেখতে চাও তার গ্রামকে না দেখলে কোন দেখাই হবে না।

সৌরেন সানন্দে জানিয়েছে, প্রথম সুযোগেই আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব।

বৃদ্ধ মুখে পাইপ ধরিয়ে বলেন, আরও এইজন্যে বলছি, তোমরা বিদেশী, দোহাই তোমাদের, লণ্ডন দেখে ইংরাজকে বিচার করো না। প্যারির নাগরিক জীবন দেখে ফ্রান্সের কথা ভেবো না। রোমকে ইতালী ভাবলেও সেই ভুল করবে।

সৌরেন তাঁকে বুঝিয়ে বলেছে, এ কথা আমাদের দেশ সম্বন্ধেও তো খাটে মিঃ হোপ্। কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ দেখে যাঁরা মনে করেন ভারতবর্ষকে বুঝতে পেরেছেন তারাও সেই একই ভুল করেন।

সৌরেনের সঙ্গে আলাপ করে যে চার্লস হোপ্ খুশী হয়েছিলেন তা বোঝা গেল শেষের দিন ট্রেনে ওঠার সময়, যখন তিনি সৌরেনের কাঁধে হাত রেখে গাঢ়-স্বরে বলে গেলেন, ইয়ংম্যান, তোমার সঙ্গে আমি আরও পরিচিত হতে চাই। এলিজাবেথ তোমার সম্বন্ধে যা যা বলে আমি এ দু দিনে মিলিয়ে দেখলাম ওর সব কথাগুলোই খাঁটি।

চার্লস হোপ চলে যাবার পর থেকে সৌরেন লক্ষ্য করেছে এলিজাবেথ যেন আরও প্রাণখোলা আরও সহজ হয়ে নিজেকে ধরা দিয়েছে সৌরেনের কাছে। পিতার সমর্থন পাবার পর আর তার মনে কোনরকম সংশয় নেই।

তাই আজ যখন সৌরেন এক সময় আবেগভরা গলায় বলল, আমার ভয় হয় যদি আমি তোমায় সুখী করতে না পারি।

এলিজাবেথ তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে একেবারে কাছটিতে বসে সৌরেনকে নিবিড় আলিঙ্গনে নিজের কাছে টেনে নিল। চোখের উপর চোখ রেখে মধুর স্বরে বলল, সুখী আমরা হবই সৌরেন, আমি যা চেয়েছিলাম তোমার মধ্যে আমি তা পেয়েছি।

অনেক দিন পরে সৌরেন আজ নিশ্চিন্ত মনে অফিসে বসে কাজ করছে।

এলিজাবেথের ঝামেলা চুকেছে। আর ওকে পুলিস স্টেশনে দৌড়তে হয় না। এ ক'দিন প্রায় রোজই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হয়েছে এলিজাবেথের জন্যে। সে কারণ টেবিলে কিছু কাজও জমা হয়েছিল। আজ অফিসে বসে সৌরেন পুরনো কাজের কাগজপত্রগুলো ঘাঁটছিল।

এমন সময় উপরওয়ালা পাঞ্জাবী অফিসার এসে হাজির, জানালেন দু'খানা দরকারী ফাইল নিয়ে এখুনি তাঁর ঘরে যাবার জন্যে।

কাজটা সৌরেনের নয়, জ্যাক ব্রেণ্টের। কিন্তু তখনও জ্যাক ব্রেণ্ট অফিসে আসে নি তাই তার টেবিলের দেরাজ খুলে সৌরেন ফাইল দুটো বার করল। কিন্তু তাতেও কাজের বিশেষ সুবিধে হল না। সৌরেন ফোন করল জ্যাককে।

জ্যাক ব্রেন্ট বাড়িতেই ছিল। ফোন পেয়ে সে ঘাবড়ে গেল, বললে, কি সর্বনাশ বল ত, আজই বস্ আমার খবর করলেন!

সৌরেন পালটা প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার জ্যাক, শরীর খারাপ নাকি?

—না, শরীর ঠিক আছে। আমি এখুনি অফিসে আসছি। নিজেই ফাইল নিয়ে বসের টেবিলে যাব।

—দেরি হয়ে যাবে না তো?

—আমি ট্যাক্সি নিচ্ছি।

সৌরেন বরাবর দেখেছে জ্যাক্ ব্রেন্টের কর্তব্যজ্ঞান খুব। সহজে সে কাজে ফাঁকি দেয় না, নিশ্চয় কোন অসুবিধায় পড়ে সকালের দিকে আসতে পারে নি।

মিনিট দশের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে জ্যাক ব্রেন্ট সৌরেনদের অফিস ঘরে ঢুকল। বেচারী একেবারে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে। টাই-এর গিঁটটা ঢিলে চুল উস্কখুস্ক, ছোঁ মেরে সৌরেনের টেবিল থেকে ফাইল দুটো নিয়ে চলে গেল পাঞ্জাবী অফিসারের ঘরে।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে জ্যাক ব্রেণ্ট টেবিলে ফিরে এল। মুখে তার প্রসন্ন হাসি। চেয়ারে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ভাগ্যিস তুমি ফোন করেছিলে লাহিড়ী, তা না হলে আমি খুব বিপদে পড়তাম।

সৌরেন কাজ করতে করতেই বলে, হাঙ্গামা মিটেছে তা হলে।

অফিসেরটা মিটিয়েছি, কিন্তু বাড়ির হাঙ্গামা আর মিটল কই?

সৌরেন ঘাড় ফেরায়, আবার কি হল?

—আমার গুণধর ভাই রবার্ট কোথায় বুঝি মারামারি করেছে, পুলিসে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিল। রেফারেন্সে দয়া করে তিনি আমার নামটি দিয়ে দিয়েছেন। কি বিপদ বল ত?

সৌরেন নিজের মনেই মাথা নাড়ে, সত্যি, তোমার ভাইটি একটি চীজ্।

জ্যাক দাঁতে দাঁত ঘষে, তা আর আমি জানি না।

—মারামারি কি নিয়ে?

—সে কথা বলতেও আমার লজ্জা করছে।

সৌরেন হাসল, কেন, নারীঘটিত বুঝি?

—তা হলে তো বলতে লজ্জা করত না।

—তবে?

জ্যাক ব্রেণ্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, আমাদের পাড়ায় বেশ কিছু জ্যামেইকান লোক বাস করে। এরা এসেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে। ওদেরই সঙ্গে রবার্টদের দলের

ঝগড়া হয়েছে।

সৌরেন বিস্মিত হয়ে বলে, আশ্চর্য। এতদিন লণ্ডনে আছি, এ রকম মারামারির কথা তো কখনও শুনি নি।

—হ্যাঁ, লণ্ডনে আজকাল এ এক নতুন বিপত্তি শুরু হয়েছে। কালো আর সাদা চামড়ার ঝগড়া।

—কিন্তু কারণ কি।

জ্যাক্ ব্রেণ্ট দৃঢ়স্বরে বলে, কারণ যদিও বা থাকে, এ অন্যায়। যেরকম করে হক, এ উত্তেজনাকে থামাতে হবে। শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দিলে আমরা ভুল করব।

জ্যাকের কথার গাম্ভীর্য সৌরেনকে নাড়া দিল, কেন, তোমার কি মনে হয় এ হাঙ্গামা আরও বাড়বে?

—কি জানি, বুঝতে পারছি না।

জ্যাক্ ব্রেণ্টের ডাক এল বস্-এর কাছ থেকে। সে উঠে চলে গেল। এ প্রসঙ্গও চাপা পড়ে গেল সেদিনের মত। সৌরেনের হাতেও অনেক কাজ, সেগুলো শেষ না করে কথা বলার তার সময় কোথায়?

কতক্ষণ এক মনে সৌরেন কাজ করেছে, খেয়াল ছিল না। এক সুদর্শন ভদ্রলোক এলেন, তার পাসপোর্টে এনডোর্সমেণ্টের জন্যে।

সৌরেন তাকে চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম?

ভদ্রলোক চালচলনে বেশ কেতাদুরস্ত, নিখুঁত সাজপোশাক। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিলেন, তাতে লেখা হারীন সোম। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম।

—কোন্ দেশের এনডোর্সমেণ্ট দরকার?

হারীন সোম পকেট থেকে পাসপোর্ট বার করলেন, জার্মানী। ওখানে যাবার কোন কথা ছিল না, কিন্তু এখানে এসে দেখছি না গেলেই নয়। ওদের সঙ্গে ব্যবসা করার সুযোগ এসেছে।

—কবে যাবেন?

—দিন পনেরোর মধ্যে।

সৌরেন ছাপা ফরম্ এগিয়ে দেয়, আপনি এগুলো ভর্তি করে দিন, আমি চেষ্টা করব যাতে আপনি তাড়াতাড়ি এন্ডোর্সমেণ্ট পেয়ে যান।

হারীন সোম ফরমের উপর নাম ঠিকানা লিখতে শুরু করে, সৌরেন সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোকের মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হয়। জিজ্ঞেস করে, আপনাকে কি আগে কোথাও দেখেছি? কতদিন এসেছেন লণ্ডনে?

—মাত্র এক সপ্তাহ।

—কোথায় উঠেছেন?

—স্ট্র্যাণ্ডে।

স্ট্র্যাণ্ডের নাম শুনে সৌরেনের মনে পড়ে যায় সোম সাহেবের কথা। বলে, কিছুদিন আগে একজন মিঃ সোমের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনিও ওই হোটেলে উঠেছিলেন, জানি না আপনার কোন আত্মীয় কিনা।

হারীন মুখ তুলে হাসল, আমার দাদা।

—উনি এখন কোথায়?

—বোধ হয় কলকাতায় ফিরে গেছেন। কন্টিনেন্ট হয়ে দাদার দেশে ফেরার কথা।

সৌরেনও হাসল, আপনারা ভাগ্যবান, কেমন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—শুধু ঘুরে বেড়াতে পারলে অবশ্য খুশী হতাম এত কাজের বোঝা থাকে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাই না।

কিছুক্ষণ পরে ধন্যবাদ জানিয়ে হারীন সোম চলে গেল। কেন জানা নেই তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে সৌরেনের হাসি পেল। বোধ হয় মনে পড়ল সোম সাহেবের কথা। সেদিন রাত্রে মলিনা দাসের ফ্ল্যাটে যে অবস্থায় তাকে দেখেছিল, তা সৌরেন কৌতুক বোধ করল। হারীন বলে গেল, সোমসাহেব কলকাতায় ফিরে গেছে, মলিনা দাসও তার সঙ্গে চলে গেল নাকি? হয়ত বা ফিরে এসেছে লণ্ডনে। একবার টেলিফোন করে দেখলে হয়। সে রাত্রে মলিনা দাসের কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর মনের মধ্যে যে সঙ্কোচ জমা হয়েছিল, এক' সপ্তাহের ব্যবধানে তার তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তাই সাহস করে সে টেলিফোনের নম্বর চাইল।

তখনও লাঞ্চে বেরবার সময় হয় নি, অন্য দিক থেকে মলিনা দাসের মিষ্টি কন্ঠস্বর ভেসে এল।

সৌরেন আস্তে আস্তে বলে, তুমি কবে ফিরলে মলিদি? আমি সৌরেন কথা বলছি।

—কিছেলে রে তুই? কোথায় ডুব মেরেছিলি? একটা খোঁজ খবর নেই।

এত সহজভাবে মলিনা দাস কথা বলল, শুনে কে বলবে এদের মধ্যে কোনরকম মনোমালিন্য হয়েছিল।

সৌরেন সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, বাঃ, তুমিই তো হঠাৎ না বলে কয়ে প্যারিসে চলে গেলে।

মলিনা দাস খিলখিল করে হাসে, কার সঙ্গে গিয়েছিলাম জানিস তো?

—জানি, সোমসাহেব।

—কি, হিংসে হচ্ছে বুঝি?

সৌরেন ইচ্ছে করে রসিকতা করে, তা একটু হচ্ছে বইকি।

—দুঃখ করতে হবে না, কাল বিকেলে আয় না, মাছ রেঁধে খাওয়াব।

—সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু একলা যাব?

মলিনা দাসের গলায় ঈষৎ শ্লেষ ফুটে ওঠে, দোক্‌লাটি কে? সেই এলিজাবেথ?

—হ্যাঁ, যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে।

—না, আপত্তি নেই, তবে—

মলিনা দাসকে থামতে দেখে সৌরেন জিজ্ঞেস করে, কি তবে?

—কাল বরং তুই একলাই আয়। অনেক কথা আছে। মেম সাহেবের সামনে সারাক্ষণ ইংরিজীতে বকর বকর করতে ভাল লাগবে না। একটু থেমে বলে, ভয় নেই, তোর চরিত্র নষ্ট হবে না।

সৌরেনও হাসল, ঠিক আছে, আমি অফিস থেকে সোজা যাব। ওহো, তোমায় বলতে ভুলে গেছি, সোম সাহেবের ছোট ভাই এসেছে লণ্ডনে।

মলিনা দাস কৌতূহল প্রকাশ করে, কে হারীন?

—হ্যাঁ।

—ওর আসবার কথা আছে শুনেছিলাম। উঠেছে কোথায়?

—স্ট্যাণ্ড।

—ঠিক আছে। কাল তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হবে, বাই বাই।

—বাই বাই।

সৌরেন টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে, চোখের সামনে তার মলিনা দাসের দুষ্টুমি-ভরা মুখখানা ভেসে ওঠে।

মলিনা দাসের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সৌরেন এটুকু বুঝেছে যে, মলিনা দাস বরাবরই পুরুষের কাছে ধাঁধার মত রয়ে যাবে। তার ভেতরের সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্যের এত অভাব যে, কোনটি তার আসল রূপ তা বোঝা একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। মলিনা দাসের রূপের বিচিত্র আকর্ষণ আছে। এ রূপশিখা যে কোন পুরুষকে মুগ্ধ করে, মোহতে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু কখনও তাকে দগ্ধ করে না। যে কোনও জায়গায়, যে কোন পরিবেশে মলিনা দাসকে সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। দেখে বাঙালীর ঘরের লক্ষ্মীমন্ত বধূরূপে কল্পনা করতেও যেমন অসুবিধা হয় না, তেমনি অসুবিধা হয় না কল্পনা করতে নাইট ক্লাবের প্রগলভ নারীর রূপসজ্জায়।

মলিনা দাস যে বিচিত্ররূপিণী সে কথা আরও বেশী প্রতীয়মান হল পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সৌরেন যখন গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। আজ যেন মলিনা দাসকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, আগের চেয়েও রঙ ফরসা হয়েছে, কচি কলাপাতা রঙের ব্লাউজের সঙ্গে মেটে লাল পাড় ঘন সবুজ শাড়ি চমৎকার মানিয়েছে। কপালে সবুজ রঙের বড় টিপ, আর উপর থেকে সাদা সিঁথি চুলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। শান্ত, সংযত চেহারা অথচ চোখ দুটি কৌতুকময়ী।

সৌরেন না বলে পারল না, তোমাকে যে আরও ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে মলিদি।

এ কথার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই, প্রায় সকলের কাছেই মলিনা দাস এই ধরনের উক্তি শোনে। তবু হেসে প্রশ্ন করল সত্যি? তোর এলিজাবেথের চেয়েও ছোট মনে হচ্ছে?

—ও বেচারীকে আর এ ব্যাপারের মধ্যে টানছ কেন? লিজি যে তোমার মত সুন্দরী নয় সে তো তুমি ভাল করেই জান। একটু থেমে বলে, আজকের সাজটা বড় সুন্দর হয়েছে।

মলিনা দাস আড়চোখে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নেয়, তুই আসবি বলে ইচ্ছে করেই বুক পিট, হাত কাটা জামা পরি নি, পাছে আবার সেদিনের মত ভয় পেয়ে পালিয়ে যাস।

ওর কথার ধরনে সৌরেন হাসল, না, এখন আর সে ভয় নেই।

—তাই নাকি? তারপর লণ্ডনের সব কি খবর বল। প্রায় চার সপ্তাহ বাদে ফিরলাম তো।

সৌরেন সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে মোটামুটি খবর জানাল তার বন্ধুবান্ধবী-দের। মীনাক্ষী, পীয়েরের বেলজিয়ামে চলে যাওয়া কিংবা প্রমীলার অসুখের কথায় বিশেষ কান দিল না মলিনা দাস, কিন্তু লিণ্ডসে হোপের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা রসিয়ে রসিয়ে শুনল। বলল, এলিজাবেথের কাকা, তার মানে বেশ রসিক লোক ছিলেন। আহা বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হল না।

—হলে কি লাভ হত?

—দেখতাম সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হলে তার কি ফল হয়। বলা যায় না, হয়ত

দেখতিস তোর মলিদি হোটেল ফ্যাশান হাউসের মালিকান্ হয়ে বসেছে।

আর একজনের কথা মলিনা দাস মন দিয়ে শুনেছে সে হল রজত। বলল হুঃ, তোর দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে। মেয়ে পকেটমারের সঙ্গে কখন নাচতে পেরেছিস, আমাকে আর ভয় কর্‌ছিস কেন?

সৌরেন বিজ্ঞের মত হাসল।

মলিনা দাসের চোখে দুষ্টুমি উথলে ওঠে, আমাকে একদিন নিয়ে চল্ না ওদের আড্ডায়।

—ধ্যাৎ, তুমি সেখানে কি করে যাবে?

—কেন, যেতে পারি না?

সৌরেন মাথা নাড়ে। তোমার ভাল লাগবে না। ওরা একেবারে নীচের তলার মানুষ—

মলিনা দাস থামিয়ে দেয়, তবু মানুষ তো।

—তাতে কি হল?

—তোর বন্ধু রজত যে জন্তুটার কথা বলে তাকে নিয়ে খেলা করতে এক এক সময় আমার বেশ ভাল লাগে। একদিন সুবিধে মত চল, দু'জনে মিলে ঘুরে আসব।

মলিনা দাসের গলায় এ একেবারে অন্য সুর শুনে সৌরেন শুধু যে চমকে উঠল তাই নয়, বিস্মিত হল। কিন্তু সেও বেশীক্ষণের জন্য নয়, মলিনা দাস নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে, তুই কি ঠিক করলি? এলিজাবেথকে বিয়ে করছিস?

সৌরেন হ্যাঁ না কিছুই বলে না।

মলিনা দাস হাসে, বুঝতে পারছি, তোর মনে ইচ্ছে অথচ বুকে সাহস নেই। তাই না?

সৌরেন চোখ তুলে বলে, সত্যি তাই, বাড়িতে যে এখনও জানাতে পারছি না। মা যা সেন্টিমেন্টাল, মেম্ বিয়ে করছি শুনলে একেবারে না ভেঙে পড়েন।

—তবে এ হ্যাঙ্গামায় যাচ্ছিস কেন?

সৌরেন স্পষ্ট উত্তর দেয়, এলিজাবেথকে যে আমি ভালবাসি। ও মেয়েটা যে কি সরল, উদার তা আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার ভাল মন্দ সব কিছুকে সে ভালবেসেছে, সম্পূর্ণরূপে আমাকে গ্রহণ করেছে। এমন একটি মেয়ের ভালবাসা আমি পাব তা আগে ভাবতে পারি নি।

মলিনা দাস এক মনে সৌরেনের কথা শুনছিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, তোরাই সুখী। ভালবাসা খুব শক্ত, কিন্তু সত্যিই যদি ভালবাসা যায় তাতে বড় আনন্দ।

মলিনা দাসের মুখ থেকে এ ধরনের কথা সৌরেন কখনও শোনে নি, তাই প্রশ্ন করল, তুমি কাউকে ভালবাস নি মলিদি?

মলিনা দাস প্রথমটা চুপ করে থেকে পরে উত্তর দেয়, ভাল বোধ হয় বেসে-ছিলাম একজনকে কিন্তু এমনই বরাত, মানুষটা বেরল একেবারে কিম্ভূত। বয়সে সে অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল। আমরা থাকতাম পাশাপাশি ফ্ল্যাটে।

পাছে কথা বলায় বাধা পড়ে তাই সৌরেন চুপ করে শোনে।

মলিনা দাস যেন ফেলে আসা দিনগুলোর মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, বলে, সে মানুষটাকে ভাল না বেসে পারা যায় না। একেবারে আত্ম-ভোলা লোক, সারাদিন পড়াশুনো নিয়ে থাকত। তার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে

পারতাম আমাদের কোন জ্ঞানই হয় নি, অথচ এতটুকু অহঙ্কার তার ছিল না। প্রায়ই নিউটনের মত বলত, জ্ঞানসমুদ্রের বেলায় আমরা নুড়ি কুড়াচ্ছি মাত্র। তখন আমার বয়েস অল্প, মানুষটাকে যে কি গভীরভাবে ভালবেসেছিলাম অথচ—

মলিনা দাসকে থামতে দেখে সৌরেন প্রশ্ন করে, কি হল?

—সে আমাকে বুঝতে পারল না। ও'র স্ত্রী যখন মারা গেল—

সৌরেন বিস্মিত হয়, তার মানে, তিনি বিবাহিত।

—হ্যাঁ, একটি মেয়ে রেখে তাঁর স্ত্রী মারা যায়। জানতাম একলা মেয়েকে মানুষ করতে সে পারবে না। তাই আমি চেয়েছিলাম তাকে বিয়ে করতে, তাদের সব দায়িত্ব নিতে। কিন্তু সে আমাকে ফিরিয়ে দিল। বলল, দোজবরকে বিয়ে করে কোনদিন তুমি সুখী হবে না মিলি। আমাকে তুমি শ্রদ্ধা কর, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার সহানুভূতি, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস না। কিছুতেই তাকে আমি বোঝাতে পারলাম না।

—তারপর কি হল?

মলিনা দাস করুণ হাসে, হবে আর কি। কিছুদিন বাদে ভদ্রলোক আবার বিয়ে করলেন, একেবারে একটি গাঁইয়া মেয়েকে, একবার ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব, তার মধ্যে কোন্ ভালবাসার সন্ধান সে পেয়েছিল।

সৌরেন প্রশ্ন করে, ভদ্রলোক সুখী হয়েছেন?

—জানি না। তবে এখন বাংলাদেশের তিনি একজন নামকরা লোক। তোরা সবাই তাঁকে চিনিস। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি যে কি গভীর আঘাত আমায় করেছিলেন তা বোধ হয় বুঝতে পারেন নি। জীবনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হবার অভিশাপ বড় নির্মম। ওই ঘটনাটা না ঘটলে আমি হয়ত আজকের এই মলিনা দাসে পরিণত হতাম না। কেন জানি না সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাকে যে ভালবাসবে, তাকেও আমি অমনি করে আঘাত করব, ফিরিয়ে দেব। দিয়েওছিলাম।

—কাকে?

মলিনা দাস আবার অতীতের সমুদ্রে ডুব দিল, ছেলেটি আমাদের চেয়ে দু' বছরের সিনিয়র। আমি যখন বি এ পড়ি, সে তখন এম এ পাশ করে বেরল। প্রফেসাররা তাকে খুব স্নেহ করতেন, বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সে।

এই পর্যন্ত বলে মলিনা দাস হাসতে শুরু করে, তখন আমার ভাগ্য প্রসন্ন। সেই রত্নটি আমার প্রেমে মজে হাবুডুবু খেতে শুরু করলেন। রিসার্চ করা তার মাথায় উঠল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি রেখে আমার ক্লাশের চার পাশে ঘুরত, আর মেহের আলির মত বলত, সব ঝুটা হ্যায়।

সৌরেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

—জীবনটা তার মিথ্যেই হয়ে গেল। সব জেনে শুনেও আমি তাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম। অথচ তার কোন অপরাধ ছিল না। অপরাধ এইটুকুই, সে ছিল পুরুষ মানুষ।

সৌরেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, প্রশ্ন করে, সে ভদ্রলোক এখন কোথায়?

মলিনা দাসের মুখে রহস্যময়ীর হাসি, সে কথা জেনে কি লাভ?

—তিনি বিয়ে করেছেন?

—না। বললাম যে মেহের আলি হয়ে গেছে।

এমন সময় দরজায় ঘণ্টি বেজে উঠল। মলিনা দাস দরজা খোলার জন্যে উঠে

দাঁড়ায়।

সৌরেন জিজ্ঞেস করে, কারুর আসবার কথা আছে নাকি?

হ্যাঁ। সোমসাহেবের ভাইকে ডেকেছি।

—আমি তা হলে এখন যাই।

মলিনা দাস বাধা দেয়, না, না, ওর সঙ্গে আমার বেশী কিছু বলার নেই, আধ ঘন্টার বেশী সময় লাগবে না, তুই আমার শোবার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে হারীন সোমকে বিদায় করছি। তারপর দু'জনে কোথাও খেতে যাওয়া যাবে, কি বল?

আজ সন্ধ্যায় সৌরেনের বিশেষ কিছু করার ছিল না তাই সে সহজেই মলিনা দাসের প্রস্তাবে রাজী হল। পাশের ঘরে চলে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল ভাল করে।

এই সেই ঘর যেখানে মলিনা দাস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত সৌরেন কতদিন আড্ডা মেরেছে, কত সময় পরিশ্রান্ত হয়ে খাটের উপর জিরিয়ে নিয়েছে, আবার এই ঘর থেকেই একদিন ভয় পেয়ে বিবর্ণ মুখে মলিনা দাসের আহ্বানকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেছে। আজ অবশ্য এ ঘরে একলা বসে থাকতে তার ভয় করল না। কেন জানা নেই, তার মনে হল, মলিনা দাসের লুকনো ব্যথার স্থানটুকু সে খুঁজে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে কেন এই মেয়েটি অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও অস্বাভাবিক পথে চলতে চায়। এতদিন পর্যন্ত যে মলিদিকে সে ধাঁধার সঙ্গে তুলনা করত, আজ তার অতীত জীবনের কথা শুনে মনে হল, আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই সে চেয়েছিল সংসার পাততে ভালবেসে বিয়ে করতে। না পাওয়ার কান্নাটাই তার হৃদয়ের মূল সুর, জীবনে তার বিচিত্র প্রকাশ। মলিদির জন্যে তার মন করুণায় ভরে গেল।

বাইরের ঘরে হারীন সোম মলিনা দাসের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ সৌরেনের কানে গেল উঁচু পর্দার কথাবার্তা। কৌতূহলী হ'ল সৌরেন, চাবির ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখল হারীন সোমের চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, দরজায় কান পেতে শুনল, হারীন সোম সরোষে বলছে, কেন আপনি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন।

খুব সংযত কণ্ঠে মলিনা দাস উত্তর দিল, আপনাকে তো ভয় দেখাই নি, শুধু বলেছি আমি কি করব। আপনার দাদা আমাকে যে চিঠিপত্রগুলো লিখেছেন সেগুলো পাঠিয়ে দেব আপনার বউদির কাছে।

—তার মানে আমাদের পরিবারে আপনি একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান।

মলিনা দাস খিলখিল করে হাসে।

হারীন সোম ধমকে ওঠে, থাক আর আদিখ্যেতা করে হাসতে হবে না। শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

মলিনা দাস কপট বিস্ময়ের সুরে বলে, সে কি, আমার এই হাসি শোনার জন্যে আপনার দাদা তো উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। শুধু লণ্ডনে এক সঙ্গে ঘুরে তার মন ভরল না ব'লে আমায় জোর করে নিয়ে গেল প্যারিসে। জানেন তো সেখানে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মত এক হোটেলেই থাকতাম।

—আঃ, চুপ করুন।

—মিথ্যে আপনি রেগে যাচ্ছেন। আমার কাছে হোটেলের বিল আছে। রেলের

রিজার্ভেশান আছে, মিঃ অ্যান্ড মিসেস সোম বলে।

হারীন সোম বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে, আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন, তার জন্যে আমাকে ডেকেছেন কেন?

মলিনা দাস মিষ্টি মিষ্টি হাসে, ভাবলাম আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল, যদি দাদা বউদিদির মধ্যে একটা ঝগড়াই বাধে তাতে হয়ত আপনার সুবিধেই হতে পারে কি বলুন?

—তার মানে, কি বলতে চান আপনি?

—অবশ্য জানি না কথাটা কতদূর সত্যি। সোমসায়েবের মুখ থেকেই শোনা তো।

হারীন সোম তীব্রদৃষ্টিতে তাকায়, কি শুনেছেন?

মলিনা দাস কৌতুক করে, মানে ওই 'নষ্টনীড়ের' ব্যাপার আর কি। সোম-সাহেব বোধ হয় আপনার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কটা খুব ভাল চোখে দেখেন নি।

হারীন সোমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, বলে, আমি চললাম। আপনার সঙ্গে কথা বলার আর আমার কোন প্রবৃত্তি নেই।

মলিনা দাস স্বাভাবিকভাবে বলে, মাথা গরম করছেন কেন, ইচ্ছে করলেই সব ঝামেলাই তো আপনি মিটিয়ে ফেলতে পারেন।

—কি করে?

—চিঠিগুলো কিনে ফেলুন।

হারীন সোমের মুখে বিদ্রূপ ফুটে ওঠে, ও এই বুঝি আপনার ব্যবসা। তাহলে বলে রাখি, খুব ভুল লোক ধরেছেন। আমি ওসবের মধ্যে নেই।

—বেশ তো, তবে যদি মত বদলান, আমাকে টেলিফোন করতে দ্বিধা করবেন না। নম্বর তো আপনাকে দেওয়াই আছে। আমি না হয় চিঠিগুলো দু দিন বাদেই পাঠাব।

হারীন সোম আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সৌরেন তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে এসে ড্রেসিং টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে বসে ছবির বই-এর পাতা ওলটাতে লাগল যেন বাইরের ঘরের কোন কথাই সে শুনতে পায় নি।

একটু বাদে হাসতে হাসতে মলিনা দাস ঘরে ঢুকল, চল সৌরেন কোথাও খেতে যাওয়া যাক বড্ড খিদে পেয়েছে।

সৌরেন ইচ্ছে করে প্রশ্ন করল, হারীন সোম কি বলতে এসেছিল?

মলিনা দাস একটা চোখ ছোট করে বলে, সোমসাহেবের ভাই তো, নতুন কথা আর কি বলবে। ক'দিন আমাকে নিয়ে ঘুরতে চায়, এই আর কি।

মলিনা দাসের মুখে এই নির্জলা মিথ্যে কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সৌরেন। তবু সে সন্ধ্যায় মলিনা দাসের সঙ্গেই তাকে বেরতে হয়েছিল, খেতে হয়েছিল রেস্তরাঁয়, কিন্তু একবারও সে মলিদির সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারে নি। সব সময় মনে হয়েছে, রজত বোধ হয় এই মলিনা দাসদের কথাই বলতে চায়, যাদের স্বরূপ কেউই বুঝতে পারে না। হয়ত কোন একদিন এরা নিষ্পাপ ছিল, কিন্তু আজ যে পঙ্কিলতার মধ্যে তলিয়ে গেছে সেখান থেকে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। এদের জন্যে করুণা প্রকাশ করেও কোন লাভ নেই। এরা সমাজের অভিশাপ।

রেস্তরাঁয় খাওয়ার পর মলিনা দাস সৌরেনকে ডেকেছিল তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে, কফি খাওয়ার অছিলায়। কিন্তু সৌরেন তাতে রাজী হয় নি। শরীরের দোহাই দিয়ে মলিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে।

টিউব ট্রেনে উঠে সৌরেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কলকাতায় থাকতে মলিনা দাসদের সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না, এখানে এসেও পরিচয় না হলেই বোধ হয় ভাল হত। বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ও গর্বের ভাব তার মধ্যে সঞ্চিত ছিল মলিনা দাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই সুন্দরী মেয়েটির অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছবি দেখে মনে মনে সে এতখানি শঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে এদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই যেন সে বাঁচে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি মেয়ের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, কি স্নিগ্ধ, শান্ত জীবন। এ এলিজাবেথ। এখন তাকে একবারও বিদেশী বলে মনে হয় না। ভারতকে সে ভালবেসেছে, সেই সঙ্গে তার দর্শন আর সেখানকার অধিবাসীদের। নিজেকে ভারতীয় করে গড়ে তোলার কি প্রাণপণ চেষ্টা। এই ক মাসের পরিচয়ের মধ্যেই এলিজাবেথ যে সৌরেনকে শুধু কাছেই টেনে নিয়েছে তা নয় তার উপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। এলিজাবেথ সেই জাতের মেয়ে যাকে দেখলে বোঝা যায় এরা সেই চিরন্তন নারী; যে নারী নিজে কষ্ট পেলেও অপরের মনে দুঃখ দিতে চায় না।

মলিনা দাসের সঙ্গে এলিজাবেথের কোন তুলনা করতে যাওয়াই ভুল, নারীত্ব ছাড়া আর কোন মিল তাদের দুজনের মধ্যে নেই। মলিনা দাসের রূপ পুরুষের মনে মোহ জাগায় কিন্তু এলিজাবেথের রূপ তাকে সমীহ করে চলতে শেখায়। মলিনা দাসের সঙ্গে কিছুদিন আলাপের পর মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায় অথচ এলিজাবেথের সংস্পর্শে এসে মন পবিত্র হয়ে ওঠে। মলিনা দাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় গভীর, অফিসের কাজকর্ম করতে তাদের মন ওঠে না, অথচ সৌরেন নিজেই অনুভব করেছে এলিজাবেথ শুধু অফিস কেন আরও পাঁচ রকম কাজ করতে তাকে প্রেরণা যোগায়।

এলিজাবেথের সঙ্গে এখনই দেখা করার জন্যে তার মন উন্মুখ হয়ে উঠল। বড় নিরীহ, ভালমানুষ মেয়ে, সত্যিই তাকে পেলে অনেকখানি যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সৌরেন আজ চিন্তা করছে। ভাবছে কতজনের কথা। মনে পড়ল মীনাক্ষীকে, সেও ভাল, সেও সুন্দরী, কিন্তু বড় বেশী যুক্তি ওর মধ্যে। কথায় কাজে, ব্যবহারে সব সময় যুক্তির অবতারণা করে। অত বাঁধাধরা ছককাটা জীবন সৌরেনের ভাল লাগে না। মীনাক্ষীর সঙ্গে এতদিন আলাপ করে সৌরেন বুঝেছে সে তার মনকে স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে দেয় না, সব সময় যুক্তির চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখে। কিন্তু সে জায়গায় এলিজাবেথ অনেক খোলামেলা, অনেক সহজ। ভাবের আবেগকে সে স্বীকার করে, তার আহ্বানে সে সাড়া দেয় এলিজাবেথের সঙ্গে সৌরেনের যতখানি মিল মীনাক্ষীর সঙ্গে সে মিল তার ছিল না।

লীলা আর প্রমীলাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ সৌরেন পেয়েছিল। কিন্তু কোনদিনই তাদের ভাল লাগে নি। সৌরেনের বরাবর মনে হয়েছে তারাও যেন সৃষ্টিছাড়া, উদ্ভট। ওদের জীবনের মূল অর্কিডের মত হাওয়ায় ভাসে, মাটির

সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরাও সুন্দর, হয়ত ভাল, কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র কেমন করে যেন হারিয়ে ফেলেছে। এদের তুলনায় এলিজাবেথ রক্তমাংসের গড়া মানুষ, স্বাভাবিক সুখ দুঃখ হাসি কান্না দিয়ে গড়া তার জীবন। সৌরেন তাকে অনেক বেশী বুঝতে পারে।

অবশ্য বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে মেশবার বিশেষ সুযোগ পায় নি সৌরেন। ডোরিয়ার মধ্যে সে কোন আকর্ষণ খুঁজে পায় নি। কেন যে জিতের তাকে পছন্দ হল সৌরেন তা আজও বুঝতে পারে না। মারিয়াকে তার ভাল লাগা তো দূরের কথা মলিনা দাসের মত তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। নারীর প্রগল্ভতা তার কাছে অসহ্য। ঠিক এই সময় লরার মুখখানা একবার মনের মধ্যে উঁকি মারল। নিজের মনেই হেসে উঠল সৌরেন। কি আশ্চর্য, একেবারে মেয়ে পকেটমারের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, ভাগ্যিস সে এদের ফাঁদে পা দেয় নি।

টিউব ট্রেন খুব জোরে চলছে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। গাড়ির আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। হঠাৎ সৌরেনের মনে হল তার চোখের সামনে নিমেষের জন্যে সব কিছু অন্ধকারের মধ্যে ঢেকে গেল, এতক্ষণ যাদের কথা সে ভাবছিল তারা তলিয়ে গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে। অতি দূর থেকে পাতলা আলো এগিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল সেই অন্ধকার তরঙ্গের উপর। ফেনার মত সাদা সাদা হাসি উত্তাল তরঙ্গ তুলে সৌরেনকে সম্মোহিত করে দিল। যেখান থেকে সেই আলোর ধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেই দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল সৌরেন, দেখল এক সম্মোহিনী মূর্তি। সৌরেন চিনতে পারল—সে আর কেউ নয়, এলিজাবেথ।

কখন ট্রেন গিয়ে স্টেশনে থেমেছে, কিভাবে স্টেশন অতিক্রম করে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে সৌরেন, কিছুই তার খেয়াল ছিল না। চমক ভাঙ্গল একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে। দরজা খোলাই ছিল, পকেট থেকে চাবি বার করতে হল না। এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠে গেল। বুঝতে পারল এলিজাবেথ ঘরে আছে, আলো জ্বলছে ভেতরে। বুকের স্পন্দন তার বেড়ে গেল, মৃদু করাঘাত করল তার দরজায়।

—ভেতরে এস। ডাকল এলিজাবেথ।

সৌরেন ঘরে ঢুকে দেখল ফিকে নীল রঙের জামা পরে সোফায় আরাম করে বসে এলিজাবেথ আলোর তলায় বই পড়ছে। আজ যেন আরও মিষ্টি দেখাচ্ছে তাকে। হেসে জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হল কেন সৌরেন? আমি ভেবেছিলাম তুমি আগেই ফিরবে।

সৌরেন পাল্টা প্রশ্ন করল, বাঃ, তুমি যে বলেছিলে কোন বান্ধবীর কাছে যাবে।

—গিয়েছিলাম, কিন্তু ভাল লাগল না সেখানে, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

আজ এলিজাবেথের যাবার কথা ছিল তার এক পুরনো বান্ধবীর কাছে, এক গ্রামের মেয়ে তারা। লণ্ডনে এসেছে চাকরি করতে। সৌরেন সামনের চেয়ারে বসলে এলিজাবেথ সেই মেয়েটিরই গল্প বলতে থাকে। আগে তাদের সম্পর্ক কত গভীর ছিল, কিভাবে তারা দিন কাটাত তার খুঁটিনাটি গল্প, কেমন করে আগের সম্পর্ক শিথিল হয়ে এল তার বিবরণ। বলা বাহুল্য, সৌরেন একটা কথাও শুনছিল না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল এলিজাবেথের দিকে, দেখছিল তার ঢলঢলে মুখখানা, কথার মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা। এলিজাবেথ বোধ হয় বুঝতে

পেয়েছিল তার কথা শোনায় সৌরেনের মন নেই। জিজ্ঞেস করল কি ভাবছ সৌরেন?

সৌরেন গম্ভীর গলায় বলল, কিছু না তো।

—অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

—তোমাকে দেখছিলাম।

—আমাকে! হাসবার চেষ্টা করল এলিজাবেথ।

সৌরেন উঠে এসে এলিজাবেথের পাশে বসল, হাত দুটো টেনে নিয়ে বলে, একটা কথা তোমাকে বলবার জন্যে ক'দিন থেকে ছটফট করছি, কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছি না।

এলিজাবেথের ফরসা গাল দুটোতে যেন আবীর ছড়িয়ে পড়ল, কি কথা, বল সৌরেন।

সৌরেন ইতস্তত করে বলে, তুমি আমাকে গ্রহণ কর লিজি। বলতে গিয়ে আবেগে সৌরেনের গলা কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে হাত দুটোও।

এলিজাবেথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, মৃদুস্বরে বলল, আমি অপেক্ষা করে ছিলাম কবে তুমি একথা বলবে তাই শোনবার জন্য।

সৌরেন সোচ্ছ্বাসে বললে, তুমি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ আমার করে পেতে চাই।

সৌরেন এলিজাবেথকে কাছে টেনে নিল, এলিজাবেথ এতটুকু বাধা দিল না। নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে সমর্পণ করল সৌরেনের কাছে।

জ্যাক ব্রেণ্টের আশঙ্কা মিথ্যে নয়। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই লণ্ডনের বুকে দাঙ্গা বেধে গেল, বর্ণবৈষম্য নিয়ে।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা, কালো সাদা গায়ের রঙের পার্থক্য নিয়ে যে কখনও ইংলণ্ডের মত সুসভ্য দেশে দাঙ্গা বাধা সম্ভব তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। বেশ কিছুদিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দলের নেতারা বক্তৃতা করছিলেন ইংলণ্ডকে সাদা রাখার জন্যে। তাঁদের অভিমত কালো চামড়ার লোকেদের আর এখানে ঢুকতে না দেওয়াই উচিত। গরম গরম বক্তৃতা ছাপা হতে লাগল কাগজে। তার বিষময় ফল ফলতেও দেরি হল না, ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে গেল বিভিন্ন শহরতলিতে ইংরাজ আর নিগ্রোদের মধ্যে। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। লণ্ডনের নটিং হিল গেটের অধিবাসীরা সবিস্ময়ে দেখল রাতের অন্ধকারে বেশ কিছু সংখ্যক ইংরেজ আক্রমণ করেছে একটি জ্যামেইকান নাইট ক্লাব। চেঁচামেচি, হৈ চৈ, আর্তনাদ, পুলিস এসে তা থামিয়ে দিল বটে কিন্তু এই হল দাঙ্গার সূত্রপাত।

নটিং হিল গেট থেকে এই ঝগড়া শুরু হবার কারণ আছে। এ অঞ্চলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বহু অধিবাসী বাস করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর অনেক ইংরেজ ইংলণ্ড ছেড়ে বিভিন্ন কলোনীতে বাস করার জন্যে চলে গিয়েছিল, কারণ সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ ছিল উজ্জ্বল। ফলে ইংলণ্ডে কায়িক পরিশ্রম করার লোকের সংখ্যা কমে গেল। উনিশ শ' তিপ্পান্ন থেকে তিন বছর পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংলণ্ডের সবচেয়ে ভাল সময়। কমনওয়েলথ-এর বিভিন্ন দেশে তারা তৈরী মাল রপ্তানি করেছে, সেই অনুপাতে কলকারখানায় কাজ চলেছে পুরোদমে, উৎপাদনী শক্তি বাড়াবার জন্যে তিন শিফ্‌টে কাজ করতেও ইতস্তত করেন নি মিল-মালিকরা।

কিন্তু এজন্যে চাই শ্রমিক, দেশে তখন লোকসংখ্যা কম, অগত্যা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

থেকে হাজারে হাজারে মজুর আনা হল কাজ করবার জন্যে। লণ্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বসবাস করতে শুরু করল, বিশেষ করে নটিং হিল গেটে তাদের বিরাট আস্তানা।

বিপদ হল ১৯৫৭ সালের পর। পৃথিবীর সব দেশেই ব্যবসায় মন্দা পড়ল, ইংলণ্ডও উৎপাদন কমাতে বাধ্য হল। ফলে কাজ কমল, কিন্তু লোক বেশী। শুরু হল ছাঁটাই করা, যোগ্যতা হিসেবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজরা কারুর চেয়ে কম নয়, বরং অনেক বিষয়ে ভাল। তাই তাদের কাজ থেকে সরানো গেল না। হিংসে জেগে উঠল ইংরেজ ছেলেদের মনে। তারা যখন কাজ পাচ্ছে না, বেকার হয়ে বসে আছে, তাদেরই দেশে এসে মুখের রুটি কেড়ে নিচ্ছে কালো চামড়ার লোকগুলো। অতএব ওদের বিদায় কর, সেই সঙ্গে ইন্ধন জুগিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের বক্তৃতা, Keek the Britain White.

অবশ্য ঝগড়া যখন বাধে তার কারণ দেখানো হল অন্য। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ না করে সাদা চামড়ার লোকেরা বলতে শুরু করল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যে জ্যামেইকানরা অত্যন্ত অভদ্র। বড় বেশী মাত্রায় পান করে, যেখানে সেখানে হল্লা করে বেড়ায়। নাইট ক্লাব খুলে মেয়েদের পাপব্যবসায় লিপ্ত করে। এই অজুহাত দেখিয়ে শুরু হল মারামারি। ক'দিন ধরে চলল এর তাণ্ডব নৃত্য, পুলিস এসে এক জায়গায় গোলমাল চাপা দেয়, অমনি আর এক দিকে শুরু হয়ে যায়। নটিং হিল গেট থেকে এজ্‌ওয়ার রোড, প্যাডিংটন এমনকি মার্বল আর্চ পর্যন্ত এই দাঙ্গার জের ছড়িয়ে পড়ল। হ্যাম্পস্টেড রেহাই পেলেও কিলবার্ন হাই রোডে খুনখারাপি হল যথেষ্ট, এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে টেডী বয়েজরাও কম লুঠতরাজ করল না।

কিছুদিন ধরেই লণ্ডনে বেশ আতঙ্ক দেখা দিল, বিশেষ করে কালো চামড়ার লোকেদের মধ্যে। এমনকি ভারতীয়রাও ভয়ে ভয়ে চলত, কে বলতে পারে হঠাৎ তাদের ওপর কোন আক্রমণ হয় কিনা। ইতিমধ্যে খবরও পাওয়া গেছে দুটি ভারতীয় ছেলেকে ছুরি মারা হয়েছে। যদিও বোঝা যায় নি কারা তাদের আক্রমণ করেছিল। টাকার লোভে টেডী বয়েজরা, না, বর্ণবৈষম্যের নীতি মেনে নেওয়া ইংরাজ যুবক?

সৌরেন অফিস থেকে সোজা ফিরে আসত বাড়িতে। তারপর আর বেরত না। এলিজাবেথ হয়ত দু-একদিন বলেছে, এ পাড়ায় তো কোন গণ্ডগোল নেই, চল না কোথাও খেয়ে আসি।

সৌরেন আপত্তি করেছে, না থাক, কখন কোথায় গণ্ডগোল হয় কে বলতে পারে।

—আমি তো তোমার সঙ্গে থাকব—

—সেই জন্যেই তো আরও ভয়। এমনিতে হয়ত আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু যেই দেখবে তোমার মত একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে আমি ঘুরছি অমনি ওদের হিংসে বেড়ে যাবে।

এলিজাবেথ নিজের মনে মাথা নাড়ে, বিশ্রী ব্যাপার। ইংলণ্ডে যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে আমি ভাবতে পারছি না। সত্যি, আমার লজ্জা করছে সৌরেন, মনে হচ্ছে দিন দিন আমরা অসভ্য হয়ে পড়ছি।

সৌরেন ইচ্ছে করে বলল, আমি অবশ্য মোটেই অবাক হই নি, কারণ আমাদের দেশে সেদিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লাগত। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে তবে সেটা থেমেছে। এলিজাবেথ তখনও কি ভাবছিল, বলল, ছোটবেলায় কি ভাবতাম

জান, ইংলণ্ডকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না। অন্য সব দেশের খবর পেতাম, মনে হত আমাদের তুলনায় তারা কত অসভ্য, কিন্তু আজ এখুনি এই মুহূর্তে তুমি যদি আমায় ভারতে যেতে বল আমি আর কোন রকম চিন্তা না করে চলে যাব। আর এখানে থাকতে আমার ভাল লাগছে না।

সৌরেন এলিজাবেথকে সান্ত্বনা দিয়েছে, নানা রকম গল্প করেছে, শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে বলেছে, এই দাঙ্গার ফলে আমাদের কিছু লোকসান হয় নি।

এলিজাবেথ প্রশ্ন করেছে, কেন?

—দেখ না অফিস ছাড়া সকালসন্ধ্যে সব সময়টুকু আমরা দুজনে দুজনের কাছে থাকি, আমার কাছে এইটাই তো পরম লাভ।

এলিজাবেথও হেসে ফেলে, বলে, ভারী দুষ্টু তুমি।

সৌরেন কিন্তু মিথ্যে বলে নি, সত্যিই এই ক'টা দিন তারা এত কাছাকাছি থেকেছে যে কখন কোন দিক দিয়ে সময় কেটে গেছে বুঝতে পারে নি। নিজেদের আনন্দে তারা বিভোর হয়ে ছিল। দেহের মাদকতা তাদের ভুলিয়ে রেখেছিল বর্তমান পরিস্থিতির নোংরামি থেকে।

হঠাৎ একদিন টেলিফোন এল কোন এক হাসপাতাল থেকে।

—আপনার নাম সৌরেন লাহিড়ী?

—আপনার বন্ধু রজত বোস সাম্প্রতিক দাঙ্গায় আহত হয়ে এই হাসপাতালে এসেছিলেন, এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বাড়ি ফিরে যেতে চান, আপনাকে খবর দিতে বললেন।

রজত যে এ দাঙ্গায় আহত হয়েছে তা সৌরেন জানত না বলেই অবাক হল খুব বেশী। বললে, আমি আজই যাব দেখা করতে।

সৌরেন ভেবেছিল এলিজাবেথকে নিয়েই যাবে কিন্তু এলিজাবেথের অফিসে বেশী কাজ থাকায় আজ তার পক্ষে বেরনো সম্ভব হবে না জানাল।

হাসপাতালের রিসেপ্‌শনে গিয়ে নাম বলতেই সৌরেনকে তারা পাঠিয়ে দিল রজতের কাছে। রজত বিছানার ওপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ, দাড়িটা বেড়ে গেছে। কিন্তু চোখে সেই আগের মত উজ্জ্বল হাসি, সৌরেনকে দেখে সে সত্যিই খুশী হল। প্রথম কথাই বলল, তুই এসেছিস, বাঁচা গেছে, আর এখানে ভাল লাগছে না। ইংরেজ নার্স আর ডাক্তারদের ভণ্ডামি আমার কাছে অসহ্য।

সৌরেন অল্প হাসল, এদের উপর রাগ করছিস কেন?

—বলেছি না, এ জাতটাই বুজরুক। রাস্তায় দেখলে ডাণ্ডা মারছে তার পরেই হাসপাতালে ঢুকিয়ে সেবা, আহা কি উদারতার মহিমা। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।

—কবে তুই হাসপাতালে এসেছিস, কি হয়েছিল, খুলে বল।

রজত মাথা নাড়ে, সে দীর্ঘ ইতিহাস, পাঁচ মিনিটে তো আর বলা যাবে না। আগে বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

অগত্যা সৌরেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে গিয়ে জানাল, রজত বাড়ি যেতে চায়। তারা আপত্তি করলেন না, বললেন, এখন আর কোন ভয়ের কারণ নেই। একটু সাবধানে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

সৌরেন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না, প্রশ্ন করে, কি হয়েছিল ওর?

—পেছন থেকে কেউ ছুরি মেরেছিল, কিন্তু সেটা বেশীদূর ঢোকে নি। বেশী আঘাত পেয়েছেন উনি মাথায়। মনে হয় লোহার ডান্ডা দিয়ে কেউ ঘা মেরেছে।

—সত্যি ?

—দু দিন প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন, তারপর ক্রমশ ভাল হয়ে উঠেছেন। ডিলিরিয়ামের ঝোঁকে একটি মেয়ের নাম উনি প্রায়ই বলতেন।

—কি নাম বলুন তো ?

—মারিয়া।

সৌরেন যেন এই নামটাই শুনতে চেয়েছিল, বললে, আমিও তাই ভেবেছিলাম।

—আপনার নামও মাঝে মাঝে করতেন। তাই আপনাকেই খবর দিয়েছি।

সৌরেন সৌজন্য প্রকাশ করে বলে, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, এখন ওকে কি করে নিয়ে যেতে পারি বলুন।

—আমরা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়িতে পাঠিয়ে দেব, স্ট্রেচারে করে একেবারে উপরে তুলে দিয়ে আসবে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সৌরেন রজতকে নিয়ে গিয়ে ইস্ট এন্ডে তার ফ্ল্যাটের বিছানায় শুইয়ে দিলে। ঘর-দোর খুব অপরিষ্কার না হলেও ঝাড়পোঁছ করার প্রয়োজন আছে বইকি। প্রায় দিন দশেক বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল। রজতের কোন আপত্তি না শুনে সৌরেন কোটটা খুলে রেখে কাজে লেগে গেল। টেবিল-চেয়ার-গুলো মোটামুটি ডাস্টার দিয়ে ঝেড়ে ফেলে রান্নাঘরে জল ফুটতে দিয়ে ভাঁড়ারে কি আছে নেড়েচেড়ে দেখে নিল। কয়েকটা সুপের টিন, কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক, চা, খানিকটা চাল ডাল ছাড়া বিশেষ কিছু নেই।

দু' কাপ চা তৈরি করে এনে সৌরেন বললে, গরম গরম খেয়ে নাও, ভাল লাগবে।

রজত হেসে বলল, এমনিতে আমার ভাল লাগছে, নিজের ঘরে এসে শুয়ে আছি। পাশে আমার ভারতীয় বন্ধু, আর কি চাই।

—সিগারেট খাবে নাকি ?

—দাও। এখন তো পাইপ খেতে পারছি না।

সৌরেন কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়, প্রশ্ন করে, কবে এ দুর্ঘটনা ঘটল ?

—তা প্রায় দু সপ্তাহ হল বইকি। এই দাঙ্গার অন্যতম প্রধান বলি বোধ হয় আমি। সেদিন পর্যন্ত লন্ডনে কোনরকম গোলমালের খবর ছিল না, আমি নটিং হিল টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তা ধরে পূর্বদিকে এগুচ্ছি, রাস্তায় বিশেষ লোক ছিল না। হঠাৎ পেছন থেকে একটা চীৎকার শুনলাম, দেখি এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছেন। তাঁদের পেছনে তাড়া করে ছুটে আসছে একদল লোক। প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। হক্‌চকিয়ে গিয়ে রাস্তার এক দিকে সরে দাঁড়ালাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে সন্দেহ জাগল এও বর্ণ-বৈষম্যের বিষক্রিয়া কিনা। কারণ দেখলাম যাঁরা পালাচ্ছেন, তাঁদের গায়ের রঙ কালো, যারা তাড়া করে আসছে তারা সাদা। ভদ্রলোকটি চীৎকার করতে করতে ছুটছেন, "আমাদের বাঁচাও, ওরা মেরে ফেলবে।" আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, দরজা জানলা খুলে অনেকে মুখ বাড়াচ্ছে কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না। লোকটি আমার কাছ পর্যন্ত এসে ব্যাকুল স্বরে বলল, তুমি ভারতীয়, দয়া করে আমার স্ত্রীকে বাঁচাও, ও অন্তঃসত্ত্বা।

বিশ্বাস কর সৌরেন, ওই মানুষটার কাতর উক্তি এখনও আমার কানে বাজছে, আর কোন কথা চিন্তা না করে পাশের একটা মুদীর দোকান ঠেলে খুলে ফেলে ভদ্রমহিলাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। ততক্ষণে পেছনের দল তাড়া করে এসেছে, নির্দয় ভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে জ্যামেইকান ভদ্রলোকটির উপর। আমি কিন্তু আর কালবিলম্ব না করে ছুটলাম সামনের টেলিফোন বুথ লক্ষ্য করে। ভাগ্য ভাল, পুলিসকে খবরটা আমি দিয়ে দিতে পেরেছিলাম, হিংস্র ইংরেজ ছেলেরা আমাকে টেলিফোন বুথ্ থেকে টেনে বার করলে, তারপর কি হল আমার মনে নেই। মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। জ্ঞান ফিরে পেলাম একেবারে হাসপাতালে, তবে পরে খবর পেয়েছি মেয়েটিকে ওরা কিছু করতে পারে নি, মুদীর দোকান তাকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছিল। ভদ্রলোকটি আমারই মত অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে যায়, তবে এখন ভাল আছে।

সৌরেন দুঃখ করে বলে, ছি, ছি, একটি অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে তারা এই ভাবে তাড়া করল। মনুষ্যত্ব বলে কি কোন জিনিস নেই?

—মনুষ্যত্ব! রজত হা হা করে হাসলে। মানুষ থাকলে তবে তো মনুষ্যত্বের কথা ওঠে।

সৌরেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলে তাকায়।

—কেন, এ ক'দিন কাগজে পড় নি, নারীর অবমাননা, শিশুহত্যা, কোন জিনিসটা এরা বাদ দিয়েছে? সভ্যতার বড়াই আর যেন ইংরেজ না করে।

—কিন্তু এরকম হল কেন?

রজত গম্ভীর গলায় বলে, আমি তো আগেই বলেছিলাম, জমিদার-বাড়ির যখন বোলবোলা থাকে, তখন সেখানে কত আনন্দ, হৈ চৈ, হাতিশালে হাতি, ঘোড়া-শালে ঘোড়া, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসীর অভাব নেই। কত দান ধ্যান, বার মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকে। কিন্তু সেই জমিদারি যখন চলে যায়, দেখেছ তখন সেই লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ির কি অবস্থা হয়? ভুতুড়ে প্রাসাদের মত অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, পঞ্চাশটা শরিকে মিলে বাড়িখানা ভাগ করে নেয়। তখন তাদের মধ্যে দেখা দেয় ঈর্ষা, দ্বেষ, মনের সঙ্কীর্ণতা।

রজত চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করে, এখন ইংলণ্ডের কথা ভাবলে আমার মনে হয় ওই জমিদারির কথা। একে একে আলো নিবে যাচ্ছে, সাম্রাজ্য গেছে, কমনওয়েল্‌থ-এর মুখোশও খুলে পড়বে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে এই ছোট্ট দ্বীপখানা। চারদিকে দেখা দেবে অভাব, অনটন। তারই সূত্রপাত এখন আমরা দেখছি। অভাবের মধ্যে বোধ হয় মানুষকে ঠিক যাচিয়ে দেখা যায়। প্রাচুর্যের মধ্যে সে উদারতার অভিনয় করে মাত্র। আমার কি মনে হয় জান সৌরেন, আর ক'বছরের মধ্যে দেখবে ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স আর ইটালীর কোন তফাত নেই। আভিজাত্য তারা হারাবে না, কিন্তু তার পাশাপাশি দেখা যাবে মনের সঙ্কীর্ণতা। যা দেখেছ আমাদের দেশেও।

সৌরেন চায়ের পেয়ালাগুলো ধুতে নিয়ে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল, রজত বলল, দেশে ফিরে যা সৌরেন। গিয়ে সবাইকে বল আর যেন কেউ এ দেশে না আসে। ইংলণ্ডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কণ্টিনেণ্টও শেষ হয়ে গেছে। যদি কেউ বাইরে যেতে চায় যাক তারা আমেরিকা, কিংবা রাশিয়া যারা এখনও বড় হবার স্বপ্ন দেখছে, যারা এখনও সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় নি।

সৌরেন ইচ্ছে করেই পাশের ঘরে চলে যায়, বোঝে বেশী কথা বললে রজত উত্তেজিত হয়ে পড়বে, তার চেয়ে ওকে শুতে দেওয়া ভাল।

কাপ দুটো ধুয়ে রেখে বাজারের প্লাস্টিক ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল সৌরেন, বলল, তুমি একটু শুয়ে নাও, আমি চট্ করে কয়েকটা দরকারী জিনিস বাজার করে আনছি।

রজত বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম সৌরেন।

সৌরেন হাসল, তুমি তো সেণ্টিমেণ্টাল নও।

—তা নই। তবে আমার জন্যে কেউ খাটছে দেখলে খারাপ লাগে। দেখ ত ওই ড্রয়ারে কিছু টাকা ছিল, নিয়ে যাও।

সৌরেন বলল, তার দরকার হবে না, আমার কাছে টাকা আছে।

মোড়ের মাথায় প্রথম যে দোকানটা খোলা পেল সেখানেই ঢুকে পড়ল সৌরেন। রুটি মাখন কয়েকটা ডিম, পাশের দোকান থেকে আলু ফল নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে বাড়িতে ফিরে এল। দরজা খুলে দেখে রজত ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে সৌরেন চলে গেল রান্নাঘরে। চাল আর ডাল মিশিয়ে অল্প করে খিচুড়ি বসিয়ে দিল, তার সঙ্গে খাবার সময়ে দুটো ডিম ভেজে নিলেই চলবে। কিন্তু একটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরতে থাকল, রজত একলা এ বাড়িতে থাকবে কি করে? তার যা শরীরের অবস্থা, খুব বেশী ঘোরাঘুরি করা উচিত নয়, রান্না করা তো একরকম অসম্ভবই বলতে হবে। এক হয় লাঞ্চের সময় সৌরেন যদি খাবার কিনে নিয়ে এখানে চলে আসে, দুজনে মিলে খায় আবার বিকেলে অফিস ছুটি হয়ে যাবার পর এখানে এসে রান্না করে ফেলে।

সৌরেনের মনে হল রজত কার সঙ্গে কথা বলছে। ঘরে কেউ এল নাকি? কিন্তু কি করে আসবে, দরজা তো ভেতর থেকে লক্ করা। একটু অবাক হয়েই সৌরেন পাশের ঘরে বেরিয়ে এল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছে রজত। খুব পরিস্কার নয়, জড়ানো উচ্চারণ, কাছে এসে কান না পাতলে শোনা যায় না।

সৌরেন খুব সাবধানে খাটের কাছে এগিয়ে গেল, মাথা নীচু করে শুনল রজত বলছে, আমাকে বিশ্বাস কর, আমি বড় একা। আর আমি পারছি না। এ পরীক্ষার মধ্যে না পড়লে হয়ত কোনদিন বুঝতে পারতাম না আমি তোমাকে এতখানি ভালবাসি।

চুপ করে গেল রজত।

সৌরেন আবার রান্নাঘরে ফিরে গেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিল রজত, নিশ্চয় মারিয়া। লরা বলে মনে হয় না। মারিয়া এখন কোথায়? রজত কি তার ঠিকানা জানে?

একটু পরে রজতের ঘুম ভাঙ্গল। সৌরেন জিজ্ঞেস করল, এখন কিরকম লাগছে?

—অনেক ভাল।

—আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি।

রজত উৎফুল্ল স্বরে বলে, খিচুড়ি! সত্যি সৌরেন, তুমি বড় ভাল ছেলে। কতদিন খিচুড়ি খাই নি।

সৌরেন অন্যমনস্ক স্বরে জিজ্ঞেস করে, মারিয়া এখন কোথায়? ওর কোন

চিঠি পেয়েছ?

রজত মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে, ওই মেয়েটার কথা এখনও ভোল নি দেখছি। তোমাকে খুব যাদু করেছিল, না?

—হঠাৎ এ কথা কেন?

রজত চোখ মুখ কঠিন করে বলে, ওর মত স্বার্থপর, ওর মত নিষ্ঠুর মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি, নিজেরটুকু ছাড়া দুনিয়ায় সে আর কিছু বোঝে না। নাচের প্রোগ্রাম তার শেষ হয়ে গেছে, নাম হয়েছে খুব। এতদিন বাদে মাতৃভূমির কথা মনে পড়েছে। নেপল্‌স্‌-এ গিয়ে বসে আছে।

—তাই নাকি, তোমায় চিঠি দিয়েছে বুঝি?

রজত বিদ্রূপ করে হাসে, শুধু তাই, সেখানে এক সুদর্শন ছেলে বন্ধু হয়েছে। ইটালীয়ান ছেলে, নাম রোবার্টো। ভাল পিয়ানো বাজায়। তিন পাতা ধরে তার রূপগুণের ব্যাখ্যা করেছে। ওইটেই তার শেষ চিঠি। বলা বাহুল্য আমি কোনও উত্তর দিই নি।

সৌরেন চুপ করে থেকে বলে, তোমার অসুখের খবরটা বোধ হয় একবার মারিয়াকে জানানো দরকার।

রজত চেঁচিয়ে ওঠে, মোটেই না। আমি মরি বাঁচি তাতে মারিয়ার কি এসে যায়? কোন খবর আমি তাকে দেব না। আমি তো ভাবছি লরাকে বলব কদিন এসে এখানে থাকতে। মারিয়া যদি ফিরে আসে, অন্য কোথাও তাকে বাড়ি ভাড়া নিতে হবে।

এ নিয়ে আর কথা বলল না সৌরেন, কিন্তু রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুভরাত্রি জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় গোপনে মারিয়ার ঠিকানাটা লিখে নিয়ে এল কাগজে।

সৌরেন বাড়ি ফিরে দেখে এলিজাবেথ তখনও শুতে যায় নি, তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। সৌরেনকে দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার বন্ধু কিরকম আছে সৌরেন?

সৌরেন হাসবার চেষ্টা করে, বলে অনেকটা ভাল। ওকে ওর বাড়িতে রেখে এসেছি।

—একলা থাকবার কোন অসুবিধে হবে না?

—সকাল বিকেল আমাকে যেতে হবে আর কি।

ঘরে ঢুকে জামা ছাড়তে ছাড়তে সৌরেন আজকের ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করে। এমন কি প্রথম দিন নটিং হিল গেটে কি ভাবে রজত আক্রান্ত হয় সে কথা জানাতেও ভোলে না।

এলিজাবেথ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সব কথা শুনছিল, অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, ছি ছি কি লজ্জার কথা বল ত! নির্দোষ মানুষকে এই ভাবে বিপদগ্রস্ত করা। যারা এসব গোলযোগ করছে সরকারের উচিত তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া।

সৌরেন ড্রেসিং গাউনটা পরে সোফায় বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এলিজাবেথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আজ তোমার ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে, তাই না? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

সৌরেন কোন উত্তর না দিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

এলিজাবেথ তার কাছে উঠে এসে বলে, কাল থেকে তোমায় আর এত ভাবতে হবে না। আমিও যাব রজতের ফ্ল্যাটে তোমাকে সাহায্য করতে। আহা বেচারী!

রান্না করে মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

সৌরেন এই ভয়ই পাচ্ছিল, জানত সব কথা শুনলে এলিজাবেথ তার সংগে যেতে চাইবে, অথচ রজতের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বলল, না, না, তোমার কষ্ট করতে হবে না লিজি, আমি করে নিতে পারব।

এলিজাবেথ মধুর হাসে, এতে আবার কষ্ট কি? অফিসের পর দুজনে এক-সংগে থাকা যাবে সেই তো ভাল।

সৌরেন বিব্রত বোধ করে, বলে, ঠিক সে জন্যে নয়, মানে রজত কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের ছেলে।

—তাতে কি হল?

সৌরেন বোঝাবার চেষ্টা করে, আমার ভয় করে যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে বসে তুমি মনে কষ্ট পাবে।

এলিজাবেথ কথা শুনে হাসে, তুমি কি আমাকে কচি খুকি ভেবেছ সৌরেন। রজত এখন অসুস্থ, যদি সে কিছু বলেই আমি তা নিয়ে মন খারাপ করতে যাব কেন? তা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে ওর কি অভিযোগই বা থাকতে পারে?

—কি করে তোমাকে বোঝাব লিজি রজতের রাগ গোটা ইংরেজ জাতটার ওপর। অন্যায়ভাবে মার খেয়ে রাগটা তার আরও বেড়ে গেছে। তোমাকে সামনে পেলে তার সব রাগটা গিয়ে পড়বে তোমার উপর।

এলিজাবেথ তবুও বুঝতে চায় না, মাথা নাড়ে, বলে, সেইজন্যই তো আমার আরও বেশী যাওয়া দরকার। তার মনের মধ্যে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সে যদি মনে করে এই গুণ্ডামি, মারধোর করাকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ সমর্থন করছে তবে ভুল করবে, আমি ইংরেজ মেয়ে হিসেবে বলছি এ অন্যায়। তুমি দেখবে কোর্টে প্রত্যেকটি অপরাধীর বিচার হবে, তারা শাস্তি পাবে।

কথা বলতে বলতে এলিজাবেথের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। সৌরেন তাকে শান্ত করার চেষ্টায় বলে, তুমি বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছ লিজি। কদিন বাদে রজতের ভুল আপনা থেকেই ভেঙে যাবে। তখন আলাপ করো। এ কটা দিন যাক না।

এলিজাবেথ আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল, বেশ, তুমি যখন বলছ, যাব না। রজত তোমার বন্ধু, তুমি নিশ্চয় তাকে আমার চেয়ে ভাল চেনো। কাল সকালসকাল আমায় অফিসে বেরতে হবে, যাই শুয়ে পড়ি। গুড্ নাইট্।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে এলিজাবেথ ফিরে তাকাল, বলল, আমার মনে হয় মারিয়াকে তোমার চিঠি লিখে দেওয়া উচিত, অবশ্য সেটা তুমি ভাল বুঝবে।

এলিজাবেথ বেরিয়ে চলে গেল।

সৌরেন চুপ করে বসে রইল। বুঝল এলিজাবেথের অভিমান হয়েছে। কিন্তু কিই বা তার করার আছে। রজতকে তো সে চেনে না। তবু এলিজাবেথের কথামত রাত্রে বসে বসে মারিয়াকে সে এক দীর্ঘ চিঠি লিখল, কালকে অফিস থেকে পোস্ট করে দেবে।

পরদিন সকালে উঠতে অন্য দিনের চেয়ে সৌরেনের দেরি হল। ব্রেকফাস্ট খাবার সময় মিসেস্ হেরিং জানাল এলিজাবেথ ইতিমধ্যেই অফিসে চলে গেছে। সৌরেন মনে মনে ঠিক করল, অফিস থেকে এলিজাবেথকে ফোন করবে। কাল বেচারী নিশ্চয় মনে কষ্ট পেয়েছে।

সেদিনও অফিসে জ্যাক্ ব্রেন্ট এল দেরি করে। সৌরেন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল, আজকাল যে এত ঘন ঘন দেরি হচ্ছে জ্যাক্, বুড়ো বয়সে কারুর প্রেমে পড়লে না তো?

জ্যাক ম্লান হেসে উত্তর দিল, আর দেরি হবে না, সব ঝামেলা মিটে গেছে।

—আবার কিসের ঝামেলা?

—ঝামেলা একটাই, আমার সেই ভাই রবার্ট বলেছিলাম দাঙ্গা করার জন্যে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আজকে তার বিচারের রায় বেরুল।

জ্যাক্ একটু থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ছ' মাসের সশ্রম কারাদণ্ড, এক শ' পাউণ্ড জরিমানা। টাকা দিতে না পারলে আরও ছ' মাস কারাবাস।

সৌরেন চুপ করে কথাগুলো শুনলো, তুমি এখন কি করবে?

—করবার তো কিছু নেই। এক শ' পাউণ্ড দেবার আমার সামর্থ্য কোথায়? আর থাকলেও বোধ হয় দিতাম না। এক বছর জেলে থেকে যদি নিজের ভুল বুঝতে পারে, কিছুটা মানুষের মত হয়, তা হলেই বাঁচি।

সৌরেনের কিছু বলার ছিল না, জ্যাক্‌কে আর সান্ত্বনা দেবার কি আছে? চুপচাপ নিজের কাজ করে গেল বাকী সময়টা, মনে পড়ল এলিজাবেথের কথা। সে ঠিক বলেছে, বিচারে সত্যি সত্যি কঠিন শাস্তি হয়েছে অপরাধীদের। জজেরা অন্তত চামড়ার রঙের কোন পার্থক্য করে নি।

এলিজাবেথের অফিসে বার দুই ফোন করেও সৌরেন ধরতে পারল না, বোধ হয় লাঞ্চে বেরিয়েছে। সাড়ে বারটা নাগাদ কিছু স্যাণ্ডউইচ, আর বড় বড় দু টুকরো মাছ ভাজা কাগজে মুড়ে নিয়ে সে হাজির হল রজতের ফ্ল্যাটে। সৌরেনকে দেখে রজতের মুখ খুশীতে ঝলমল করে ওঠে। বলে, ঠিক সময় এসে পড়েছিস সৌরেন, পেটে আমার ইঁদুরে ডন মারছে।

কথা না বাড়িয়ে দুজনে খেতে বসল। সৌরেন এক সময় জানাল জ্যাক ব্রেন্টের ভাইয়ের কথা, বলল, আর যাই হোক, ইংলিশ কোর্ট ন্যায্য বিচার করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রজতের মুখের চেহারা বদলে গেল, তীক্ষ্ণ কন্ঠে বলল, তুই ওদের বিচারের প্রহসনকে বিশ্বাস করিস? লোক দেখিয়ে দু'-তিনটে ইংরেজকে ওরা শাস্তি দেবে, আর অন্য দিকে সব ক'টি চাবি বন্ধ করে দেবে, যাতে না কালো লোকরা আর ইংলণ্ডে আসতে পারে, আর না এখানে চাকরি পায়। শয়তানের অনুচরদের কথা যে আমরা বইতে পড়েছিলাম না, তাদেরই জীবন্ত রূপ হচ্ছে ইংরেজ। সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের মায়ায় ভুলো না বন্ধু।

ট্র্যাভেল এজেন্টের অফিস থেকে নেমে এল লীলা চৌধুরী। সঙ্গে তার অমিতাভ। লীলা চৌধুরী আগের চেয়েও যেন রোগা হয়েছে। ফিকে সবুজ রঙের সিল্ক শাড়ীতে বেশ মানিয়েছে তাকে। দেখলেই বোঝা যায় মোটেই যত্ন করে সে প্রসাধন করে নি, কোনরকমে মুখে খানিকটা পাউডার মেখে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এসেছে। এমন কি চোখের কোলগুলোতেও পেন্সিল টানে নি। তবু তাকে দেখতে ভাল লাগছে। রোল করে টানা চুলের সামনে ঢলঢলে মুখখানা পরিষ্কার হয়ে ফুটে রয়েছে।

লীলা চৌধুরী অফিস যায় নি। আজ একবার ট্র্যাভেল এজেন্সিতে আসবার কথা ছিল বটে, কিন্তু সেজন্যে অফিস কামাই করার প্রয়োজন ছিল না। সত্যি কথা

বলতে কি সকাল থেকে লীলা চৌধুরীকে আলস্যে ধরছে। বিছানার উপর গড়িমসি করে উঠে মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে সাড়ে নটা বেজে গেল। এর পর আর অফিস যাবার কোন মানে হয় না। অমিতাভকে বলা ছিল সাড়ে এগারটার সময় ট্র্যাভেল এজেন্সির সামনে অপেক্ষা করতে, তাই শাড়ী বদলে সোজা এখানে চলে এসেছে।

এখানে অবশ্য বেশীক্ষণ সময় লাগে নি, মাস দেড়েক বাদে 'স্ট্র্যাথমোর' জাহাজ সাউদামটন থেকে বোম্বাই যাবে, লীলা চৌধুরীর জন্যে ওই জাহাজে বার্থ পাওয়া গেছে। এত তাড়াতাড়ি বার্থ পাওয়া যাবে লীলা আশা করে নি, হঠাৎ কয়েকজনের রিজার্ভেশান ক্যানসেল হওয়ায় জায়গা খালি হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লীলা বলল, আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে অমিত, চল যেখানে হক ঢুকে পড়ি।

অমিতাভ আপত্তি করল না, পিকাডেলীতেই যখন এসে পড়েছি, চল লায়ন্স কর্নার হাউসে যাওয়া যাক।

একটু বাদে বলল, সত্যিই তা হলে তুমি চললে।

লীলা হাসে, অনেকদিন তো হল, আর এখানে পড়ে থেকে কি হবে বল?

অমিতাভর চোখ ছলছল করে ওঠে, সবাই চলে যাবে, একলা আমি পড়ে থাকব। কি যে করব কিছুই বুঝতে পারি না।

—পড়াশুনো করছিস, ভালই তো।

অমিতাভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সকলেরই বুঝি পড়াশুনো হয় দিদি!

লায়ন্স-এর দোকানে পৌঁছে ওরা উপরে উঠে গেল। দু'জনে দু'খানা ট্রে হাতে নিয়ে রেলিং-এর ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পাশে সাজান রয়েছে নানা-রকমের খাবার। প্রত্যেকটি পদের উপর দাম লেখা। নিজেদের পছন্দ মত ট্রেতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে লীলারা বেরিয়ে এল বড় ঘরে। সামনে কাউন্টার, টাকা দিল লীলা। পাশের ডেস্ক থেকে প্রয়োজন মত কাঁটা চামচ তুলে নিয়ে বসল টেবিলে।

বেশ বড় ঘর, অনেকে খাচ্ছে। ইচ্ছে মত স্বচ্ছন্দ আরামে এখানে খাওয়া যায়। খেতে খেতে অমিতাভ বলল, তুমি কিন্তু লন্ডনকে খুব মিস করবে।

লীলা চোখ তুলে তাকাল, অমিতাভর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতে মৃদু হাসল সে, বলল, প্রথম প্রথম মিস করব বইকি। এতগুলো দিন তোদের সঙ্গে কাটালাম। বিশেষ করে তোর কথা খুব মনে পড়বে।

—সত্যি বলছ?

—কেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

কথা বলতে গিয়ে অমিতাভর গলা ধরে আসে, বিশ্বাস কর, আমি তো ভাবতেই পারছি না তুমি চলে গেলে আমি একলা থাকব কি করে। তুমি যে আমার কাছে কি তা বোধ হয় মুখে বলে কোনদিন বোঝাতে পারব না।

অমিতাভর প্রত্যেকটি কথা এত সত্য যে সহজেই লীলার মন স্পর্শ করল। যতদূর সম্ভব নরম গলায় সে বলল, আমি বুঝতে পারি রে অমিত।

—তুমি কিছুই বুঝতে পার না। কেন জানি না আমার ভয় হয় তুমি চলে গেলে আমি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়ব।

কথাটা লীলার কানে অদ্ভুত শোনাল, এ কথা ভাবছিস কেন?

—আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না দিদি, এক এক সময় নিজেকে আমি

ঘেন্না করি, মনে হয় আমার মত অপদার্থের এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

লীলা বাধা দেয়, কি আবোলতাবোল বকছিস।

অমিতাভ চোখ নীচু করে থেকে অপরাধীর মত বলে, একটা কথা কাউকে বলতে পারি নি। যদি তুমি আমার ওপর রাগ না কর তো বলি।

অমিতাভের কথার ধরনে লীলা শঙ্কিত হয়, প্রশ্ন করে, কি কথা রে?

—আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি।

—সেকি, কবে থেকে?

—প্রায় দু' মাস হল। ভয়ে তোমায় বলি নি।

—কিন্তু ছেড়ে দিলি কেন?

অমিতাভ মাথা ঝাঁকুনি দেয়, লেখাপড়া করতে পারছিলাম না। বই নিয়ে বসি যখন মন কোথায় চলে যায়। একটা একজামিনেও আমি পাশ করতে পারি নি। অন্য ছেলেদের কাছে নিজকে হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। প্রথম প্রথম স্কুল কামাই করতাম, তারপর আস্তে আস্তে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এখন ওরা আমার নাম কেটে দিয়েছে।

লীলা চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, মাকে এ কথা জানিয়েছিস?

—না। মা জানতে পারলে মনে খুব কষ্ট পাবেন। একটু চুপ করে থেকে অমিতাভ অধীর স্বরে বলে, সেইজন্যে তো আর এখানে আমার ভাল লাগছে না। তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে চল, আমি কলকাতায় ফিরে যাব। এবার তাই ভেবেছি মাকে সব কথা খুলে লিখব। কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা নষ্ট করে এখানে পড়ে থেকে কোন লাভ নেই। আমার দ্বারা লেখাপড়া হবে না।

ইচ্ছে করেই লীলা আর কথা বলল না। সে ভেবেছিল আজ হাতে খানিকটা ফালতু সময় আছে, লাঞ্চের পর অমিতাভকে নিয়ে দু-চারটে দোকানে বেড়াতে যাবে। কিন্তু অমিতাভর কথাগুলো শোনার পর আর ভাল লাগল না। নীরস গলায় বলল, চল, বাড়ি ফিরে যাই।

এই ভাল-না-লাগার কারণ লীলাও যে খুব পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছিল তা নয়, কেন জানা নেই নিজেকে তার অপরাধী মনে হচ্ছিল। অমিতাভর সঙ্গে দিনের পর দিন গল্প করা, তাকে নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ানো, বোধ হয় লীলার উচিত হয় নি। অমিতাভ ছেলেমানুষ, সে লেখাপড়া করছে কিনা, কাজে মন দিচ্ছে কিনা এসব বিষয়ে তার নজর রাখা উচিত ছিল। যদি অমিতাভর মা আজ লীলার কাছে এ সব বিষয়ের জবাবদিহি চান সে তার কি উত্তর দেবে? যদিও জবাবদিহি করার কোন কথা ওঠে না, অমিতাভর মা তাকে কতটুকুই বা চেনেন, চিঠিপত্রেই যা আলাপ। তবু লীলার মনে হল সে অপয়া, তার সংস্পর্শে যে আসে তারই ক্ষতি হয়। তা না হলে লণ্ডনে আসার পর সরোজদার সঙ্গে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এভাবে তা নষ্ট হয়ে গেল কেন! নিজের বোন প্রমীলাকে সে অসুখী করেছে, স্বেচ্ছায় সে নির্বাসন দণ্ড নিয়ে চলে গেছে কার্ডিফে, তারপর এই অমিতাভ। পরম স্নেহে এই ছেলেটিকে সে কাছে টেনে নিয়েছিল, কিন্তু এই তার পরিণাম। অনুতপ্ত অমিতাভর মলিন মুখখানি দেখে লীলা মনে মনে যারপরনাই দুঃখ অনুভব করল।

এই দুঃখবোধ আরও গভীরভাবে প্রকাশ পেল বাড়িতে পৌঁছবার পর।

পরিচারিকা এসে লীলার হাতে রেজিস্ট্রিপোস্টে আসা একখানা জরুরী চিঠি দিল। কার চিঠি হতে পারে প্রথমটা লীলা বুঝতে পারে নি, পোস্ট অফিসের ছাপ লক্ষ্য করে দেখল কার্ডিফের চিঠি। অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল লীলার। চিঠি পড়ে অতিমাত্রায় বিচলিত হল সে।

অমিতাভ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কি লিখেছে চিঠিতে?

লীলা থেমে থেমে উত্তর দিল, প্রমীলার শরীর খুব খারাপ, হাসপাতাল থেকে জানিয়েছে অপারেশন করতে হবে।

অপারেশন!

—হ্যাঁ। গ্যাসট্রিক আলসার ফরম করেছে। একটু থেমে লীলা চেঁচিয়ে ওঠে, এ সব আমার জন্যে হচ্ছে, আমি অপয়া, আমি যাদের ভালবাসি সবাই কষ্ট পায়।

অমিতাভ বুঝিয়ে বলে, কি সব আবোলতাবোল ভাবছ।

লীলা সজল কণ্ঠে বলে, তা না হলে প্রমীলার এ রকম হল কেন?

—সে ভাবলে তো চলে না, এখন কি করতে হবে তাই বল। চিঠির একটা জবাব দিতে হবে তো।

লীলা ভেঙে পড়ে, আমি আর কি বলব। সরোজদাকে একবার ফোনে দেখ।

অমিতাভ সরোজের অফিসে টেলিফোন করে হাসপাতালের চিঠির কথা জানাল।

সরোজ একটু ভেবে উত্তর দিল, লীলাকে বল তৈরী হয়ে নিতে, আমাদের কার্ডিফে যেতে হবে।

—কখন?

—আমি অফিসে ছুটির কথা বলছি, তুই লীলাকে নিয়ে চারটে নাগাদ পিকাডেলী স্টেশনে আয়। ওইখানে কথা হবে।

লীলা আর অমিতাভ চারটের আগেই গিয়ে পেঁছল পিকাডেলীতে, এখনও অফিস ফেরত যাত্রীদের ভিড় শুরু হয় নি। তা'হলেও লোক চলাচলের কমতি নেই। আন্তর্জাতিক ঘড়ির সামনে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। অমিতাভ গেছে সিগারেট কিনতে।

দূর থেকে হাসতে হাসতে কে যেন এগিয়ে আসছে। লীলা প্রথমটা বুঝতে না পারলেও পরে চিনতে পারল, সৌরেন। লীলার কাছে এসে হেসে বলল, কতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নি লীলা। কেমন আছ সব?

লীলা ছোট্ট উত্তর দিল, ভাল।

—কই, মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না।

লীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, মানে প্রমীলার জন্যে একটু চিন্তিত আছি।

—প্রমীলা? কি হয়েছে ওর?

লীলা যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব প্রমীলার অসুখের কথা বলল। জানাল আজকের চিঠির কথা।

সৌরেন উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কবে যাচ্ছ কার্ডিফ?

—বোধ হয় আজ রাত্রে, কিংবা কাল সকালে।

সৌরেন ইতস্তত করে বলে, যদি আপত্তি না থাকে, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

লীলা সাগ্রহে বলল, বেশ তো, চল না। তোমাদের দেখলে প্রমীলা খুব খুশী হবে।

—বেশ, আমি তা'হলে সরোজদাকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করে নেব কখন তোমরা

যাচ্ছ। ছ'টা নাগাদ ওকে বাড়িতে পাব আশা করি?

ইচ্ছে থাকলেও সৌরেন আর দাঁড়াতে পারল না, আধঘন্টার মধ্যে তাকে পেঁছতে হবে 'সোহো'র সেই পুরনো রেস্তরাঁয়। আগে থেকে কথা দেওয়া আছে। টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে সৌরেন ঢুকল স্যাফটস্‌বেরী এভেনিউতে। প্রমীলার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দু বিনুনি করা ঢলঢলে মুখখানার উপর বড় বড় চোখ দুটো দেখলে মনে হত কেমন যেন বিষন্নতার ছাপ আছে সেখানে। প্রমীলা হাসত, কিন্তু হাসির অন্তরালে যে বেদনা লুকনো আছে তা প্রকাশ পেত চোখের চাহনিতে।

প্রমীলার সঙ্গে দেখাও হয় নি অনেকদিন। এখন সে অসুস্থ, একবার তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করা সৌরেনের কর্তব্য বলে মনে হল। সেই জন্যে সে লীলাকে কথা দিয়ে এল কার্ডিফে যাবে বলে।

দু'দিন আগে হলেও অবশ্য এ কথা দেওয়া সৌরেনের পক্ষে সম্ভব হত না। প্রতিদিন দুপুরে বিকেলে যেতে হত তাকে রজতের কাছে, দু'বেলাই তাকে খাওয়াতে হত। প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও শেষের দিকে সৌরেন যেত শুধু কর্তব্যের খাতিরে, বিশেষ করে রজতের একঘেয়ে কথাগুলো শুনতে আর ভাল লাগত না। তা'ছাড়া, নিজের জীবনেও ক্রমশ অশান্তি দেখা দিচ্ছিল। সৌরেন সন্ধ্যেবেলাটা রজতের কাছে আটকে থাকত বলে এলিজাবেথ পড়ে যেত একেবারে একা। সে সব সময় চাইত সৌরেনকে সাহায্য করতে, রজতের ফ্ল্যাটে যেতে, কিন্তু সৌরেনই তাতে বাধা দিয়েছে। ফলে মাঝে মাঝে এলিজাবেথ বিরক্ত না হয়ে পারে নি। হয়ত বলেছে, কি জানি সৌরেন, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার কাজের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। রজতকে তোমার এত ভয় কিসের?

সৌরেন উত্তর দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারবে না লিজি, ও একটা বিদ্‌ঘুটে লোক।

—যদি ভাল না লাগে তার সঙ্গে মিশো না।

সৌরেন মুখ নীচু করে উত্তর দিয়েছে, কি করব বল। রজত আমার বন্ধু। তার উপর সে অসুস্থ।

এলিজাবেথ স্থির গলায় প্রশ্ন করে, তুমি কেন আমায় ওর কাছে নিয়ে যেতে চাও না?

—আমার ভয় হয় পাছে রজত তোমায় অপমান করে।

—আমার অপরাধ?

—তুমি ইংরেজ?

বিরক্তিতে এলিজাবেথ উঠে পায়চারি করে, যদি তোমার বন্ধু আমাকে ভালভাবে নিতে না পারে আমার মনে হয় তোমার উচিত তাকে পরিত্যাগ করা।

সৌরেন নরম সুরে বলে, এ ধরনের কথা তোমার মুখে শোভা পায় না লিজি। একবার রজতের কথা ভাবো, জীবনে সে কি পেয়েছে? completely frustrated একটা লোক। তাকে যদি আমিও দূরে সরিয়ে দিই, সে বাঁচবে কি করে বলতে পার?

এলিজাবেথ প্রথমটা কোন উত্তর দেয় না, পরে বলে, আমি জানি তোমার মনটা খুব নরম সৌরেন। অন্যের দুঃখ-কষ্ট বড় সহজে তোমাকে কাতর করে, কিন্তু এর বিপদ কি জান? অন্যদের দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে নিজেকে না অসুখী করে ফেল।

—এ কথা বলছ কেন লিজি?

এলিজাবেথ উদাস কণ্ঠে বলে, ওইখানেই বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার তফাত। মোটেও ভেব না আমি তোমাকে স্বার্থপর হতে বলছি। স্বার্থপরতাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। কিন্তু তাই বলে নিজের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যায় না। সেটাও মহাপাপ।

এলিজাবেথ এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর বেশী কথা বলে নি। কিন্তু সৌরেন লক্ষ্য করেছে সেই দিন থেকে কেমন যেন সে আনমনা হয়ে গেছে। যেটুকু সময় দেখা হয় দু-চারটে মামুলী কথা ছাড়া আর কিছু বলে না। আগের মত কখন রাত্রে সৌরেন বাড়ি ফিরবে বলে জেগে বসে থাকে না। বেশীর ভাগ সময় কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকে।

দু দিন আগে জানাল, সৌরেন এই শনি-রবিবার আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।

এলিজাবেথের বাড়ি যাবার কথা সৌরেন আগে শোনে নি, তাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, হঠাৎ, কি ব্যাপার?

—যাই, ঘুরে আসি। অনেক দিন দেখা হয় নি।

—সোমবার ফিরে আসছ তো?

এলিজাবেথ হাসল, ইচ্ছে তো তাই, তা'ছাড়া অফিসও আছে।

সৌরেন দুষ্টুমি করে বলে, শুধু অফিস, আর আমি নেই।

এলিজাবেথ সৌরেনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হ্যাঁ, তুমিও আছ। বড় বেশী আছ।

—তার মানে?

এলিজাবেথ হাসবার চেষ্টা করল, না, এমনি বললাম।

আজ শুক্রবার। অফিস থেকে এলিজাবেথ আর বাড়ি ফিরবে না, সোজা চলে যাবে দেশের বাড়িতে। বেচারা মনে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু সৌরেনের কি করবার ছিল। দু-দিন বাদে দেশ থেকে ফিরে এসে এলিজাবেথ নিশ্চয় সব বুঝতে পারবে। এ কথা আরও সে ভাবতে পারছে এই জন্যে আজ থেকে আর তাকে রজতের কাছে আগের মত যেতে হবে না। সে ছুটি পেয়েছে।

আজ দুপুরবেলা লাঞ্চে বেরবার আগে রজত ফোন করল, গলায় খুশী উপচে পড়ছে, সৌরেন, আজ থেকে তোর ছুটি।

—সে কি রে, আমি তো এখুনি স্যান্ডউইচ নিয়ে তোর বাড়ি যাচ্ছিলাম।

রজত বলল, আর শুকনো স্যান্ডউইচ নয়, গরম মাংস খাব। নাকে তার গন্ধ আসছে।

—বলিস কি, রাতারাতি এ ভাগ্য পরিবর্তন?

—এই নে, কথা বল।

একটু পরেই অন্য দিক থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, হ্যালো সৌরেন, কেমন আছ?

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। সৌরেন খুশী হয়ে প্রশ্ন করল, মারিয়া না? কবে এলে কোন খবর দাও নি কেন?

মারিয়া তরল গলায় উত্তর দেয়, আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। দেখা হলে সব বলব।

—কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে? রাত্রে যাব?

—নিশ্চয় আসবে। তবে বিকেলে সাড়ে চারটে নাগাদ আমি থাকব সোহোতে। যদি সময় পাও তো এস না, দরকার আছে।

—বেশ তো যাব। সেই পুরনো রেস্তরাঁয় ?

—হ্যাঁ। মারিয়া জোর দিয়ে বলল, ঠিক এস কিন্তু।

সৌরেন এখন সোহোতেই যাচ্ছে মারিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। মারিয়া যখন এসে গেছে, রজতের ভাবনা আর তাকে করতে হবে না। এলিজাবেথও দু-দিন লণ্ডনে থাকবে না, অতএব এর মধ্যে কার্ডিফে গিয়ে যদি প্রমীলার সঙ্গে দেখা করে আসা যায়, মন্দ কি।

কফি বারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মারিয়া মালিকানের সঙ্গে গল্প করছিল, সৌরেনকে ঢুকতে দেখে সোচ্ছ্বাসে তার করমর্দন করে বলল, ঠিক সময় মত তুমি আমায় চিঠিটা লিখেছিলে সৌরেন। তোমার কাছে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ।

সৌরেন ইচ্ছে করে অন্য কথা তুলল, ওসব formality ছাড়, কিন্তু তোমাকে দেখে আমি তো একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

—কেন ?

—এই ক'মাসে বছর দশেক বয়স কমিয়ে ফেলেছ যে।

মারিয়া খিলখিল করে হাসল, এই কথাটা তোমার বন্ধুটিকে বল না ?

—কাকে, রজতকে ?

মারিয়া হাসল, ওর মতে আমাকে বুড়ীর মত দেখাচ্ছে, আর পয়সা খরচ করে আমার নাচ দেখতে কেউ আসবে না। বরং পচা টোমাটো ছুঁড়ে নাচ থামিয়ে দিতে পারে।

কথা শুনে সৌরেনও হাসল, চল কোথাও বসা যাক।

মারিয়া তাকে নিয়ে গেল নীচে বেসমেণ্টে। পাশাপাশি বসে কফির অর্ডার দিল।

সৌরেন বললে, রজত যখন তোমার চেহারার এত নিন্দে করেছে, বুঝতে হবে তোমার রূপে ও মুগ্ধ হয়েছে। কারণ রজত যা ভাবে, মুখে বলে ঠিক তার উল্টো কথা।

মারিয়া সজোরে হাসল, এতদিনে দেখছি তোমার বন্ধুটিকে ঠিক চিনতে পেরেছ।

মারিয়া আজ সৌরেনকে এখানে ডেকে এনেছিল তার কাছে জানবার জন্যে কী হয়েছিল রজতের। কতদিন হাসপাতালে ছিল, বিশেষ করে ডাক্তাররা কোনও বিষয়ে সাবধান হতে বলেছিলেন কিনা ?

সৌরেন একে একে সব কথা বলে গেল।

মারিয়া সজল কণ্ঠে বলে, সত্যি সৌরেন, তুমি না থাকলে রজতের কী হত বলা যায় না। এভাবে আবার হয়তো তাকে ফিরে পেতাম না।

—তুমি এখন লণ্ডনেই থাকবে তো ?

—আর কি রজতকে একলা ফেলে রাখা যায়। বেচারী রুগ্ন মানুষ। তা'ছাড়া যথেষ্ট শিক্ষাও হয়েছে ওর।

সৌরেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না, প্রশ্ন করল, তার মানে ?

মারিয়া ম্লান হাসে, আমি চেয়েছিলাম রজত বুঝুক কতগুলো থিয়োরী দিয়ে জীবনটাকে চালানো যায় না; থিয়োরী আর প্র্যাকটিসে অনেক তফাত। আমি জানি রজত কোনদিন একলা থাকতে পারবে না। অথচ ও সে কথা স্বীকার করতো না, বলতো একলা থাকার মধ্যেই নাকি সবচেয়ে বেশী আনন্দ। সেই জন্যে ইচ্ছে করে

আমি কন্টিনেন্টে চলে গিয়েছিলাম। দেখছিলাম রজত একলা থাকতে পারে কিনা? না, ও পারে নি, হেরে গেছে।

—রজত সে কথা স্বীকার করেছে?

—স্বীকার তো রজত কোন দিন মুখে করবে না।

সৌরেনের হঠাৎ কী মনে হওয়ায় প্রশ্ন করল রজত তোমায় চিঠি লিখতো?

—এই ক মাসে একখানা চিঠি লিখেছিল। তাতে জানিয়েছিল লণ্ডনে সে দিব্যি আছে। সকাল থেকে উঠে পান করছে। রাত পর্যন্ত হল্লা করে বেড়ায়। রাত্রে মাঝে মাঝে লরার কাছে যায়। আমার কথা সে প্রায় ভুলতে বসেছে। মারিয়া একটু থেমে বলে, আমি অবশ্য পনেরো দিন অন্তর ঠিক একখানা করে চিঠি দিয়ে যেতাম। বলা বাহুল্য, কোন উত্তর পেতাম না রজতের কাছ থেকে।

—তুমি ফিরে আসায় রজত নিশ্চয় খুব খুশী হয়েছে?

মারিয়া মাথা নাড়ল, অন্তত মুখে তা প্রকাশ করে নি। আমাকে দেখে বলল, আরে কী আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরে এলে? জিজ্ঞেস করলাম, কেন তুমি কি ভেবেছিলে আমি ফিরব না?

রজত বলল, হাজার হক দেশের মাটিতে, দেশের ছেলের সঙ্গে পীরিত হয়েছে। হঠাৎ সে সব ছেড়ে আসবে কেন? অবশ্য তুমি আসায় আমায় বড় উপকার হয়েছে।

—কি রকম?

—শরীরটা খারাপ, নিজে রান্না করতে পারি না, তুমি অন্তত ক'দিন গরম গরম রেঁধে খাওয়াতে পারবে।

মারিয়া সৌরেনের হাতের উপর চাপ দিয়ে বলল, ভাব দেখি, এতদিন বাদে দেখা হবার পর কি মধুর অভ্যর্থনা করল তোমার বন্ধু। আমি রজতকে বলি নি ওর অসুখের কথা জানিয়ে তুমি আমায় চিঠি লিখেছিলে। ওর কথাবার্তা শুনে সত্যিই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, তুমি যা লিখেছ তা সত্যি কিনা। স্বপ্নের ঘোরেও কি সে আমার কথা ভেবেছিল? চেয়েছিল আমি তার কাছে আসি? অবশ্য এখন আমার মনে আর কোন রকম সন্দেহ নেই।

কথা বলতে বলতে মারিয়ার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সৌরেন তার অর্থ বুঝতে না পেরে, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, তারপর বুঝি রজতের সঙ্গে আর কোন কথা হয়েছে?

—না, হয় নি।

—তা হলে?

—রজত যখন বাথরুমে স্নান করতে গেল, ওর বিছানা ঠিক করতে গিয়ে দেখলাম ম্যাট্রেসের তলায় কালো রঙের মোটা খাতাটা রয়েছে। ও খাতাটা আমার অতি পরিচিত। রজত কখনও ডায়েরী লেখে না, কিন্তু মাঝে মাঝে খেয়াল চাপলে তারিখ দিয়ে মনের কথা লিখে রাখে ওই খাতাটায়। কেমন যেন কৌতূহল হল, তাড়াতাড়ি উল্টেপাল্টে খাতাটা দেখলাম। একটা পাতার উপর নজর পড়তে অবাক হয়ে গেলাম। বার বার পড়লাম ওর লেখা।

সৌরেন উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে, কি লিখেছে রজত?

মারিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয়, লাইনগুলো প্রায় আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে নিজের ফ্ল্যাটে বসে এই কথাগুলো সে লেখে, 'আমি

ভগবানে বিশ্বাস করি না। যারা বিশ্বাসী তারা বলবে তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তা না হলে এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে আমি আহত হলাম কেন? শুনেছি দরিদ্রের কাছে ভগবান আসেন রুটির রূপ নিয়ে, আমার কাছে কি তিনি এলেন এই আঘাতের রূপে? আমি জানি আমার এই অসুখের কথা শুনলে মারিয়া যেখানে থাক, কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না। সে আসবে।'

কথাগুলো বলতে বলতে মারিয়ার চোখ জলে ভরে এল, রজত যে এ ধরনের কথা লিখতে পারে আমি কখনও ভাবি নি। আমার মনে হয় এখন থেকে ও অনেকখানি বদলে যাবে।

ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো শুকনো করে নিয়ে বলল, সৌরেন, তোমার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ রইলাম। রজতকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছ।

মারিয়ার ভাবাবেগ সৌরেনের মন স্পর্শ করে, সে গাঢ় গলায় বলে, প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও মারিয়া।

—ধন্যবাদ। মারিয়া উঠে পড়ে। বলে, রজত অনেকক্ষণ একলা আছে।

সৌরেন মারিয়াকে নিয়ে কফি বার থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলে পিকাডেলী সার্কাসের দিকে।

টিউব স্টেশন থেকে সে ফোন করল সরোজকে, সরোজদা, আমি সৌরেন কথা বলছি।

গম্ভীর গলা ভেসে এল সরোজ রায়ের কাল সকাল সাতটার ট্রেনে আমরা কার্ডিফ যাব।

—সকাল সাতটায়?

—হ্যাঁ, স্টেশনে চলে আসিস।

মারিয়ার কাছে ফিরে এসে সৌরেন বলল, চল রজতের সঙ্গে দেখা করে আসি।

অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে। নার্সরা জানলার পর্দা দিয়েছে সরিয়ে। তবু প্রমীলার মনে হল অন্য দিনের তুলনায় ঘরের মধ্যে কম আলো। উঃ, পেটের মধ্যে একটা আড়ষ্ট যন্ত্রণা। শুধু পেটে নয়, ওই যন্ত্রণাটা যেন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। হাত, পা, পিঠ, বুক প্রত্যেকটি অঙ্গে ওই আড়ষ্টতা। ডাক্তার বলেছে কাল তারা অপারেশান করবে। তারপর হয়ত এ যন্ত্রণার লাঘব হবে। অবশ্য অনেক কিছু নির্ভর করছে লীলাদের উপর। ওরা আজ আসে তবে তো! আর যদি না আসে?

প্রমীলা নিজেই বিস্মিত হল। এ কথা সে ভাবতে পারল কি করে? তার অসুখের কথা শুনেও লীলা না এসে চুপ করে লন্ডনে বসে থাকবে, এও কি সম্ভব? না, লীলা আসবে। সঙ্গে থাকবে অমিতাভ। ও ছেলেটা ভাল। কিন্তু বড্ড যেন মেয়েলী ধরনের। প্রমীলা বোঝে লীলাকে দিদি ডাকলেও অমিতাভ সব সময় তাকে দিদি হিসেবে দেখে না। সম্পর্কটা বোধ হয় একটু ঘোলাটে ধরনের। যদিও প্রমীলা এ নিয়ে কখনও কথা বলে নি। লীলার দিক থেকে যখন কোন গণ্ডগোল নেই, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই বা কি?

কিন্তু ওদের সঙ্গে কি সরোজ আসবে? চোখের সামনে সরোজের মুখখানা ভেসে উঠতেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল প্রমীলা। বড় ভাল লোক। এই দূর

বিদেশে সত্যিই এমন একটি লোক পাওয়া দুর্লভ ভাগ্য। ওদের দুই বোনকে আপনার জনের মত সে কাছে টেনে নিয়েছিল। এদের জন্যে অকাতরে সে কাজ করে গেছে। কিন্তু প্রতিদানে কোন দিন কিছুই চায় নি। এই অসুখটা না হলে বোধ হয় প্রমীলা বুঝতে পারত না সে সরোজকে কতখানি ভালবেসেছে। লণ্ডন ছেড়ে চলে আসার পর থেকে এমন একটি দিন কাটে নি যেদিন সে সরোজের অভাব অনুভব করে নি। সরোজের হাসিঠাট্টা, মেলামেশার টুকরো ছবি যে শুধু মনে পড়ত তাই নয়, সারা দিনের কাজের পর অবসন্ন দেহে কোথাও একলা বসলেই কানে ভেসে আসত সরোজের কণ্ঠের গানগুলো। এক একদিন তার মনে হত স্পষ্ট সে শুনতে পাচ্ছে সরোজদার খাদের গলা, ঠিক যেন তারই পাশে অন্ধকারে বসে সে গান করছে। এ অনুভূতি মিথ্যে নয়। কারণ সেই শোনা গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কতদিন সে গান করেছে, দ্বৈত সঙ্গীত, গাইতে গাইতে চোখে জল এসেছে। আনন্দে বিভোর হয়েছে, তন্ময় হয়ে সেই সুরের রাজ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

নার্স এসে হাসতে হাসতে জানাল প্রমীলার সঙ্গে দেখা করার জন্যে লণ্ডন থেকে 'ভিজিটার্স' এসেছে। প্রমীলা শুনে খুশী হল, কিন্তু বালিশে ভর দিয়েও উঠে বসতে পারল না। বড় ক্লান্ত লাগছে। নার্সরা দু'দিক থেকে স্ক্রীন এনে প্রমীলার বিছানা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দিল। পেতে দিল খানকয়েক চেয়ার। প্রমীলা অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাত দিয়ে কপালের ছোট ছোট চুলগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

একটু পরেই তার কাছে এল লীলা। পেছনে অমিতাভ, তারপরে সৌরেন। প্রমীলার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, তবে কি সরোজ আসে নি? না, এসেছে, সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে বেঁটে মানুষ, তাই প্রথমটা নজরে পড়ে নি। খুশিতে ঝলমল করে উঠল প্রমীলার মুখ। হাসল, হাসতে গিয়ে চোখ ছলছল করে উঠল। লীলা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গিয়ে বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে সস্নেহে প্রমীলার কপালে চুমু খেল। রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিল ওর চোখের জল।

জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস রে প্রমী?

প্রমীলা লীলার মুখের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, পেটের যন্ত্রণাটা বড় বেড়েছে।

—কি করে যে এত বেড়ে গেল!

প্রমীলা করুণ সুরে বলে, হ্যাঁ, বড্ড বেড়ে গেছে। এখন ওরা অপারেশান করে ফেললে বাঁচি।

লীলা চিন্তিত স্বরে বলে, মাকে না জানিয়ে অপারেশান করানো কি ঠিক হবে? আমি বরং আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি। উত্তর এলে তারপর—

প্রমীলা অধীর গলায় বলে, না, না, আর আমি পারছি না। এখনও যদি ওরা অপারেশান না করে আমি মরে যাব। তোমরা বুঝতে পারছ না, চব্বিশ ঘণ্টা কি অসহ্য যন্ত্রণা!

কথা বলল সরোজ, ঠিক আছে, অপারেশান নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমি এখুনি ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলছি। আমার মনে হয় এ মাইনর ব্যাপার।

প্রমীলা বলল, হ্যাঁ ডাক্তার আমাকেও তাই বলেছে। এ সব অপারেশান হাসপাতালে হামেশাই হচ্ছে।

এরপর খুব বেশীক্ষণ কথা হল না, প্রমীলাকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছিল। তারই মধ্যে সে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল, ভাল আছিস তো অমিত? সৌরেনকে জানাল, এত কষ্ট করে আপনি এসেছেন বড় খুশী হলাম। লীলাকে বুঝিয়ে বলল, আমার জন্যে তুই ভাবিস না। ঠিক সেরে উঠব। শুধু বিশেষ করে কোন কথা বলল না সরোজকে। কিন্তু তাকিয়ে রইল ব্যাকুল চোখে, যে ব্যাকুলতার অর্থ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, তুমি একবার একলা এস আমার সঙ্গে দেখা করতে।

প্রমীলার সঙ্গে দেখা সেরে সরোজ গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, মিস্ চৌধুরীর মত মেয়ের চিকিৎসা করা শক্ত। এরা মনে যা ভাবে মুখে তা কোনদিন প্রকাশ করে না। এত তাড়াতাড়ি যে গ্যাস্ট্রিক আলসার ফরম্ করবে বুঝতে পারি নি।

সরোজ জিজ্ঞেস করেছে, কেন এ রকম হল?

—এ রোগটা তরুণীদের মধ্যেই বেশী প্রকাশ পায়। এর একটা প্রধান কারণ অবশ্য স্নায়বিক দুর্বলতা। যাই হক, ভাবনার কিছু নেই। অপারেশান হয়ে গেলে দু' সপ্তাহের মধ্যেই সেরে উঠবে, তারপর না হয় কিছু দিনের জন্য লন্ডনে নিয়ে যান।

তবু সরোজ দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, মানে, দেখুন প্রমীলার মা, দাদা, সবাই আছেন কলকাতায়, যদি অপারেশান করতে গিয়ে—

ডাক্তার হাসলেন, আমি বুঝতে পারছি কেন আপনারা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যে কোন অপারেশান করতে গেলে কিছু রিসক্ আছে নিশ্চয়। কারণ আমরা ডাক্তার, ভগবান নই। তবে ডাক্তার হিসেবে এইটুকু বলতে পারি বিপদের কোন রকম আশঙ্কাই নেই।

সরোজ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ল, বেশ, প্রমীলারও যখন ইচ্ছে, কাল আপনারা অপারেশান করে ফেলুন। আমরা এ দু'দিন এখানে হোটেলেই থাকব।

ডাক্তার বললেন, তা'হলে তো খুবই ভাল হয়, আপনারা কার্ডিফে আছেন শুনলে রুগী মনে বেশ জোর পাবে।

—আর একটা অনুরোধ করব, আমি আজ আর একবার প্রমীলার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—বেশ। আমি নার্সদের বলে রাখব। বিকেলে চারটের সময় এসে দেখা করবেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সরোজরা একটা ছোট হোটেল ঠিক করল। যেখানে অন্তত দুটো রাত তারা কাটাতে পারবে। বেশী দূরে নয়, মিনিট পনেরো হাঁটলেই সে হোটেলে পেঁছন যায়। কারুরই মনের অবস্থা ভাল নেই। লীলা বসে বসে মাকে দীর্ঘ চিঠি লিখল, অপারেশানের কথা জানিয়ে। অমিতাভ আর সৌরেন সিগারেট কেনার জন্যে বাইরে বেরিয়েছিল, সেই অজুহাতে চারদিকটা ঘুরে একবার দেখে এল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর লীলা শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। সৌরেনরা বই পড়ছে দেখে সরোজ উঠে পড়ল, বললে, আমি একটু ঘুরে আসছি রে। লীলা উঠলে বলিস আমি ফেরবার পথে হাসপাতালের খবর নিয়ে আসব। ডাক্তার বলেছিল এই সময় একবার যেতে।

ঠিক চারটের সময় হাসপাতালে গিয়ে নার্সদের কাছে বলতেই তারা সরোজকে নিয়ে গেল প্রমীলার কাছে। সকালের চেয়ে প্রমীলাকে এখন অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে। বালিশে ঠেস দিয়ে সে উঠে বসেছে। চুলগুলো ভাল করে আঁচড়ানো, দুটো বিনুনি বাঁধা, চোখে উজ্জ্বল হাসি। পর্দা দিয়ে ওদের ঢেকে দিয়ে যেতেই প্রমীলা সানন্দে বলল, আমি জানতাম আপনি আসবেন।

সরোজ চেয়ারটা টেনে নিয়ে প্রমীলার কাছে বসতে বসতে বলল, হ্যাঁ, আমি ডাক্তারকে বলে গিয়েছিলাম।

প্রমীলা একদৃষ্টে সরোজের দিকে তাকিয়ে থাকে, সরোজ জিজ্ঞেস করে, অমন করে কি দেখছ প্রমীলা?

—দেখছি আপনাকে। দেখছি যে-সরোজ রায়ের ছবি আমার মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে, তার সঙ্গে আপনার কতখানি মিল।

সরোজ হাসল, কোন মিলই খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি?

প্রমীলা স্থির গলায় বলল, ঠিক তার উল্টো। হুবহু মিল, প্রত্যেকটি দিনই তো আমি আপনার কথা ভাবি, ভাবি আপনার উপদেশগুলো।

সরোজ ইচ্ছে করেই তরল কণ্ঠে বলে, ওই সব ভেবেই বুঝি শরীর খারাপ করেছ?

—সে জন্যে শরীর খারাপ হয় নি সরোজদা। এখন আমি বুঝতে পেরেছি কোথায় আমার ভুল হয়েছে।

—কি ভুল?

প্রমীলা সজল চোখে বলে, আমার কার্ডিফে আসাই উচিত হয় নি। লণ্ডনে থাকলে আমার শরীর খারাপ হত না। যা সত্য কেন আমি তা স্বীকার করতে পারলাম না? কেন আমি পালিয়ে এলাম?

সরোজ প্রমীলাকে সান্ত্বনা দেয়, ওসব কথা এখন ভেব না। অপারেশান হয়ে যাক, তোমাকে আর কি এখানে ফেলে রাখব? তুমি না চাইলেও আমি জোর করে লণ্ডনে নিয়ে যাব।

প্রমীলার ঠোঁট দুটো কাঁপে, সত্যি বলছেন সরোজদা?

সরোজ প্রমীলার বাঁ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

প্রমীলার দু' চোখ বেয়ে নীরব জলের ধারা নেমে আসে, আর আমার কোন ভাবনা নেই। লণ্ডনে গিয়ে থাকলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব। রোজ আপনার সঙ্গে দেখা হবে। একটু হেসে বলে, জানেন, এই কথাগুলো বলবার জন্যে আমার প্রাণ ছটফট করত। অথচ লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে চিঠি লিখতে পারতাম না। আঃ, আমার বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাষাণের ভার নেমে গেল। আমার যা বলবার তা বলে ফেলেছি, এখন আপনার যা করবার তা করবেন।

সরোজ আবেগের সঙ্গে বলে, আমি সব বুঝতে পেরেছি প্রমীলা। আর কিছু তোমায় ভাবতে হবে না, এর পর থেকে তোমার সব দায়িত্বই আমি নিলাম।

প্রমীলার দুর্বল শরীর উত্তেজনায় কেঁপে উঠল, সরোজের মুখের উপর হাত রেখে কাঁপা গলায় বলল, আজ আমার সব চেয়ে আনন্দের দিন। ঈশ্বর আমার মনের কথা শুনেছেন।

এর পর কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা, কেউ কোন কথা বলতে পারল না। শুধু চোখের ভাষা, স্পর্শসুখ কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত রচনা করল।

বিদায় নেবার পালা যখন এল প্রমীলা জিজ্ঞেস করলে, কাল সকালে একবার আসবেন তো।

সরোজ জানাল, আমি তো সব সময় আসতে প্রস্তুত, কিন্তু অপারেশানের আগে দেখা করতে দেবে না।

—তা'হলে অপারেশানের পর জ্ঞান যখন ফিরে আসবে চোখ খুলে যেন আপনাকেই দেখতে পাই।

সরোজ হেসে বলল, তখন তো নিশ্চয় আসব।

প্রমীলা চাপা গলায় বলে, এখনকার মত একলা আসবেন, দলবল নিয়ে নয়।

—বেশ। একলাই আসব।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল সরোজ, কত কথা আজ মনে পড়ছে। প্রমীলা মেয়েটা যে এত চাপা সত্যিই আগে বোঝা যায় নি। জানলে সরোজ কিছুতেই তাকে কার্ডিফে পড়তে আসতে দিত না। প্রকৃত ভালবাসা জীবনে সহজে আসে না, যদি আসে তাকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায়, ভুল। এই বিরাট পৃথিবীতে যে যার পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সরোজও তো পথ খুঁজছে। যদি তাকে এই খোঁজার কাজে কেউ সাহায্য করে, যদি তাকে আলো দেখায়, তাকে স্বীকার না করে নিলে সে নিজেই যে ঠকবে। জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ প্রীতি প্রেম আর ভালবাসা। সঞ্চয়ের তহবিলে ওইগুলোই জমা হয়। খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তির জলুস থাকতে পারে কিন্তু তা শুধু ঈর্ষার যোগান দেয়, মনে শান্তি দিতে পারে না। সে জন নেহাতই হতভাগ্য যে চোখ রাঙিয়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তাকে সবাই ভয় পায়, কিন্তু ভক্তি করে না।

আজ সরোজের সামনে যে ভালবাসার ডালি নিয়ে প্রমীলা উপস্থিত হয়েছে তা সানন্দে গ্রহণ করতে না পারলে সরোজ শুধু যে তার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিত তাই নয়, জীবনের বেচাকেনায় নিঃসম্বল ব্যাপারীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকত দিনান্তের নির্জন হাটের মধ্যে।

সরোজ হোটেলে ফিরল। প্রমীলা যে আগের চেয়ে ভাল আছে সে কথা জানাল সকলের কাছে, কিছুক্ষণের জন্যে গল্প করল। একসঙ্গে হেঁটে বেড়িয়ে এল চারদিক। কিন্তু সারাক্ষণই সে ছিল অন্যমনস্ক। বার বার তার মনে হয়েছে একলা বিছানায় শুয়ে প্রমীলা বোধ হয় তারই কথা ভাবছে। রাত্রে সরোজের ভাল করে ঘুমও হল না। সোফায় বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে গেল।

পরের দিন দশটার সময় লীলাকে নিয়ে সরোজ গেল হাসপাতালে। খবর পেল প্রমীলাকে নিয়ে গেছে অপারেশান থিয়েটারে। মেডিক্যাল রিপোর্টে দেখছে শরীর ভালই আছে, ভাবনার কিছু নেই। যদিও সরোজদের করবার কিছু ছিল না তবু তারা খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল বসবার ঘরে।

কতক্ষণ এভাবে সময় কেটে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ একজন নার্স এসে খবর দিল ডাক্তার সরোজদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

লীলা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, অপারেশান হয়ে গেছে?

নার্স বলল, আমি বাইরে কাজ করি, ভেতরের খবর তো জানি না। ডাক্তার নিজেই আপনাদের বলবেন।

সরোজ আর লীলা ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মুখ গম্ভীর, বললেন, মিস্ চৌধুরীর অপারেশান করা যায় নি।

—কেন ?

—সকালে আমরা রুগীকে পরীক্ষা করেছিলাম, হার্ট, লাঙ্গ্স্ কিছুতেই গোলমাল ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য, অপারেশন টেবিলে শুইয়ে অ্যানাস্থেসিয়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুগীর 'হার্ট অ্যাটাক্' করে। সাধারণত অ্যানাস্থেসিয়া দেবার সময় সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করি। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-আধজন অ্যানাস্থেসিয়া সহ্য করতে পারে না। তাদের শরীরে প্রতিক্রিয়া হয়। যদিও তাদের সংখ্যা হয়ত শতকরা ·০১ পারসেন্টও নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মিস্ চৌধুরী ওই মাইনরিটির মধ্যেই পড়েছেন।

সরোজ শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করে, তারপর কি হল ?

ডাক্তার জলদগম্ভীর গলায় বলে, কার্ডিয়াক অ্যাটাকের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ম্যাসাজের ব্যবস্থা করি। আস্তে আস্তে ওর জ্ঞান ফিরে আসতে থাকে।

লীলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, প্রমীলা আছে কিরকম ?

—এখনও খুব দুর্বল, যতক্ষণ না পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসছে কিছু বলা মুশকিল। তবে মনে হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ভয়ের কিছু নেই তো ?

—একেবারে অভয়ই বা কি করে দেব বলুন! হাজার হোক 'হার্ট অ্যাটাক্' তো! ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, আমি এখন ওরই কাছে যাচ্ছি।

—আমরা এখানে অপেক্ষা করব তো ?

—তার দরকার নেই, হোটেলে ফিরে যান। যদি কোন খবর দেবার থাকে আমরা জানাব।

ডাক্তার চলে যেতে সরোজ আর লীলা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর সরোজ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বলল, চল লীলা, হোটেলে যাই।

অস্বস্তিকর কয়েক ঘণ্টা। কারুর মনে এতটুকু শান্তি নেই। উন্মুখ হয়ে বসে আছে প্রমীলার খবরের আশায়।

খবর এল। কাল খবর। সবে ওরা খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে বসেছে, হাসপাতাল থেকে জানাল হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রমীলা মারা গেছে।

এই আকস্মিক দুঃসংবাদে প্রথমটা সকলেই কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। প্রমীলা নেই, আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। এ কথা চিন্তা করাই যে কঠিন।

লীলার শরীর থরথর করে কাঁপছিল, সোফার উপরে লুটিয়ে পড়ে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল। '

—এ আমি কি করলাম সরোজদা, কি করে আমি মাকে জানাব ? প্রমী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কেন আমি ওর অপারেশান করতে দিলাম ?

শোকাতুরা লীলার করুণ বিলাপ অন্য তিনজনকে আরও বিচলিত করল। প্রমীলার অকালমৃত্যু তাদেরও তো সমধিক শোকাচ্ছন্ন করেছে। বিশেষ করে সরোজ এ মৃত্যুর জন্যে লীলার চেয়েও নিজেকে অপরাধী মনে করছে বেশী। কেন সে অপারেশান করবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিল ? কে কাকে সান্ত্বনা দেবে, কারুর মুখে কোন ভাষাই তো জোগাল না।

অথচ কর্তব্য অনেক। হাসপাতালে তাদের যেতে হল, পড়তে হল মৃত্যুর কারণ।

ডাক্তার তাদের বললেন, যদি প্রমীলার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনরকম সন্দেহ জেগে থাকে, মনে হয়ে থাকে ঠিক মত চিকিৎসা হয় নি বলে মৃত্যু ঘটেছে তা'হলে তদন্তের জন্য করোনারের কাছে লীলারা আবেদন করতে পারে।

কান্না ভেজা গলায় লীলা জিজ্ঞেস করল, তাতে লাভ?

ডাক্তার বোঝালেন, অন্তত মনের শান্তি যে আপনার বোন আমাদের অবহেলার জন্যে মারা যান নি। একে আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোন আখ্যাই দেওয়া চলে না। অ্যানাস্থেসিয়া দিতে গিয়ে কার্ডিয়াক্ অ্যাটাক্ এবং সেই থেকে মৃত্যু এই হাসপাতালে ঘটল অনেক বছর বাদে। তা'হলেও আমার মনে হয় করোনারের কাছে আপনারা আপীল করুন।

লীলা অতি ধীরে মাথা নাড়ল, ওসব হাঙ্গামায় কি লাভ! প্রমীকে তো আর ফিরে পাব না। তারা হয়ত আবার ওর দেহটাকে নিয়ে কাটাকাটি করবে। বলতে গিয়েই লীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ডাক্তারও নিজের চোখ মুছলেন, আমার নিজেরই এত খারাপ লাগছে। মিস্ চৌধুরীর আমার উপর এতখানি বিশ্বাস আর আস্থা ছিল, অথচ কি হয়ে গেল।

সরোজ গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করলে, এখন আমাদের কি কর্তব্য?

ডাক্তার জানালেন, যদি তাদের হাসপাতালের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে তা'হলে সেই মর্মে কাগজে সই করে দিতে হবে। যদি তারা মৃতদেহ দেখতে চায়, হাসপাতাল থেকে মর্গে প্রমীলার দেহ স্থানান্তরিত করা হয়েছে, সেখানে তারা যেতে পারে। তারপর খবর দিতে হবে 'ফিউনারাল' এজেণ্টদের, তারা মৃতদেহ পোড়াবার ব্যবস্থা করবে।

মর্গে যেতে রাজী হল না লীলা। বলল, ওই অবস্থায় প্রমীকে আমি কিছুতেই দেখতে পারব না। যদি তোমরা চাও, মর্গ ঘুরে এস।

সরোজ বলল, আমি যাব। তোমরা থাক লীলার কাছে।

হাসপাতালের লাগোয়া বাগানের মধ্যেই একতলা বড় ঘর। পরের পর টেবিল সাজানো। হাসপাতালে কেউ মারা গেলে তার দেহ এখানেই স্থানান্তরিত করে রাখা হয়। যদি করোনারের কোর্টে মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের জন্যে কেস্ ওঠে তা'হলে সে ক'দিন মৃতদেহ এখানেই থাকে।

সরোজ একলা এসে মর্গে ঢুকল। সঙ্গে একজন ওয়ার্ডেন, সে তাকে নিয়ে গেল ঘরের দক্ষিণ দিকে রাখা উঁচু টেবিলের দিকে। অন্য দিকে আরও দুটি মৃতদেহ রয়েছে, সাদা কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা।

সরোজ যখন নির্দিষ্ট টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, বুকের স্পন্দন তার বেড়ে গেছে। কোন এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে।

ওয়ার্ডেন মৃতদেহের মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিল। সাদা ফ্যাকাশে প্রমীলার মুখ। মুখে কিন্তু কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই, চোখদুটি বন্ধ। মাথার চুল টান করে আঁচড়ানো, পিছনে বিনুনি খোঁপা বাঁধা।

ওয়ার্ডেন বোধ হয় ইচ্ছে করেই সরোজকে একলা রেখে দূরে সরে গেল। সেই বিরাট নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সরোজের মনে হল প্রমীলার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে, প্রমীলা ঘুমচ্ছে, এখুনি হয়ত সে চোখ খুলবে, তাকে দেখে হাসবে।

পরমুহূর্তে মনে হল এ কি যুক্তিহীন কথা সে ভাবছে! তার আর প্রমীলার মাঝখানে আজ মৃত্যুর ব্যবধান। তবু তার অবুঝ মন যেন সজোরে বলে উঠল,

আমি কথা রেখেছি প্রমীলা, তোমার সঙ্গে একলা দেখা করতে এসেছি।

সরোজের চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ল। তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসে একটি মেয়ে তার জীবন বিসর্জন দিল। এ অমূল্য প্রেমের কি প্রতিদান সে দিতে পারবে? প্রমীলার মহত্ত্বের কাছে আজ নিজেকে বড় ছোট মনে হল সরোজের। মনে হল এই স্বর্গীয় প্রেমের কোন মূল্যই সে দিতে পারবে না। কতক্ষণ তার এভাবে কেটেছে খেয়াল ছিল না। একটু পরে তার পাশে এসে দাঁড়াল সৌরেন। মৃদু স্বরে বলল, লীলা বড় কান্নাকাটি করছে, এখন চলুন।

সরোজ অন্যমনস্ক স্বরে জিজ্ঞেস করে, কান্নাকাটি করছে, কেন?

সৌরেন বুঝতে পারে সরোজের মন এ রাজ্যে নেই। সে এগিয়ে গিয়ে প্রমীলার মুখখানা ভাল করে দেখল।

পেছনে থেকে সরোজ বললে, দেখছ সৌরেন, মৃত্যুর মধ্যেও প্রমীলার মুখে কি প্রশান্তি। তোমার কি মনে হয় ও সুখী হয়েছিল, জীবনে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে?

—এ সব কি বলছেন সরোজদা?

—না, আমারই ভুল, চল যাই।

প্রমীলার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ঘুমিয়ে পড় প্রমী, আর কোন ভাবনা নেই।

আস্তে আস্তে চাদর দিয়ে প্রমীলার মুখখানা ঢেকে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল সরোজ। তার পেছনে সৌরেন।

সেই যে মর্গ থেকে বেরিয়ে এল সরোজ তারপর থেকে সারাক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, বিশেষ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। লীলার মনের অবস্থা আরও খারাপ, বার বার সে নিজের উপর দোষারোপ করছে আর কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে বসে আছে। ইতিমধ্যে বার দুই সে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। অগত্যা ওদের দু'জনের কাছে অমিতাভকে রেখে সৌরেনকেই বেরুতে হল অন্য সব কাজ সারার জন্যে। হাসপাতাল থেকেই ফিউনারাল এজেন্টের ঠিকানা বলে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তারা মর্গ থেকে মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল নিজেদের অফিসে। কিন্তু জানাল ক্রিমেটোরিয়ামে জায়গা পাওয়ার অসুবিধা আছে। তার জন্য দু-তিন দিন সময় লেগে যায়। সে ক'দিন অবশ্য মৃতদেহ তাদের জিম্মায় থাকবে।

সৌরেন তাদের বিশেষ করে অনুরোধ করল যাতে তাড়াতাড়ি পোড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়। জানাল যে ভারতীয় হাইকমিশনারের লোক, বিদেশে এসে এই বিপদে পড়েছে, তাদের কথা যেন বিশেষ করে চিন্তা করা হয়।

সৌরেনের চেষ্টায় ঠিক হল পরের দিন দুপুরবেলা ক্রিমেটোরিয়ামে প্রমীলার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে তারা চারজনে গিয়ে হাজির হল ক্রিমেটোরিয়ামের দরজায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে ছোট একটা গির্জে। তখন সেখানে অন্য কোন মৃতের সৎকারের জন্য খৃস্টান মতে মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল।

পাশের দালানে থরে থরে ফুল সাজানো রয়েছে। সম্প্রতি যারা মারা গেছে, যাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ফুল পাঠায়, নাম লিখে লিখে সাজিয়ে রাখা হয়

এখানে।

একটু পরে এলেন হাসপাতালের ডাক্তার। পরনে তাঁর স্ট্রাইপ্‌ড্‌ ট্রাউজার, কালো টেল কোট, কালো টুপি, কালো টাই। শোকের বেশ।

ফিউনারাল এজেন্টের লোক এসে জানাল এবার তাদের গির্জার ভেতরে যেতে হবে। নিঃশব্দে তারা হলের মধ্যে ঢুকল। কয়েক সারি বেঞ্চি পাতা। একেবারে সামনের সারিতে তারা গিয়ে দাঁড়াল। খানিকটা জায়গা ছেড়ে একটা বেদী, তার উপরে উঁচু টেবিল, সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। ডান দিকে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্ল্যাটফরম যেখানে ধর্মযাজকরা এসে দাঁড়ান।

দেওয়ালের দরজা আপনা হতে খুলে গেল, সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে এল একটা কফিন। বেদীর উপরের সেই উঁচু টেবিলেতে। ক্রিমেটোরিয়ামের কালো পোশাক পরা কর্মচারী খুলে দিলে কফিনের ডালা। প্রমীলা শুয়ে রয়েছে। সাদা ফুল দিয়ে সাজানো; মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে।

পাশের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন হিন্দু ধর্মযাজক। ইনি ভারতীয় কিন্তু অবাঙালী। প্রমীলার আত্মার সদ্‌গতির জন্য বৈদিক মন্ত্রপাঠ করলেন। লীলাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করল।

পুরোহিত একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে লীলার হাতে দিলেন। লীলা প্রমীলার মুখের কাছে প্রদীপের আলো দেখিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে নেমে এল। কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। সকলেই মনে মনে প্রার্থনা করে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ায় কফিনের ডালা বন্ধ করে দেওয়া হল। আপনা হতে তা চলে গেল পাশের ঘরে।

আর কিছু করার ছিল না। ভারাক্রান্ত মনে সকলে হোটেলে ফিরে এল। তখন অপরাহ্ণ অতিক্রম করতে চলেছে।

আরও একটি বিনিদ্র রজনী কাটল হোটেলে।

পরদিন সকালে সৌরেনকে আবার যেতে হল ক্রিমেটোরিয়ামে, ছাই আনতে। পুরো ছাই নিয়ে নিলে পয়সা লাগে না। তবে অল্প একটু নিলে বাকি ছাইটার গতি করার জন্য মূল্য ধরে দিতে হয়।

একটা বাক্স করে ছাই নিয়ে সৌরেন ফিরে এল।

দুপুরে ওরা লণ্ডনের গাড়ি ধরল।

কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। সকলের মনেও আজ এক চিন্তা, মাত্র ক'দিন আগে প্রমীলার জন্যে দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে তারা কার্ডিফে এসেছিল, কিন্তু মনে আশা ছিল তাকে সুস্থ দেখে ফিরবে, ভেবেছিল ক'দিন বাদে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজ সব রকম চিন্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা ফিরছে। প্রমীলা একলা চলে এসেছিল কার্ডিফে, একলাই সে এখানে রয়ে গেল। আর কোনদিন ফিরে আসবে না। ভাগ নেবে না তাদের হাসিকান্নার, সুখ-দুঃখের।

সরোজের মনে পড়ল প্রমীলা বলত, এ পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। তার আপনার বলতে কেউ নেই।

প্রশ্ন জাগল, মৃত্যুর পরেও কি সে ওই একই কথা ভাববে?

সৌরেনের হাতে ছাইয়ের বাক্স। প্রমীলার নশ্বর দেহের অবশিষ্ট। চিরন্তন দার্শনিক চিন্তা সৌরেনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে, এই তো জীবনের পরিণতি। মানুষের এত দম্ভ, এত অহংকার সব একদিন এইভাবে শেষ হয়ে যায়। নিজের

অজান্তে আশ্রয় নেয় স্মৃতির পাতায়। তবে কি সত্যিই জগৎ মিথ্যা, জীবন মায়া?
কে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে!
দ্রুতগতিতে ট্রেন তখন এগিয়ে চলেছে লন্ডনের দিকে।

—

নদীর বুকে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা দেখলে মাঝিরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, পাল নামিয়ে ফেলে। নৌকো টেনে নিয়ে যায় পারের দিকে। কিন্তু যে মাঝি পাল খুলে দেবার সুযোগ পায় না, মাঝ-নদীতে খরস্রোতের মধ্যে পড়ে যায়, অতি দ্রুত গতিতে ছুটতে ছুটতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোথায় সে চলে যায় কে তার খবর রাখে।

কার্ডিফ থেকে ফেরার পর সৌরেনও ঠিক ওই রকম পথ-হারানো পথিকের মত নিরুদ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নৈরাশ্যবাদের তীব্র স্রোত তার অজান্তে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল হতাশার কিনারায়। চিরন্তন প্রশ্নগুলি নতুন করে সৌরেনকে নাড়া দিল। এ জীবনের অর্থ কি? মানুষের গড়া সমাজ সংসার কি মিথ্যা নয়? যে প্রেম ও প্রীতির আমরা এত বড়াই করি তার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের শেষ হয়ে গেল? পরলোক এবং আত্মার অবিনশ্বরতায় কি বিশ্বাস করা সম্ভব? তা'হলে কি জন্মান্তরবাদ সত্য?

এ সব চিন্তার কোন খেই পেল না সৌরেন। একটা থেকে আর একটা অসংলগ্ন চিন্তা। কিন্তু আর যেন লন্ডনের আগের জীবনের সঙ্গে সৌরেন কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারল না।

প্রথম দিন তার চোখ-মুখ দেখেই এলিজাবেথ বিস্মিত হয়েছিল। প্রশ্ন করেছিল, কি হয়েছে সৌরেন? তোমাকে একেবারে বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

উত্তর দিতে গিয়ে সৌরেন কেঁদে ফেলেছে, প্রমীলা মারা গেছে লিজি।

সৌরেন যে প্রমীলার সঙ্গে দেখা করতে গেছে এ কথা এলিজাবেথের জানা ছিল না। গ্রাম থেকে ফিরে এসে মিসেস হেরিং-এর কাছে খবর পেয়েছিল, সৌরেন কোথাও বাইরে গেছে এই পর্যন্ত মাত্র। তাই হঠাৎ প্রমীলার মৃত্যুসংবাদে এলিজাবেথও কম বিচলিত হয় নি। চেঁচিয়ে উঠেছে, না, না, তা কি করে সম্ভব?

সৌরেনের মুখে সব কথা শুনে প্রমীলার জন্যে সে দুঃখ পেয়েছে, লীলার জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করেছে, সৌরেনকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

কিন্তু কয়েকদিন যাবার পর সৌরেনের আচরণ কেমন যেন তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল। এতখানি দুর্বলতা একজন পুরুষমানুষের শোভা পায় না। সৌরেন আজকাল ঘুম থেকে ওঠে দেরিতে, অফিস যায়, কিন্তু কাজ করে না। টেবিলের উপর স্তূপীকৃত ফাইল জমা হয়েছে। তারই সামনে চুপচাপ বসে থাকে। ছুটির পর গ্রীন পার্কে গিয়ে খানিকটা হাঁটে, বেশীর ভাগ দিন একলা। প্রথম প্রথম তার মন ভাল রাখার জন্যে এলিজাবেথ ওর অফিসে এসেছে, একসঙ্গে দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছে, কিন্তু সৌরেন বিশেষ কথা বলত না, চুপচাপ হাঁটত। পার্কের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে এলিজাবেথ একদিন না বলে পারে নি, তুমি যে এতখানি সেন্টিমেন্টাল, আমি জানতাম না সৌরেন।

সৌরেন দার্শনিকের মত উত্তর দিয়েছে, মানুষ তো কতগুলো সেণ্টিমেণ্টের সমষ্টি বই আর কিছু নয় লিজি।

—তাই বলে ভাবপ্রবণতার বশে তুমি জীবনকে উপেক্ষা করবে?

—কোনটা জীবন আর কোনটা জীবন নয় তাই তো বোঝবার চেষ্টা করছি।

এলিজাবেথ আবেগভরা গলায় বলেছে, তুমি কি বুঝতে পারছ না তোমার চিন্তার সূত্রগুলোয় জট পাকিয়ে যাচ্ছে?

সৌরেন মৃদু হেসেছে, তুমি যেটাকে ভাবছ জট-পাকানো চিন্তা, কে বলতে পারে সেইটেই চিন্তারাজ্যের প্রথম সোপান কিনা? এতদিন যা ভেবেছি সবই হয়ত ভুল, এখন যা ভাবছি সেইটাই ঠিক।

হতাশ হয়ে এলিজাবেথ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সৌরেনকে সে এখন একলা ছেড়ে দেয়, সে জানে অফিসের পর সৌরেন একলা কিছুক্ষণ মাঠে বেড়ায়, তারপর চলে যায় লীলার ফ্ল্যাটে। সেখানে আসে সরোজ, আসে অমিতাভ, চারজনে চুপচাপ বসে থাকে। বিশেষ যে কথা হয় তা নয়, কিন্তু চারজনই অনুভব করে তারা একই ব্যথার ব্যথী। তাদের অন্তরের বেদনার কথা অন্যেরা বুঝতে পারবে না। তাই সকলের কাছ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে নিয়ে এই প্রায়-অন্ধকার ঘরে তারা সন্ধ্যেটা কাটায়।

এই সময়টির জন্যে সৌরেনরা যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। কেন জানা নেই, তাদের মনে হয় প্রমীলার আত্মাও তাদের কাছে আসে। এই ঘরে প্রমীলা কতদিন কাটিয়েছে, তার স্মৃতিতে ভরা এই ফ্ল্যাট। তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো, ওদের মনে হয় তাদের বসিয়ে রেখে প্রমীলা যেন পাশের ঘরে গেছে, যেন চায়ের জল বসিয়ে গুনগুন করে গান করছে, একটু বাদেই যেন প্রসাধন সেরে হাসিমুখে এসে ঢুকবে।

প্রতিটি সন্ধ্যা তারা প্রমীলার অস্তিত্ব অনুভব করে, প্রতিটি সন্ধ্যা তার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে থাকে। তারপর এক সময় ওই ফ্ল্যাটেই খাওয়া পর্ব চুকিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

একদিন রাত্রে লীলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছিল সৌরেন আর সরোজ। অন্ধকার রাস্তা, পাশাপাশি তারা হাঁটছে। সৌরেন ইতস্তত করে বলে, সরোজদা, একটা কথা বলব?

সরোজ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল, কি কথা সৌরেন?

—আমি ভাবছিলাম একদিন প্ল্যানচেটে বসলে হয় না?

সরোজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ওসবে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

—তবু দেখতে দোষ কি? যদি প্রমীলার কিছু বলবার থাকে!

—না সৌরেন, ও থেকে আবার নতুন কোন বিপত্তি দাঁড়ায় কে বলতে পারে? আমার তো লীলার জন্যে ভয় করছে, বেচারী একলা থাকে ওই ফ্ল্যাটে। ভালয় ভালয় জাহাজে তুলে দিতে পারলে বাঁচি।

সৌরেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, তাহলে থাক।

দিন দুই পরের ঘটনা। সবে তখন এলিজাবেথের তন্দ্রার ভাব এসেছে, এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ সেরে ফিরতে তার রাতই হয়েছিল, একটা আর্ত চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল পাশের ঘরে সৌরেন যেন চেঁচাল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে করিডোরে বেরিয়ে এসে সৌরেনের দরজায় টোকা মারল। চাপা গলায় ডাকল, সৌরেন, দরজা খোল।

সৌরেন দরজা খুলতে তার ফ্যাকাশে চোখ-মুখ দেখে ভয় পেল এলিজাবেথ।

—শরীর খারাপ লাগছে নাকি? কি হয়েছে?

সৌরেন তখনও আতঙ্কগ্রস্থ, চেয়ারের উপর বসে পড়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম, না নিজের চোখে—

—কি দেখেছ সৌরেন?

সৌরেনের কণ্ঠস্বর অন্যরকম শোনায়, আমার মনে হল প্রমীলা এই ঘরে এসেছে।

—প্রমীলা? এলিজাবেথ বিস্মিত না হয়ে পারে না, কি বলছ সৌরেন?

—বিশ্বাস কর লিজি, ঠিক তুমি যে রকম আমার সামনে বসে রয়েছ, মনে হল প্রমীলাও সেই রকম আমার কাছে এসেছে।

—কি বলল সে?

সৌরেন ভাববার চেষ্টা করে বলে, আমি ঠিক শুনতে পাই নি। কিন্তু বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। মার্বেলের স্ট্যাচুর মত সাদা, ঠান্ডা, পবিত্র।

এলিজাবেথ সৌরেনের কাছে এসে বুঝিয়ে বলে, তুমি স্বপ্ন দেখছিলে সৌরেন।

সৌরেন অন্যমনস্ক গলায় বলে, স্বপ্ন? হয়ত তাই। কিন্তু জান লিজি, আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুর পরও আত্মা বেঁচে থাকে। তার সুখ-দুঃখ সব থাকে।

—ও সব কথা ভেবে কি লাভ সৌরেন? জন্ম আর মৃত্যু জীবনের এই দুটো মাত্রা, একটা শুরু আর একটা শেষ, এর আগে-পরের কথা নাই বা আমরা ভাবলাম।

সৌরেন ঘন ঘন মাথা নাড়ে, আমি কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না। বড় কষ্ট হয়, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে।

এলিজাবেথ এবার দৃঢ়স্বরে বলে, এবার তোমাকে শক্ত হতেই হবে সৌরেন। তুমি যে ক্রমশ চোরাবালির উপর পা দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করছ। বুঝতে পারছ না কোথায় তলিয়ে যাবে। এখন তোমাকে নিজের কথা ভাবতে হবে, আমার কথাও খানিকটা ভাবতে হবে বইকি। নতুন করে আমরা সংসার পাততে যাচ্ছি, সুখ-দুঃখ হাসিকান্না আমাদের জীবনেও আসবে। যাই আসুক, ভয় পেলে তো চলবে না।

সৌরেন বিহ্বলভাবে এলিজাবেথের কথাগুলো শুনছিল, অন্যমনস্ক স্বরে উত্তর দিল, তোমাকে আমি ভালবাসি লিজি।

এলিজাবেথ হেসে বলে, তা তো আমি জানি। কিন্তু এবারে আমাদের প্ল্যান করা দরকার।

সৌরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, প্ল্যানের কি দরকার আছে? তুমি যা বলবে তাই হবে।

এ শুধু একদিনের ঘটনা নয়, দিনের পর দিন দুজনের মধ্যে এই ধরনের কথা চলতে লাগল। যুক্তিবাদী এলিজাবেথ কিছুতেই বুঝতে পারল না কেন সৌরেন অসহায়ভাবে স্রোতের মুখে পড়া খড়কুটোর মত ভাবপ্রবণতার বেগে ভেসে চলেছে। কেন সে চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত করতে পারছে না।

প্রায় সপ্তাহখানেক সৌরেনের সঙ্গে এলিজাবেথের আর দেখা হয় নি। কখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, কখন ফেরে, কোন হদিসই পাওয়া যায় না। এমনকি শনি রবিবার দুটো ছুটির দিনও সৌরেন বাইরে কাটাল। অবশ্য খবর করলে তাকে নিশ্চয় পাওয়া যেত লীলা বা সরোজের ফ্ল্যাটে, কিন্তু এলিজাবেথের সে ইচ্ছা করল না।

সারা সপ্তাহটা এলিজাবেথ অফিসের পর বাড়িতে বসে কাটিয়েছে, অপেক্ষা

করেছে সৌরেনের জন্যে, কিন্তু দেখা পায় নি। শনিবার সকাল বেলাতেও যখন সৌরেন তার সঙ্গে দেখা না করে বেরিয়ে গেল এলিজাবেথ মনে মনে বিরক্ত না হয়ে পারল না।

এগারটা নাগাদ সেজেগুজে এলিজাবেথ খেতে বেরল। আজ সে সৌরেনের উপর রেগে গিয়ে শাড়ি পরে নি, অনেক দিন বাদে পরল ইউরোপীয়ান ড্রেস। আয়নার সামনে নিজেকে দেখে তার অন্যরকম মনে হল। এলিজাবেথ মনে মনে ঠিক করেছিল 'সেলফ্রিজে'র দোকানে খাবে। ওই বিরাট দোকানটায় ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। নানা রকম জিনিস দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যেন সময় কেটে যায়।

'সেলফ্রিজে'র দোকানে ঢুকে এলিজাবেথ সোজা চলে গেল রান্না করার সাজ-সরঞ্জাম যেখানে পাওয়া যায় সেই ডিপার্টমেণ্টে। তরকারি কাটার সুবিধের জন্যে নিত্য নতুন ধরনের কল বেরয়, এখানকার কাউণ্টারে তা সাজানো থাকে, এলিজাবেথ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো দেখছিল।

হঠাৎ তার নজর পড়ল একেবারে ডান দিকের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের ওপর। টুপির জন্যে তার মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবু এলিজাবেথের মনে হল মেয়েটি তার পরিচিত। অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় মেয়েটির বেশ কাছাকাছি গিয়ে হাজির হল এলিজাবেথ। মেয়েটি পিছন ফিরে দোকানীর সঙ্গে আলাপ করছিল, তাই বোধ হয় এতক্ষণ এলিজাবেথকে দেখতে পায় নি। এলিজাবেথ আরও ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল।

মেয়েটি একবার ফিরে তাকাল। কিন্তু এলিজাবেথকে চেনে বলে মনে হল না। দোকানীর সঙ্গে কথা শেষ করে অন্য দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

কয়েকটা ছোটখাট জিনিস কিনে এলিজাবেথ 'এস্‌কেলিটার' ধরে ওপরে উঠে গেল। 'সেলফ্রিজে' এলে একবার করে অন্তত বাচ্চাদের খেলনা সাজানো ঘরটা ঘুরে যায়। কত দামী খেলনা, কি নিখুঁত, কি সুন্দর। খেলনা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল এলিজাবেথ। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে সে ঘাড় ফিরে তাকাল। অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীচের ঘরে দেখা সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি। এলিজাবেথ সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল। চোখাচোখি হতে মনে হল মেয়েটি কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে। চট করে ঘর থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল। কৌতূহল বেড়ে গেল এলিজাবেথের, সেও পেছন পেছন চলল। একটা নির্জন করিডোরে দুজনের দেখা হতেই এলিজাবেথ প্রশ্ন করল, ডোরিয়া না?

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বলল, কেন তুমি আমাকে বিরক্ত করছ?

এলিজাবেথ থতমত খেয়ে যায়, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। আমি ভেবেছিলাম আমার এক বান্ধবী, ডোরিয়া।

মেয়েটি আগের মতই বলল, আমার নাম ডোরিয়া।

এলিজাবেথ বিস্মিত কন্ঠে প্রশ্ন করে, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি এলিজাবেথ!

ডোরিয়া অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বলল, তুমি যে-ডোরিয়ার কথা ভাবছ, সে ডোরিয়া আমি নই।

—তার মানে?

—কেন, দেখে মনে হচ্ছে না, আমি অন্য লোক?

এলিজাবেথ অবশ্য লক্ষ্য করছিল ডোরিয়ার সাজপোশাক আগের মত নেই, সে

আজকালকার ফ্যাশানের ঘননীল রঙের ব্লাউজ আর স্কার্ট পরেছে। চুলেরও কায়দা করেছে যথেষ্ট। আগে তার সাজপোশাক ছিল একেবারে মামুলী ধরনের।

এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করে, লণ্ডনে তুমি কবে ফিরেছ?

—প্রায় এক সপ্তায় হল।

—জয় কোথায়?

—সে আসে নি।

কথাগুলো কেমন যেন গোলমেলে মনে হল এলিজাবেথের। ডোরিয়া নিজে থেকেই কথা বলল, আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

এলিজাবেথের কাছে খবরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, কি বলবে ভেবে পেল না। ডোরিয়া বলে গেল, আট মাস বাদে দেশে ফিরে অনেকটা ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে আমি বেঁচে আছি।

—ভারতবর্ষ কি তোমার ভাল লাগল না?

—সে অনেক কথা। এখানে দাঁড়িয়ে তা বলা যায় না।

এলিজাবেথ আমন্ত্রণ জানাল, যদি আপত্তি না থাকে, চল না আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে।

ডোরিয়া বুঝল এলিজাবেথ তার কথা শুনতে চায়। প্রথমটা ভাবল এড়িয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে বলল, চল।

তারা গিয়ে বসল একটি ছোট্ট রেস্তরাঁয়। একেবারে পেছনের দিকের টেবিলে। ডোরিয়া অনর্গল বলে গেল কথা, যা গুছিয়ে নিলে এই দাঁড়ায়ঃ প্রথম প্রথম কলকাতায় পেঁছে ডোরিয়ার ভালই লেগেছিল। যদিও নোংরা শহর, জীবনধারণের নানারকম অব্যবস্থা, তবু ডোরিয়ার মনে হয়েছিল এখানকার মানুষগুলোকে জানতে পারলে, তাদের সঙ্গে আলাপ হলে সে সানন্দে থাকতে পারবে। জয় ওকে বরাবর বুঝিয়ে ছিল বাইরের চাকচিক্য না থাকলেও ভেতরটা এদের সম্পদে ভরা। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ডোরিয়া বুঝতে পারল, ও দেশে শুধু মিথ্যেরই জয়জয়কার। বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই মিলে এক সংসারে তারা থাকে কিন্তু এতটুকু মিল নেই তাদের মধ্যে। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সব সময় খাওয়া-খাওয়ি করছে। অথচ বাইরে বড়াই করে বলবে যৌথ পরিবারে থাকার কত সুবিধে। এদের সমাজের লোক নানারকম সংস্কার মেনে চলে অথচ এতটুকু প্রাণ নেই তার মধ্যে। অন্তত ডোরিয়ার মনে হয়েছে ওগুলো নিছক প্রহসন। রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতন্ত্রের প্রচণ্ড তামাশা। শতকরা আশী ভাগ নিরক্ষর লোককে নিয়ে ওরা ভোটের রঙ্গ দেখে। ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া হয় না, শুধু রাজনীতি চলে। ক্রিকেট ফুটবল খেলার কমতি নেই, কিন্তু কোথায় সেখানে স্পোর্টসম্যানশিপ, শুধু নোংরামি। ডোরিয়া যত এসব দেখেছে ততই সে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে গেছে। তবু সহ্য করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না, যখন সে বুঝতে পারল ও দেশে মেয়েদের কোন স্থান নেই। তারা শুধু পুতুলের মত বসে থাকে, খায়দায়, সাজেগোজে, পিতা বা স্বামীর মন যুগিয়ে চলে।

বলতে বলতে ডোরিয়ার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে, আমার কাছে মনে হল ওই রকম পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। জয়ের মা তাঁর ইচ্ছে মত

আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বসিয়ে রাখতেন, পাঁচ বাড়ির লোক এসে আমায় দেখে যেত। প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগে নি, সে কথা আমি চিঠিতেও লিখেছিলাম। নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হত। ভাবতাম আমি যেন হিন্দু দেবী হয়ে গেছি। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম ও দেশে থাকতে হলে ওই ভাবেই আমায় সারাটা জীবন কাটাতে হবে, ভয়ে শুকিয়ে গেলাম। আমি এখন বুঝতে পেরেছি কেন ভারতীয়েরা জীবনকে এড়িয়ে চলতে চায়, কেন দর্শনের বড় বড় বুলি আউড়ে ওরা আমাদের ভাওতা দিতে চায়। কারণ ওরা খেলা করতেই ভালবাসে, পুতুল আর প্রতিমা নিয়ে খেলা করে। উঃ, এই আট মাসের দুঃস্বপ্ন আমার কেটেছে।

এলিজাবেথ একাগ্র মনে কথাগুলো শুনছিল, প্রশ্ন করল, জয়ের সঙ্গে এ নিয়ে তোমার কোন কথা হয় নি?

ডোরিয়া বিদ্রূপ করে হাসল, হয়েছে, কিন্তু তাতে কি ফল হবে? সবচেয়ে বড় কথা কি জান, এখানে যেসব ভারতীয় ছেলেদের আমরা দেখি, দেশে ফিরে যাবার পর তারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়, নিজের মতামত বলতে কিছু থাকে না। জয়কে আমি যখন যে কথা বলতে গেছি, সে বলেছে বাবার কাছে যাও, নয় ত মায়ের কাছে। তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না যে, জয়কে এখানে দেখে আমি ভাবতাম চালাকচতুর, দেশে গিয়ে ক'মাস থাকার পর দেখলাম সে এক বুড়ো খোকায় পরিণত হয়েছে।

এলিজাবেথ বিড়বিড় করে বলল, আশ্চর্য, এও কি সম্ভব?

ডোরিয়া ক্লান্ত সুরে বলে, একেবারে হতাশ হয়েছিলাম আমি কি দেখে জান? জীবনে যখন কোন সমস্যা আসে ওরা তার মীমাংসা করতে পারে না। জয়ের মত যুবক কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য তাকায় প্রৌঢ়দের দিকে, প্রৌঢ়রা ডাকেন বৃদ্ধদের সভা। কিন্তু বিশ্বাস কর এলিজাবেথ, কোন সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছুতে পারে না, শেষ পর্যন্ত ভগবানের দোহাই দিয়ে বসে থাকে। তুমিই বল, এ অবস্থার মধ্যে কি আমাদের মত কারুর পক্ষে বাস করা সম্ভব, যাদের এতটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর তারা রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। বিদায় নেবার আগে ডোরিয়া অনুরোধ করে বলে, এলিজাবেথ, আমি যে লণ্ডনে ফিরে এসেছি একথা এখানকার ভারতীয় মহলের ছেলেমেয়েরা যেন না জানতে পারে, তাদের কারুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না।

এলিজাবেথ কথা দিল, বেশ, আমি কাউকে বলব না। তবে যদি আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই?

ডোরিয়া তার টেলিফোন নম্বরটা লিখিয়ে দিল।

সারা রাস্তা এলিজাবেথ ডোরিয়ার কথাগুলো ভেবেছে। সে যা বলল তা বোধ হয় মিথ্যে নয়, কারণ সৌরেনের সাম্প্রতিক আচরণে সে বিস্মিত না হয়ে পারে নি। প্রমীলার মৃত্যুর পর থেকে একেবারে মানুষটা বদলে গেছে, তাও তো প্রমীলা তার আপনার কেউ নয়। শোক তাপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার যদি তার এটুকু শক্তি না থাকে তাহলে এলিজাবেথ কোন ভরসায় তাকে নিয়ে জীবন সংগ্রামে নামবে? ভারত সম্বন্ধে যে মোহ এলিজাবেথের মনে ছিল ডোরিয়ার কথা শোনবার পর সে

মোহও কাটতে শুরু করেছে। ডোরিয়া যা বলেছে হয়ত কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়ত নিজের মন দিয়ে বিচার করতে গিয়ে কিছুটা সে ভুল করেছে, কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় একেবারে অসহ্য না হলে ডোরিয়া জয়কে ফেলে রেখে এখানে চলে আসত না। কারণ জয়কে সে যে ভালবেসেছিল, তার গুণে মুগ্ধ হয়েছিল, এ তো এলিজাবেথ লণ্ডনে থাকতে নিজের চোখেই দেখেছে। এত সহজে সেই প্রেম তিক্ততার পর্যায়ে নেমে এল কি করে?

যাই হক আর ফেলে রাখলে চলবে না, আজই সে সৌরেনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে, যা হক একটা নিষ্পত্তি করে ফেলবে। যদি মনে হয় মিলের চেয়ে অমিলটা তাদের মধ্যে বড় হয়ে উঠছে তাহলে বোধ হয় এখুনি একটা পূর্ণচ্ছেদ টানা দরকার। আর যদি সৌরেন সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এলিজাবেথকেই গ্রহণ করতে চায়, তাহলে আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই, এখুনি বিয়ে করে সংসার পাতা উচিত।

যা হক একটা মীমাংসা তাকে আজ করতেই হবে।

অমিতাভ মায়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে, দেশে ফিরে যাবার তিনি অনুমতি দিয়েছেন। অল্প চেষ্টা করে অমিতাভ লীলা যে জাহাজে ফিরছে সেই জাহাজেই প্যাসেজ বুক করেছে। এ ব্যাপারে খুশী হয়েছ সকলে। লীলাকে একলা যেতে হবে না, তবু তাকে দেখাশোনা করার একটা লোক হল। তাছাড়া অমিতাভরও লণ্ডনে থাকায় কোন লোভ নেই। লেখাপড়া যখন সে করছে না, মিছিমিছি এখানে থেকে পয়সা নষ্ট করে কি হবে?

ওই কথা আলোচনা করতে করতেই সৌরেন আর অমিতাভ বাড়ি ফিরছিল, সৌরেন বলল, দেশের জন্যে আমারও বড় মন কেমন করছে রে অমিত।

অমিতাভ বলে, তুমিও চল না সৌরেনদা।

—যাব বললেই কি যাওয়া যায়? তবে যদি কোন সুযোগ পাই।

—কোন সুযোগের কথা ভাবছ?

সৌরেন হাসল, তুই বুঝতে পারবি না। এখানে সামান্য চাকরি করি, ক'টা টাকাই বা জমেছে। ফিরতে গেলেও তে শ'খানেক পাউণ্ড দরকার।

অমিতাভ ইতস্তত করে বলে, যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি। আমার কাছে কিছু টাকা বেশী আছে, যদি তোমার দরকার থাকে তো আমি ধার দিতে পারি।

কথাটা শুনেই সৌরেনের চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল, সত্যি বলছিস, ধর যদি আমার চল্লিশ পাউণ্ড দরকার হয় তুই ধার দিতে পারবি?

—হ্যাঁ, পারব।

সৌরেন নিজের মনে বিড়বিড় করে, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। সত্যি আর এখানে ভাল লাগছে না। অন্তত কিছুদিনের জন্যে যদি ঘুরেও আসতে পারি, অফিসের কাছে আমার ছুটি পাওনা আছে অনেক, অন্তত দু'মাসের জন্য, আবেদন করলে নিশ্চয় মঞ্জুর হবে।

অমিতাভ উৎসাহ দেয়, তাহলে আর দেরি করো না। কালই ঠিক করে ফেল। ওই একই জাহাজে তোমারও প্যাসেজ বুক করে দেব।

—কাল তোকে জানাব।

টিউব স্টেশন থেকে দুজনে দুদিকে চলে গেল। দম-বন্ধ-করা সাম্প্রতিক লণ্ডন জীবন থেকে মুক্তি পাবার ক্ষীণ আলো দেখতে পেল সৌরেন। অন্তত কয়েকটা মাস যদি ঘুরে আসতে পারে। ঝলমলে রোদ ভরা কলকাতার কথা মনে পড়তেই মন তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই অতি পরিচিত কলকাতায় কতদিন বাদে আবার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে। দেশ ছাড়ার পর থেকে সৌরেন কি অনেক বদলে গেছে? তা মনে হয় না। এ সময় বাড়ি ফিরলে মা খুব খুশী হবেন। বিশেষ করে বাড়িতে এখন ভাইয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে, সৌরেনকে যাবার জন্যে সকলে লিখেছে, সে অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিল যেতে পারবে না। এখন হঠাৎ আসছে শুনলে সবাই বড় আনন্দ পাবে।

টাকার মুশকিল নিশ্চয় ছিল, সে মুশকিল আসান করতে প্রস্তুত অমিতাভ। কিন্তু এলিজাবেথকে সে কি বোঝাবে? বড় ভাল মেয়ে। এ কথা সত্যি, সৌরেন কিছু-দিনের জন্যে দেশে ঘুরে আসতে চায় জানলে সে মোটেই বাধা দেবে না। কিন্তু তবু বড় একলা পড়ে যাবে। তা হলেও সৌরেনের মনে হল একবার ওকে বুঝিয়ে বলা ভাল, সব মানুষেরই তো চেঞ্জের দরকার হয়। সৌরেনের বোধ হয় ঠিক তাই হয়েছে। তা না হলে হঠাৎ এভাবে দেশের জন্যে তার মন কেঁদে উঠল কেন? মায়ের সঙ্গে দেখা হবার কথা ভাবতেই চোখে তার জল আসছে। অবশ্য সৌরেন যদি ঠাণ্ডা মাথায় একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করত তা হলে বুঝত এই দেশে ফেরার মূলেও রয়েছে প্রমীলার মৃত্যু। প্রমীলা যে মৃত্যুর আগে তার মা, বাবা, ভাই, বোন কারুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারল না, এই চিন্তাই সৌরেনকে দেশে ফেরার জন্যে ব্যস্ত করে তুলেছে।

বাড়ি ফিরে সৌরেন দেখল তখনও এলিজাবেথের ঘরে আলো জ্বলছে। সৌরেনের মনে হল এইবেলা কথাটা তাকে বলে ফেলা ভাল। যদি সে তাকে কল-কাতায় ফেরার অনুমতি দেয় তা হলে কাল সকালেই অমিতাভর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্যাসেজের চেষ্টা করবে।

দরজায় টোকা মেরে সৌরেন জিজ্ঞেস করল, আমি ভেতরে আসতে পারি?

ভেতর থেকে উত্তর এল, এস।

সৌরেন ঘরে ঢুকে দেখে, এলিজাবেথ টেবিল চেয়ারে বসে চিঠি লিখছে। সৌরেন কাছে গিয়ে তার কপালে চুমু খেল।

এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করে, এত রাত হল ফিরতে?

সৌরেন শুকনো উত্তর দেয়, লীলাদের ফ্ল্যাটে ছিলাম।

—তা তো জানি। আমি ভেবেছিলাম আজ ছুটির দিন, অন্তত সকালবেলা তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে।

সৌরেন ভাববার চেষ্টা করে, কেন দেখা হল না বল ত ? আমি বোধ হয় এসে-ছিলাম তোমার ঘরে। ঘরটা কি বন্ধ ছিল? ভাবলাম তুমি বোধ হয় বেরিয়ে গেছ, ঠিক মনে পড়ছে না। আজকাল আমার মাথাটা—

পাদ পূরণ করে দিল এলিজাবেথ, আমিও তো সেই কথাই বলতে চাইছি। আজ-কাল তুমি এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছ যে, মনে হয় তুমি জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

—ঠিক তা নয় লিজি।

এলিজাবেথ অভিমানের সুরে বলে, না হলেই ভাল। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ

সৌরেন, কার্ডিফ থেকে ফেরার পর কটা সন্ধ্যা তুমি আমার সঙ্গে কাটিয়েছ? সারাক্ষণ থমথমে মুখ করে বসে থাক; সারা দিনে একবারও আমার কথা ভাব বলে তো মনে হয় না।

—এ তুমি কি বলছ লিজি? তুমি কি বুঝতে পার না, সারাক্ষণই তো আমি তোমার কথা ভাবি। এ শুধু একটা সাময়িক দুঃখ, কেমন যেন আমাকে—

এলিজাবেথ থামিয়ে দিয়ে বলে, আশ্চর্য লাগছে এই জন্যে, তুমি বুঝলেও না আমি কত একা। অথচ এই সময় তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সব কথাই কি আমায় খুলে বলতে হবে?

এলিজাবেথের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সৌরেন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত দুটো তুলে নিয়ে বলে, হঠাৎ এ কথা কেন বললে লিজি?

এলিজাবেথ নীরস কণ্ঠে বলে, আমি তো আর একলা নই।

এতক্ষণে সৌরেন বুঝতে পারে, তার মানে—

—আমি মা হতে চলেছি।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

সারা রাত ঘুমতে পারল না সৌরেন। অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে মন তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, ছি, ছি, এ কাজ সে করল কেন? এলিজাবেথকে সে ভালবাসে, তাকে সে আপনার করে পেতে চায়, সব সত্যি, তবুও এভাবে বিয়ের আগে অবৈধ-ভাবে জড়িয়ে পড়া তার উচিত হয় নি। এখন সে কি করবে? বিয়ে, হ্যাঁ, বিয়ে তাকে করতেই হবে, কিন্তু তার জন্যেও তো সময় লাগবে কিছু দিন। তারপর নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তখন সে কি কৈফিয়ত দেবে সমাজের কাছে? দেশের আত্মীয়স্বজনদের কথা মনে হতেই সৌরেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মাসীমা পিসীমাদের শান দেওয়া জিভগুলোর কথা চিন্তা করতেই সে ভয় পেল। কিন্তু ব্যথা পাবেন একজন, তিনি সৌরেনের মা। স্নেহময়ী জননীর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চোখে জল এল সৌরেনের। এই প্রথম তার মনে হল, সে অন্যায় করেছে। মায়ের প্রতি পুত্রের যে কর্তব্য তা সে পালন করে নি, করলে অন্তত এভাবে সে তাঁকে আঘাত দিতে পারত না। একে বিদেশিনী পুত্রবধূ, তার উপর যদি অবৈধ সন্তান জন্মায়, কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

আর এক হয়—সৌরেন যদি এখন দেশে না ফিরে যায়। অন্তত আরও বছর দুই লণ্ডনেই থাকে। পরে যখন সে স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেশে ফিরবে তখন হয়ত এসব প্রসঙ্গ আর উঠবে না। কিন্তু আরও দু' বছর এখানে পড়ে থাকাও যে অত্যন্ত কষ্টকর। কে বলতে পারে বেশী দিন এখানে পড়ে থাকলে আর হয়ত দেশে ফেরার সুযোগই পাবে না। বছরের পর বছর বিদেশে থাকতে হবে।

এ কথা ভাবতে গিয়ে প্রমীলার কথা মনে পড়ল। প্রমীলার মত যদি তাকেও বিদেশে মৃত্যু বরণ করতে হয়, মা, দাদা, ভাই, বোন, কারুর সঙ্গে দেখা হবে না, দেশের মাটির স্পর্শটুকু পাবে না, সকলের কাছ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত একদিন হঠাৎ তার জীবনের কাহিনী শেষ হয়ে যাবে।

অথচ উপায় বা কি! সৌরেনের চেয়েও এলিজাবেথের মনের অবস্থা নিশ্চয় আরও খারাপ, সংশয়ের দোলায় তার মন দুলছে। তার নিজের মনের মধ্যে যাই হক না

কেন, এলিজাবেথকে সে ভরসা দেবে—যত শীঘ্র সম্ভব তাকে বিয়ে করবে।

নিজের অজ্ঞান্তে দীর্ঘশ্বাস পড়ল সৌরেনের। দেশের কথা, আত্মীস্বজনের চিন্তা তাকে আস্তে আস্তে ভুলতে হবে। নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে এ-দেশী কায়দায়, তা না হলে বিবাহিত জীবনে সে সুখী হতে পারবে না। যত এ কথা সৌরেন ভাবতে লাগল, মনকে শক্ত করার চেষ্টা করল, ততই চোখের জল ধারার মত নেমে এসে তাকে দুর্বল করে ফেলল।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে সৌরেন কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙ্গল দেরিতে, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। মুখ ধুয়েই সে গেল এলিজাবেথের ঘরে। ঘর বন্ধ, এলিজাবেথ বেরিয়ে গেছে। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজায় তার নাম লেখা একটা খাম পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে। সৌরেন সেটা খুলে নিয়ে পড়ল, এলিজাবেথ দু' লাইনের চিঠি লিখে রেখে গেছে, বিশেষ কাজে মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজই তাকে দেশের বাড়িতে যেতে হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই সে ফিরবে।

কেন জানা নেই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সৌরেন। তবু যা হক দুদিন সময় পাওয়া গেল। এখুনি তাকে এলিজাবেথের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলতে হবে না। মনে মনে এলিজাবেথের উপরও সে বিরক্ত হয়েছিল, কেন সে সময় মত সৌরেনকে সাবধান করে নি, কেন তাকে প্রলুব্ধ করেছিল। একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারল তার মনের কোণে। এলিজাবেথ কি ইচ্ছে করে সৌরেনকে জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে? এইভাবেই কি এ-দেশের মেয়েরা স্বামী শিকার করে? না না, এলিজাবেথ সম্বন্ধে এ কথা ভাবা তার উচিত হয় নি, মেয়েটা ভাল। সত্যিই সৌরেনকে সে ভালবেসেছে।

টেলিফোন এল সৌরেনের। অপর দিকে নারীকণ্ঠ। প্রথমটা সৌরেন বুঝতে পারে নি কে কথা বলছে। মেয়েটি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল, এরই মধ্যে ভুলে গেলে আমায়?

সৌরেন স্বীকার করল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমি মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী! কোথা থেকে কথা বলছ?

—কাল আমরা লন্ডনে এসেছি, আমি আর পীয়ের। খালি থাক তো চলে এস না একবার আমাদের হোটেলে।

সৌরেন খুব উৎসাহ প্রকাশ করল না, বলল, যাব এক সময়।

মীনাক্ষী জোর দিয়ে বলে, না না, এখুনি এস। সঙ্গে এলিজাবেথকেও এনো কিন্তু।

—লিজি লন্ডনে নেই।

—তা হলে তুমি একলাই এস।

মীনাক্ষী রাসেল্ স্কোয়ারের হোটেলের নাম ঠিকানা বলে দিয়ে রিসিভার রেখে দিল।

আজ যা সৌরেনের মনের অবস্থা, তা নিয়ে কারুর সঙ্গে দেখা না করাই উচিত ছিল। কিন্তু মনে হল বাড়িতে বসে থাকলে আরও খারাপ লাগবে, তাই সে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ল মীনাক্ষর হোটেলের উদ্দেশে। তা ছাড়া কালই

মীনাক্ষীরা ফিরে যাচ্ছে ব্র্যাসেলস-এ, আজ দেখা না করলে হয়ত আরও কতদিন দেখা হবে না। যদিও মীনাক্ষী লণ্ডন ছেড়েছে মাস তিনেক, কিন্তু তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র এক মাস। প্রথম দিকে একখানা চিঠিও লেখে নি লণ্ডনের ভারতীয় মহলে, বিয়ের পর সমুদ্রতীরে হনিমুন করতে গিয়ে সে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল। বলতে গেলে সংক্ষেপে গত দু'মাসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিল তাতে, কিভাবে পীয়েরের বাবা মা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। বিয়ের আগে পর্যন্তও নিজে-দের বাড়িতে রেখেছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সযত্ন আলাপ করিয়ে দিয়ে-ছিলেন, সেই সব কথা। বিয়ের সময় বাধা কম পড়ে নি মীনাক্ষীর। ব্যর্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট না থাকায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল বইকি। শেষ পর্যন্ত ওর দাদু জন্মতারিখের কথা অ্যাফিডেভিট করে পাঠান। পীয়রদের পরিবারের এক বিশেষ বন্ধু মীনাক্ষীর পিতৃগৃহের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ান, সম্পূর্ণ নতুনভাবে আনন্দময় পরিবেশে মীনাক্ষী আর পীয়েরের বিবাহ হয়।

এর পর মীনাক্ষী আর কোন চিঠি দেয় নি। যখন ওই চিঠিটা আসে, সকলেই এক একবার পড়েছিল কিন্তু প্রমীলা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকায় এ নিয়ে সরোজদের মহলে বিশেষ হৈ চৈ পড়ে নি। তারপর প্রমীলার মৃত্যুর ফলে এ চিঠির কথা সকলে ভুলেই গিয়েছিল একরকম। আজ মীনাক্ষীর টেলিফোন পেয়ে একে একে সব কথা সৌরেনের মনে পড়ল।

ভাগ্যিস সৌরেন তখুনি বেরিয়ে পড়েছিল মীনাক্ষীদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, তা না হলে পরে আর দেখা হ'ত না। ওদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ বাইরে, সেখান থেকে দেখা করতে যাবে এক বন্ধুর বাড়ি, চা খাবে আর এক জয়াগায়। রাত্রের ডিনার বুঝি কোন এক কন্টিনেন্টাল রেস্তরাঁয়। আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে আছে। দু একদিনের জন্যে কোন পুরনো জায়গায় বেড়াতে এলে যা হয়ে থাকে আর কি।

সৌরেনকে দেখে ওরা দু'জনেই চমকে উঠল, এ কি চেহারা হয়েছে সৌরেন? অসুখবিসুখ করে নি তো? চোখের তলায় কালি, মুখখানা শুকনো, কি হয়েছে?

সৌরেন ম্লান হাসে, নাঃ শরীর ঠিক আছে।

—তা হলে এরকম চেহারা হয়েছে কেন?

—মানে অনেক ঝামেলা গেল তো। শুনছে বোধ হয় প্রমীলা—

মীনাক্ষী ব্যথিত গলায় বলে, এখানে এসে তাই শুনলাম। আজ সকালে গিয়ে-ছিলাম লীলার সঙ্গে দেখা করতে বেচারী একেবারে মুষড়ে পড়েছে। ও দেশে ফিরে যাচ্ছে, সে একরকম ভাল। আত্মীয় স্বজনদের দেখে তবু খানিকটা শোক ভুলতে পারবে।

প্রমীলার কথা বলতে গিয়ে এখনও সৌরেনের চোখ দুটো ছলছল করে, বলে, প্রমীলার এই অকালমৃত্যু কেমন যেন আমাকে বিহ্বল করে ফেলেছে। বিশ্বাস কর মীনাক্ষী, এক এক সময় ভয় হয় আমি বোধ হয় জীবনের ওপর আস্থা হারাচ্ছি।

মীনাক্ষী সহানুভূতি প্রকাশ করে, একে বলে শ্মাশানবৈরাগ্য। ও ধরণের চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ওকে বেশী প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত।

মাঝখান থেকে কথা বলল পীয়ের, প্রমীলার মৃত্যুর জন্যে আমি কিন্তু অনেক-খানি দায়ী করব সরোজকে।

সৌরেন কথাটা বুঝতে না পেরে মুখ তুলে তাকাল।

—সরোজ কেন বুঝতে পারল না প্রমীলা তাকে প্রাণ ভরে ভালবাসে। ভাল-

বাসার অভাবই প্রমীলকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে কিনা জানি না মীনা, ওই একটা অভাবেব জন্যে তোমার অতুল-মামার জীবনেরও এই ট্র্যাজেডি।

মীনাক্ষী সায় দিয়ে বলে, বেচারী অতুলমামা। ভাবতেও কষ্ট হয়। এই বুড়ো বয়সে এভাবে একলা পড়ে থাকা।

পীয়ের উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল, আমাকে মাপ করতে হবে সৌরেন। চট করে আমি তৈরী হয়ে আসি। ততক্ষণ মীনার সঙ্গে তুমি গল্প কর।

পীয়ের চলে গেল স্নানের ঘরে। মীনাক্ষী বোধ হয় তখনও অতুলমামার কথা ভাবছিল। বললে, তুমি তো আমার অতুলমামার কথা সবই জান সৌরেন, ভাবতে পার এই বুড়ো বয়সে আইলীন মামী তাকে ডিভোর্স করেছে?

সৌরেন চমকে উঠল, তাই নাকি?

—একরকম সেই জন্যে আমাদের লণ্ডনে আসা। অতুলমামা জরুরী তার করে-ছিলেন। যদি শেষ পর্যন্ত এই বিচ্ছেদটা থামানো যায়। পারলাম না। আইলীন মামী একটা কথাও শুনতে চাইলে না। অসুস্থ অতুলমমাকে নিয়ে সে দিন কাটাতে নারাজ। কুকুর নিয়ে একলা থাকবে। অথচ ওই অতুলমামা দেশে ফিরে যাবার জন্যে মন ছটফট করলেও কখনও যান নি। পাছে আইলীন মামীর সেখানে কষ্ট হয়, বা এখানে একলা থাকতে খারাপ লাগে। অতুলমামা ভুলটা কোথায় করেছিলেন জান? ভালবাসা তাদের মধ্যে ছিল না, সারা জীবনটাই আপস করে একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করেছেন, তারই বিষময় ফল ফলল এই বুড়ো বয়সে। ছেলেমানুষের মত অতুলমামা কাঁদছেন, কিন্তু কি তাকে সান্ত্বনা দেব বলতে পার?

সৌরেন জিজ্ঞেস করে, তা হলে এখন তিনি কি করবেন?

—আমরা বলেছি মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে থাকবার জন্যে, আর নয় ত দেশে ফিরে যেতে। মীনাক্ষী নিজের মনে কি যেন ভাবল, অন্যমনস্ক সুরে বলল, পীয়েরকে না পেলে ভালবাসা যে কি জিনিস বোধ হয় আমি বুঝতে পারতাম না। আমার জীবনের সমস্ত অভাব সে পূরণ করেছে। আমার দেশ, আমার আত্মীয়-স্বজন, সব কিছু ছাপিয়ে যার কথা সারাক্ষণ ভাবি সে পীয়ের। এভাবে যে কাউকে ভালবাসা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না। আজ বুঝতে পেরেছি এ ভালবাসার স্বাদ যে জীবনে পায় নি তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নেই।

সৌরেন এতক্ষণ মীনাক্ষীকে লক্ষ করছিল, চেহারা তার আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে, কথা বলার ধরন গেছে বদলে। আগে যে রকম মেপে মেপে কথা বলত এখন আর সে রকম নয়, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বলতা, পাওয়ার আনন্দ। মুখে তার প্রশান্ত হাসি।

সৌরেন বলল, তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি তুমি জীবনে সুখী হয়েছ মীনাক্ষী।

মীনাক্ষীর চোখে জল এসে পড়ে, এর গভীরতা তোমায় কথায় বোঝাতে পারব না, দাদুকেও আমি তা লিখেছি। ইচ্ছে আছে দুজনে কলকাতায় বেড়াতে যাব। দাদু খুব খুশী হবেন।

—কবে যাচ্ছ?

—এখনও কোন ঠিক নেই, তবে যাব। এবার মীনাক্ষী সৌরেনের কথায় এল, এখন তোমাদের কি খবর? এলিজাবেথ কেমন আছে? বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছ তো?

সৌরেন অন্যমনস্ক গলায় জবাব দেয়, বিয়ে, হ্যাঁ করতে হবে বইকি।

—ও আবার কি কথার ধরন? এখনও কিছু ঠিক হয় নি বুঝি?

—না, মানে বাড়িতে এখনও জানানো হয় নি তো। তাই একটু চিন্তায় আছি।

মীনাক্ষী স্থির দৃষ্টিতে সৌরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, ভাবের ঘরে কখনও চুরি করো না সৌরেন।

—তার মানে?

—সত্যিই যদি এলিজাবেথকে ভালবেসে থাক, যদি মনে হয় তাকে ছাড়া তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে তবেই বিয়ে করো। নয়ত শুধু দায়সারাভাবে বিয়ে করে ভুল করো না, সারাট জীবন পস্তাতে হবে আমার ওই অতুলমামার মত।

সৌরেন কোন কথা বলল না, কিই-বা বলবার আছে। চুপ করে পুতুলের মত বসে রইল। পীয়ের সাজগোজ করে ফিরে আসায় সে মুক্তি পেল এ অসহ্য নীরবতার হাত থেকে।

পীয়ের বলল, মীনা, তুমি ড্রেস করে এস। তা না হলে আমাদের বেরুতে দেরি হয়ে যাবে।

মীনাক্ষী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল, তুমি যা ব্যস্তবাগীশ! সৌরেন, তুমি বসো আমার বেশী সময় লাগবে না, আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

মীনাক্ষী চলে গেল।

সাদা শার্টের উপর ঘন সবুজ টাই পরে পীয়েরকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। টেবিলের উপর রাখা টিন থেকে সিগারেট বার করে সৌরেনের দিকে এগিয়ে দিল। দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে প্রশ্ন করল, কেমন দেখলে মীনাক্ষীকে?

সৌরেন হাসল, খুব ভাল। আমি তো এতক্ষণ মীনাক্ষীকে তাই বলছিলাম। কতখানি বদলে গেছে। আগের মত কথায় কথায় আর তর্ক করে না।

—তাও তো লণ্ডনে এখন দেখলে ওকে বুঝতে পারবে না। এস, ব্রাসেল্‌স্‌-এ দেখো ওর নিজের সংসার। বুঝতে পারবে কি আনন্দে সে সংসার করছে। তখন সত্যি মীনাকে তুমি চিনতে পারবে।

—ওর কথা থেকে আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি।

সিগারেটের ধোঁয়া রিং করে ওপরে ছেড়ে পা ছড়িয়ে, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে পীয়ের বলে, she is an angel, আমাকে মীনা কতখানি বদলে দিয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই ক্রমশ আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছিলাম। যখন একেবারে শেষ মাত্রায় এসে পৌঁছেছি, তখন হল মীনার সঙ্গে দেখা। মীনা আমার সেই হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে, এখন আবার মনে হচ্ছে মানুষের মধ্যে অনেক কিছু ভাল আছে। স্বভাবত সে শয়তানের অনুচর নয়। শয়তান তাকে করা হয়, তার জন্যে হয়ত সমাজ দায়ী, হয়ত এ সভ্যতা দায়ী, কিন্তু সে নিজে দায়ী নয়। এ বিশ্বাস ফিরে না পেলে আমি বেঁচে থাকার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন আমি তা পেয়েছি। এখন আমার চোখে উজ্জ্বল আশা। তাই তো মীনাকে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করেছি।

সৌরেন ধরা গলায় বলে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও, তাঁর করুণা লাভ কর।

পীয়ের বলল, ধন্যবাদ সৌরেন, তোমার এই শুভ কামনার জন্যে। একটু থেমে বলে, যখনই ভাবি আমার জন্যে মীনাক্ষী তার ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে দিয়েছে তখনই মনে হয় তাকে যেন আমি সুখে রাখতে পারি, তার অভাব

যেন পূরণ করতে পারি। কোনদিন ওর চোখে জল দেখলে আমি কিছুতেই শান্ত হতে পারি না, ওর হাসি উজ্জ্বল প্রসন্নতায় আমার মন ভরিয়ে দেয়। ওর আনন্দ আমাকে কোন এক স্বর্গীয়লোকে নিয়ে যায়, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না সৌরেন।

সৌরেন পীয়েরের হাতের উপর চাপ দিয়ে বলে, তোমাদের দুজনকে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি পীয়ের।

পীয়ের এবার গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, মীনাক্ষী বোধ হল লজ্জায় তোমায় বলে নি, আমরা আশা করছি এই বছরেই আমাদের সংসারে নতুনের আবির্ভাব হবে।

সৌরেন হাসবার চেষ্টা করল, সত্যি?

—আমরা দুজনেই খুব খুশী হয়েছি। আমি অবশ্য জানি মীনাক্ষী চায় ছেলে তবে যদি মেয়ে হয়—

পীয়ের অনেকক্ষণ ধরে তাদের সংসারের কথা বলে গেল, ছেলে হলে কি করবে, মেয়ে হলেই বা তার কি প্ল্যান, বাড়ি ঘরদোর কিভাবে সাজাবে, কোথায় পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করবে আরও নানান গল্প।

তারপর একসময় মীনাক্ষী এল। তারা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে, টিউব স্টেশনের দোরগোড়ায় গিয়ে বিদায় চেয়ে নিল সৌরেন।

—খুব আনন্দ হল তোমাদের সংগে আলাপ করে, এখন আমি চলি।

মীনাক্ষী দুষ্টুমি করে হেসে বলল, বিয়ের নেমন্তন্নয় আমাদের বাদ দিয়ো না। কে বলতে পারে খাওয়ার লোভে বেলজিয়াম থেকে হয়ত চলেই আসব।

পীয়ের সৌরেনের করমর্দন করে বলল, এলিজাবেথকে বলো আমাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল, যেদিন যখন খুশি তোমরা আমাদের গেস্ট হতে পার।

হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরেন নেমে গেল টিউব স্টেশনে।

এ সেই মীনাক্ষী যে কলকাতার বাড়িতে ছাদের উপর বসে দূর আকাশের একলা তারার সংগে নিজেকে তুলনা করত? এ সেই মীনাক্ষী যে লণ্ডনে এসেও নিজেকে সন্তর্পণে আলাদা করে রেখেছিল সকলের কাছ থেকে? সৌরেনের মনে পড়ছে ফেলেআসা কতকগুলো বছরের কথা। কতভাবেই না সে মীনাক্ষীকে দেখেছে, পীয়েরর সংগে তার আলাপ দেখে মনে মনে সৌরেন ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। কারণ, সে ভেবেছিল ও শুধু দুদিনের আলাপ। সত্যিকারের প্রেম তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে কতখানি ভুল সে করেছিল। মীনাক্ষী আর পীয়েরকে দেখে তার মনের সব সংশয় দূর হয়েছে। তাদের সুখের সংসারে নতুন অতিথি আসছে. তার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে বসে আছে ওরা।

এ কথা মনে হতে নিজে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সৌরেন। কেন সে ওই রকম আনন্দ করতে পারছে না? কেন ভরসা দিতে পারছে না এলিজাবেথকে? সংগে সংগে কানে ভেসে এল মীনাক্ষীর কথা, সে তাকে ভাবের ঘরে চুরি করতে বারণ করেছে। এই প্রথম সৌরেনের মনে প্রশ্ন জাগল, সে কি সত্যি এলিজাবেথকে ভালবাসে? সে কি মনে করে এলিজাবেথকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? কই, মনের দিক থেকে কোন সাড়া তো সে পেল না। অন্ধকার বিরাট গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে যেন চিৎকার করে প্রশ্ন করল। ফিরে এল তার প্রতিধ্বনি, কিন্তু কোন উত্তর তো এল না। সৌরেন ছাড়া আর কেই বা এ প্রশ্নের জবাব দেবে?

এই প্রসঙ্গে আর একজনের চিন্তা তাকে তাড়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সে হল মীনাক্ষীর অতুলমামা। ভদ্রলোককে সে নিজেও দেখেছে। মীনাক্ষী বরাবর বলত, বিবাহিত জীবনে অতুলমামা সুখী হন নি। কিন্তু সেই সুখী না হওয়ার পরিণতি যে এই রকম মারাত্মক হওয়া সম্ভব তা ভাবতেও পারে নি সৌরেন। সর্বজনপরিত্যক্ত অসুস্থ অতুলমামার রিক্ত জীবনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সৌরেন।

কে বলতে পারে, তার নিজের ভবিষ্যৎ কি! তার জন্যেও হয়ত এমনি করে একজন করুণা প্রকাশ করবে। অপারগ অবস্থায় তাকেও হয়ত কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে থাকতে হবে এই দূর বিদেশে। নিজের বোকামির জন্যে তার দুঃখ হল। কেন সে আগে থেকে সাবধান হল না? কেন এ ভুল করল, যার জন্যে সারাটা জীবন শুধু অনুশোচনা করে কাটাতে হবে?

সৌরেনের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। শরীরটা খারাপ লাগছে নাকি? পিকাডেলী স্টেশনে নেমে পড়ল সৌরেন। ওপরে উঠে এল। এখান থেকে বাসে করে বাড়ি ফিরে যাবে, আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা ভাল।

আন্তর্জাতিক ঘড়ির সামনে এসে অল্পক্ষণের জন্যে সৌরেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গত ক' বছর লন্ডনে থাকাকালীন কত লোকের সঙ্গে এইখানে দেখা করেছে। চারদিকে ঝলমলে আলো লাগানো এই টিউব স্টেশনটা তার অতি প্রিয়। একদিকে ব্যস্ত মানুষের ভিড়, আর একদিকে যারা বেড়াতে আসে এরকম কত লোক। বেশ দেখতে লাগে।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সৌরেন ফিরে তাকাল, হাসতে হাসতে মলিনা এই দিকে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে হারীন সোম। দুজনেই সানন্দে গল্প করছে। সৌরেন শুনতে পেল মলিনা দাস আবদেরে সুরে বলছে, না না, অত দাম দিয়ে তুমি আমার জন্যে কোটটা কিনো না। আমার খারাপ লাগছে।

হারীন সোম নীচু গলায় উত্তর দিল, প্লীজ মলি, তুমি আর আপত্তি করো না। আমি তাদের টাকা দিয়ে ফেলেছি।

—এই ক'দিনে তুমি আমার জন্যে কত টাকা নষ্ট করলে বল তো।

—কোন মেয়ের জন্যে খরচ করে এই প্রথম আনন্দ পেলাম।

—তোমার দাদাও কিন্তু এই কথাই বলত।

—আঃ, দাদার কথা বলে আর আমায় বিরক্ত করো না।

হাসতে হাসতে ওরা দুজন সৌরেনের সামনে দিয়ে চলে গেল। একবার ফিরেও তাকাল না মলিনা দাস, ভাব দেখাল সে তাকে চেনেও না।

আশ্চর্য হল সৌরেন। এও কি সম্ভব? যে সোম সাহেবকে নিয়ে রাত কাটাত মলিনা দাস, আজ তার ভাইকে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি বোকা ওই হারীন সোম! সে কি বুঝতে পারছে না কতখানি বোকামি করছে সে?

মাথাটা বোধ হয় সৌরেনের ঘুরছিল, চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা বিরাট মাকড়সার জাল। একটা পোকা পড়ে তার উপর ছটফট করছে, আস্তে আস্তে এগিয়ে অসছে মকড়সা। একটু বাদেই ওই পোকাটার সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে মেরে ফেলবে মাকড়সা। উঃ কি নিষ্ঠুর!

পোকাটার জন্যে সৌরেনের অনুকম্পা হল। কিন্তু ওই পোকাটা কে?

হারীন সোম? কেন জানা নেই সৌরেনের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল, মনে হল ওই একই প্রশ্ন কে যেন তার দিকে ছুঁড়ে মারছে, হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে তার মাথায়। একঘেয়ে আঘাতের শব্দ। সমস্ত চিন্তা গুলিয়ে গেল।

মনে হল পোকাটা আর কেউ নয়, সে নিজে।

এ এক বিচিত্র অনুভূতি।

দু' দিন ধরে সৌরেন অফিস যেতে পারল না। বাড়ি ফিরল না সময় মত, এমনকি লীলাদের ফ্ল্যাটেও গেল না। রাত্রে শোবার সময়টুকু ছাড়া মাঠে মাঠে সে ঘুরে বেড়িয়েছে।

কেন জানা নেই সৌরেনের সব সময় মনে হয়েছে সে একা নয়, তার সঙ্গে আর একজন কেউ রয়েছে। কিন্তু কে সে, প্রথমটা সৌরেন বুঝতে পারে নি।

রিজেন্ট পার্কের বেঞ্চিতে সন্ধ্যের পর বসে থাকতে থাকতে সৌরেনের গা ছমছম করে উঠল। মনে হল তার গা ঘেঁষে বসে আছে সেই অন্যজন। যে তাকে দিন নেই রাত নেই ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে।

সৌরেন সভয়ে প্রশ্ন করল, কে তুমি? কি চাও? কেন আমাকে এভাবে বিরক্ত করছ?

সে উত্তর দিল, আকাশ পাতাল মাথামুণ্ডু এত ভাবছ কি? যা হবার তা হয়ে গেছে, এলিজাবেথকে বিয়ে করে ফেল, সব হাঙ্গামা মিটে যাবে।

সৌরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তুমি আমার বাড়ির কথা জান না তাই বলছ, আমার মা—

সে থামিয়ে দিয়ে বলল, যখন এলিজাবেথের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলে তখন মনে পড়ে নি?

—আমি ভেবেছিলাম মায়ের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়ে তারপর বিয়ে করব। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তারপর তো আর অনুমতি চাওয়ার কোন উপায় নেই। বিয়ে আমায় করতেই হবে।

সৌরেনের ম্লান মুখখানা দেখে সে হেসে ফেলল, বলল, তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল বুড়ো খোকা। কোনদিন কারুর দায়িত্ব নিতে শেখ নি বলে এলিজাবেথের ভার নিতে তোমার এত কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া এ কথাও সত্যি এলিজাবেথকে তুমি ভালবাস না।

সৌরেন ওর কথার ধরনে বিরক্ত হয়, রুখে উঠে বলে, কে বলে সে কথা? আমি তিন সত্যি করে বলতে পারি, লিজিকে আমি ভালবাসি, তাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সৌরেনের কথাটা সে যেন কানে তুলল না। হো হো করে হেসে উঠে বলল, মিথ্যে কথা বলে বলে তোমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে নিজের কাছে মিথ্যে বলতেও তোমার লজ্জা করছে না।

—কি বলছ যা তা?

—আমি ঠিক কথাই বলছি, তুমি ভীতু, তুমি কাপুরুষ।

—তার মানে?

সে চড়া গলায় বলে, যদি সৎসাহস থাকে আজই মনস্থির করে ফেল, বিয়ে কর এলিজাবেথকে। আর যদি না বিয়ে করতে চাও স্পষ্ট জানিয়ে দাও সে কথা। দোহাই তোমার, আকাশ-পাতাল ভেবে মুখ ভার করে বসে থেকো না।

আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না সৌরেনের, বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। পেছনে পায়ের শব্দ হচ্ছে, সৌরেন বুঝতে পারল সে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আসছে, এক মিনিটের জন্যেও সৌরেনকে চোখের আড়াল করছে না। কিন্তু কে ও?

এ কি শুধু তার চিন্তার প্রতিধ্বনি? তাও তো সম্ভব নয়, সৌরেনের সঙ্গে তো তার কথার কোন মিল নেই। সৌরেন যা বলছে তাকে উড়িয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করছে নতুন ঢঙে। তবে কি সে বিবেক? তাই বা কি করে সম্ভব? সে তো বলছেই, প্রেম না থাকলে এলিজাবেথকে বিয়ে করার কোন অর্থ হয় না। কারুর বিবেক, এলিজাবেথ অন্তঃসত্ত্বা জেনেও এ ধরনের অন্যায় কথা বলতে পারে না।

তবে কি এ সৌরেনের অবচেতন মন? তাও তো নয়। অবচেতন মনের প্রকাশ বেশীর ভাগ সময় স্বপ্নের মাধ্যমে। আর নয়ত অবচেতন মন যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সচেতন মন স্তিমিত হয়ে যায়, উৎপত্তি হয় মানসিক বিকারের।

তবে যে তাকে সর্বক্ষণ এভাবে বিরক্ত করছে সে কে? সৌরেনের মনে হচ্ছে সে যেন আর একজন লোক। সে এবং সৌরেন দুজন পৃথক ব্যক্তি, দুজনের পৃথক সত্তা। একজন ভীরু দুর্বল, আর একজন বেপরোয়া যুক্তিবাদী।

রাতের পর রাত ঘুমতে পারে নি সৌরেন, সেই লোকটা তার খাটের কাছে বসে পাহারা দিয়েছে। ক্ষিধে পেলেও ভাল করে খেতে পারে নি। সে এসে নজর দিয়েছে তার খাবারে। স্নানের ঘরে ঢুকেও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি, বার বার দরজায় টোকা মেরে জানিয়ে দিয়েছে, সে সৌরেনের জন্যে বাইরেই অপেক্ষা করছে।

এই রকম যখন সৌরেনের মনের অবস্থা, উত্ত্যক্ত, বিরক্ত, সেই পরিমাণে অনুতপ্তও, ঠিক এই সময় হঠাৎ একদিন ফিরে এল এলিজাবেথ। সৌরেনকে সে দেখে প্রথমটা চিনতে পারল না। শুকনো গাল, কোটরগত চোখ, চোখের তলায় কালি পড়েছে। এলিজাবেথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোমার সৌরেন?

সৌরেন কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এলিজাবেথের দিকে।

—কি দেখছ অমন হাঁ করে?

সৌরেন থেমে থেমে বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর লিজি।

এলিজাবেথ কাছে এসে সৌরেনের কাঁধের উপর হাত রাখে।

সৌরেন বলে যায়, আমার উচিত ছিল তোমাকে দুর্ভাবনার মধ্যে না ফেলে রেখে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলা।

এলিজাবেথের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, আমি তো নিশ্চিন্তই আছি সৌরেন।

সৌরেন নিজের মাথায় হাত দিয়ে আঘাত করে, কেন যে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না, কেন যে আমি মায়ের কথা ভাবছি, কেন যে মনে হচ্ছে অতুলমামার মত আমাদের জীবনটাও না নষ্ট হয়ে যায়, কেন যে মনের জোর করতে পারছি না মীনাক্ষীর মত! যদি আর ক'টা মাস আমি সময় পেতাম—

এলিজাবেথ মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, তা'হলে কি করতে?

—আমি একবার দেশে যেতাম, মাকে বুঝিয়ে আসতাম, তা'হলে আর কোন হাঙ্গামা থাকত না, দেখতে আমরা কত সুখী হতাম।

—বেশ তো, ঘুরে এস না।

সৌরেন মাথা নাড়ে, তা হয় না। আর দেরি করা আমার উচিত নয়। তাতে আমাদের দুজনেরই বিপদ।

এলিজাবেথ সৌরেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, আমি নিজেই যদি যাবার অনুমতি দিই তোমার আপত্তি কিসের?

সৌরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তা হয় না লিজি। তা না হলে তো আমি মোটামুটি একরকম ঠিকই করেছিলাম লীলা আর অমিতাভর সঙ্গে একই জাহাজে কয়েক দিনের জন্য অন্তত দেশে ফিরে যাব।

এলিজাবেথ জোর দিয়ে বলল, বেশ তো, তাই যাও, ঘুরে এস।

—না, এখন তা হয় না।

এলিজাবেথ অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়ায়, সৌরেন, একটা কথা তোমাকে খুলে বলা দরকার।

সৌরেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বল লিজি।

সৌরেন, তোমাকে যে আমি বলেছিলাম আমি অন্তঃসত্ত্বা সেটা মিথ্যে কথা।

সৌরেন চমকে উঠল, কি বলছ লিজি?

এলিজাবেথ ধীর স্বরে বলে, আমি শুধু যাচিয়ে দেখছিলাম এ ধরনের কোন বিপদ জীবনে এসে পড়লে, তুমি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পার কিনা।

সৌরেন সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, কি দেখলে লিজি?

এলিজাবেথ স্পষ্ট জানায়, কিছু মনে করো না সৌরেন, দেখলাম তুমি নিতান্ত নাবালক, বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত মনের জোর তোমার নেই।

সৌরেনের আত্মাভিমানে ঘা লাগে, চেঁচিয়ে উঠে বলে, তার মানে তুমি এতদিন আমাকে পরীক্ষা করছিলে?

—একরকম তাই।

—ছি ছি, এ রকম ব্যবহার আমি তোমার কাছ থেকে মোটেই আশা করি নি লিজি। তুমি জান এ ক'দিন কিরকম আমি চিন্তা করেছি? একটা মিনিটের জন্যে শান্তি পাই নি। আর তুমি আসলে আমাকে নিয়ে মজা করছিলে?

এলিজাবেথ সংযত অথচ কঠিন সুরে বলল, মজা করি নি সৌরেন, নিজের ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিলাম। দেখছিলাম, তুমি মুখে যা বল কাজে তা করতে পার কিনা, ভাবছিলাম, তোমাকে বিয়ে করা আমার উচিত হবে কিনা।

সৌরেন তিক্ত গলায় প্রশ্ন করে, কি দেখলে ভেবে?

—বিয়ে করলে আমরা ভুল করব। অতুলমামাদের মতই ট্র্যাজিক পরিণতি হবে আমাদের।

—অতএব তোমার বক্তব্য কি?

এলিজাবেথ নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করে, let us part as friends।

চেঁচাতে গিয়ে সৌরেনের গলার আওয়াজ বিকৃত শোনাল, এ তুমি কি বলছ লিজি?

—অনেক ভেবে-চিন্তে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। বিশ্বাস কর সৌরেন, তোমাকে আমি আজও ভালবাসি। সেইজন্যেই বুঝতে পেরেছি তোমার দেশ, তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে আমি তোমাকে শুধু অসুখীই করব তাই নয়, সারা জীবনটা তোমার নষ্ট হয়ে যাবে।

সৌরেন কোন কথা বলতে পারল না, তার চোখে জল এল।

এলিজাবেথ বলে যায়, জানি আমার এ কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে, বুঝি এর জন্যে তুমি দুঃখও পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখো এর ফল ভাল হবে সৌরেন। তা'ছাড়া, এটাকে বিচ্ছেদ বলে নাই-বা ভাবলে। দেশে যাও, মনটা ভাল কর, আবার যদি ফিরে আসতে ইচ্ছে কর নিশ্চয় এস। আমার বন্ধুত্বে তুমি আস্থা রাখতে পার পুরোমাত্রায়।

সৌরেন ধরা গলায় বলে, কিন্তু এলিজাবেথ, আমি যে সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।

এলিজাবেথ ম্লান হেসে উত্তর দেয়, সে কথা তো আমি কোনদিন অস্বীকার করি নি সৌরেন।

—তবে এ মিলনে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

—বোধ হয় এই জন্যে যে, আমাদের দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটা বেশী যা এতদিন ধরা পড়ে নি, এখন হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেই জন্যেই মনে মনে স্থির করেছি এদেশে তোমাকে ধরে রাখব না, পাঠিয়ে দেব তোমার মায়ের কাছে। আমার বিশ্বাস সেখানে ফিরে গেলে তুমি শান্তি পাবে, সুখী হবে।

সৌরেনের পৌরুষ বিদ্রোহ করল, মনে হল এলিজাবেথ আজ তাকে পুরোপুরি বোকা বানিয়েছে, অপমান করেছে। সে কিছুতেই মুখ বুজে এ অপমান সহ্য করবে না। এলিজাবেথের কোন ওজর-আপত্তি সে শুনবে না। তাকে সে বিয়ে করবে। লণ্ডনের ভারতীয় মহলে সকলেই জানে সৌরেন ও এলিজাবেথ এনগেজড্, কিছু দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হবে। এখন যদি তারা শুনতে পায় এলিজাবেথ এ বিয়ে ভেঙে দিয়েছে, সকলে হাসাহাসি করবে। না না, সৌরেন কিছুতেই নিজেকে এভাবে তাদের কাছে হাস্যাস্পদ হতে দেবে না।

অনেক রাত পর্যন্ত সৌরেনের চোখে ঘুম এল না, বহুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ ছটফট করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। টোকা মারল এলিজাবেথের দরজায়।

ভেতর থেকে এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল, কে?

—আমি সৌরেন, দরজা খোল।

এলিজাবেথের নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর—এত রাতে কি দরকার?

সৌরেন অনুনয় করে, প্লীজ লিজি, দরজা খোল।

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজা খুলে দিল এলিজাবেথ। সৌরেন এগিয়ে গিয়ে তার হাতদুটি ধরে আবেগভরা গলায় বলে, তুমি এ রকম নিষ্ঠুর হয়ো না, লিজি, আমার উপর এতখানি অবিচার করো না।

এলিজাবেথ শুকনো স্বরে উত্তর দিল, এ সব কথা আলোচনা করার কি এই সময়?

সৌরেন ব্যাকুল হয়ে বলে, আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। তুমি কি বুঝতে পারছ না লিজি, এতদূর এগিয়ে যদি তুমি সরে দাঁড়াও, লোকে কী ভাববে! আমি যে কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

এলিজাবেথ মৃদু হেসে বলল, আশ্চর্য, লোকে কী বলবে; সেই ভাবনাটাই তোমার কাছে বড় হল। এ বিয়ে সুখের হবে কি হবে না, সে কথা ভাববার দরকারও মনে করলে না?

—তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না, লিজি।

—জানি না সব কথা বুঝতে পেরেছি কিনা। তবে এটুকু নিশ্চয় বুঝেছি জীবন সম্বন্ধে তোমার কতকগুলো বদ্ধমূল ধারণা আছে। এ ধারণাগুলো হয়তো তোমার সহজাত, কিংবা জন্মেছে অনেক দিনের জমানো সংস্কার থেকে। সে যাই হক, জীবনটাকে তুমি মিলিয়ে দেখতে চাও ওই ধারণাগুলোর সঙ্গে, যদি মেলে তুমি খুশী হও কিন্তু না মিললেই হতাশ হয়ে পড়। শুধু হতাশ নয়, একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাক।

সৌরেন অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করে, তবে আর মিথ্যে এতদিন আমাকে নিয়ে এভাবে খেলা করার কি দরকার ছিল?

এলিজাবেথ মাথা নেড়ে উত্তর দেয়, খেলা তো করি নি সৌরেন, সত্যিই ভালবেসেছিলাম। ভাল না বাসলে বুঝতে পারতাম না তোমাকে মুক্তি দেওয়াই আমার কর্তব্য।

—দয়া করে আর মহত্ত্বের ঢাক পিটিয়ো না। কানে বড় বেসুরো লাগছে।

এলিজাবেথ সৌরেনের এ রূঢ়তায় আঘাত পেল। বলল, গুড নাইট সৌরেন, আর তর্ক করতে ভাল লাগছে না, আমার ঘুম পেয়েছে।

সৌরেন আগের মতই রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে, তার মানে তোমার কথাই শেষ কথা। আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখতে চাও না?

—আমি তো আগেই বলেছি, let us part as friends।

এ কথায় আরও বিরক্ত হল সৌরেন। কোন রকম জবাব না দিয়ে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না।

কতক্ষণ এভাবে সময় কেটেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হল পায়ের কাছে তার খাটের উপর কে যেন এসে বসল।

ভয় পেল সৌরেন, মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে?

সৌরেন যাকে আশঙ্কা করেছিল, সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল অন্ধকারের মধ্যে থেকে, আর কি ভাবনা, দিব্যি রেহাই পেয়ে গেছ, এবার ভাল ছেলের মত সুড়সুড় করে দেশে ফিরে যাও। মা দেখলে খুশী হবে, রাঙা টুকটুকে বউ আনবে। নির্ঝঞ্ঝাটে ঘর-সংসার করবে, কি বল?

সৌরেন বিরক্ত হয়ে বলে, ওভাবে ঠাট্টা করো না, এলিজাবেথ আমাকে অপমান করেছে।

—করলেই বা, তুমি তো মুক্তি পেয়েছ।

—এ নিষ্ঠুর রসিকতা আমার কাছে অসহ্য।

সে ধমক দিয়ে উঠল, বাজে বকর-বকর আর নাই-বা করলে। তুমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলে এ বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। এলিজাবেথ স্বেচ্ছায় সে মুক্তি তোমায় দিয়েছে। কোথায় তোমার উচিত তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, তা নয় যত রাজ্যের লম্বা চওড়া কথা।

সৌরেন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, তা'হলে এখন আমার কি কর্তব্য?

—অমিতাভর কাছ থেকে টাকা ধার চেয়ে দেশে ফিরে যাও।

—অন্যরা যদি আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে?

সে কৌতুক করে হাসল, তাতে তোমার কী আসে যায়? জানই তো আপনি

বাঁচলে পিতার নাম।

সৌরেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বেশ, তবে তাই হবে।

—এখন নিশ্চিন্ত হয়েছ তো?

—অনেকটা হয়েছি।

সে খুশী হয়ে বলল, আশা করি আর আমার আসবার দরকার হবে না, তোমার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছি।

কথা শেষ করেই সে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। সৌরেন চেষ্টা করেও আর তাকে দেখতে পায় নি। শুধু সেই দিনই নয়, বাকি যে ক'দিন সৌরেন লণ্ডনে ছিল আর সে তার কাছে আসে নি। যখনই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠত তখনই সে আসত, কথা বলত সৌরেনের সঙ্গে, কত সময় তাকে ভর্ৎসনা করত, প্রয়োজনবোধে তিরস্কার করতেও পেছপা হত না। কিন্তু সে রাতে যখন সৌরেন মনঃস্থির করে ফেলল দেশে ফিরে যাবে বলে, আর সে এসে তাকে বিরক্ত করে নি।

পরদিন সকালে উঠে সৌরেন গেল অমিতাভর কাছে। বলল, যদি তুই আমায় টাকা ধার দিস, অমিত, আমি প্যাসেজ বুক করব।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল অমিতাভ, সত্যিই তুমি দেশে ফিরে যাবে, সৌরেনদা?

—হ্যাঁ রে, আর ভাল লাগছে না।

—নিশ্চই টাকা দেব। তা'হলে চল, চেষ্টা করে দেখা যাক আমাদের জাহাজেই জায়গা পাওয়া যায় কিনা। বড় ভাল হয় তা'হলে, তুমি আমি লীলাদি একসঙ্গে যেতে পারি।

প্যাসেজ ওই জাহাজেই পাওয়া গেল।

সুতরাং সেই অনুযায়ী ছুটির দরখাস্ত করা, জিনিসপত্র গোছানো, বন্ধু-বন্ধবের বাড়ি যাওয়া এই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সৌরেন। দেশে ফেরার একটা অজুহাত খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সৌরেন জানাল কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পাবার কথা হয়েছে। নিজে গিয়ে ইন্টারভিউ না দিলে হয়তো ফসকে যাবে। দু'একজন যে এলিজাবেথের কথা জিগ্যেস করে নি তা নয়, কিন্তু সৌরেন উত্তরে বলেছে, আগে দেশে ফিরে চাকরিটা পাকা করে নিই। তারপর এলিজাবেথকে নিয়ে গেলেই হবে। বেকার অবস্থায় মেমসাহেব বউ নিয়ে দেশে ফেরাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ বোধ হয় হবে না। এ কথা যারা শুনেছে সকলেই তারিফ করেছে সৌরেনের। বলেছে খাসা বুদ্ধিমান ছেলে। খুব বিচক্ষণ, সংসারে কখনও ঠকবে না।

তবে সৌরেন কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে বলে যে মনে-প্রাণে খুশী হয়েছে, সে সরোজ। সৌরেনকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে নিয়ে গিয়ে গাঢ় স্বরে বলেছে, তুমি যে ফিরে যাচ্ছ খুব ভাল কথা। ক'দিন থেকে লীলার জন্যে বড় ভাবছিলাম, একলা যাবে জাহাজে, একে ওই মনের অবস্থা, যদি রাস্তায় অসুখ-বিসুখ করে, অমিতাভটা যা বাচ্চ ও কি আর সামলাতে পারবে? তুমি সঙ্গে থাকছ জেনে এখন নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আশ্চর্য রকম বদলে গেছে সরোজ রায়, কে বলবে এ সেই সরোজদা যে একলাই এক'শ ছিল লণ্ডনের প্রবাসী বাঙালীদের কাছে। যে গান করে, হাসির গল্প বলে সকলকে মাতিয়ে রাখত। এ যেন অতি বিচক্ষণ। সাবধানী মানুষ।

এক সময় বলল, সৌরেন আর এ-দেশে ফিরে এসো না।

—এ কথা কেন বলছ, সরোজদা?

—যে চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় যাচ্ছ, যদি পেয়ে যাও ভাল, না পেলে ও-দেশে থেকেই অন্য কাজের চেষ্টা করো, কিন্তু এ-দেশে আর ফিরে এসো না। সরোজের কথাগুলো বড় করুণ শোনাল, কি হবে এখানে থেকে?

সৌরেন সহানুভূতি-ভরা গলায় প্রশ্ন করে, তবে আপনিই বা এখানে রয়েছেন কেন?

—থাকবার আর ইচ্ছে নেই। বিশ্বাস কর সৌরেন, প্রথম সুযোগেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

—কোথায়?

সরোজ উদাস সুরে বলে, দেশে ফিরতে পারলেই সুখী হব সবচেয়ে বেশী, কিন্তু অদৃষ্টে যদি তা না থাকে, চলে যাব জার্মানী। ওরা একটা ভাল চাকরি দিতে আমায় রাজী আছে। রিসার্চের কাজ। কিন্তু লন্ডনে আর নয়।

সৌরেন সায় দিয়ে বলল, সত্যি, আগের সে লন্ডন আর নেই। কোথায় সে হৈ চৈ, কোথায় সে আনন্দ! পুরোনো বন্ধুবান্ধবরা যে যার চলে গেল, এখন রাস্তায়-ঘাটে দেখছি নিত্য-নতুন মুখ। বেশীর ভাগই অচেনা।

সরোজ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, অচেনাও একদিন চেনা হয়ে যায় সৌরেন, একদিন যে রকম তুমি, লীলা, মীনাক্ষী সকলেই অচেনা ছিলে। আজকের যারা অচেনা তাদেরও চেনা করে নিতে পারতাম যদি আগের মত মনটা থাকত। সেই মনটা যে আর নেই ভাই।

সৌরেন কোন কথা বলল না, চুপ করে শুনল।

—আজকাল কি মনে হয় জান, সৌরেন, আর বেশী আলাপ না করাই ভাল। কি হবে মিথ্যে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়িয়ে? কিই বা লাভ?

সরোজের মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনবে ভাবতেও পারে নি সৌরেন, বলল, এ কথা কেন বলছেন সরোজদা? যে প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা আপনার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তার তো কোন তুলনা নেই। লাভ-লোকসানের ওজন করতে বসলে লাভের পাল্লাটাই কি আমাদের অনেক বেশী ভারী হবে না?

সরোজ মৃদু স্বরে বলে, কি জানি ভাই, নিজের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। ভেবে তো ছিলাম সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রবাসী জীবনটাকে আনন্দময় করে রাখব। কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! একজনের এমন অভিমান যে, তা ভাঙাবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না।

কথা বলতে বলতে সরোজের গলা ধরে এসেছিল, উঠে পড়ে বলল, বস সৌরেন। তোমার জন্যে একটু কফি তৈরি করে আনি। সরোজ উঠে গেল। সৌরেনের বুঝতে বাকি রইল না কার অভিমানের কথা স্মরণ করে সরোজদা এতখানি কাতর হয়ে পড়েছেন। তাকিয়ে দেখল সরোজদার টেবিলের উপর প্রমীলার একখানি বড় ছবি। এটি নতুন রাখা হয়েছে। তার পাশেই ধূপদানি।

ছবিতেও প্রমীলার মুখখানা বড় করুণ দেখাচ্ছে। নিষ্পাপ চোখদুটোয় কথা বলবার কী অসীম আগ্রহ।

সৌরেন টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে প্রমীলার ছবিটা দেখছিল, খেয়াল করে নি কখন সরোজ এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

—বড় জীবন্ত ছবি, তাই না?

সরোজের ৮... · ভাঙল, হ্যাঁ, সরোজদা।

—ঠিক যেভাবে প্রমীলা কথা বলত, কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা করত। আশ্চর্য মেয়ে! একটু থেমে সরোজদা নিজের মনেই বলে, ওকে একলা যেতে দেওয়া আমার উচিত হয় নি। শুধু অভিমানে মেয়েটা ওইভাবে শুকিয়ে গেল। আমার দোষ।

—এ আপনি কি বলছেন সরোজদা?

সরোজ তবু অবুঝের মত বলে, আমিই বোধ হয় মেয়েটাকে মেরে ফেললাম।

সেদিন আর বিশেষ কোন কথা হল না। একসময় বিদায় চেয়ে নিয়ে সৌরেন বাড়ি ফিরে এল। রাস্তায় আসতে আসতে সে সরোজের কথাই ভেবেছে। সত্যি, প্রমীলার মৃত্যু তার জীবনের ধারা বদলে দিয়েছে। পীয়ের ঠিকই ধরেছিল, অনুশোচনার আত্মগ্লানিতে সরোজদা এতটুকু মনে শান্তি পাচ্ছে না।

পীয়েরের কথা ভাবতেই মনে হল এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে মীনাক্ষীকে একবার জানিয়ে যাওয়া বোধ হয় উচিত।

পরের দিন সৌরেন ফোন করল ব্রাসেলসে। মীনাক্ষী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল সে কি, কবে ফিরছ?

—সামনের সপ্তাহে।

—কই, লণ্ডনেও তো সেদিন আমাদের বললে না?

সৌরেন মৃদু হাসল, তখনও ঠিক ছিল না যে।

মীনাক্ষী খুশী হয়ে বলল, নিশ্চয় তুমি খুব excited হয়ে আছ? এক মাসের মধ্যে কলকাতায় ফিরবে, মায়ের সঙ্গে দেখা হবে।

—তা একটু হচ্ছি বইকি!

—এলিজাবেথ তা'হলে এখন তোমার সঙ্গে যাচ্ছে না?

সৌরেন এই প্রথম একজনকে স্পষ্ট করে জানাল, এখনও যাচ্ছে না পরেও বোধ হয় যাবে না।

মীনাক্ষী চমকে উঠল, কেন কি হল হঠাৎ?

—সে কথা পরে তোমাকে চিঠিতে জানাব।। তোমাদের খবর সব ভাল তো?

—ভাল। পীয়ের এখন অফিস গেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পেলে আনন্দ পেত।

তিন মিনিট সময় ফুরিয়ে এসেছিল, তাই সৌরেন বলল, পার তো জাহাজে চিঠি দিও।

মীনাক্ষী সম্মতি জানাল, দেব।

—কলকাতায় ফিরে তোম্যর দাদুকে তোমাদের সব কথা জানাব।

—দাদুর কাছে নিশ্চয় যেয়ো, উনি খুব খুশী হবেন।

সৌরেন বলে, সময় হয়ে গেছে। টেলিফোন রেখে দিচ্ছি।

মীনাক্ষী শুভকামনা জানায়। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমার সমুদ্র-যাত্রা শুভ হক। বঁ ভোয়াইয়াজ।

আগামী কাল জাহাজ ছাড়বে।

সৌরেন আজ ইচ্ছে করেই কোনরকম কাজ রাখে নি হাতে। তা ছাড়া করবারও বিশেষ কিছু ছিল না। অফিস থেকে ছুটি হয়ে গেছে আগের দিন। সব কাজ

বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে জ্যাককে। বাজার করার হাঙ্গামা নেই। পয়সা কোথায় যে, পাঁচরকম শৌখিন জিনিস কিনে নিয়ে যাবে? বাক্স-গুছিয়ে ফেলেছিল আগে থেকে। বড় ট্রাঙ্ক দুটো ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে হ্যান্ডলিং এজেন্ট মারফত। এক কথায় বলতে সৌরেন আজ সম্পূর্ণ ঝাড়া হাত-পা।

আজ সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কুয়াশা তখনও পরিষ্কার হয় নি। তবু সৌরেন বাড়িতে বসে রইল না। ব্রেকফাস্ট খেয়ে, গায়ে বর্ষাতি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কোথায় যাবে, আগে থেকে সে ঠিক করে নি। স্টেশন থেকে শহরের টিউব ধরল।

কত কথা আজ মনে পড়ছে। প্রায় সাড়ে তিন বছর সে লন্ডনে কাটিয়েছে। কোথা দিয়ে যে এতগুলো দিন কেটে গেল! আজও সৌরেনের পরিষ্কার মনে পড়ে প্রথম যখন সে লন্ডনে এসে পেঁছিল। অচেনা শহরে ঘুরে বেড়াতে তার অদ্ভুত ভাল লেগেছিল; বিরাট সাজানো শহর, কত সুন্দর সুন্দর দেখবার জায়গা, দোকানপাট, বাড়িঘর সব কিছুর বৈচিত্রে সে মুগ্ধ হয়েছিল। অচেনাকে চেনবার আগ্রহও ছিল প্রবল, তাই সে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছিল লন্ডনের এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায়, এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায়।

ক্রমে লন্ডনের ব্যস্ততার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শিখল সৌরেন। ক্রমে এই অজানা শহর তার কাছে জানা হয়ে গেল। যখনই চোখে পড়ত বন্ড স্ট্রীট, পলমল, চ্যারিংক্রশ রোড, তখনই মনে পড়ত চালর্স ল্যাম্বের লেখার কথা। বেকার স্ট্রীটে ঢুকলেই মনের কোণে উঁকি দিত শারলক হোমস পাইপ মুখে করে রহস্যের তদন্ত করছে। ইস্ট এন্ড আর সোহোর নোংরা অন্ধকার গলির সঙ্গে কত খুন-খারাপি আর রোমান্সের গল্প জড়ানো রয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে লন্ডনের অনেক অঞ্চলের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল আগে থেকে, লন্ডনে এসে সে জায়গাগুলো নিজের চোখে দেখে মনে মনে রোমান্স অনুভব করলে সৌরেন।

সোহোর প্রসঙ্গে মনে পড়ল রজতের কথা। দেশ ছাড়ার পর রজতের সঙ্গে তার আলাপ হয় ওই সোহোর রেস্তরাঁয়। প্রথম দিন তার বোহেমিয়ান কথাবার্তা শুনে কত না আশ্চর্য হয়েছিল সৌরেন। মনে হয়েছিল, রজতের মত প্রকৃত বুদ্ধিমান লোক সে বড় একটা দেখে নি। কি চমৎকার কথা বলার ভঙ্গি, কত অনায়াসে অন্যদের যুক্তিকে সে কেটে ফেলতে পারে! বিয়ে না করেও মারিয়ার সঙ্গে তার বেপরোয়া জীবন যাপনের কথা শুনে প্রথমটা সৌরেন খুশী হতে না পারলেও পরে ওদের দুজনের সঙ্গে মিশে মনে মনে রজতকে শ্রদ্ধা না করে পারে নি, কারণ সে বুঝেছিল, ওই ভাবে দিন কাটাতে সে নিজে অক্ষম। বুঝেছিল রজতের কথাগুলো শুধু ফাঁকা বুলি নয়; যা সে মুখে বলে কাজেও তাই করে।

কিন্তু আজ এই সাড়ে তিন বছর রজতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর সৌরেন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, রজত ভুল করেছে, মারাত্মক ভুল। এতদিন জীবনটাকে নিয়ে সে শুধু পরীক্ষা করছিল, খেলা করছিল আগুন নিয়ে। তাই প্রয়োজনের সময় এতটুকু শান্তি সে পায় নি। মিথ্যে ছুটে বেড়িয়েছে একজন থেকে আর জনের কাছে। মারিয়া কি লরা, মাইকেল কি সৌরেন কেউ তাকে শান্ত করতে পারে নি। নিজের আত্মম্ভরিতায় মত্ত থেকে এতদিন কিছুই সে গ্রাহ্য করত না; কিন্তু দাঙ্গার সময় অসুস্থ রজতকে দেখে, সৌরেন বুঝতে পেরেছে, ভেতরে ভেতরে কতখানি অসহায় সে। ক্ষণে ক্ষণে তার মনের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে সৌরেনের সামনে।

তা দেখে সৌরেন শুধু বিচলিতই হয় নি, হতাশ হয়েছিল পুরোমাত্রায়। রজতের মনগড়া দর্শন যে নৈরাশ্যবাদের নামান্তর মাত্র, এ-কথা সে আগে কখনও কল্পনা করতে পারে নি।

সৌরেনের এ-ধারণা যে অভ্রান্ত, তা আরও ভাল করে প্রতীয়মান হল কদিন আগে সে যখন গিয়েছিল রজতদের সঙ্গে দেখা করে আসতে। রজত এখন সম্পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠেছে। বসেছিল সোফায় একলা। মরিয়া বাড়ি ছিল না। গেছে থিয়েটারে।

সৌরেন কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে শুনে রজতের উজ্জ্বল চোখ দুটো হঠাৎ যেন নিবে গেল। ক্লান্তস্বরে বলল, তুমিও তা হলে ফিরে চললে সৌরেন?

রজতের কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হল সৌরেন। প্রশ্ন করল, তাতে কি হয়েছে?

—একে একে সবাই চলে যাবে। পড়ে থাকব শুধু আমরা।

সৌরেন একটু থেমে বলল, ইচ্ছে করে তো দেশে ফিরে চল না।

রজত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, আমার আবার দেশ কোথায়?

—কেন, বাংলা দেশ কি দোষ করল ?

—না, আমার কোন দেশ নেই। একসময় ভাবতাম, নিজের দেশের কথা চিন্তা করে মনকে সঙ্কীর্ণ করব না, সারা বিশ্বকে আপনার করে নেব। তখন ভেবেছিলাম, কোন জাতির কথা মনে স্থান দেব না, আমার পরিচয় হবে আমি মানুষ। কিন্তু এখন আর এ-বিশ্বাসের মধ্যে কোন জোর পাচ্ছি না।

সেদিন রজত যতক্ষণ কথা বলল, একটিও আশার কথা শোনাল না। একটু পরে মারিয়া ফিরে আসতে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, সৌরেন, তুমি মারিয়ার সঙ্গে গল্প কর, আমি বাথরুম থেকে আসছি।

রজত চলে যেতে মারিয়া তার জায়গায় বসল। কচি কলাপাতা রঙের ফ্রক পরে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল মারিয়াকে। সৌরেনকে দেখে সে সত্যিই খুশী হয়েছিল। বললে, দু দিন থেকে ভাবছিলাম তোমায় ফোন করব সৌরেন।

—কেন, কি ব্যাপার?

—না, ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করব। তবে এখন আর তার প্রয়োজন নেই। যা হক, একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছি।

সৌরেন বুঝতে না পেরে মাথা তুলে তাকাল।

মারিয়া স্থির গলায় বলে, আমি কন্টিনেণ্টে চলে যাচ্ছি। আর হয়তো এখানে ফিরব না।

—হঠাৎ?

—একটা টুরিং কোম্পানীতে ভাল চাকরি পেয়েছি।

সৌরেন অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কিন্তু রজত কি একলা থাকতে পারবে?

মারিয়া কোন জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল।

—কি হয়েছে মারিয়া, আমায় খুলে বল।

মারিয়ার চোখ ছলছল করে উঠল বলে, রজত আর আমাকে চায় না।

—তার মানে?

কথায় কথায় আমাকে অপমান করে, ও যে কি চায় আজও আমি বুঝতে পারলাম না।

সৌরেন চিন্তিত স্বরে বলে, আজকে তাই দেখছিলাম, সারাক্ষণই দুঃখ করছিল।

—ও দুঃখের কোন মানে হয় না সৌরেন! ও যে কি চায়, কেন চায়, তা ও নিজেই জানে না। আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর পারছি না। আর কিছুদিন ওর সঙ্গে থাকলে আমার জীবনটাও frustrated হয়ে যাবে।

এ-কথাগুলো বলতে মারিয়ার কষ্ট হচ্ছিল যথেষ্ট, তবু সৌরেনের কাছে সব বলে ফেলে অনেকটা হালকা মনে হল তার।

সৌরেন একসময় জিগ্যেস করল, পাগলা গেল কোথায়?

—কে, রজত? আমি যতক্ষণ থাকব ও আসবে না।

—কেন?

—আজকাল আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয় না। হলেই তো ঝগড়া, তাই চুপচাপ থাকি। কোনরকমে এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, আমি চলে যাব ইটালি।

সৌরেনের আর ওদের বাড়ি বসে থাকতে ইচ্ছে করে নি, এসব কথা শুনে আরও যেন মনটা ভারী হয়ে উঠে। মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়ে সে চলে আসে।

আজ লন্ডন থেকে বিদায় নেবার আগে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সৌরেনের মনে হল, মারিয়ার কথাই ঠিক, রজতের মত যারা নৈরাশ্যবাদের চোরা-বালিতে পা দিয়েছে, তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা এক রকম অসম্ভব। শুধু রজতই বা কেন, মীনাক্ষীর অতুলমামার সম্বন্ধেও ওই এক কথা। অনুশোচনা আর আত্মগ্লানি তার নিজের জীবনটা তো নষ্ট করেছেই, সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের মনে এনে দিয়েছে ভয়। কে বলতে পারে আইলিন মামীরও হয়তো পুরো দোষ নয়। অতুলমামার ব্যবহার তাকে ক্রমশ উত্ত্যক্ত করে মেরেছে, সেজন্যে শেষ পর্যন্ত স্বার্থপর হয়ে পড়া ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। তা না হলে এই বুড়ো বয়সে সে অতুলমামাকে ডিভোর্স করতে চাইবে কেন?

এদিক দিয়ে ভাবলে আদর্শ মানুষ সরোজদা। সাড়ে তিন বছর ধরে সৌরেন তাকে দেখছে সব রকম কাজে তার কী প্রচণ্ড উৎসাহ। যে কাজটিতে একবার হাত দেবে, তাকে সফল না করে ছাড়বে না। সরোজদার কাছে পরামর্শ চাইলে, বরাবর সে দেয় উৎসাহ, বলে কাজ করে যাও ভাই, মন প্রাণ দিয়ে লেগে পড়, একদিন না একদিন ঠিক ফল পাবে।

সেইজন্যই বোধ হয় সেদিন সরোজদা যখন তাকে বারণ করল এ-দেশে যেন ফিরে না আসে, সৌরেন মনে মনে বিস্মিত হয়েছিল। এ ধরনের নৈরাশ্যজনক কথা সরোজদাকে বলতে আগে সে কখনও শোনে নি। অবশ্য এজন্যে সরোজদাকে দোষ দেওয়া যায় না। প্রমীলা যে তার জীবনের অনেক হিসেব গোলমাল করে দিয়েছে।

আশ্চর্য মেয়ে প্রমীলা! অত্যন্ত মামুলী সাধারণ চেহারা, কারুর সঙ্গে বেশী মিশত না, নিজের মনে থাকত। সে যে সকলের অজান্তে কতখানি তাদের মনকে অধিকার করে বসেছিল, তা প্রথমে কেউ বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারল তার মৃত্যুর পর। সৌরেনের চেয়ে ভাল আর কে এ-কথা জানে? প্রমীলার সঙ্গে তার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না, পিঠ চুলকানো সমিতির মাধ্যমেই যা যোগাযোগ, অথচ প্রমীলার অকালমৃত্যুতে সত্যিই তো সে বিকল হয়ে পড়েছে। কেমন যেন অবসাদ এসেছে এ-জীবনে।

লীলার অবশ্য কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ছিল আগে থেকেই। কিন্তু প্রমীলাকে জন্মের মত হারিয়ে আজ একলা দেশে ফিরে যেতে এতটুকু ইচ্ছে করছে

না তার। বারবার বলছে, কী কুক্ষণে আমি লণ্ডনে এসেছিলাম! কোন্ মুখে আমি মায়ের সামনে একলা গিয়ে দাঁড়াব? কী বলে সান্ত্বনা দেব তাঁকে?

মায়ের কথা ছেড়ে দিলেও লীলাকেই সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় নি সৌরেন। নীরবে বসে থেকে তার দুঃখের কথা শুনেছে।

—আমার সবচেয়ে দুঃখ কেন জান সৌরেন, প্রমীলা আমার উপর অভিমান করে লণ্ডন থেকে চলে গিয়েছিল।

সৌরেন বোঝাবার চেষ্টা করেছে, ওসব কথা এখন ভেবে কী লাভ লীলা?

—না ভেবে যে পারি না সৌরেন। বলতে পার কেন আমার বোন হয়েও প্রমীলা আমাকে ভুল বুঝল? কেন সে বুঝতে পারল না, আমার সব আশা আকঙ্ক্ষা ছিল তাকে জুড়ে?

সৌরেনের কিছু বলার ছিল না, চুপ করে শোনে।

উচ্ছ্বসিত কান্নায় আকুল হয়ে লীলা বলে, এ-কথা সত্যি, আমি সরোজকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু যদি জানতাম প্রমীও তাকে—

কথা শেষ করতে পারল না লীলা, অভিমানে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। প্রমীলা যাতে সুখী হয়, আনন্দে থাকে তার জন্যে সারা জীবন সে চেষ্টা করেছে অথচ এমনই নিয়তির পরিহাস, তাকেই ভুল বুঝল প্রমীলা।

—বলতে পার সৌরেন, কেন প্রমী এভাবে আমাকে নির্মম আঘাত করল? আমি কী দোষ করেছিলাম? সে কি একেবারেই বুঝতে পারে নি, যদি আমি তাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তা না জেনে দিয়েছি! সে কি দেখতে পায় নি, তার সরোজের সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্কই রাখি নি!

সৌরেনকে যখনই একলা পেয়েছে, এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে লীলা।

আজ মনে হচ্ছে প্রমীলার জন্যে সরোজ আর লীলা দুজনের জীবনই বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেল। সরোজ হয়তো জার্মানিতে গিয়ে নতুন রিসার্চ শুরু করবে, কিন্তু বেচারী লীলা? তার কি করার আছে? এতগুলো বছর লণ্ডনে কাটিয়ে কোন লাভই তার হল না। কোন কাজ সে শেখে নি, পরীক্ষাও দেয় নি। শুধু শখের কেরানী হয়ে কলম পিষেছে। অনেক আশা নিয়ে সে বিদেশে এসেছিল।

লীলার দুঃখের বোঝা কমাতে গিয়ে তারই মত আশাহতদের দলে নাম লিখিয়েছে অমিতাভ। তার মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে সে পারল না। একটাও পরীক্ষা না দিয়ে সে দেশে ফিরছে। তার জন্যে মা অনেকগুলো টাকা খরচা করেছেন, ছেলেকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে কষ্ট পাবেন নিশ্চয়। কিন্তু অমিতাভ বেচারা কি করবে? আশৈশব তার উপোসী মন চেয়েছে স্নেহ, চেয়েছে ভালবাসা। সেই স্নেহ-ভালবাসার স্বাদ সে পেল সুদূর লণ্ডনে এসে। লীলার কাছে। এই স্নেহময়ী পাতানো দিদিটির সুখদুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে যদি সে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে থাকে, সে জন্যে তার মন এতটুকু অনুতপ্ত হয় নি। এ সংসারে জমাখরচের খাতা দেখিয়ে অনেকে হয়তো তাকে ঠাট্টা করবে। বুঝিয়ে দেবে জমার চেয়ে খরচ হয়েছে অনেক বেশী। কিন্তু তা নিয়ে এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই অমিতাভর, কারণ সে যা চেয়েছিল, তা সে পেয়েছে। শুধু পেয়েছে নয়, তার পাওয়ার কলসী লীলা ভরে দিয়েছে কানায় কানায়। এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে?

সকালের কুয়াশাটা এতক্ষণে কেটেছে। বৃষ্টিও আর নেই। মাদাম তুসোর মিউ-

জিয়ামের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সৌরেন এসে ঢুকল রিজেন্ট পার্কে। অনির্দিষ্টভাবে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। এই সাড়ে তিন বছরে কতবার করে দেখেছে লণ্ডনের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো। ওই মাদাম তুসোর মোমের পুতুল, উইণ্ডসর কাসেল, টাওয়ার অব লণ্ডন, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা। কমপক্ষে অন্তত বার চারেক করে এক একটা জায়গা সে দেখেছে। নিজের দেখার চেয়ে তাকে দেখাতে হয়েছে অন্যদের, যারা অল্পদিনের জন্যে লণ্ডনে বেড়াতে আসে দেশ থেকে। শেষবার সে ঘুরেছে মলিনা দাসকে নিয়ে। তাও প্রায় মাস তিনেক আগে।

মলিনা দাসের কথা মনে পড়তেই হাসি পেল সৌরেনের। ওই বিচিত্ররূপিণী আবার কন্টিনেন্টে যাচ্ছে—এবার অবশ্য হারীন সোমের সঙ্গে। সত্যি কি অদ্ভুত ওর শিকার ধরার ফন্দি।

ক'দিন আগে সৌরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পল্টুর। ছোঁড়া দামী স্যুট পরেছে, জানাল তার ভাল কাজ হয়েছে। কোন এক জার্মান ফার্মে, তারাই ওকে দুবছর বাদে জার্মানি ঘুরিয়ে কলকাতায় পাঠাবে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার করে।

সৌরেন খুশী হয়ে বলেছিল, কনগ্রাচুলেশন, কি করে এ চাকরিটা বাগালি?

পল্টু একটা চোখ ছোট করে হাসলে, স্রেফ মলিদির জোরে।

—তার মানে?

—মাইরি বলছি। আমাদের ফার্মের ডিরেক্টরের সঙ্গে মলিদি এমন ঝুলে পড়ল যে, সে বেটা আমাকে চাকরি না দিয়ে পারল না।

—তা হলে তোর দিদি একটা কাজ করেছে বল।

পল্টু সকৃতজ্ঞ কন্ঠে বলল, সত্যি, মলিদি না থাকলে এ চাকরি আমি পেতাম না। আমার চেয়ে অনেক ভাল ভাল ক্যাণ্ডিডেট ছিল ওই চাকরিটার জন্যে।

শুনে সৌরেনের তবু ভাল লাগল। মলিনা দাস যে কারুর ভাল করতে পারে এ ধারণা আদৌ তার ছিল না।

আজ রিজেণ্ট পার্কে বসে গত সাড়ে তিন বছরের সালতামামি করতে গিয়ে সৌরেনের মনে হল, দিনগুলো তার বৃথাই কেটেছে। এতদিন যাদের সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তারাও কেউ জীবনে দাঁড়াতে পারল না। কোথায় ভেসে চলে গেল। সৌরেন দেখা করতে গিয়েছিল ব্রেনহিম ক্রেসেন্টের পুরনো বাড়িতে, সেই বেঁটে কেষ্ট আর বাজপায়ীর দল এখনও আগের মত খাটে শুয়ে শুয়ে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে মাথা ফাটাচ্ছে। নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করার তাদের সময় কোথায়? বছরের পর বছরই বা লণ্ডনে কাটিয়ে ওরা কি করবে? এদের দেখে দুঃখ পেয়েছিল সৌরেন।

ঠিক এমনি দুঃখ পেয়েছিল জয় আর ডোরিয়ার কথা শুনে। এলিজাবেথ যেদিন সৌরেনের কাছে বিদায় নিতে আসে সেইদিনই সে ডোরিয়ার কথা বলে যায়। কি ভাবে জয় ও তার আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে পীড়িত হয়ে ডোরিয়া চলে আসে লণ্ডনে, তার ইতিবৃত্তও। জয়ের মত ফুর্তিবাজ ছেলে সৌরেন খুব কম দেখেছে, তার বিবাহ সুখের হয় নি জেনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে সৌরেন। তবে আর জিতল কে? তার জানাশোনা তো সকলেই হেরেছে, অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তো তাই মনে হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় পীয়ের আর মীনাক্ষী। কিন্তু তাদের ভেতরকার কথাও তো পরিষ্কার করে জানা যায় নি।

এই সঙ্গে মনে পড়ছে জ্যাক্ ব্রেন্টের কথা, ওর টেডি বয় ভাই রবার্ট এখনও জেল খাটছে। যত দীর্ঘদিন সে জেলে থাকে জ্যাকের তত সুবিধে। অন্তত তাকে যখন তখন এসে বিরক্ত করতে পারবে না। মনে পড়ছে লিন্ডসে হোপের কথা। কি শয়তান! কতগুলো সুখী পরিবারের সে সর্বনাশ করেছে। অবশ্য ভগবানও তাকে সহজে নিষ্কৃতি দেন নি। গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে। তার চেয়েও বড় শাস্তি হয়েছে বোধ হয় আদালতে। হত্যাকারীর বিচারের সময় লিন্ডসে হোপের সাধুতার মুখোশ খুলে পড়েছে জনসাধারণের সামনে।

লিন্ডসে হোপের কথা ভাবতে গিয়ে সৌরেনের চোখের উপর ভেসে উঠল এলিজাবেথের সুন্দর মুখখানা। ইচ্ছে করে আজ সে ওর কথা ভাবতে চাইছিল না। মতান্তর তাদের মধ্যে যাই হক না কেন, শেষের দিন অতি অল্প সময়ের জন্য সৌরেনের সঙ্গে দেখা করে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বিদায় নিয়ে গেছে এলিজাবেথ। একটাও নরম কথা বলে নি। ডোরিয়া যে লন্ডনে ফিরে এসেছে সেই গল্প শুনিয়ে নিতান্ত ব্যবহারিক গলায় বলল, আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না সৌরেন, তাই আজ বিদায় চেয়ে নিতে এসেছি।

সৌরেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, সে কি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—দেশে। আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। বাবা আমাদের গ্রামে একটা মুদীর দোকান খুলেছেন, আমাকে তার দেখাশোনা করতে হবে।

একটু পরেই এলিজাবেথ চলে গিয়েছিল, ওর কথায় ব্যবহারে এতটুকু আন্তরিকতা ছিল না। সেদিন সত্যি মনে বড় দুঃখ পেয়েছিল সৌরেন।

আজ সারা দিন ধরে সৌরেন একলা ঘুরে বেড়াল লন্ডনের অতিপরিচিত জায়গা-গুলোয় যেখানে যেখানে ও প্রায়ই যেত। এই সাড়ে তিন বছরের লন্ডন-জীবনের সঙ্গে যেখানকার স্মৃতি বিশেষভাবে জড়ানো রয়েছে। ইচ্ছে করেই লাঞ্চ করল লায়ন্স্-এর দোকানে। কতদিন দুপুরে সে এখানে খেয়েছে। বিকেলবেলা কফি খেতে ঢুকল সোহোর সেই অতিপরিচিত কফিঘরে, রজত আর মারিয়ার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত না আলাপ করেছে এখানে বসে। সন্ধ্যের পর লন্ডনের বুকে যখন আলো জ্বলে উঠল, সৌরেন দোতলা বাসের উপরে বসে দেখতে লাগল পিকাডেলী সার্কাস, মার্বেল আর্চ। সাড়ে তিন বছর ধরে যে আলোর বিজ্ঞাপনগুলো দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল তার, আজ সেগুলো আবার দেখল নতুন চোখে। লন্ডনে আজ তার শেষ রাত্রি, কে জানে এ আলোগুলো সে আর দেখতে পাবে কিনা।

সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরে মুখ-হাত-পা ধুয়ে জামা বদলে সে ডিনার খেতে গেল ফিঞ্চলে রোডের ভারতীয় রেস্তরাঁয়। এ রেস্তরাঁয় ঢুকলে কতজনের কথা মনে পড়ে, পীয়ের, মীনাক্ষী, সরোজদা, লীলা, প্রমীলা, অমিতাভ জয়, ডোরিয়া প্রত্যেকের সঙ্গেই সে এখানে বসে খেয়েছে। কখনও কখনও বা সকলে মিলে তিনটে টেবিল জোড়া দিয়ে একসঙ্গে বসে হৈ চৈ করে ভাত ডাল আর চিংড়ি মাছের কারি খেয়েছে। তবে শেষের দিকে ইচ্ছে করে সৌরেন একেবারে পেছনের টেবিলে বসত। আজকেও তাকে ঢুকতে দেখে রেস্তরাঁর মালিক রসিদ আলি খাতির করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল সেই টেবিলে।

এই টেবিলে সে বেশীর ভাগ দিন এসে বসেছে এলিজাবেথের সঙ্গে। এলিজা-বেথ ভালবাসত চাপাটি আর মাংসের কোরমা খেতে। আজও সৌরেন ওই দুটি পদের অর্ডার দিল। রেস্তরাঁ ফাঁকা, দু-চারজন লোক শুধু সামনের দিকে বসে

আছে। সুন্দর ওয়াল-পেপার আর কার্পেট দিয়ে সাজানো ঘর, অতি মৃদু নীল আলো, সৌরেন একলা বসে বসে এলিজাবেথের কথাই ভাবছিল। প্রথম যেদিন দেশলাই চাইতে এসেছিল তার ঘরে, তারপরে কিভাবে তাদের আলাপ গভীর হয়ে উঠল। চিত্রাঙ্গদা রিহার্সালের সময় দিনের পর দিন সৌরেনের সঙ্গে গেছে সরোজ-দার ফ্ল্যাটে। 'পিঠ চুলকানো সমিতি' ভেঙ্গে যাবার পর ওদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারপর লিন্ডসে হোপের মৃত্যুর সময় থেকে এলিজাবেথের সব দায়িত্বই তুলে নিয়েছিল নিজের ঘাড়ে, কিন্তু শেষকালটা সব যেন কিরকম গোলমাল হয়ে গেল। আজকাল একটা প্রশ্ন প্রায়ই সৌরেনকে বিব্রত করে, এলিজাবেথ কি সত্যি তাকে ভালবেসেছিল, না শুধু ক্ষণিকের মোহ। তা না হলে কি করে এত সহজে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সে চলে যেতে পারল।

ইতিমধ্যে রসিদ আলি খাবার দিয়ে গিয়েছিল, অন্যমনস্কভাবে খেতে শুরু করেছিল সৌরেন। একজন দু'জন করে মধ্যে মধ্যে লোক ঢুকছিল রেস্তরাঁয়, সৌরেন যে খুব লক্ষ্য করে দেখছিল তা নয়, হঠাৎ খেয়াল হল ঘন নীল স্কার্ট পরা একটি মেয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চিনতে পারল, সে আর কেউ নয়, এলিজাবেথ। এ সময় এখানে এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না বলেই বোধ হয় সৌরেন প্রথমটা এলিজাবেথকে চিনতে পারে নি, তাড়াতাড়ি সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল, লিজি, তুমি?

এলিজাবেথ সহজ গলায় বলে, আমি জানতাম আজ রাত্রে নিশ্চয় তুমি এখানে আসবে, তাই এলাম দেখা করতে।

কথা বলতে গিয়ে সৌরেনের গলা ধরে এল, তুমি এসেছ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি লিজি—

—কেন, তুমি কি ভেবেছিলে আমি আসব না?

—ঠিক তা নয়।

এলিজাবেথ আগের মত তরল কণ্ঠে বলল, বাঃ সৌরেন, তুমি আমাকে খাওয়াবে না? কই, খাবার অর্ডার দাও!

সৌরেন এতক্ষণ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এলিজাবেথকে ও-রকম সহজ সুরে কথা বলতে শুনে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস লিজি।

এলিজাবেথ বসে পড়ে রসিদ আলিকে ইশারায় কাছে ডেকে হেসে বলল, মিঃ আলি, আমার জন্যে যে মাংসের কোর্মা আনবেন তাতে বেশ করে ঝাল দিয়ে দিন।

সৌরেন বাধা দিয়ে বলল, সে কি, তুমি যে একেবারেই ঝাল খেতে পার না।

—দেখি না চেষ্টা করে, বলা যায় না, ভালও লাগতে পারে তো।

অল্পক্ষণের মধ্যে দু'জনেই আগের মত সহজ হয়ে আলাপ করতে শুরু করল। বেশীর ভাগ অবশ্য পুরনো দিনের কথা, কবে কোথায় কি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা হয়েছিল, সে সব কথা স্মরণ করে আজকে আবার তারা হাসল।

এলিজাবেথ বলল, এ সব দিন আর কখনও ফিরে আসবে না সৌরেন।

সৌরেন উত্তর দেয়, তা কি আর আমি জানি না। সাড়ে তিন বছর তোমাদের দেশে কাটালাম, তার মধ্যে দেড় বছর বোধ হয় শুধু তোমার সঙ্গে।

—কে বলবে দেড় বছর। আজও মনে হচ্ছে যেন সেদিনের কথা। তোমাকে আমি কম জ্বালাতন করি নি, না সৌরেন? কত জায়গায় যে তোমায় ধরে নিয়ে গেছি।

তবে এ কথা সত্যি, তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে এই বিরাট শহরে আমি একলা নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারতাম না।

সৌরেন ভাল করে এলিজাবেথের মুখখানা দেখল, সেখানে পরিহাসের কোন চিহ্নমাত্র নেই, প্রত্যেকটি কথা অন্তর দিয়ে অনুভব করে সে বলছে।

সৌরেন জিজ্ঞেস করল, এতদিন কি তুমি গ্রামেই ছিলে?

—হ্যাঁ, এসেছি আজ, উঠেছি হোটেলে। কাল সকালেই ফিরে যাব।

—কাল ভোরবেলা আমার বোট ট্রেন, তুমি স্টেশনে আসবে?

—না সৌরেন, ওই অনুরোধটি তুমি আমায় করো না। জান তো আমি বড় সেণ্টিমেণ্টাল! বলে এলিজাবেথ হাসতে থাকে, সেখানে তো আর আলি সাহেবের ঝাল কোর্মা পাব না, যার দোহাই দিয়ে চোখের জল লুকতে পারি।

সত্যিই এলিজাবেথের দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে।

সৌরেন অভিভূত হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে. একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব লিজি?

—কি কথা?

—কেন তুমি আমার উপর এতটা কঠিন হয়েছিলে?

—তা না হলে তো তুমি আমাকে একলা রেখে দেশে ফিরে যেতে চাইতে না, সৌরেন।

এলিজাবেথের প্রত্যেকটি কথা কান্নায় ভেজা।

সৌরেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এতে কি তুমি সুখী হবে লিজি?

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে এলিজাবেথ উত্তর দেয়, নিজের কথা তো ভাবি নি, ভেবেছি তোমার কথা। দেশে ফিরে গেলে তুমি সুখী হবে কিনা জানি না, কিন্তু মনে-প্রাণে এটুকু বুঝেছিলাম, আমাকে বিয়ে করার জন্যে যদি তোমাকে এখানে আটকে পড়ে থাকতে হয় তাতে তুমি অসুখী হতে। সেই জন্যেই আমি তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছি, অন্যায়ভাবে কঠোর হয়েছি, তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা কর সৌরেন।

ওদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, সৌরেন এলিজাবেথকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল, এখন কোথায় যাবে?

—যদি আপত্তি না থাকে আমার ঘরে চল।

এলিজাবেথ স্বভাবসুলভ নরম গলায় বলল, চল। আজ আমি তোমার। যেখানেই বল, যাব।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তারা এগিয়ে চলল। অন্ধকার রাত, দূরে রাস্তার আলো জ্বলছে। বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে তার ঝিরঝিরে শব্দ। হাতের মধ্যে হাত দিয়ে তারা হাঁটছে।

সৌরেন বলল, আজ সকাল পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, এই সাড়ে তিন বছরের লণ্ডন বাস আমার ব্যর্থ হয়েছে। কি পেয়েছি তার হিসাব মেলাতে বসে দেখলাম কিছুই পাই নি। অথচ এখন মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে সুখী আর কে? তোমাকে না পেলেও তোমার ভালবাসা যে পেয়েছি এইতেই আমার জীবন ধন্য।

এলিজাবেথ সৌরেনের হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে বলল, এখন বুঝতে

রোই নিজের করে পাওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী আনন্দ, পেয়েও তার ভালর জন্যে তাকে মুক্তি দেওয়ায়। ত্যাগের এ মহিমার কথা আমাদের শাস্ত্রে পড়েছি, অনেকের মুখে শুনেছি, কিন্তু আজ জীবন দিয়ে উপলব্ধি করলাম। তোমাকে না ভালবাসলে এ সত্য আমার অজানা থেকে যেত সৌরেন।

প্রায়রী রোডের বাড়িতে পৌঁছে তারা উঠে গেল তিনতলায়, গিয়ে বসল সৌরেনের ঘরে। কত দিন কত রাত তারা দু'জনে এ ঘরে কাটিয়েছে। হাজারো সুখের স্মৃতিভরা ওই ঘরে আজও তারা পাশাপাশি বসল। দুজনে তাকিয়ে রইল দু'জনের দিকে। অনিমেষ চেয়ে থাকার মধ্যে প্রকাশ পেল যুগ্ম প্রাণের অসহায় আকুতি। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় কাতর দুটি তরুণ হৃদয়। বাইরে রাত্রির নিস্তব্ধতা ক্রমশ বাড়ছে। দু'জনেরই চোখে জল কিন্তু অন্তরে কোন গ্লানি নেই। বিরহ সেখানে এনে দিল না দুঃখের স্রোত, বইয়ে দিল আনন্দের বন্যা। সেই আনন্দের সাগরে তারা ডুব দিল। ভুলে গেল বিচ্ছেদের ব্যথা, ভুলে গেল নিরানন্দময় জীবনের কথা, ভুলে গেল এতদিনের সঞ্চিত মান-অভিমান।

পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল, কিন্তু তারা শুনতে পেল না দেহের কান্না। অনুভব করল হৃদয়ের স্পন্দন, উপলব্ধি করল জীবনের ছন্দ।

এ সেই ছন্দ যাকে খুঁজে পায় না বলেই মানুষে-মানুষে এত পার্থক্য, এত বিচ্ছেদ, এত দ্বন্দ্ব।

ক্রমশ রাত্রি গভীর হচ্ছে।

দুটি ব্যাকুল আত্মার ঐকান্তিক প্রার্থনা, এ মধুর রাত্রি যেন উত্তীর্ণ না হয়, বিচ্ছেদের প্রভাত যেন না আসে।

প্রকৃতির নিয়মে রাত্রি কেটে যাবে। প্রভাতও আসবে।

কিন্তু যারা জীবনের ছন্দ বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে এই একই ছন্দ মানুষের জীবনধারায়, তাকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে পৃথিবীর আদি ও অনন্ত প্রাণীর সঙ্গে, দীক্ষিত করেছে সেই একই প্রাণধর্মে যার সচল সামঞ্জস্যের সন্ধান মানুষ নিয়ত করছে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, তারা নাই বা খুঁজে পেল মিল এ জগতে। কতটুকু তাতে আসে-যায়?

দূরে গির্জের ঘড়িতে প্রহর ঘোষণা করছে। কে বা তার খবর রাখে?